উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৪

ছোটগল্প

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ তিনসঙ্গী।

একক ২ ল্যাবরেটরি।

একক ৩ বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর।

একক ৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – জলসাঘর, তারিণী মাঝি, নারী ও নাগিনী, কালাপাহাড়।

একক ৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প – বেদেনী, ডাইনি, পৌষ লক্ষ্মী, অগ্রদানী ।

একক ৬ তারাশঙ্করের নির্বাচিত দুটি গল্প – পদ্মবউ, খাজাঞ্চিবাবু।

একক ৭ তারাশঙ্করের নির্বাচিত আরও তিনটি গল্প – ডাকহরকরার, ট্যারা, না।

পর্যায় – খ

একক ৮ কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ।

একক ৯ নির্বাচিত গল্প – ফসিল, গোত্রান্তর, অযান্ত্রিক, পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম।

একক ১০ নির্বাচিত গল্প - গরল অমিয় ভেল, কালাগুরু, বারবধূ, কাঞ্চনসংসর্গাৎ, মা হিংসী।

একক ১১ নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

একক ১২ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা পারদর্শিতা।

একক ১৩ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – চোর, রস, চড়াই-উৎরাই, অবতরণিকা।

একক ১৪ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – অভিনেত্রী, রানু যদি না হতো, হেডমাস্টার, হেডমাস্টার, পালঙ্ক।

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৪ ছোটগল্প

একক ৮ কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ - কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষঃ সাধারন আলোচনা।

একক ৯ নির্বাচিত গল্প – ফসিল, গোত্রান্তর, অযান্ত্রিক, পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম - ফসিল, গোত্রান্তর, অযান্ত্রিক, পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম।

একক ১০ নির্বাচিত গল্প - গরল অমিয় ভেল, কালাগুরু, বারবধূ, কাঞ্চনসংসর্গাৎ, মা হিংসী - গরল অমিয় ভেল, কালাগুরু, বারবধূ, কাঞ্চনসংসর্গাৎ, মা হিংসী ।

একক ১১ নরেন্দ্রনাথ মিত্র - সাধারণ আলোচনা, নরেন্দ্রনাথ ও ছোটগল্প, নরেন মিত্রের গল্পে নারী চরিত্র, নরেন মিত্র ও বাস্তববাদ, কয়েকটি গল্প বিচারে সমসাময়িকতা, নতুনধারা, মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, ।

একক ১২ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা পারদর্শিতা - শহুরে জীবন ও নরেন মিত্র, চরিত্র, বিষয়, বিদেশী প্রভাব, গল্পে শিল্পী চরিত্র, জটিল প্রেম, জীবন মৃত্যু ও নরেন মিত্র, ছোটদের নরেন মিত্র, ।

একক ১৩ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – চোর, রস, চড়াই-উৎরাই, অবতরণিকা - চোর, রস, চড়াই-উৎরাই, অবতরণিকা।

একক ১৪ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – অভিনেত্রী, রানু যদি না হতো, হেডমাস্টার, হেডমাস্টার, পালঙ্ক - অভিনেত্রী, রানু যদি না হতো, হেডমাস্টার, হেডমাস্টার, পালঙ্ক।

একক ৮ কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ

বিন্যাস ক্রম

৮.১ কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষঃ সাধারন আলোচনা

৮.২ অনুশীলনী

৮.৩ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষঃ সাধারন আলোচনা

বিক্রমপুরের বহর গ্রাম পৈতৃক নিবাস হলেও সুবোধ ঘোষের জন্ম বিহারের হাজারিবাগে, ১৯১০ সালে। সেখানেই তার শিক্ষা। ছাত্রাবস্থায় হাজারিবাগের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ঋষি মহেশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে ও তাঁর স্নেহ-আনুকুল্যে হারে অবাধে অধ্যয়ন করেছেন। কল্লোল-উত্তরকালে আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্তাধিকারী সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে তিনি কোলকাতায় সাংবাদিকতার কাজে যোগদান করেন। এ সময়ই ১৯৪০ সালে ‘ফসিল’ আর ‘অযান্ত্রিক’ নামে তার দুটি গল্প বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর স্থায়ী আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছে। সুবোধ ঘোষের রচনায় বাস্তব জীবনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে বাস্তব কল্পনার মায়া-কাজল লাগানো রঙিন বাস্তব নয়। সে বাস্তব সাধারণ মানুষের জীবনের কঠোর, কঠিন ও রূঢ় বাস্তব। উপন্যাস ও ছোটগল্প কথাসাহিত্যের দুটি ধারাতেই তার দক্ষতা প্রমাণিত হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিশ শতকের অন্যতম ছোটগল্পকাররূপে।

ছোটগল্প ঃ সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। তার সে অভিজ্ঞতা বিচিত্র। সার্কাসের আসরে অংশগ্রহণ, পনেরো বছর বয়সে রোজ সকালে এক মাইল পথ হেঁটে উকিলবাবুর বাচ্চাদের দশটাকা মাইনেয় পড়াতে যাওয়া এবং একদিনের গরহাজিরীতে বেতন কেটে নেওয়া, সাংবাদিকতা শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তাঁর গল্পে সে অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে অভিনব ভাবে। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে তাঁর প্রবেশ ‘অযান্ত্রিক’ গল্পের মাধ্যমে। দ্বিতীয় গল্প ‘ফসিল’। এরপর একে একে অনেক গল্প লিখেছেন সুবোধ ঘোষ। তার প্রথম গল্পের বই ‘ফসিল’ (১৯৪০)। এরপর প্রকাশ পায়—‘গ্রামযমুনা’ (১৯৪৪), ‘কুসুমেষু’ (১৯৫৬), ‘পলাশের নেশা’ (১৯৫৭), ‘মনোবাসিতা’ (১৯৫৭), ‘নিতসিন্দুর’ (১৯৫৮), ‘জতুগৃহ' (১৯৬২), ‘নিকষিত হেম’ (১৯৬৩), ‘রূপনগর’ (১৯৬৪) প্রভৃতি।

সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’ গল্পে যন্ত্র আর মানুষের সম্পর্ক যেভাবে ফুটে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ‘মুক্তধারা’ নাটকে যন্ত্রকে অভিশাপ দিয়েছেন, ‘পক্ষীমানব’ কবিতায় গল্পের ঔদ্ধত্যকে স্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু সুবোধ ঘোষ হয়ে উঠেছেন সেই যন্ত্রের সমব্যথী। বিমলের দীর্ঘদিনের সাথী একটি ফোর্ড ট্যাকিস যে ট্যাকিস তার ভরণপোষণ করেছে দীর্ঘদিন। এখন সেই ট্যাকিস পুরানো ও জীর্ণ হয়ে উঠেছে। সবাই উপদেশ দিয়েছে একে (জগদ্দল) বিক্রি করে দিতে। কিন্তু বিমল তা করে নি। তার যথাসবস্ব ব্যয় করে যে জগদ্দলকে সারিয়ে তুলেছে। শেষ রক্ষা করতে পারে নি সে। শেষে গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে লোহা লক্কড়ের দামে। সে সময় অচেতন যন্ত্রের প্রতি চেতন মনের যে বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছে তা অতুলনীয়। সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্প ‘ফসিল’ বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল স্মারক। সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মূল লক্ষ্য যে মানব শোষণ এবং আত্ম উন্নয়ণ, তাই ব্যক্ত হয়েছে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। অঞ্জনগড়ের মহারাজার ম্যানেজার হয়ে এসে মি. মুখার্জী আপন পরিকল্পনায় রাজ্যের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলেন—কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রকেই বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের জন্য নব পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বিবাদ বাঁধে খনির মালিকদের সঙ্গে। মহারাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মালিকের আচরণে এ সময় খবর মেলে খনির পিট ধ্বসে অনেক শ্রমিকের খনিগর্ভে মৃত্যু হয়েছে। খনিমালিকদের কব্জা করা যাবে ভেবে মহারাজ উল্লসিত হয়েছেন। কিন্তু কিছু পরেই খবর আসে তার সিপাইদের গুলিতে জঙ্গলে কাঠ কাটতে আসা কিছু কুর্মী প্রজা মারা গেছে। দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে একটা প্রতিবাদ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মিঃ মুখার্জীর কূটকৌশলে এক অমানবিক উপায়ে

শ্রমিক খুন সমস্যা ও প্রজা খুন এ সমস্যা উভয়ই গেল মিটে। দুলাল মাহাতোর দেহ সহ সব মৃত কুলির দেহ গর্তে ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হল ধ্বসে পড়া পীট। গল্প শেষে লেখকের বিশ্লেষণ অত্যন্ত তীব্রভাবে পাঠককে বিদ্ধ করে, "লক্ষবছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল যারা আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিট স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই লাল রক্তের কোন দাগ নেই।"

সভ্যতা ও সংস্কৃতি গর্বে গর্বিত মানুষের অনুভূতিকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে 'সুন্দরম', 'পরশুরামের কুঠার' আর 'তিন অধ্যায়' গল্প তিনটি। ঋষি বালকের মতো সুন্দর চেহারা সুকুমারের। সে শুদ্ধাচারী, জপতপ করে, তার বিবাহের জন্য কোন পাত্রী আর পছন্দ হয় না। সুকুমারের বাবা পুত্রগর্বে গর্বিত। কিন্তু তাদের ঘরে ভিক্ষা চাইতে আসতো বেদেনীর মেয়ে তুলসী। যেন কোন এক ডাকিনীর কালিমাখা মূর্তি। সেই কুদর্শন নোংরা মেয়ের গর্ভে সবার অলক্ষ্যে আসে সুকুমারের সন্তান। একথা জানতে পেরে বাবার বিষ ওষুধ সরিয়ে সে পাঁউরুটিতে তা প্রয়োগে তুলসীকে হত্যা করে নিজের পাপের চিহ্ন মুছে ফেলেছে। তাই গল্প শেষে লেখকের তির্যক খোঁচায় উচ্চারিত হয়েছে মর্গের ধাঙড় যদুর মুখে, "শালা বুড়ো, নাতির মুখ দেখছে।" এ গল্পে মৃত শিশুর বর্ণনায় লেখক যে শব্দরাশির প্রয়োগ করেছেন তা যেন এক অসাধারণ জীবন্ত চিত্র— "ডাক্তার মৃতার পেট থেকে বের করে আনলেন শিশুটি। মাতৃত্বের রসে ঊর্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট, কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।"

'পরশুরামের কুঠার' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধনিয়া। যে বহুপরিচর্যাকারিণী। ভর্তৃহীনা নারীর কাজ দু'তিন বৎসর অন্তর একবার হাসপাতালে গিয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজের স্তন সুধাধারার রস প্রবাহ বজায় রাখা। কারণ অভিজাত ঘরের সন্তানেরা যে তারই বক্ষসুধায় পালিত হয়। নিজের সন্তানদের দায়িত্ব তাই সে নিজে নিতে পারে না। সমাজে সবার ঘরে এক এক সময়ে আপ্যায়িত এ নারী, বাজারে বেবি ফুডের আমদানি

ঘটলে তার কদরও যায় কমে। তখন তাকে বাজারের খাতায় নাম লেখানোর জন্য অভিজাতরাই চাপ দিতে থাকে। সামাজিক বিধান পরশুরামের কুঠারের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হয়ে ধনিয়ার জীবনকে শেষ করতে চায়।

সুবোধ ঘোষের লেখা প্রেমের গল্পেও রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা,রহস্যের ধুপছায়া। দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রমণীদের প্রেমের কথাকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন লেখক ‘বারবধূ’, ‘ঠগিনী’, ইত্যাদি গল্পে।‘জতুগৃহ’ গল্পে দেখানো হয়েছে প্রেমহীনতার চরম রূপ। শতদল ও মাধুরী পরস্পর ভালোবেসে বিয়ে করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মতান্তর, মনান্তর এবং বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দীর্ঘদিন পর এক রেলের ওয়েটিং রুমে ঘটে আবার সাক্ষাৎ, সময় অতিবাহিত করার জন্যই তাদের কথাবার্তা মাত্র হয়েছে। নারী মনস্তত্ত্বের এক অদ্ভুত নিদর্শন

রয়েছে ‘সকলি অমিয় ভেল’ গল্পে। মালা বিশ্বাস যৌবনে চেয়েছে বহুজনের কাঙ্খিতা হতে, দূর্নামের ভাগী হয়েও সে বিজয়ী হতে চেয়েছে। কিন্তু তার আশাপূরণ হয় নি। পাড়ার দেওয়ালে দেওয়ালে পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা, প্রীতি যে অন্যের কামনার ধন হয়ে উঠেছে কুৎসা বিশারদেরা তা লিখে দিয়েছে। কিন্তু মালার নাম লেখেনি। সবার অজ্ঞাতসারে ব্যথিত মালা নিজেই কালও পাথরের বুকে লিখে দিল নিজের নাম। সবার চোখে সে নাম ঝলসে উঠে যেন একথাই প্রচার করে যে মালাও অন্যের প্রার্থিতা উঠেছে। ‘বারবধূ' গল্পের বেদনা আরও মর্মান্তিক। সাধারণ বারাঙ্গনা লতাকে নিয়ে জমিদার প্রসাদ রায় মধুনীড় রচনা করেছিলেন, এক সন্ধ্যায় মধুলোভী অন্যদের চোখে ধূলো দেবার জন্য তারা স্বামী-স্ত্রী সাজে। এই মেকী সম্পর্ক সমাজে লতাকে মর্যাদা এনে দেয়। কিন্তু পাড়ার আভা প্রসাদের মনে রঙ ধরায়। ফলে লতাকে বিদায় নিতে হয় ‘এক তাড়া নোট’ নিয়ে। লতা হাত পেতে প্রসাদের কাছে টাকা নিলেও তার কণ্ঠে যে বেদনা ঝরে পড়ে তা অপরিসীম—“না, তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভা ঠাকুরঝি আমার সর্বনাশটা করলে।” কয়েক দিনের সাজানো দাম্পত্যজীবনকে ছেড়ে যাবার বেদনায় ভেঙে পড়েছে সে।

৮.২ অনুশীলনী

১। ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। ছোটগল্পের বিষয় আশয়, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প - সুমিতা চক্রবর্তী

২। বড় বিস্ময় জাগে -উত্তম ঘোষ

৩। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প - জগদীশ ভট্টাচার্য

৪। কালের পুত্তলিকা - বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর – অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

একক ৯ নির্বাচিত গল্প – ফসিল, গোত্রান্তর, অযান্ত্রিক, পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম

বিন্যাস ক্রম

৯.১ ফসিল

৯.২ গোত্রান্তর

৯.৩ অযান্ত্রিক

৯.৪ পরশুরামের কুঠার

৯.৫ সুন্দরম

৯.৬ অনুশীলনী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ ফসিল

'ফসিল' স্পষ্টভাবেই সমাজ-সমস্যামূলক গল্প। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কোন সমাজের কথা এখানে চিত্রিত! ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-শোষণে যে ভারত তথা বাংলাদেশের অবস্থা রুদ্ধশ্বাস, তার সমাজ যে বুর্জোয়া সমাজ, কারণ শৃঙ্খলিত বুর্জোয়া রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিই তার একমাত্র ভিত্তি— একথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এই সমাজ উনিশ শতক থেকেই গড়ে-ওঠা শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। এ সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘাত অবধারিত। সাধারণ মানুষ যে অর্থে 'শ্রেণী' শব্দের প্রয়োগ করে, গরিব-বড়লোক, শিক্ষিত ইত্যাদি, মার্কসীয় ব্যাখ্যা— যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে

থেকেই বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, তা কোনোমতেই এক নয়। মার্কসের ব্যাখ্যায় শ্রেণী হল সমাজ-মানুষের এক একটা গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর শ্রমের ভাগ শুধু নয়, ফলও অধিকার করতে পারে। পুরনো যে সমাজ-ইতিহাস চলে আসছে, তারই প্রণালী ও ন্যায়ে এমন শ্রমের ভাগ ও অধিকার সম্ভব হয়। অর্থাৎ বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে শ্রেণী হল মানুষেরই বড় বড় গোষ্ঠী- যার একে অন্যের থেকে আলাদা।

বস্তুত এমন শ্রেণী-ভাবনা সুবোধ ঘোষের চিন্তাভাবনায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হোক, ছিল বলেই তিনি 'ফসিল' গল্পের মূল ভিত্তি করেছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ মানুষের উজ্জ্বল সংঘাতের ও অসহায় জয়-পরাজয়ের চিত্র! প্রচলিত সমাজে প্রচলিত শ্রেণীর ভূমিকা প্রায়ই ভারসাম্য বজায় রাখতে অক্ষম হয়, সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় ও শাসন-শোষণের এটাই লক্ষণ। যখনই এই লক্ষণ তীব্র হয়, তখনই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা মাথা তোলে। কিন্তু তাকে তো সমাজ সহজে মেনে নেয় না।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের মহারাজা ও অভ্রখনির বিদেশি মালিকরা ঠিক এই কারণেই দুলাল মাহাতো ও কুর্মিদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াকে মেনে নেয়নি। তারই সকরুণ পরিণতির জীবন্ত চিত্র ও ন্যায় 'ফসিল' গল্পে বড় ব্যঞ্জনা আনে। 'ফসিল' গল্পে যে অন্তর্নিহিত সামাজিক সমস্যা, তা তাই 'উপরিতলভিত্তিক' (superficial) নয়, তা সমাজ ইতিহাসের ধারা, ন্যায় ও পরিণামের সঙ্গে গভীর-সম্পৃক্ত। তাই 'ফসিল' সমাজ-সমস্যা মূলক গল্প হিসেবে অনেক বড় জাতের রচনা। জাত এখানে শিল্পের, সাহিত্যের।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের প্লট বা আখ্যান সামান্যই। গল্পের পটভূমি বাংলাদেশের বাইরে এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের খাস জমির বিস্তৃত এলা— নাম 'অঞ্জনগড়'। সেখানে এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমস্ত ব্যবস্থাই রীতি অনুযায়ী যথাযথ, পাকা, কিন্তু পুরনো সামন্ততান্ত্রিকতার কঠিন আভিজাত্য ও অহংবোধ ভঙ্গুর হতে শুরু করেছে। প্রতি বছর এই স্টেটের প্রাপ্য বখরা নিয়ে তহসিল বিভাগ আর চাষী প্রজা ভীল এবং কুর্মিদের সঙ্গে খাজনা আদায় নিয়ে বাধে সংঘর্ষ। ভীলরা নিরাপদ আশ্রয় ও শান্তির

জন্যেই রাজ্য ছেড়ে বাইরে চলে যায়, পড়ে থাকে কুর্মিরা। বাপ-পিতামহের চাষকরা জমি শত অত্যাচার ও অসুবিধা সহ্য করেও ধরে রাখে। একদিন তাদের সংগঠিত করে বাইরে-থেকে-আসা তাদেরই এক বৃদ্ধ জাত-ভাই দুলাল মাহাতো।

কিন্তু তখন সারা অঞ্জনগড় এস্টেটের হাল ফিরিয়ে দিয়েছে নবনিযুক্ত বুদ্ধিমান 'আদর্শবাদী' সচিবোত্তম মিঃ মুখার্জি। এনে বসিয়েছে বিদেশি বণিক অঞ্জনগড়ের মাটির নীচে গোপন-থাকা অভ্রখনির জন্যে। দুলাল মাহাতো জমিদারের কাছে তাদের চাষ, জীবন-যাপনের সুখ-সম্পদ, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা চায়। জমিদার দিতে চায় না। খনির কাজে নতুন শ্রমিকের প্রয়োজনে বিদেশি বণিকেরা সেই সুযোগে দুলাল মাহাতো ও কুর্মিদের টানে নানান লোভ দেখিয়ে। এই সূত্রে সামন্ততন্ত্রে ও বণিকতন্ত্রে যে সংঘাতের উপক্রম, তার নিরসন হয় দুলাল মাহাতোকে ধরে এনে গোপনে খতম করে ফেলার মধ্যে এবং সেই সূত্রেই অভ্রখনির বিস্ফোরণে যেসব শ্রমিক মারা যায় তাদের সঙ্গে দুলাল মাহাতোর মৃতদেহকে কবরস্থ করার সুযোগে। অবশ্যই দুলাল মাহাতোকে ধরে আনার প্রথম যুক্তিটি দেয় জমিদারের তরুণ সচিব-শ্রেষ্ঠ মিঃ মুখার্জিই। আবার দুলালকে এখানে হত্যা করার যুক্তি যৌথ ভাবনা-প্রসূত-- জমিদার ও বণিক উভয় গোষ্ঠীর মিলিত প্রস্তাব।

এককথায় অঞ্জনগড়ের রাজা বা জমিদার নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াসে ও অসহায়তার কারণে কৌশলী বণিকদের ওপর নির্ভর হয়। বণিক-প্রতিনিধি গিবসন ম্যাককেনাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে কুক্ষিগত করে রাখার কূট কৌশল নেয়। তরুণ সচিব মিঃ মুখার্জি তার সমস্তরকম সংগঠনমূলক কাজের মধ্যেও, বিবেকি মানসিকতার মধ্যেও ট্র্যাজেডির উপযোগী রন্ধ্রপথে (tragic flaw) মূল ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে একসময়ে। এসবই গল্পের শোষিত সর্বহারাদের অবস্থা আরও করুণ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মতো দুঃখের কথা থাকলেও দুঃখজয়ের কথা নেই, আছে দুঃখকে অতিক্রম করার সমস্তরকম প্রয়াসের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ-সর্বস্বতা ও বিবেকি, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মিঃ মুখার্জির বুদ্ধির কাটাকুটি খেলায় চালের ভয়ানক ভ্রান্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সমবেত মানুষ ব্যক্তিকে সরিয়ে অন্যায়ের সামনে শোষণের

বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী ভূমিকায় মূর্ত হয়েছে, ‘ফসিল’ গল্প তার বিপরীত। এখানে সাধারণ সর্বহারা মানুষকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে শোষক শ্রেণীর আত্মস্বার্থ-সর্বস্বতা ও শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূঢ়বুদ্ধি।

‘ফসিল’ গল্পের কাহিনী-বৃত্তে তাই মিঃ মুখার্জির শিক্ষিত মনের সততা মধ্যবিত্ত মানসিকতার সীমায় বাঁধা থেকে ফিউডাল বুর্জোয়ার জালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। মিঃ মুখার্জির ঘটে নিষ্করুণ পরাজয়। গল্পের সংঘাতে আছে সামন্ততন্ত্র ও সদ্যোদ্ভূত বণিকদের ধনতন্ত্রের প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিত্র, কিন্তু গল্পের শেষে তা শোষক-শোষিতের দুই মেরুগামী। চিরন্তন বিরুদ্ধ সম্পর্কটিকেই একমাত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এমন কাহিনীর জটে মিঃ মুখার্জির ভূমিকা লক্ষ করার মতো যা গল্পের প্লটকে করেছে ঘনপিনদ্ধ।

‘ফসিল' গল্পটির রচনাকাল যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল, তাই সুবোধ ঘোষ অতি সচেতনভাবেই সেই যুদ্ধ-সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্র ভাবনাকে গল্পের কাহিনী-ধৃত কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে ব্যবহার করেছেন। ভারত তখন এক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে দুষ্ট, পর্যুদস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। সে সময়ে একদিকে ছিল বুর্জোয়া সমাজের স্রষ্টা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক আর একদিকে দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারক বাহক দেশীয় জমিদার শ্রেণী। এ দুয়ের মধ্যে নিরন্তর পযুদস্ত হয়েছে সর্বহারা, শোষিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। সুবিন্যস্ত প্লটে ‘ফসিল’ গল্পে তারই শৈল্পিক প্রতিচিত্রণ।

উপরিউক্ত তিন গোষ্ঠীর মধ্যে লেখক এনেছেন মিঃ মুখার্জি নামের একজন নবনিযুক্ত ‘আদর্শবাদী’ সচিবোত্তম। বুর্জোয়া সমাজ-উপযোগী মানুষের মধ্যে মুখার্জিকে লেখক তৎপর রেখেছেন গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। মিঃ মুখার্জি অঞ্জনগড় এস্টেটের হাল ফিরিয়ে দিয়েছে নানা কৌশলে। তারই চেষ্টায় ও দৌত্যে এসেছে বিদেশি বণিক। তারা মাটির নীচে গোপন থাকা অভ্রখনি নিয়ে ব্যবসায়ে উৎসুক। জমিদারের নিজের শ্রমিক আছে অনেক— তাদের প্রতিনির্ধি দুলাল মাহাত ও কুর্মিরা। দুলাল মাহাতো জমিদারের কাছে চাষ ও জীবনযাপনের উপযোগী সুখ-সম্পদ, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা দাবি করে।

জমিদার নারাজ হলে বণিকদের লোভের টোপে তারা সায় দেয়। লাগে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রে বিরোধ। এই বিরোধের সালিশি করে মিঃ মুখার্জি। |

‘ফসিল’ গল্পে অঞ্জনগড়ের রাজা সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, বণিকরা ধনতন্ত্রের, দুলাল মাহাতো এবং কুর্মি প্রজারা সর্বহারাতন্ত্রের প্রতিভূ। এদের মধ্যে মিঃ মুখার্জি অবশ্য বুর্জোয়া বুদ্ধি ও বৃত্তির অফিসার। সে নতুন গণতন্ত্র চেতনায় দীপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। বয়স কম, কিন্তু অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি এবং জীবনের স্ট্যাটাস-এর বদল ঘটিয়েছে অঞ্জনগড়ে এসে। সে আইন-নবিশ। সে বিশ্বাস করে, যদিও তার জীবনযাপন সাধারণ মানুষ থেকে ওপরের পদ্ধতি-অনুগ, অর্থাৎ পোলো খেলা, কিঞ্চিৎ মদ্যপানে অবসর-যাপন ইত্যাদি, ‘যে সৎ সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।'—তাই সে তার প্রতিভার ও কর্মক্ষমতার সবটাই উজাড় করে দেয় স্টেটের উন্নতিতে এই ব্যক্তিত্ব, মানস-বৈশিষ্ট্য আঘাত পায় সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের যৌথ সন্ধির মধ্যেকার কৌশলী চাপে।

বিপদের সময় কর্তব্যবোধে এবং উপযুক্ত সচিব হিসেবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিবেচনায় অঞ্জনগড়ের মহারাজাকে সে সান্ত্বনা দেয়। বিরোধ বাধলে দুলাল মাহাতো ও গিবসনের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ দৌত্যে মাতে। এরই মধ্যে তার মনে জাগে কুর্মি প্রজাদের অসহায়তা, সর্বহারাদের কথা চিন্তা করে বিবেকি সততার দিক। মিঃ মুখার্জি কুর্মিদের সারল্যে তাদের অবিশ্বাস করে না। বিশাল বিশ্বাস ও নির্ভরতায় স্টেটের এগ্রিকালচারাল স্কিমকে গতিময় করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সমস্ত স্বপ্ন ও কৌশল বড় আঘাত পায় তার দুপাশের স্বার্থান্বেষী দুই গোষ্ঠীর গোপন তৎপরতায়।

এখানেই তার সমূহ পরাজয়! মিঃ মুখার্জি নিজেকে বোঝে ভালোভাবে, বোঝে না এই দুই বিরোধী প্রবল শক্তির গোপন চাতুর্য, অভিলাষ, কৌশলকে। এক সময় দুলালদের সঙ্গে দৌত্যে পরাজয়ের মনোভাব দেখা দেয় তার। তখন তার মানসিকতা এইরকম : পরের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতে তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলির মাথায় ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায় একটি আত্ম-বিহ্বল পরে উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে

আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও। এই ভাবনায় তার ভুলটাই বড় হয়ে ওঠে, তাকে পরাজয়ের গভীর খাদে নিক্ষেপ করে। সে অসহায় হয়েই একসময় দুলাল মাহাতোকে গ্রেপ্তার করার যুক্তি দেয় মহারাজকে : 'আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক করে ফেলুন।'

এখানে, এই মধ্যবিত্ত মানসিকতায়, বড় মনের অধিকারী হয়েও ভুল করে মিঃ মুখার্জি। তার কৌশল তাকে বোকা করে দেয়। একই টেবিলে বসে মহারাজা ও ম্যাকেনারা যে কৌশল করে দুলালকে ও কুর্মিদের হত্যার, তাতেই সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের ভিতরের স্বভাব যেমন উজ্জ্বলতম হয়, মিঃ মুখার্জির মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মনের কৌশলও সেখানে হার মানে। দুই ধনতন্ত্রের সন্ধির মৌল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি বলেই, কল্পনা করতে পারেনি বলেই দুলাল মাহাতোকে খতম করার পরিকল্পনা আকস্মিক শুনেই স্থির হয়ে যায় : 'নিরুত্তর মুখার্জি চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।'

গল্পের শেষ প্রমাণ করে সর্বহারাদের অবধারিত পরাজয়ের দিক। অর্থমদগর্বী ধনতন্ত্র ও শাসন-শোষণে পটু কৌশলী সামন্ততন্ত্র এক হলে এই পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু লেখক শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের চিত্রটি আরও উজ্জ্বল করেছেন গল্পের সিদ্ধান্তে। মধ্যবিত্ত মিঃ মুখার্জির ছলছলে চোখ, ফ্যাকাশে মুখ দ্বন্দ্বের দিক আরও নিষ্ঠুর করে তোলে। শ্রমিকদের অসহায়তা আছে ঠিকই, কিন্তু সুবোধ ঘোষ গল্পের শেষে মিঃ মুখার্জির দৃষ্টি দিয়ে যেভাবে ম্যাককেনা-গিবসন ও মহারাজার সন্ধি এবং তার করুণ-নিষ্ঠুর ফলের চিত্রে মিঃ মুখার্জির শ্রমিকদের জন্য চোখের জল ফেলিয়েছেন, তাতে দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের সত্য এবং পরাজয়ে সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। এ প্লটের মধ্যে জটিলতা নেই, আছে তাঁতের মাকুর মতো একটা নিরীহ গোষ্ঠীকে নিয়ে এই ধূর্ত অর্থলোলুপ, স্বার্থসর্ব, ধনগর্বে গর্বিত গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে অশুভ আপোস ও আঁতাত। এরই ফলে তৃতীয় শ্রেণীর ওপর অন্যায় শাসন-শোষণ এবং শেষে নিশ্চিহ্ন করার একান্ত গোপন তৎপরতা! 'ফসিল' গল্পের আখ্যানের যে সাজসজ্জা তার মধ্যে প্রয়োজনমতো ঘটনা তো আছেই এবং গল্পের শেষও নতুন ঘটনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। কিন্তু এমন

ঘটনা গল্পের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র মিঃ মুখার্জিকে এমন এক বোধের জগতে নিয়ে যায়, যা সর্বকালের বিবেকি মানুষকে নির্বাক ও স্তম্ভিত শিহরিত করে। 'ফসিল' গল্পের এত ঘটনার যে climax বা চরম রসকেন্দ্রটি, তা সুবোধ ঘোষ নিপুণ বাক্যে নির্দিষ্ট করেছেন:

'অভূতপূর্ব দৃশ্য! মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার গিবসন ম্যাককেনা, মুর আর প্যাটার্সন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিত বদনে মহারাজা মুখার্জিকে অভ্যর্থনা করলেন-- মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জি। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলে-- নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল, নিরুত্তর মুখার্জি চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।'

একটা ছোট চিত্রই এ গল্পের মূল রসকেন্দ্র- ক্লাইম্যাক্স, বিশেষ করে মিঃ মুখার্জির চাপা প্রতিক্রিয়ার বাক্যগুলি! দুলাল মাহাতোকে নির্জনে হত্যা, আর অভ্রখনির চোদ্দ নম্বর বিধ্বস্ত পীটের অন্যান্য মৃত কুর্মি শ্রমিকদের সঙ্গে তাকে ভূগর্ভে নিক্ষেপ— এটাই সমগ্র গল্পে যেমন ঘটনাগুলির একমুখিনতাকে ধরে রাখে, তেমনি লেখকের শিল্প-কলা কৌশলকে সূক্ষ্ম নিপুণ করে তোলে!

আমরা আগেই বলেছি, সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গল্প লিখতে বসেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত পটভূমিতে। যুদ্ধ ছিল দীর্ঘকালের পরাধীন ভারতে তথা বাংলাদেশে পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক রাজশক্তি বৃটিশ শাসন-শোষণের অন্যতম লক্ষ্য। ফসিল গল্পের কোথাও যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে নেই, পরোক্ষেও। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ধীর ছায়ার মতো ক্রম-প্রসারমান যে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণী-সচেতনতা একটা পরিবেশ তৈরি করে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিকতা ও নবোদ্ভূত বণিক সভ্যতার যৌথ মিশ্রণে, তার

নিপুণ চিত্র এ গল্পে রক্তের প্রবাহের মতো গতিপ্রাণ। সুবোধ ঘোষের প্রায় একই সময়ে লেখা 'গোত্রান্তর' গল্পে তা আর একভাবে উপস্থিত।

'ফসিলে'র মহারাজার শাসন-শোষণের দম্ভ অহংকার আর অভ্র অ্যাসবেস্টাসের খনির মার্চেন্ট মালিক গিবন্সদের সম্পদ বাঁচানো ও বিবৃদ্ধির কূটকৌশল- এ দু'য়ের সম্মেলন রাজ্যের সর্বহারাদের পক্ষে এক অশুভ সংকেত। সর্বহারা শ্রেণী কুর্মি-কুলিদের দল-- যারা দৈনিক নগদ পাওনার ব্যবস্থায় ঠিকে কাজ করে তারাই মিঃ মুখার্জির দৌত্যে অঞ্জনগড়ে এস্টেটের শ্রী ফেরায়। কিন্তু তারাই হয় মহারাজার victim যখন তারা তাদের একেবারে ন্যায্য কিছু দাবির জন্যে সমবেত হয়।

এমন উদ্দেশ্য ও তৎপরতার মধ্যে যে চরিত্রগুলিকে দেখি তারা বুঝিরা লেখকের মূল বক্তব্য উপস্থাপনার চিত্রণের কাছে নিমিত্তের রূপ ধরে। 'ফসিল' গল্পের চরিত্রগুলি চারটি শিবিরে বিভক্ত। বহুকাল ধরে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লালিত সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী, নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায়, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত আর চিরকালের অবহেলিত উৎপীড়িত শ্রমিক-কৃষক গোষ্ঠী। বস্তুত individual-এর থেকে collective কেই বেশি সত্য করেছেন সুবোধ ঘোষ গল্পের চরিত্রগুলির তৎপরতার চিত্রে।

লক্ষ করার বিষয়, অঞ্জনগড় এস্টেটের জমিদার মহারাজার কোনো স্বতন্ত্র নাম গল্পে নেই। তার দম্ভ, অহংকার ও অপমানবোধ এবং আভিজাত্যবোধ, তার লোভ, শাসন শোষণ সর্বকালের সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতীক-প্রতিম শিল্প-চেহারা আনে। তাই ব্যক্তির বিশেষ কোনো নাম একেবারেই প্রয়োজনহীন এখানে। মহারাজার চরিত্রায়ণ প্রতীকী। বণিক কোম্পানির গিবসন-ম্যাককেনারা সমবেতভাবে অমোঘ নিয়তির মতো সভ্যতার ইতিহাস-নির্দিষ্ট নবোদ্ভূত বণিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও প্রতিভূ হিসেবে অঙ্কিত।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো সম্পূর্ণ individual হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু লেখকের বিশেষ attitude-এর গুণে সে হয়েছে কুর্মি-কুলিদেরই একজন। তার চেহারা, স্বভাব, আচার আচরণ কুর্মিদেরই চরিত্র বোঝায়। দুলাল সম্পর্কে লেখকের শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ— 'মেষ শিশুর মতো ভীরু', 'বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা

এবং বুক ভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে', 'ভাঙা শঙ্খের মতো দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ে ইত্যাদি। গিবসনের দৃষ্টিতে 'পোষা বিড়াল মাহাতো, আর এসবের মধ্যে দুলাল মাহাতোর সপ্রাণ ঘোষণা সর্বশক্তি দিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে 'চিনে দেখ কে আমাদের দুষমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনো মতেই ক্ষমা নয় ? ... আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য।'

দুলালের নেতৃত্ব দুলালকে কিছুটা individual-এর মর্যাদা দেয়। কিন্তু তার ভীরুতা, অসহায়তা, নির্বুদ্ধিতা, সারল্য তাকে কুর্মি চাষীদেরই collective জীবনের মধ্যে মিশিয়ে দেয়।

'ফসিল' গল্পের নায়ক যদি কাউকে বলতে হয় সে বুঝি ল-এজেন্টের পদে নিযুক্ত হয়ে আসা ইংরেজি আইননবিশ, অঞ্জনগড় এস্টেটের মহারাজার উপদেষ্টা মিঃ মুখার্জি। সে আদর্শবাদী, নতুন গণতন্ত্র-চেতনায় দীপ্ত, বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি এক মধ্যবিত্ত যুবক-- যে জীবনযাপনের Status বদলেছে অঞ্জনগড়ে এসে আপন ক্ষমতার সুস্থ প্রয়োগে। সে অবসর সময়ে পোলো খেলে, মদ্যপানও করে কিঞ্চিৎ। কিন্তু সচেতন সতর্ক শিক্ষিত বিবেকি মধ্যবিত্তদের মতোই সে বিশ্বাস করে যে সৎ সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না। মুখার্জি তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতির সাধনায়। এই মুখার্জি নিঃসন্দেহে Individual চরিত্র। তার মহারাজাকে সান্তনা দান, দুলাল মাহাতো ও গিবসনদের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ দৌত্য, কুর্মিদের জন্য বিবেকি-ভাবনা ও তাদের ওপর বিশাল বিশ্বাস, নির্ভরতা, স্টেটের এগ্রিকালচারকে গতিময় করার স্কিম-- তাকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে দীপিত করে। তার ব্যক্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করার মতো।

'পরের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলির মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায় একটি আত্মবিলোপের উৎকট কল্পনা- তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও।'

সমগ্র গল্পে মিঃ মুখার্জিই সবচেয়ে গতিশীল চরিত্র। তার সমস্ত রকম তৎপরতা, চিন্তাভাবনা যেমন গল্পের একমাত্র গতি-নির্দেশক, তেমনি তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রাণও। সে অসহায় হয়েই দুলাল মাহাতোকে গ্রেপ্তার করার যুক্তি দেয় মহারাজকে : 'আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক করে ফেলুন।' কিন্তু বিমূঢ় অসহায় নীতিনিষ্ঠ, মানবিক বোধে উজ্জ্বল যুবক-মানুষটি মহারাজা ও ম্যাককেনাদের চরিত্রের একেবারে ভিতরটা বা তাদের কৌশলের সীমা বুঝতে পারেনি বলেই দুলাল মাহাতোকে খতম করার পরিকল্পনা আকস্মিকভাবে শুনেই স্থির হয়ে যায় : 'নিরুত্তর মুখার্জি চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।' এই চিত্র প্রমাণ করে নিঃসন্দেহে, মিঃ মুখার্জি এই গল্পের নায়ক এবং একমাত্র জীবন্ত চরিত্র, তার স্বরূপ চিত্রণই লেখকের আর এক উদ্দেশ্য। হয়তো মিঃ মুখার্জি স্বয়ং লেখকই। তার এই পরিণতি কুর্মিদের ও দুলাল মাহাতোর প্রতি সর্বকালের মানবিকবোধের প্রমাণ দেয়, প্রমাণ দেয় নিয়তি-নির্দেশক ধনতন্ত্রের অন্তিম রূপের জন্য সকরুণ অসহায়তাবোধের।

'ফসিল' গল্পে ছোটগল্পের ধর্ম নিখুঁতভাবে রক্ষিত। আরম্ভ অঞ্জনগড়ের ভৌগোলিক অবস্থানের চিত্র দিয়ে। যেন ছোট কোনো ইতিহাস বলছেন লেখক এইভাবে tale-ধর্মী বর্ণনায় গল্পের ভূমিকা রচনা। বস্তুত এ রীতি তারাশঙ্করের মতো লেখকেরা তিরিশের কালে নানাভাবে ব্যবহার করতেন। তিরিশ সাল থেকেই কল্লোলের কাল শুরু। তারাশঙ্কর প্রমুখ সে সময়ের সুবোধ ঘোষের পূর্বসূরি লেখকরা এমন ইতিহাস-ভাবনা দিয়ে গল্প ও উপন্যাস শুরু করতেন। সুবোধ ঘোষ তার ব্যতিক্রম নন।

এ গল্পে মিঃ মুখার্জির প্রসঙ্গ আসতেই এক চমক ও উৎসাহে পাঠকদের অকৃত্রিম ঔৎসুক্য তৈরি হয়ে যায়। মহারাজা ও মিঃ মুখার্জির যৌথ তৎপরতা, মুখার্জির ব্যক্তিগত প্রয়াস ও মানসিকতা ক্রমশ গল্পের মধ্যে নানান বেগে তৈরি করে একাধিক অন্তঃশীল স্রোত। এরই মধ্যে কুর্মিদের সঙ্গে একটা সংঘাতের প্রাকভূমি রচনা করেন লেখক। গল্পের দ্বিতীয় তরঙ্গ মূল বিষয়কে দুকূল ছাপাতে সহায়তা করে। সেই তরঙ্গ' হয়ে আসে দুলাল মাহাতো। তার নেতৃত্ব, কুর্মিদের সংগঠিত ও সচেতন করা, মহারাজা ও

গিবসনদের সঙ্গে আঁতাতের ধরন-ধারণ, মিঃ মুখার্জির অসাধারণ তৎপরতা, শেষে হতাশা, দুলাল মাহাতোকে খতম করা, অভ্রখনির চোদ্দ নম্বর পীটে কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে আকস্মিক বিস্ফোরণ এবং শেষে পীটের মধ্যে রাতের অন্ধকারে একাধিক মৃত কুর্মি কুলিদের লাশের সঙ্গে দুলাল মাহাতোর লাশকে গোপন করা—এসব ঘটনা ও চিন্তাভাবনার তীব্র ‘একমুখিনতা' গল্পের গতি বাড়ায়। ছোটগল্পের যে ধর্ম একমুখিনতা, অন্তিম ব্যঞ্জনা দিয়ে একেবারে বুকের গভীরে ঘা মারা- এসব গল্পের গতিমুখ থেকে গতি-শেষে তা স্পষ্ট। লেখক কোথাও গল্পকে থেমে থাকতে দেননি।

গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনা গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদে-- যা মিঃ মুখার্জির চোখে দেখা ও অন্তর্লীন মনোভাবনায় অন্তঃশীল। সাধারণভাবে পরিণামী একটি বাক্যে বা দুটি বাক্যেই গল্পের ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ও সমকালীন গল্প-লেখকদের, সুবোধ ঘোষ এই গল্পে সেই রীতির মূলে ঘা দিয়েছেন। গল্পের পরিণতিতে চিত্রটিকেও ঈষৎ বিস্তারিত করেছেন। রাতের অন্ধকারে জমিদার ও বণিক গোষ্ঠীর দুলাল মাহাতো। ও অন্যান্য মৃত কুর্মিদের সরিয়ে ফেলার মধ্যে নিজের যৌথ দোষ ঢাকার জন্য তৎপরতার চিত্র উপহার দিয়ে লেখক মিঃ মুখার্জির মদের মত্ততার মধ্যে এক গভীরতম উপলব্ধির ভাবনায় এনেছেন সমগ্র গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা:

‘শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জির চোখদুটো। গাড়ীর বাম্পারের উপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিনের পরে একটা কথা।'

লক্ষণীয়, এমন বিস্তারিত চিত্র-উপহার গল্পের পরিণামী-চিত্রে আদৌ বেমানান নয়। বরং গল্পের আখ্যান ও গতির সঙ্গে নায়কের চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাব বিকাশের দিক শিল্পগতভাবে সম্পৃক্ত। গতিহীন একটি গাড়ি। তার বাম্পারে বসা মিঃ মুখার্জি। মিঃ মুখার্জির বর্তমান কর্মমুখর জীবনের গতি যে স্তব্ধ তার প্রতীকী প্রয়োগ গতিহীন গাড়ির চিত্রে। পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে মিঃ মুখার্জির সমস্ত রকম অনুভূতি রহস্যাবৃত বোধহীন হয়ে ওঠার গূঢ় গভীর ব্যঞ্জনা। তার অনেকদিন পরের কথা ভাবনার

মধ্যে আছে নায়ক তথা লেখকেরই জীবন ও শোষিত এবং শোষক মানব-ইতিহাস সম্পর্কিত দর্শন! ছোটগল্পের এমন পরিণাম অভিনব।

আলোচ্য 'ফসিল' গল্পের গদ্যে আছে narrative style। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ থেকে শরৎচন্দ্র উপন্যাসে ও গল্পে এই স্টাইলের সচেতন প্রয়োগ করেছেন। তার উত্তরসূরি হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় সে প্রমাণ মেলে। তিনের দশকে 'কল্লোলে'র কালে লিখতে বসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ গল্পের বর্ণনায় যে introvert suggestiveness-কে গদ্যের বর্ণনার essence করেছিলেন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি দিয়ে, তারাশঙ্কর তার ধারে-কাছে যাননি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত লেখক! 'ফসিল' গল্পের লেখক তরুণ বয়সে লিখতে বসে তারাশঙ্কর-ব্যবহৃত বর্ণনারীতি অর্থাৎ বিবৃতিধর্মিতাকে গদ্যের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে পারেননি।

অথচ আমরা জানি, গল্প ক্রমশ কবিতার কাছাকাছি চলে এসেছে এবং বিপরীত অর্থে কবিতাও গল্পের কাছে আসবার জন্য উৎসাহী! সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে গদ্যের ভাষায় ও প্রয়োগের suggestiveness যতটা জরুরি, মানব-মনের অতল প্রদেশের আলোকিত হওয়া যতটা জরুরি, বিবৃতিধর্মিতা তার ক্ষেত্রে ততটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের গদ্য আর তারাশঙ্করের 'না' গল্পের গদ্যের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। আমাদের মনে হয়, 'ফসিল' গল্পের সঙ্গে স্বভাবের মিল না থাকলেও আন্তরবৈশিষ্ট্যে, আত্মিক গঠনে কোথাও বুঝি মিল থেকে যায় 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের গদ্যের। 'ফসিলে'র গদ্যে নিছক বিবৃতিধর্ম নেই, আছে লেখক-ভাবিত তীব্র শ্লেষ, কোথাও বা ব্যঙ্গ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গদ্যে আছে তীব্র রোমান্টিকতা ও রোমান্স ধর্ম এবং সেই সূত্রে গভীর ব্যঞ্জনা ও শ্লেষ। সুবোধ ঘোষের গল্পে আছে স্পষ্টত বিবরণের মধ্যে শ্লেষ। উদাহরণ দেওয়া যাক:

১. নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাটায় কাটায় সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই।'

২. চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা— সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়; প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।'

৩. 'বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে।'

৪. 'সিংহের চোখে জল। এর পিছনে কতখানি অন্তদাহ লুকিয়ে আছে তা স্বভাবত শশক হলেও মুখার্জি আন্দাজ করে নিতে পারে। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' থেকে এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে লেখকের গদ্য-বর্ণনায় আছে অন্যতর ব্যঞ্জনা।

'ফসিল' গল্পের ভাষায় আছে একাধিক উপমা। যেমন- 'দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মতো তামা আর লোহার ঢাল', মুখার্জিকে মহারাজার কথা- 'খাল কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কিনা?' 'এটুকু সে বুঝল— এই মেঘেই বজ্র থাকে।' এরকম আরও অনেক। প্রতীকের একাধিক প্রয়োগে যেমন শ্লেষ রক্তিম হয়েছে গদ্যের ভাষা, তেমনি গভীর ব্যঞ্জনা পেয়েছে ফসিলের গদ্যও। যেমন 'অভূতপূর্ব দৃশ্য ... সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।' অনবদ্য প্রতীকী ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক মিঃ মুখার্জির মানসিক যন্ত্রণার অন্তর্গূঢ় অস্বস্তি ও অসহায়তা এবং আক্রোশ ও হতাশার দিকঃ

'শীতের মরা মেঘের মতো একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জির হাত পায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে, দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকেল হলে, বিচেস চড়িয়ে বয়ের কাধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্ত সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে-বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট চালায়। কড়কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে।'

যেখানে লেখক পরিণামী দৃশ্য বর্ণনায় এঁকেছেন গাড়ির বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসা মিঃ মুখার্জির অন্যমনস্কতার ছবি, সে দৃশ্যের ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী। মিঃ মুখার্জির জীবনের গতি স্তব্ধ দুলাল মাহাতোদের সকরুণ পরিণতির কারণে। আগেও বলেছি,

স্থির হয়ে থাকা গাড়ি যেনবা মিঃ মুখার্জির বর্তমান সম্যক পরাজিত স্থবির জীবনের প্রতীক প্রতিম অস্তিত্ব।

বস্তুত ‘ফসিল গল্পের ভাষায় কৃত্রিম কবিত্ব নেই। কিন্তু লেখকের ইমাজিনেশান এমন এক নিরাসক্তি নিয়ে সক্রিয় থেকেছে সারা গল্পে, যা বড় কবিত্ব যাকে বলা যায় সুস্থ জীবনের পক্ষে শক্ত ভিতের কবিত্ব,-- তাকেই প্রত্যক্ষ করায়, পাঠকের অনুভূতির জগতে তাকেই স্থিত করে। গল্পের গদ্যভঙ্গি ও ভাষায়, উপমায় ও প্রতীকে মিশ্রিত থাকায় গল্পের ভাষা বক্তব্যের যথাযথ অনুগামী হয়েছে নিঃসন্দেহে।

‘ফসিল’ গল্পের নাম নিয়ে সমালোচক মহলে কিছু দ্বিধা সংশয় থাকতে পারে শিল্পের বিচারে বসে। তাদের মতে, ‘ফসিল’ নাম যেন গল্পের বক্তব্য ও বিষয়ের সঙ্গে, আখ্যান ও চরিত্রের ভিড়ে তাৎপর্যপূর্ণ, যথাযথ হয়নি। কোনো সৃষ্টিধর্মী রচনার নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকরা নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম মানেন না, সে রকম কোনো লিখিত তাত্ত্বিক-নিদিষ্ট পদ্ধতিও নেই। একাধিক ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদির নাম বিশ্লেষণ করে কিছু সূত্র পাওয়া যায় নামকরণ বিষয়ে।

লেখকের নামের ক্ষেত্রে কখনো বিশেষ ঘটনা, যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’, কোনো বিশেষ স্থান-নাম, যেমন তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’ উপন্যাস, সর্বোপরি গ্রন্থভুক্ত কোনো বিশেষ চরিত্র বা নায়ক, অথবা নায়িকাপ্রধান হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’, রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’, শরৎচন্দ্রের ‘বিপ্রদাস’, শেক্সপিয়রের ‘ম্যাকবেথ' এমন চরিত্রমুখ্য নাম। আবার গভীর ব্যঞ্জনধর্মী নামও রাখেন লেখকরা, যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়', শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’, ‘দত্তা’, তারাশঙ্করের ‘না’ ইত্যাদি এর উদাহরণ। তৃতীয় একটি পদ্ধতি হল- ব্যাখ্যামূলক নামকরণ। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’, ‘হারাণের নাতজামাই’- এসব নামই এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। চতুর্থ পদ্ধতি হল, আঙ্গিক-নির্ভরতা অনেক সময় নামের ক্ষেত্রে প্রধান হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’, ‘চার অধ্যায়’-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বস্তুত ব্যঞ্জনাধর্মী নামই বেশি হৃদয়গ্রাহী, মননরসসিক্ত। ‘ফসিল’ নামটি আমাদের উল্লিখিত দ্বিতীয় রীতির অনুসারী, নামটি গভীরতম ব্যঞ্জনার দ্যোতক। সেই ব্যঞ্জনা গল্পের বক্তব্য তথা লক্ষ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত।

‘ফসিল’ নামের মধ্যে আছে গভীর শ্লেষ। জীবজন্তু ‘ফসিল’ হয়, ফসিল হতে পারে মানুষও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মানুষেরই সৃষ্ট মৃত্যুতে আর এক মানবগোষ্ঠী ফসিল হবে আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরে এ তো কল্পনার অতীত! সুস্থ সভ্যতার বিপরীতমুখী হয় এই চিন্তার প্রবাহে। মহারাজা ও গিবসন্দের স্বার্থান্বেষী প্রয়াসে দুলাল মাহাতো ও কুর্মিরা যেভাবে ফসিল হওয়ার পক্ষে শিকার হল, তা তো মানব-সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক। ‘ফসিল’ যেন তেমন সভ্যতার ও সভ্য মানুষেরই! কাহিনীর এই ব্যঞ্জনায় নাম নিঃসন্দেহে সার্থক।

নামের সার্থকতার দিক অন্য একভাবে লক্ষণীয়। গল্পের সিদ্ধান্ত বাক্যে আছে মিঃ মুখার্জির গভীর অথচ হতাশাখিন্ন অসহায় মনন যা গোটা মানব জাতির বিড়ম্বিত ভাগ্যের নির্দেশক ও সভ্যতার অধোগমনের পরিচায়ক :

‘লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোনো এক যাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি ফেলে দেখছে কতগুলি ফসিল।’

আমরা সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যে অনেক এগিয়েছি। আদিম জীবজন্তু থেকে জীবের শরীরের ও বুদ্ধির বিবর্তনে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে হয়েছি মানুষ। ফসিলের জন্মের একাধিক স্তর-পরিচয় তাই প্রমাণ করে। এখন আবার যদি ভবিষ্যতের মানুষ ফসিলের মধ্যে দেখে সভ্য মানুষেরই সাদা, রক্তহীন ফসিল, তাহলে প্রমাণিত হয়ে যায়, মানুষ সভ্য হয়েও সত্য হয়নি। মানব সমাজের ও মানুষের মনের বিবর্তনে এই ধারণা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। ‘ফসিল’ গল্পের নামে তারই অভিব্যঞ্জনা।

নামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আর দিক থেকেও লক্ষ করার মতো। মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, জীবন, তার গঠিত সমাজের ইতিহাস একটা কাল থেকে মহাকাল রচনা করে যায় অলক্ষ্যে। কিন্তু সভ্যতার আলোয় বসে স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় সর্বহারা মানুষদের

নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের উচ্ছিষ্ট রূপে রেখে যে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস রচনা করে সংগোপনে নিজেদের পাপ ঢাকার চেষ্টায়, তার ইতিহাস গোপনে থেকে যায়। সচেতন মানুষ তা বুঝতে ও ধরতে পারে না। বুঝলেও তারা অসহায়, নিমেষে নিঃশেষিত, কর্তৃপক্ষের ক্রীড়নক হতে বাধ্য। চিরকালের বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ও রাজনীতি অর্থনীতির প্রেক্ষিতে এটাই অমোঘ নিয়ম ও নিয়তি। দুলাল মাহাতো ও কুর্মি শ্রমিকদের একান্ত অসহায় পরিণতিতে, তাদের 'অর্ধ-পশু-গঠন, অপরিণত-মস্তিষ্ক আত্মহত্যা প্রবণ সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল', অর্থাৎ ফসিল হওয়ার মধ্যে সেই নিয়তি। গল্পের 'ফসিল' নামের মধ্যে তারই আঙুল-তোলা নির্দেশ। তা সার্থক সূক্ষ্ম শিল্পেও।

প্রসঙ্গত স্মরণ করি, লেখক-জীবনে সুবোধ ঘোষ পরবর্তীকালে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হন। এর আগে সুবোধ ঘোষের জীবন-দর্শন ছিল নীচের তলার মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ, অধিকার-চেতনা ও সংগ্রামী জীবন-ভাবনার সান্নিধ্যে। 'অযান্ত্রিক', 'গোত্রান্তর', 'ফসিল' —এসব গল্পে সুবোধ ঘোষ নিঃসন্দেহে রূঢ় বাস্তব জীবনের গভীরে ডুব দিতে উৎসাহী। তাঁর জীবনদর্শন তাই সাধারণ মানুষের ঘাম, রক্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁটাচলার সঙ্গে সন্নিহিত। আপাতত এই অর্থে ফসিলে'র গল্পলেখককে আমরা অভিনন্দিত করতে পারি।

'ফসিল' গল্প সভ্যতার ধারা, ইতিহাসের নির্দেশকে মেনেই বিষয়-ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়। 'ফসিল' গল্পের বিষয়ের একদিকে ধনতন্ত্র, আর একদিকে সর্বহারাতন্ত্র, মধ্যে বিক্ষত মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী আবেগবান এক পুরুষ। ধনতন্ত্র সর্বহারাতন্ত্রে যে বিরোধ, তা বর্তমান কাঠমোয় থাকতে বাধা। ধনতন্ত্রও ভর করে প্রথমে সামন্ততন্ত্রে, পরে ফ্যাসিবাদের সহায়ক আধুনিক ধনবাদিতায়। ধনতন্ত্রের একমাত্র উপায় হল, বল কৌশল-এসবই গোপন, ব্যক্তি-ইচ্ছার অনুগামী। সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গল্পে এসব এনে রূঢ় বাস্তব-জীবন-ব্যাখ্যার দায়বদ্ধ লেখক হয়েছেন। তাঁর উত্তরসূরিদের রচনায় দেখা যায়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে পদের হাতে ধনতন্ত্রের নায়করা আরও সূক্ষ্মতায়, চাতুর্যে ও কৌশলে এবং ধূর্ততায় চরম পারদর্শী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে, গৌরকিশোর

ঘোষের 'সাগিনা-মাহাতো' গল্পে তার প্রমাণ মেলে। সাগিনা-মাহাতো চরিত্রটি যেন যুদ্ধ-সমকালের সর্বহারা নায়ক দুলাল মাহাতো'রই স্বাধীনতা-উত্তরকালের অন্য সংরক্ষণ! দুলাল মাহাতোকে নিয়ে যে খেলা ধনতন্ত্রের, সাগিনা মাহাতো ঠিক তার সমান হয় না। এখানে সাগিনাকে অতি সতর্কভাবে সক্রিয় রাখতে হয় কর্তৃপক্ষের ভাবনায়। সামন্ততন্ত্র চলে গেছে, ধনতন্ত্র অন্য রূপে অন্য রাজনীতিতে ওদের ধরতে চায়। 'ফসিল' গল্পের বিষয় ও চরিত্র একালে অন্য ডাইমেনশান পাবেই।

৯.২ গোত্রান্তর

সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পটি তার 'ফসিল' গ্রন্থভুক্ত একটি অতি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৪৪। অর্থাৎ যুদ্ধ-সমকালেই যে সমস্ত গল্প লিখেছেন, সেগুলির সবই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কারণ তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'পরশুরামের কুঠার'-এর প্রকাশকাল ১৯৪২ এবং এই সময় যুদ্ধ-সমকাল। স্বভাবতই যুদ্ধ-সমকালের এই তরুণ লেখক-মানসিকতায় সেই সময়ের সমাজভাবনা, নবোদ্ভূত নানান সমস্যার প্রতিফলন গল্পে আশা করা অন্যায় ও অযৌক্তিক হবে না। 'গোত্রান্তর' গল্পেও 'ফসিল' গল্পের মতো শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ ধনিক শ্রেণী একদিকে, অন্যদিকে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কারণে উৎপীড়িত শোষিত নীচের তলার মানুষ তথা শ্রমিকদের পাই। এই দু'য়ের মধ্যবর্তী আছে বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক নায়ক।

'ফসিল'-এ আমরা দেখেছি এক মধ্যবিত্ত, নায়কোচিত চরিত্রবিশেষ নামহীন মিঃ মুখার্জিকে। সেখানে অত্যন্ত সংকটজনক মুহূর্তে সমাজতন্ত্র তথা ধনিকতন্ত্রের প্রতিভূ হতভম্ব ও বিমূঢ় মহারাজা মিঃ মুখার্জিকে বলে, এইবার তোমার বাঙালি ইলম্ দেখাও; একটা রাস্তা বাতলাও।' তার উত্তরে একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জি বলে, - 'আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক করে ফেলুন।' এমন যুক্তি দেওয়ার জন্যই পরে প্যালেসের একটি প্রকোষ্ঠে মিঃ মুখার্জির অভ্যর্থনা এই ভাষায় হয়, 'মাহাতে ধরা পড়েছে মুখার্জি। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।' আর সবশেষে বৈঠকে সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য ফৌজদার যখন মিঃ মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শোনায়, তখন 'নিরুত্তর মুখার্জি চমকে উঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু

হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।' 'ফসিল' গল্পের এই বিশেষ নামহীন মিঃ মুখার্জিই বুঝিবা গোত্রান্তর গল্পের বিশেষ নামে চিহ্নিত এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বার্থ-সর্বস্ব যুবক সঞ্জয় হয়ে উপস্থিত হয়েছে।

'গোত্রান্তর' মধ্যবিত্ত মানুষের শ্রেণীস্বভাবসুলভ চরম বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। সে বিশ্বাসঘাতকতা শ্রেণীহীন সর্বহারা মানুষদের প্রতিই। মধ্যবিত্তরাই অতি দ্রুত গোত্র বদলাতে চায়, পারে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তো শাসক শ্রেণীরই সৃষ্টি, তার ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ফসল। মধ্যবিত্তের পায়ের তলার যে মাটি তা বড় ভঙ্গুর। তারা চায় ওপরে উঠতে, অর্থনৈতিক অবস্থায় নিজের স্বার্থ বাঁচাতে, সবরকম কৌশলে নিজের গা বাঁচাতে। 'গোত্রান্তর' গল্পের সঞ্জয় সেই মানুষ। মিঃ মুখার্জির মধ্যে তবু দ্বন্দ্ব ছিল তীব্র, ছিল চাপা রক্তক্ষয়ী অনুশোচনা। সঞ্জয়ের আছে নিজের স্বার্থ বাঁচাবার উপযোগী মানসিক তৎপরতা, সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, তার উৎসাহদান, নারী ভোগ সবই একেবারে নিজেরই একান্ত বাসনায় নিয়ন্ত্রিত।

এই সঞ্জয়ের দিকে প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সুবোধ ঘোষ 'গোত্রান্তর' গল্পের কাহিনী-বৃত্ত নির্মাণ করেছেন। এই গল্পের কাহিনী-অংশ ঘটনা বৈচিত্র্যে কিছুটা উজ্জ্বল। মকতপুর অঞ্চলের এক একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হল এম. এ. পাস, দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি বেকার যুবক সঞ্জয়। এই চার বছরের জীবনধারণ দাদার উপায় করা সংসারের সহায়তায় সহজ হলেও সঞ্জয় ক্রমশ বোঝে, এই তাদের জরাজীর্ণ বাড়িটার মতো ভেঙেপড়া সংসারে দয়া, মায়া, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-প্রীতি—সবই ব্যবসায়িক পণ্যের মতো। যে সুমিত্রাকে সে গভীরতম প্রেমে কাছে রাখতে চায়, সুমিত্রার প্রেমও পূজার মতো পবিত্রতা পায়, সেই প্রেমও অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদে একেবারে ফিকে হয়ে যায়। সঞ্জয়ের দারিদ্র্যের সঙ্গে বাস্তব রূঢ় অভিজ্ঞতা তাকে ক্রমশ এক নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক মানুষ করে তোলে। সঞ্জয় এই মানসিকতা নিয়েই চলে আসে রতনলাল সুগার মিলে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে। একটা মুক্তির আশ্বাস এখানে। এসেই সে ক্যাশমুন্সির পদ পায়। মিলের মালিক রায়বাহাদুর রতনলাল তাকে তার কাজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্নময় ধাপগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। মিলের উন্নতিতেই

তার উন্নতি। সুতরাং সঞ্জয় যদি কাজ দেখিয়ে মিলের আরও ভাগ্য খোলায় সহযোগিতা করে, তবে তারও ব্যক্তিগত পদোন্নতি ঘটবে। কিন্তু ক্রমশ তার মালিকের কথাই সার, পদোন্নতি নেই এতটুকুও এতদিনের কাজে। মিলের কাজে যখন গভীরভাবে বীতশ্রদ্ধ, তখনি তার জীবনে আসে মিলের লোডিং মুহুরি নেমিয়ার আর তার বোন রুক্মিণীর প্রত্যক্ষ আকর্ষণ। বোনকে এগিয়ে দিয়ে নেমিয়ার সঞ্জয়ের কাছে টাকা চায়। সঞ্জয় নিজেকে মনে করে ভাগ্যহত। মকতপুরের চিঠিপত্তর, সম্পর্ক তাকে রাগে ক্ষোভে চণ্ডাল করে তোলে। রুক্মিণী তাকে দেহসম্ভোগের আরাম আর আনন্দের চরম তৃপ্তি দেয়। মিলের কাজে পদোন্নতি প্রয়াসে প্রায়-পরাজিত, রুক্মিণীর সাহচর্যে মত্ত সঞ্জয় বিদেশের সঙ্গে চিনির লেনদেনে মূল্যহ্রাসে রতনলালের সুগার মিলের দুর্ভাগ্যের সুযোগে নিজের ভাগ্য ফেরাবার নতুন কৌশল নেয়। মিলের কর্তৃপক্ষের দিক থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা হ্রাসের প্রতিবাদে সে গোপনে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে। নেমিয়ার তার একমাত্র সহায়। জমির চাষ-করা আখ মাঠ থেকে তুলতে নিষেধ করে দেয় চাষাদের। ক্রমশ এমন অবস্থা আসে যখন আখের অভাবে মিল অচল হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ বাইরের সব বড় বড় অর্ডার ঠিকমতো জোগান দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

এ সময়ে শ্রমিকরা সঞ্জয়ের কথায় বিশ্বাস করে এককাট্টা। তাদের চরম অভাব মিল থেকে ছাঁটাই হওয়ার মধ্যে তাদের শেষতম দুরবস্থাকেই সত্য করে। এই অবস্থায় সঞ্জয় প্রতীক্ষা করে রায়বাহাদর রতনলালের তার যুক্তি নেওয়ার জন্য আহ্বানের। কিন্তু তা আর আসে না। এদিকে রুক্মিণী অন্তঃস্বত্ত্বা, অন্যদিকে শ্রমিকদের সংগ্রামের শেষ স্তরে চরম অসহায় অবস্থা। তারা সঞ্জয়ের নেতৃত্বে শেষ নির্দেশের মুখ চেয়ে থাকে। বাইরে থেকে আখ এনে মিল চালানোর পরিকল্পনায় শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত, কিন্তু দেশীয় আখের চাষও তারা জমি থেকে মিলকে দেবে না, নষ্ট হয়ে গেলেও। বাইরের আখ আমদানির বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবার জন্যে নেমিয়ার আসে সঞ্জয়ের কাছে। চাই কিষাণ-ফৌজকে খাদ্য জোগাবার রসদ। নেমিয়ার সঞ্জয়ের কাছ থেকে মিলের ক্যাশঘরের চাবি আদায় করে নেয়। সঞ্জয়কে শেষে এমন সিদ্ধান্তে আসতে হবে শ্রমিকদের সঙ্গে রায়, ভাবতেই পারেনি সে। আসে গভীর ভয়। সে দেখে রুক্মিণীর গর্ভে তারই সন্তানের জন্মের দৃশ্য,

আর নেমিয়ার-এর ক্যাশঘর লুঠ করার জন্য প্রস্তুতি। দুই চিত্রই তার সমূহ সর্বনাশের। সঞ্জয় এবার নিজেকে বাঁচাবার জন্যে গোপনে চলে আসে রাজা-বাহাদুরের কাছে। জানিয়ে দেয়- নেমিয়ার তার কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে ক্যাশঘরের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। রায়বাহাদুর রতনলাল চমৎকার সামলে নিল মিলের এই জটিল দুর্যোগপূর্ণ দুঃসময় অবস্থা। তার বদলে সঞ্জয় পেল মালিকের কাছ থেকে মোটা বকশিশ এবং অদূর ভবিষ্যতে গোরখপুর মিলের বড় চাকরির প্রতিশ্রুতি। সঞ্জয় এই উন্নতির পথের আশ্বাসেই কিছুদিনের আত্মগোপনের প্রয়োজনে যাত্রা করে তার মকতপুরের বাড়ির দিকে।

এখানেই গল্পের শেষ। সুবোধ ঘোষ গল্পের কাহিনীকে যেমন আরম্ভের চমক দিয়েছেন, তেমনি পরিণতির নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনানির্ভর সীমায় বেঁধেছেন। কাহিনী-বৃত্তের কেন্দ্রে সঞ্জয়। প্লট গঠনে লেখক একাধিক ঘটনা এনেছেন। কিন্তু ঘটনাগুলির উপস্থাপনায় ও বিন্যাসে স্পষ্টত ছোটগল্পের শিল্পাঙ্গিকের উপযোগী সংক্ষিপ্ততা ও তির্যকতা নেই। ঘটনা সংগঠনে subtlety না থাকায় গল্পের কাহিনী শ্লথ-মন্থর ও মূল বক্তব্যের পক্ষে কেন্দ্রানুগ হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়।

গল্পের কাহিনী-প্রবাহে তিনটি তরঙ্গ নির্মিত হয়েছে সঞ্জয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে। প্রথম তরঙ্গে সঞ্জয়ের মকতপুরের বেকার জীবনচিত্র, দ্বিতীয় তরঙ্গে রতনলাল সুগার মিলে সঞ্জয়ের আত্মোন্নতির তৎপরতায় প্রথম দিকে নেমিয়ারের বোন রুক্মিণীকে সর্বদিক থেকে অবৈধভাবে ভোগ করার চরিতার্থতা, তৃতীয় তরঙ্গে সঞ্জয়ের মিলে অসহায় শ্রমিকদের নেতৃত্ব ও পরামর্শদান এবং শেষে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে রুক্মিণীর দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের নেতৃত্বের দায়িত্বকে অস্বীকার। একমাত্র নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ও নিজের ভাগ্যোন্নতির জন্যেই মালিকের বকশিশ ও আশীর্বাদ নিয়ে পলায়নী মনোবৃত্তির উৎকট প্রয়াস ও প্রকাশ।

কাহিনীর প্রথম তরঙ্গটি অকারণ দীর্ঘ, শিল্পের পক্ষে অবাঞ্ছিত এবং সঞ্জয়ের কিছু ভাবনার পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্তিকর, গল্পের কাহিনীগত একমুখিনতা রক্ষায় প্রয়োজনহীন। দ্বিতীয় অংশে কাহিনী-মধ্যে যে রতনলাল সুগার মিলের প্রসঙ্গ ও

পটভূমিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং যার সঙ্গে সংঘর্ষেই গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনা, সেই মিলের পরিবেশ রচনা প্রয়োজনীয় গুরুত্বে চিত্রিত হয়নি। মিল প্রসঙ্গ থেকে, এবং তার মালিক রায়বাহাদুর রতনলাল প্রসঙ্গ থেকে লেখক কাহিনীকে অতি দ্রুততায় নেমিয়ার ও রুক্মিণী প্রসঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এর ফলে গল্পের মধ্যে বিষয়-ভাবনায় যে একমুখিনতা— তা নিশ্চিতভাবে ব্যাহত হয়েছে, কাহিনী-নিহিত গল্পের মৌল রস দানা বাঁধার পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। | মিল কর্তৃপক্ষ সঞ্জয়ের সক্রিয়তা সম্পর্কে এত উদাসীন, তার সমস্ত রকম মিলবিরোধী সক্রিয়তা সম্পর্কে এত অনবহিত থাকায় পাঠকের বিশ্বাসে আঘাত লাগে। শিল্পের যে দাবি, কাহিনীর এই অংশ তা মেটাতে ব্যর্থ। কাহিনীর শেষ অংশে জমাট পরিবেশ চমৎকারভাবে রচিত। কিন্তু একই সঙ্গে রুক্মিণীর গর্ভের সন্তান-জন্মের দৃশ্য ও নেমিয়ারের ক্যাশঘর লুঠের ভয়াবহ প্রস্তুতির চিত্র সঞ্জয়ের পক্ষে দর্শন, কাহিনীর মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশনের পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ও পাঠকের প্রতীতিতে আঘাত হানে। সঞ্জয় মধ্যবিত্ত যুবক, শিক্ষিত। তার পক্ষে শ্রমিক-জীবন নিয়ে তৎপরতার চিত্রে যে স্বভাব-নিষ্ফলত্ব, তা স্বাভাবিক হলেও আরও সূক্ষ্মতার দাবি রাখে।

মোট কথা, সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পের কাহিনী-বৃত্তটির মধ্যে শিল্পের সংযম রক্ষিত হয়নি, সঞ্জয়ের চরিত্রকে বোঝাতে গিয়ে যথেষ্ট অতিরিক্ততা আনা হয়েছে কাহিনীর দেহে। ঘটনাকেও কোথাও কোথাও চড়া রঙে আঁকা হয়েছে।

'গোত্রান্তর' গল্পের সামগ্রিক চরিত্র-পরিকল্পনার গৌরব-দীপ্তি সঞ্জয় চরিত্রেই বেশি। প্রধান চরিত্র সঞ্জয়, কিন্তু ছোট ছোট চিত্রের স্বভাবে রুক্মিণী, নেমিয়ার, রায়বাহাদুর রতনলাল এসব চরিত্রও গল্পের মৌল দাবি মেটাতে সক্ষম। সুবোধ ঘোষের মূল লক্ষ্য সঞ্জয়। তার কথা দিয়েই গল্পের আরম্ভ, যদিও, আগেও বলেছি, সেই আরম্ভ চরিত্রের ভাবনার পৌনঃপুনিকতায় ভারাক্রান্ত। সঞ্জয়ের ছাত্রজীবনের অতীত-জীবনগুলোর সূত্রে বর্তমান শিক্ষিত বেকার জীবনের মধ্যেকার তাৎপর্যগত তফাতের দিকগুলি স্পষ্টত ধরা পড়ে। ধরা পড়ে অভাবের সংসারে মায়ের গঞ্জনাময় শাসন-বাক্য। সঞ্জয়ের কাছে সংসারের মায়া-মমতার মানবিক বন্ধন যেমন নিল এবং বাজারি পণ্যের

তুল্যমূল্যেই সে সবের চাহিদা, তেমনি প্রেমিকা সুমিত্রার এত দিনের পরিচিত প্রেম-অস্তিত্বের মূল্যও।

এরই মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা সঞ্জয়ের আর এক মূর্তি রতনলাল সুগার মিলের পোষা ক্যাশমুন্সির জীবনে। স্তর বদল করতে চায় সঞ্জয়। বদল এক জিনিস, আর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উঠে যাওয়া অন্য বিষয়। সঞ্জয় তার মধ্যবিত্ত জীবন স্বভাব থেকে ভাগ্য ফেরাতে চায় ওপরের দিকে। অর্থ, পদোন্নতি, সামাজিক স্ট্যাটাস তার উচ্চাশার লক্ষ্য। তার পারিবারিক জীবনের পরিবেশ ও শিক্ষা তার মধ্যবিত্ত মানসকতা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে করতে চরম স্বার্থপর, জীবনের যে কোনো মূল্যে উন্নতিকামী পুরুষে রূপান্তরিত করে তাকে। মধ্যবিত্তদের কাছে নীচের তলার মানুষ নয়, তার ওপরের স্তরের মানুষ ও চিওই আকর্ষণীয় হয়। যৌনতা, দেহভোগ সবই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা-অনুমোদিত। নারী ভোগের সামগ্রী, সুবিধাবাদী, স্বার্থসর্বস্ব, সুযোগসন্ধানী ভোগবাসনা দিয়ে নিজ আরাম তৃপ্তিতেই তার যথার্থ স্বীকৃতি মধ্যবিত্তের কাছে। সঞ্জয় সেই মানসিকতার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে রুক্মিণীকে কাছে এনে। নেমিয়ারকে তেমন ভোগের কারণে ঘুষের নামে টাকা দিয়ে দিয়ে তাকে কিনে নেয়। নেমিয়ারকে সম্বল করেই তার যথাবিহিত সাহসের সক্রিয়তা। যখন আবার সুযোগ আসে পালিয়ে যাওয়ার, তখন তার সদ্ব্যবহারে সঞ্জয় পারঙ্গম।

শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা ও মিল-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করানোর প্রয়াসটুকু মূলত আত্মস্বার্থ ও আত্মোন্নতির উপায়মাত্রই ছিল। যে রতনলাল তার উন্নতির ব্যাপারে নিস্পৃহ নিরাসক্তচিত্ত, তাকে তারই শ্রমিকদের দিয়ে শায়েস্তা করে নিজের বড় হওয়ার পথের সুযোগ তৈরি করা, কাটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো কাজ! একদিকে সঞ্জয়ের সুবিধাবাদী প্রেমহীন সুখসর্বস্ব নারীদের সম্ভোগ বাসনা, আর একদিকে নিজের উন্নতির আশায় সঙঘবদ্ধ শক্তির আঘাতে স্বার্থকে চরিতার্থ করে পলায়নী মনোভাবে কৌশল স্থির রাখা— এই দু'য়ের দ্বৈরথে সঞ্জয় যথার্থ অর্থেই এক বুর্জোয়া নায়ক চরিত্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মার্কসীয় ব্যাখ্যায় মধ্যবিত্তরা কোনো বড় শ্রেণীর মর্যাদা পায় না। তারা সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধনিক শ্রেণীর, তার অসুস্থ বুর্জোয়া অর্থনীতির

সমাজনীতির যথাযথ অধিকার মাত্র। সঞ্জয় তারই প্রতিনিধিত্ব করে। আর যারা শ্রম দিয়ে ফসল ফলায়, সেই কৃষক এবং যারা ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন করে সেই কারখানার শ্রমিক– এরাই যথার্থ অর্থে শ্রেণীনির্দিষ্ট মানুষ। এদের ফলের মোটা অংশ, সমস্ত লভ্যাংশ কুক্ষিগত করে ধনিক শ্রেণী। সুতরাং একদিকে ক্যাপিটালিস্ট আর একদিকে প্রোলেতারিয়েত এই দু'য়ের মধ্যে সঞ্জয়ের মতো মানুষ তো তাঁতের মাকুর মতো বার বার চরিত্র বদল করতে বাধ্য। তারাই তো সময় বুঝে অভিনেতা হয়!

আর সঞ্জয়ের এই চরিত্র বদলেই গল্পের সামগ্রিক বক্তব্যের টান টান স্বভাব আগ্রহী করে। সঞ্জয়ের যে স্বভাব, তা তারই ভাগ্য। 'তুরী ছত্রি আর আহীরদের বস্তি যাদের হাড়ের সারে রক্তসম্ভবা হয়েছে চুরাশী পরগণার মাটি'– তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে। সঞ্জয়ের যেভাবে মিথ্যাভাষণে নেমিয়াকে ধরিয়ে দেওয়া, শ্রমিকদের অনাহারে কাছে এগিয়ে দিয়ে হীন ভীরুতায় পলায়ন, চাষীদের আখ বিক্রির ব্যবস্থায় বাধা দিয়ে তাদের মিথ্যে আশা-ভরসা দান- সবই সঞ্জয়ের চমৎকার বিশ্বাসঘাতক চরিত্র স্পষ্ট করে তোলে। রায়বাহাদুরের কাছ থেকে নির্লজ্জ বকশিশ গ্রহণ, পরবর্তী অন্য মিলে বড় চাকরির প্রতিশ্রুতি আদায় করে পলায়নের চিত্রের কলঙ্ককে লেখক অসাধারণ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপ দিয়েছে গল্পের শেষতম সিদ্ধান্ত চিত্রেঃ

'সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুরগী চুরি করে খেয়ে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও এসে জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।' 'ফসিল' গল্পের মিঃ মুখার্জি দুলাল মাহাতোকে ধরার যুক্তি দিয়ে যে ভুল করেছিল, তাতে তার পরবর্তী অনুশোচনা তাকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। সঞ্জয়ের যে নেমিয়ারকে ধরিয়ে দেওয়া তাতে তাকে একেবারে নীচের স্তরেই নামিয়ে দেয়। সে চিরকালের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকার সার্থক প্রমাণ থেকেছে।

গল্পে নেমিয়ারের বোন রুক্মিণী চরিত্রটির ভূমিকা খুবই নগণ্য। কিন্তু তার তাৎপর্য আরও গভীরে। সঞ্জয়কে আগেই সাবধান করে দেয় মিলের প্রবীণ-অর্বাচীন সবাই—'ঐ ভাইবোনের খপ্পর থেকে সামলে থেক বাঙালিবাবু। নেমিয়ার সঞ্জয়ের কাছ থেকে তার

স্বভাবসুলভ সোজা পথে টাকা না পেয়ে বোনকে এগিয়ে দেয় রাতে। রুক্মিণী তার ভাইয়ের স্বার্থে চালিত চরিত্র। তার চেহারায়, স্বভাবে, কথাবার্তায় একটা গোপন গভীর আকর্ষণ আছে পুরুষের পক্ষে। রুক্মিণী তা বোঝে। সঞ্জয়ের কাছে রুক্মিণী তৈরি হয়েই এসেছিল স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদানের ব্যাপারে। তার সংলাপ তা প্রমাণ করে। এঁটো হাতে সঞ্জয় তার হাত আচমকা ধরলে সে বলে, 'আঃ, বাসনগুলো পড়ে যাবে। আগে নামিয়ে রাখতে দাও।' রুক্মিণী সঞ্জয়ের লাঞ্ছিত পৌরুষের কাছে এক সম্মান। সঞ্জয় বাড়ির চিঠি পড়ে কেন হাঁড়িয়া খাওয়ার ঘোরে কাঁদে, রুক্মিণীর পক্ষে তা না-বোঝাই স্বাভাবিক। তবে রুক্মিণী বোঝে সঞ্জয়ের এত প্রেম, আপনত্ব নিষ্ফল, অর্থহীন। সঞ্জয় তাকে ছেড়ে যাবেই, কারণ সঞ্জয়ের নেশার ঘোরে একটা কথা, যা রুক্মিণী শোনায় সঞ্জয়কে 'আমি নাকি সরবতের গেলাস, সরবত নই'– এতেই প্রমাণ পেয়ে যায়। তার মাতৃত্ব তার পক্ষে শেষ সম্বল, আশ্রয়। সঞ্জয়ের টাকাটুকু তার একান্ত প্রয়োজনের। মাতৃত্বে তার মুক্তি, তার এত দিনের দেহদানের সার্থকতা- এই ধারণাতেই রুক্মিণীর বেঁচে থাকা। রুক্মিণী চরিত্র সঞ্জয়ের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যৌনতা বোধ, দেহ বাসনা, প্রেম-প্রেম খেলার সুত্রে তার সুবিধাবাদী, স্বার্থপর মানসিকতা গঠনের সহায়ক হয়েছে। 'মিল কর্তৃপক্ষের দু'চোখের বিষ' নেমিয়ার এক অসহায় শ্রমিক, রতনলাল সুগার মিলের লোডিং মুহুরি। তার চাকরির বেতন-ভাগ্য— 'ত্রিশ টাকায় আরম্ভ করে এখন এসে ঠেকেছে পনের টাকায়। এর পক্ষে একটি অবিবাহিত বোন নিয়ে জীবনযাপন যে দুর্বিষহ বোঝা যায়, তাই তার সঞ্জয় ও তার মতো মানুষদের কাছে টাকা-চাওয়া এবং হলে বোনকে মূলধন করে কাজে লাগানোর প্রয়াস স্বাভাবিকত্ব পায়। এই নেমিয়ারকে নিজের কাজে লাগাতে চায় সঞ্জয়। নেমিয়ার সঞ্জয়ের চোখে 'কেন্নো হতে পারে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য তার চেহারায় 'লোহার মূর্তির মতো ঋজু ও কঠিন।'

যে নেমিয়ারকে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল 'মেরুদণ্ডহীন', সে সঞ্জয়ের নেতৃত্বে শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আবেগে, উত্তেজনা ও শিক্ষা পেয়ে হয়ে ওঠে আলাদা জাতের শ্রমিক। আর শ্রমিক অসন্তোষের চরম দুর্দিনে তার মতো 'গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁতকে উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে।' নেমিয়ারের পক্ষে সঞ্জয়ের সান্নিধ্য, সাহচর্য ও সাহায্য পাওয়ার প্রয়াস সহজ সরল।

তবে সে সঞ্জয়ের টাকা খায়, কিন্তু সঞ্জয়ের সঙ্গে নিমকহারামি করে না। সঞ্জয় তাকে বলেছিল ‘আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। খুব ভালো করে অর্গানাইজ কর।'- এই আদেশের বেগ ও সততা নেমিয়ার আন্তরিকতার সঙ্গে বজায় রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। সঞ্জয়ের পর তার বিশ্বাস অগাধ! সেই বিশ্বাসেই সে ‘বাড়িতেও থাকে না, অফিসেও আসে না। দাঁড়কাকের মতো সে দিনরাত চুরাশি পরগণার মাঠে ঘাটে উড়ে বেড়ায়- খবরদার এজেন্টদের কথায় কেউ ঘাবড়িয়ো না। রতনলাল মিল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।’

নেমিয়ারের যে মিলের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত চোখের প্রতিশোধস্পৃহা-- তা দু'দিক থেকে তীব্রতা পায়—নিজের পক্ষে ‘কর্তৃপক্ষের চোখের বিষ’ হওয়ায় ত্রিশ টাকার বেতন পনেরো টাকায় নেমে আসার কারণে, আর সঞ্জয়ের প্রতি গভীর বিশ্বাসে সামগ্রিক শ্রমিক-ঐক্যের আবেগধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিতে। মিলের ক্যাশঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ও টাকাপয়সা নিঃশেষ করে ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে চাবি চাওয়ার মূলে দুটি উদ্দেশ্য-- ১. তাদের নেতা সঞ্জয়কে যাতে দায়ী না করে মিল কর্তৃপক্ষ তার জন্য, ২. মিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নয়াবাদের সড়ক ধরে মাল আনায় বাধাদানকারী কিষাণ ফৌজদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। অর্থাৎ, নেমিয়ার যখন একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচার তাগিদে, মিল কর্তৃপক্ষের অন্যায় উপেক্ষার কারণে অর্থনৈতিক অসহায়তায় জীবন কাটায়, তখন তার চরিত্রের একটি দিক তার সীমাবদ্ধতার দিক। আবার যখন সে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকদের হয়ে মজুরের আশ্বাসে আবেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, ভয়ঙ্কর তৎপরতায় মিলের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকদের সঙঘবদ্ধ করে, তখন সে নির্বিশেষে সর্বহারাদের নেতা হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে নেমিয়ার চরিত্রের এই পরিবর্তন অসাধারণ শিল্পের মহিমায় অঙ্কিত। নেমিয়ার মধ্যবিত্ত নায়ক সঞ্জয়ের কলঙ্কলিপ্ত চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করে দেখায়।

রায়বাহাদুর রতনলালকে গল্পের প্রথমে একবার দেখি সঞ্জয়কে আশ্বাসদানের চিত্রে ‘এই মিল তোমার। এর উন্নতি হলে তোমারও উন্নতি হবে। কাজ দেখাও, এখানে প্রসপেক্ট আছে। অথচ এই চরিত্রটি যে যথার্থ অর্থেই ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ তা বোঝা যায় সঞ্জয়ের আশা-ভঙ্গের মধ্যে। রায়বাহাদুর কাজ হাসিল করতে জানে। সঞ্জয়ের

কাছে কাজ পেয়েও তার কথা রাখে না। রায়বাহাদুরের ভাবনা, সঞ্জয়ের অভিজ্ঞতায় ‘পয়োমুখ ধনকুম্ভদের রীতিনীতি।’

রতনলাল মিলের মালিক। মিলের সূত্রেই গল্পের সমস্ত প্রধান ঘটনা সমহের সক্রিয়তা। অথচ রতনলালকে আমরা মাত্র গল্পের শেষে একবারই দেখি। মধ্য অংশে মিল কর্তৃপক্ষের কোনো সক্রিয় চিত্র না থাকায় গল্পে তার চরিত্ররূপ কিছুটা অসঙ্গত মনে হয়। একেবারে গল্পের শেষে রতনলালের নেমিয়ারকে গ্রেপ্তার করার আদেশ, সঞ্জয়কে ঘোড়ায় চাপিয়ে মকতপুরে পাঠানো, সঞ্জয়কে উপযুক্ত বকশিশ দান এবং তার গোরখপুর মিলে নতুন মোটা মাইনের চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব-প্রতিশ্রুতি শোনানো এসব তার ধনিকশ্রেণীর পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থাই। কিন্তু গল্পের মধ্যে তার আর কোনো সক্রিয়তার চিত্র না থাকায় রায়বাহাদুর রতনলাল চরিত্র শিল্পের বাস্তবতা থেকে কিছুটা বঞ্চিত।

‘গোত্রান্তর’ গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে। এই গল্পের মূল লক্ষ্য সঞ্জয়। সে বেকার মধ্যবিত্ত যুবক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ছলে-বলে-কৌশলে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনেই তার সমস্তরকম তৎপরতা। গল্পের শেষ তাকে নিয়ে। সে যে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত চরিত্র, এক অন্য গোত্রের মানুষ, এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যেই তার অন্তিম চিত্রটি অঙ্কিত। চরিত্রনির্ভর গল্পের বৈশিষ্ট্য হল, একটি প্রধান চরিত্রের উত্থান-পতন অন্তর্দ্বন্দ্বই সমগ্র গল্পের কাহিনী, ঘটনা, পরিণতি- সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে তার কমেডি-ট্র্যাজেডি-বৈশিষ্ট্যই গল্পকারের লক্ষ্য। ‘গোত্রান্তর’-এর যথার্থ ছোটগল্প-সুলভ শিল্পভিত্তি সঞ্জয়কেন্দ্রিক নিঃসন্দেহে।

গল্পের চরমক্ষণটি (climax) নির্দিষ্ট হয় চরিত্রের সূত্রেই। এই চরমক্ষণ থেকেই কাহিনী ও চরিত্র এমন এক লক্ষণীয় মোড় ফেরানোর দিকের ব্যঞ্জনা দেয়, যা গল্পের চমৎকারিত্বের উপযোগী। ‘গোত্রান্তর’ গল্পের ক্লাইম্যাক্স বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিলেও চরিত্রের একটা বিশেষ দিক সেখানেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সন্তানের জন্ম-যন্ত্রণায় ভয়ঙ্করভাবে কাতর রুক্মিণীর নতুন সন্তানের জন্মের মুহূর্ত, আর নেমিয়ারের ক্যাশঘরের চাবি নিয়ে যাওয়ার পর অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় দু’ঠোটে নেকড়ের মতো হাসি

নিয়ে পরবর্তী বিদ্রোহের প্রস্তুতি- এই দুই চিত্রের মাঝখানে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সঞ্জয়ের যে মিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে গোপন যাত্রা সেখানেই গল্পের ক্লাইম্যাক্স রচিত। রুক্মিণী ও নেমিয়ার— এই দুই। চরিত্রের মাঝখানে সঞ্জয় যে 'সর্বনাশের আহ্বান' শোনায়, তাতে তার ক্লাইম্যাক্স আছে ঠিকই, কিন্তু সমগ্র গল্প ও চরিত্রের সম্মিলিত রূপের যে ক্লাইম্যাক্স অংশ, তারও পরিচয় লেখকের বর্ণনায় মেলে।

'সঞ্জয় দৌড় দিল। সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়তে থাকে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলোর মত কুয়াশায় দপ দপ করছে। আর বেশি দূর নয়।'

এই চিত্রে চরিত্রের অন্তঃশীল স্বভাবের অভিব্যক্তির তীব্রতা ও গভীরতা অনস্বীকার্য। চরিত্রগত ভাবের একমুখিতা রক্ষায় লেখক কিছুটা প্রয়োজনহীন বিস্তারের অতিরিক্ততার পরিচয় রেখেছেন। গল্পের প্রথমে সঞ্জয়ের একান্নবর্তী পরিবার-চিত্রে যেমন তার পরিচয় আছে, তেমনি লক্ষণীয়, মিল সংক্রান্ত চিত্রের প্রয়োজনীয় অনুপস্থিতিও গল্পে চোখে পড়ে। গল্পের শেষের চিত্র অনবদ্য। শেষাংশের ইঙ্গিতধর্ম 'গোত্রান্তর' গল্পের প্রাণ। গল্পটির রচনারীতিগত একাধিক বৈশিষ্ট্য ও লেখকের শিল্পসৃষ্টির নিপুণতা, এর ভাষাচিত্র, একাধিক মন্তব্যের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও যুক্তির অকাট্য-স্বভাব, বর্ণনায় ও চরিত্রের বিশেষ বিশেষ সময়ের সাংকেতিক মানসধর্ম-উপযোগী প্রেক্ষিত রচনায় সুবোধ ঘোষ 'গোত্রান্তর' গল্পের শিল্পের সীমাকে ঢেকে দিয়েছেন।

বর্ণনাভঙ্গিতে আছে সঞ্জয়ের পরিবার-জীবনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উপযোগী বাক্যাংশ স্নেহ পণ্য মাত্র; প্রত্যেকটি আশীর্বাদ এক একটি পাওয়ার নোটিশ, মা-বাবা ভাই-বাোনের সম্পর্কে সঞ্জয় দেখে 'নির্লজ্জ মহাজনের মাংস'। তার কাছে যে ক্রেতা সেই আপনজন।" এই বর্ণনার তাৎপর্য সঞ্জয়ের চরিত্র গঠনের উপযোগী ভূমিকা রচনা করে। সঞ্জয়ের কাছে 'জলো দাম্পত্যের চেয়ে' রুক্মিণীর সঙ্গে প্রেমহীন অবৈধ যৌন-সম্ভোগ শ্রেয়। এসব ভাবনায় লেখকের মন্তব্য লক্ষ করার মতো। সঞ্জয়ের চরিত্রের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। রুক্মিণী সঞ্জয়ের ভাবনায় আঁকা 'সরবতের গেলাস, সরবত নয়।' একই সঙ্গে রুক্মিণী ও নেমিয়ারের রূপ দেখে সঞ্জয়ের বিশেষ মানসিকতার বর্ণনায় লেখকের

বাক্য প্রয়োগ : ‘এ ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর দুজন কুপিন ডাইন ও ডাইনী যেন তু করে সর্বনাশের আহ্বান করছে।’ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস ও প্রতিবাদী শক্তির সীমা ছাড়িয়ে সঞ্জয়ের ঘোড়ায় চেপে পলায়নের প্রেক্ষিতে লেখকের বর্ণনা ‘আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে। কিষাণেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে। যেন পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা।’ সঞ্জয় আঁজলা ভরে জল তোলে স্রোত থেকে, আর ‘গেরস্থের মুরগি চুরি করে খেয়ে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও এসে জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো’— এমন সব বর্ণনায় ও চিত্রে বৈপরীত্যে, গভীর গূঢ় মন্তব্যে যে লেখক-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁর রচনারীতির অনবদ্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ‘গোত্রান্তর’ গল্পের সংকেতধর্ম তার ভাষার গভীরতার প্রমাণ দেয়। গল্পের ভাষার উপমা যেমন চিত্রের স্বভাবে শিয়ালের সক্রিয়তায় ধরা, তেমনি তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ সঞ্জয় চরিত্রের স্বভাবকেও স্পষ্ট করার সহায়ক হয়েছে। পারিবারিক চিঠিগুলিকে সহসা ছিড়ে পুড়িয়ে ফেলার স্বভাবের উপমার রূপ—‘ক্ষ্যাপা বামুন যেমন করে তার পৈতে ভস্ম করেন’, নেমিয়ারের এক বিশেষ সময়ে শুকনো ঠোঁট দুটো নেকড়ের ঠোঁটের মত হাসছে।' সঞ্জয়ের অন্তিম সর্বনাশা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে মানসিকতা বর্ণনার ভাষাচিত্র নদীতে বান ডাকে, ভয়াল জলের তোড় আসে গর্জন করে। জেলে তার যথাসর্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড় দিল।’ ‘সামনে টুলের ওপর বসে আছে সঞ্জয় বিশীর্ণ রোগীর মত।’ গল্পের রচনারীতি ও গদ্যভঙ্গিতে এমন সব প্রয়োগ সার্থক ছোটগল্পের অঙ্কশায়ী করেছে ‘গোত্রান্তর' গল্পটিকে।

গল্পের লেখক সুবোধ ঘোষ এই দুটি গল্পে শুধু নয়, সম সময়ের একাধিক প্রচনায় তার একান্ত নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। লেখক ব্যক্তিত্ব ফসিলের মতো গোত্রান্তরেও স্পষ্ট। আগেই বলেছি, 'ফসিল’ ও ‘গোত্রান্তর’ দুটি গল্পই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের রচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল এক রক্তিম অগ্নিপরীক্ষার কাল-- বিশেষ করে বাংলার সমাজজীবন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যেমন, তেমনি তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি-জীবনের পক্ষেও। 'ফসিলে’র মতো ‘গোত্রান্তর' গল্পে তারই সম্যক ছায়াপাত ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।

তার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ছিল তিনটি বিবাদমান শক্তি আমেরিকা-ব্রিটেন, হিটলার-মুসোলিনি এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে সেই যুদ্ধের অভিঘাতে আমরা দেখেছি ধনিকতন্ত্র, সাম্যবাদী গণচেতনার উদ্বুদ্ধ সর্বহারাতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব, আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্রমভঙ্গুর অবক্ষয়িত রূপাবয়ব। সুবোধ ঘোষ এই কালে লিখতে বসে কালকে অস্বীকার করতে পারলেন না। আশ্চর্যজনকভাবে অদ্ভুত শিল্পী-প্রাণ কালের দাবিতেই বুঝিবা সর্বহারা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর পক্ষে চলে আসেন। তার 'ফসিল' ও 'গোত্রান্তর' গল্পে সেই প্রাণের পরিচয় আছে।

আর এই সূত্রেই তার বিশেষ মানসিকতা ধরা পড়ে। এই মানসিকতাতেই তার ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত হয়ে যায়। 'গোত্রান্তর' গল্পে শ্রমিকদের পক্ষে থেকে মধ্যবিত্ত-মানসিকতার ফাঁকা, ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য, অবিবেকি দিকগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। সঞ্জয় তারই প্রতিনিধিত্ব করে। সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গল্পের মতো এই গল্পেও শ্রমিকদের একতাবদ্ধ জাগরণের দিক এঁকেছেন। ধনতন্ত্র নয়, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ নয়, সামন্ততান্ত্রিক কৌশল নয়, শ্রমিক জাগরণ যে অবশ্যম্ভাবী, তার প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন এ গল্পে। নেমিয়ারের আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জ্বলে-ওঠা, রায়বাহাদুর রতনলালের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিষাণ মুনিরামের যাবতীয় সঠিক argument, নয়াবাদ পরগনা থেকে ফসল আনার সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা, আখের খেত থেকে আখ না তুলে শেষে তাতে আগুন লাগিয়ে রতনলালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, দাঁতে দাঁত চেপে আমরণ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার যে সব ছবি এঁকেছেন সুবোধ ঘোষ, তা তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে।

এরই মধ্যে নেতৃত্ব দিতে আসে সবদিক থেকে মধ্যবিত্ত সঞ্জয়। তার চরিত্র যে আত্মসর্বস্বতার নামান্তর, তার নেতৃত্ব যে সুযোগসন্ধানীর কর্মতৎপরতা, এ দিকটিও নিপুণভাবে আঁকতে ভোলেননি লেখক। ধনীর সঙ্গে সর্বহারাদের বিরোধে মধ্যবিত্তরা যে পরগাছা- তা এ গল্পে প্রমাণিত। সুবোধ ঘোষ আরও এক ধাপ এগিয়েছেন এ গল্পে 'ফসিল' থেকে। 'ফসিলে' আছে শুধু শ্রমিক, এ গল্পে কৃষক ও শ্রমিক এককাট্টা। যৌথভাবে দুই শ্রেণীকে সঙ্গে এনে যেভাবে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একতার

বন্ধনে বেঁধেছেন লেখক প্রতিবাদী মানুষদের, তার পরিকল্পনা লেখকের বিশিষ্ট দষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

সুবোধ ঘোষ স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমশ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়েছেন, ফিরে এসেছেন শ্রমিক কৃষকদের *ছেড়ে* অন্য আশ্রয়ে। এই আশ্রয়ে *থেকে* তিনি ‘ফসিল’, ‘গোত্রান্তরের বিশ্বাস ও দৃষ্টি থেকে সরে এসেছেন বিপরীত দিকে। ‘ফসিলে’র দুলাল মাহাতো যেমন compromise করেনি, করতে চায়নি ‘গোত্রান্তরে’র নেমিয়ার, মনিরাম, ছেদিলালরাও। তাই মিঃ মুখার্জির অনুশোচনা, সঞ্জয়ের বিশ্বাসঘাতকতা তার সেই শ্রেণী-উপযোগী যথার্থতা ও বাস্তবতা পেয়েছে। কিন্তু উত্তরকালে সুবোধ ঘোষ নিছক প্রেমের গল্প নিয়ে। যেমন নিজেকে কোনো রকমে জিইয়ে রেখেছেন, তেমনি শ্রেণী-সংগ্রামে জেতা বা হারা মানুষ নয়, শ্রেণীগুলির মধ্যে অবিরাম আপোসের কথা বলে একটা মীমাংসায় স্থিত হতে চেয়েছেন, যা শ্রেণীস্বভাব-বিশ্লেষণে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই সুবোধ ঘোষের শিল্পী সাহার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়ে যায়। কিন্তু ‘ফসিল’ ও ‘গোত্রান্তরে’র সুবোধ ঘোষ নিশ্চিতভাবে ছোটগল্পের কি প্রসঙ্গ এবং প্রকরণ— উভয়তই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ লেখক ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

‘গোত্রান্তর' গল্পের নামের ব্যাখ্যা নানা দিক থেকে মূল্যবান মনে হবেই। গল্পের প্রথমে যে সঞ্জয়ের একান্নবর্তী পরিবার-চিত্র আছে, তার মধ্যেই ‘গোত্রান্তর' নামের ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া একটুও কঠিন নয়। আমাদের একান্নবর্তী পারিবারিক জীবন দোষে-গুণে এমন। একটা জীবন, যার মধ্যে মানবিক বোধ ও বুদ্ধির নানান পরিচয় মেলে। পিতার পিতৃত্ব, মায়ের স্নেহ, ভাইদের ভালোবাসা, পরিবার জীবনে থাকতে থাকতে অন্য অন্য পরিবারের কোনো নারীর প্রতি প্রেমের সম্পর্কে মঙ্গল ভাবনা— এসবই তো মানব-ধর্মের অনুগত। মানুষের মানবিকতাবোধের যে গভীর নিগূঢ় শিক্ষা, তা সমাজ-নির্দিষ্ট পরিবার-জীবনেই মেলে- যদিও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহে তার মধ্যে নানান ভাঙনের সূত্র মাথাচাড়া দিয়েছে। সঞ্জয় এমন পরিবারে মানুষ হয়েও সে সমস্ত মানবিক সম্পর্কের বোধ ও বুদ্ধিকে, সূক্ষ্ম আকর্ষণগুলিকে তার দিক থেকে তিক্ত অভিজ্ঞতায় ‘পণ্য মাত্র’ মনে করে, মনে করে ‘নীলামী মহলে তার সব মনুষ্যত্ব অতি সস্তায় বিকিয়ে’

যায়। এই ধারণাই তাকে পরিবার জীবনের সগোত্র থেকে আলাদা করে দেয় মনে মনে। এই যে স্বাভাবিক মানব-সম্পর্ককে তুচ্ছ করে সঞ্জয়ের মানসিকতায় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ওঠা— এটাই এক অর্থে সর্বকালের মানুষের পক্ষে এক ধরনের গোত্রান্তর হওয়া। সঞ্জয়ের পক্ষে মানব ভাবনার স্বাভাবিকত্বের পাশে বিকৃতি বটে, কিন্তু তা গোত্রান্তরই এক অর্থে।

আর এক বড় দিক থেকে সঞ্জয়ের গোত্রান্তর হওয়ার মানসিকতা তৈরি হতে দেখা যায় গল্পে। পরিবার-জীবনে দীর্ঘ চার বছরের বেকারি জীবন কাটাতে কাটাতে ভাবে সঞ্জয়- ‘পশুর মতো নিছক একটা গোমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইচ্ছা এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। সঞ্জয় বুঝেছে, তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তার গোত্রান্তর। এই গৃহকুটের বস্য সে ধরে ফেলেছে।’ এই ভাবনার সূত্রেই সে আসে রতনলাল সুগার মিলে চাকরি নিয়ে। উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত জীবন-স্তর থেকে উচ্চবিত্তের জীবন-স্তরে ওঠা। মধ্যবিত্ত মানুষ সঞ্জয় মধ্যবিত্ত অবস্থাকেই ঘৃণা করে উঠতে চায় উচচ্চবিত্তের স্তরে। তার সমস্ত রকম তৎপরতা গল্পের মধ্যে যেভাবে চিত্রিত-- তাতে আছে গোত্রান্তর হওয়ার গভীর বাসনা। সুতরাং মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত তথা ধনিকশ্রেণীতে আসার মধ্যে যে গোত্রান্তরের ব্যঞ্জনা তাতেই গল্পের নামের সার্থকতার পরিচয়।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যার সূত্র আছে নামের স্বপক্ষে। সঞ্জয়ের আর এক চরিত্ররূপ তার পক্ষে রুক্মিণীর দেহ সম্ভোগ-বাসনা। সঞ্জয় গোত্র বদলে নীচে নামতে চায় না। তার লক্ষ্য, প্রসপেক্ট নয়, আরও বড় ও কঠোর এক সাধনার ভার নিয়ে সঞ্জয় এসেছে এখানে। নিঃশব্দে লোপ করতে হবে তার পুরনো সত্তাকে, ফেরারী আসামীর মতো। আর নেমিয়ারের দীর্ঘ পাঁচ বছরের কর্মজীবনের পতন-চিত্র দেখে সে ভাবে-- ‘লোকটার ছায়ার মধ্যে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ।’ গোত্রের কথা এখানেও বিচার করে সঞ্জয়। সেই বিচারেই নেমিয়ারকে দেখে মনে হয় লোকটা মেরুদণ্ডহীন, নইলে কেন্নোর মতো অমন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকা যায় না। এমন যার আত্মবিশ্বাস, নেমিয়ার প্রসঙ্গে যে মনে করে ‘মানুষের হৃদয়বৃত্তির চরম পরিচয় সে জেনেছে। অত সহজে ভবী তার ভোলে না। নেমিয়ার কোন ছার’– আজ সেই মানুষই নেমিয়ারের তৈরি-করা, বোন রুক্মিণীর

মতো টোপ গিলে অতি সহজেই আর এক গোত্রে চলে গেছে। তাই তার রুক্মিণীর অবারিত দেহ সম্ভোগের, যৌন-পিপাসা চরিতার্থ হওয়ার মাদকতাতেই উপলব্ধি ঘটে 'সত্যিকারের গোত্রান্তর হয়েছে সঞ্জয়ের। পাখি শুধু তার ডাকার আবেগে যেমন করে সঙ্গিনী লাভ করে, রুক্মিণী তেমনি ভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সসম্মানে লুফে নিয়েছে। জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো। তার বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।' এমন রুক্মিণী-নির্ভর স্বভাব-পরিবর্তন সঞ্জয়ের যথার্থ গোত্রান্তরের পরিচায়ক।

চতুর্থ ব্যাখ্যাটি হল নেমিয়ারের দিক থেকে। নেমিয়ার গোত্রে সঞ্জয়ের নীচের তলার মানুষ ছিল। তাদের কোনো আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল না। মানুষ নিজের স্বার্থে তাদের একতাবদ্ধ করে, তাদের নেতা হয়। নেমিয়ার, মুনিরাম, সুখলাল, ছেদি সকলকে নিয়ে যে মিলের কর্তৃপক্ষ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা এবং সঞ্জয় যার নেতা, সেই শ্রমিক কৃষকের যৌথ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মের নেতা নেমিয়ার। সে ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সমবেত স্বার্থের জন্য লড়তে চায়। নেমিয়ার চরিত্রের এই যে উত্তরণ তা তার নতুন গোত্রভুক্ত হওয়ারই উপায়। সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক একতাবদ্ধ হয়ে একটা শ্রেণীর গোত্রে চলে আসে, সে শ্রেণী শোষিতদের শ্রেণী। এই গোত্রান্তরে নেমিয়ার একটা প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। ক্যাশঘরের চাবি চাইবার মুহূর্তে নেমিয়ারকে দেখে সঞ্জয় 'গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁতকে উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে।' বাস্তবিক অর্থে যে নেমিয়ার ইত্যাদিরা গোত্রহীন ছিল, তারা আজ সর্বহারা শ্রেণীর মানবতার জাগরণের মধ্যে গোত্রসমন্বিত হয়েছে। এই গোত্রান্তরে সঞ্জয় পরাজিত ব্যক্তিত্ব। নাম সার্থক এই অর্থেই।

'গোত্রান্তর' নামের শেষতম ব্যাখ্যাটিই গল্পের একমুখিন বক্তব্যের মূল ব্যঞ্জনা। নিজের পারিবারিক সম্পর্কে সঞ্জয়ের গোত্রান্তর ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তা তার আংশিক পরিচয়। নেমিয়ার-রুক্মিণী-- দুজনের সুত্রে সঞ্জয়ের যে গোত্র বদল, তা-ও আংশিক, তার ব্যক্তিগত বাসনা-কামনার অঙ্গীভূত দিক। কিন্তু সমস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে সঞ্জয়ের যে আত্মসর্বসতা ও সুযোগ-সন্ধানী তৎপরতার কারণে শ্রমিক কৃষক

শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাকে সর্বকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আলাদা এক গোত্রে নিয়ে যায়। সে চেয়েছিল আরও বড় হতে অর্থকৌলীন্যে, সামাজিক মর্যাদায়, কিন্তু সে নেমে এসেছে কুৎসিত হীন মনোবৈশিষ্ট্যের মানুষের স্তরে। সে সত্যিকারের মধ্যবিত্তই যার আপন স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এতটুকু কাপে না, বরং শিয়ালের মতো ধূর্ততায় ও নির্লজ্জতায় ধনিক শ্রেণীর কাছে বকশিশের বরমাল্য গ্রহণে প্রীত ও পুলকিত হয়। শ্রমিকের ও কৃষকের স্বার্থ ধ্বংস করে আত্মস্বার্থের কারণে ধনিক শ্রেণীর পদলেহনেই, প্রসাদ প্রাপ্তিতেই যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা তৃপ্তি পায়, তার শ্রেণী হিসেবে গোত্রবদলে বড় তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে 'গোত্রান্তর' গল্প। এই দিকের ব্যাখ্যাতেই 'গোত্রান্তর' গল্পটির নামকরণের সামগ্রিক তাৎপর্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই অর্থে নামের সবচেয়ে বড় ব্যঞ্জনা এখানেই।

৯.৩ অযান্ত্রিক

সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে, নাম পরশুরামের কুঠার। এই গ্রন্থেরই অন্যতম গল্প 'অযান্ত্রিক'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে লিখতে বসে এই লেখক একাধিক গল্পে যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ার উত্তাপ, কখনো বা সেই সময়কালের দেশীয় নানান প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত স্বভাবকে মনে রেখে গল্প লিখে গেছেন। যুদ্ধ-সমকালে সাম্যবাদী আন্দোলন ভারতে যথেষ্ট তীব্রতা পায়। গান্ধীজির নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলনে ঔপনিবেশিক শাসকদল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশীয় সর্বস্তরের মানুষ যেমন সামিল হয়েছিলেন, তেমনি সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় ব্রতী হয়ে একাধিক নেতা শ্রমিক-কৃষকদের দাবি-দাওয়ার সূত্রে তাদের সংগঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এ সবই ছিল শাসক ও শোষক, অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাংলা তথা ভারত থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রবল প্রয়াস। এরই মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকের নিজ নিজ শ্রেণী সম্পর্কে সচেতনতা স্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। শ্রমিকদের শ্রমের বণ্টন এবং তার সূত্রে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া অর্থনীতির বিষম নীতির প্রয়োগে শ্রমিকদের শ্রমবিভাগ নিয়েও নানান চাপ চারপাশ থেকে দেশীয় রাজনীতি ও ব্রিটিশ

বিরোধী আন্দোলনে বিরুদ্ধ শক্তি-উপযোগী ছায়াপাত ঘটায়। সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পটি সেই শ্রমিক ও শ্রম-ভাবনার এক অত্যদ্ভুত শিল্পরূপ-- যা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একদিক থেকে এক নতুন গল্পের জন্ম দিয়েছে, নতুন স্বাদ সৃষ্টি করেছে।

শ্রমিকদের পক্ষে শ্রমই একমাত্র মূলধন জীবনধারণের ক্ষেত্রে। এই শ্রম যে বাড়তি খাদ্য উৎপাদনে বা বস্তুনির্মাণে সক্ষম হয়, সেই লাভ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ক্যাপিটালিস্টরা ভোগ করে বলেই যত বিরোধ। আবার শ্রমদানের ক্ষমতা যখন শ্রমিকদের চলে যায়, তখন জীবনধারণের উপযোগী আশ্রয়ের অসহায়তা তাদের পঙ্গু করে দেয়। 'অযান্ত্রিক' গল্পের নায়ক বিমল, কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশ্চয়ই। তার আছে একটি সাবেক আমলের ফোর্ড গাড়ি, যার 'প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটি কদর্য দীনতার ছাপ।' বিমলের 'ব্যস্ত-ত্রস্ত কর্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরটি বছরের সাথী এই যন্ত্রপশুটা, বিমলের সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।' 'অযান্ত্রিক' গল্পের যদি কোনো কাহিনী অংশ থাকে, প্লট বা গল্পভিত্তি থাকে এবং কাহিনী-নির্দিষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকে, তবে তা বিমল ও তার 'জগদ্দল' নামের ট্যাক্সির মধ্যেকার সম্পর্ক-ভাবনার ধারাবাহিক প্রকাশেই চিহ্নিত।

কিন্তু অযান্ত্রিক গল্পে প্রচলিত অর্থে, সাধারণ নিয়মে কোনো ঘটনা-কাহিনী নেই। ঘটনার বৈচিত্র্য নেই, কাহিনী-বৃত্তের নিটোল স্বভাব নেই, আছে বিমল ও জগদ্দলের মধ্যেকার গোপন মানসিক সম্পর্কের ধারাসম্মত ইতিবৃত্ত। তাই কিছুটা কাহিনীর মর্যাদা পেতে পারে। অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙাচোরা ভয়ঙ্কর জংলীপথে বিমল তার জগদ্দল গাড়িটি নিয়ে যাতায়াত করে। গাড়িটি পুরনো আমলের এবং প্রায় জীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থা তার। বিমল নাম রেখেছে 'জগদ্দল'। এটি বিমলের জীবনের পক্ষে বড় প্রিয় সম্পদ। তাকে যেনবা এক গভীর মানবিক অপত্য স্নেহ-ভালোবাসায় মায়া-মমতায় কাছে রাখে। যেখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, যাত্রীদের প্রধান ওঠানামার জায়গা, সেখানে বিমলের জগদ্দলও দাঁড়ায়। কিন্তু যাত্রীরা নতুন আধুনিক মডেলের ট্যাক্সিই নেয়, বিমলের গাড়ি চড়তে আসে না।

অথচ বিমলের গাড়ির গতিবেগ অত্যন্ত বেশি, ঠিকমতোই যাত্রীদের পৌঁছে দিতে সক্ষম। তার গাড়িতে তেল অনেক কম লাগে। কম তেলেই সে তুলনায় অনেক বেশি মাইল চলে যেতে পারে। এমন গাড়ির প্রতি বিমলের এতই মমতা যে, কেউ তার গাড়ি নিয়ে যে কোনো ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ করলে সে তার গাড়ির পাশে হাল আমলের গাড়িকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। গাড়িটি পুরনো হয়ে যাওয়ার ফলে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তার দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিমল অতি সস্নেহে তার এমন গাড়িকে নিজের হাতেই সারায়, কলকাতা থেকে দামী দামী পার্টস এনে তার শরীরকে, ইঞ্জিনকে নতুন করে, নতুন শক্তির জোগান দেয়। তার জন্যে বিমলের মতো একজন গরিব ট্যাক্সি ড্রাইভারের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও সে তার এই গাড়ির প্রতি মমতায় এতটুকুও কার্পণ্ করে না কারণ বিমল নিজেই তার মালিক এবং চালক। সে আবার নিজেই মোটর বিশারদ একজন পাকা মিস্ত্রিও।

কিন্তু ক্রমশ বিমল অনুভব করে, তার যেমন বয়স হয়েছে, তেমনি বয়স হয়েছে জগদ্দলের। গতি তার কমে আসছে, যেন মানুষের মতোই বার্ধক্যের রোগে ধরেছে তাকে। বিমল কিন্তু দমবার পাত্র নয়। সে জগদ্দলকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। দিনের যাত্রী না পেলে বিমল দমে না, সন্ধের শেষ-যাত্রীদের দিয়েই জগদ্দলকে বোঝাই করে বিমল নিয়ে যেতে সক্ষম। সে বিশ্বাস তার জগদ্দলের প্রতি এতদিন ছিল। কিন্তু এখন তার, এই অক্ষমতায় বিমল তার হাতঘড়ি, বাসনপত্র, এমনকি শোবার তক্তপোষটাও বিক্রি করে তাকে একেবারে নতুন করে দেয়। খুশি হয়ে সেদিন বিমল রাতে শুতে গেলেও গভীর রাতে ঝুপঝুপ বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গ্যারেজে গিয়ে দেখে ফুটো টিনের ছাদ দিয়ে জল পড়ে ইঞ্জিন অকেজো হবার উপক্রম। নিজের শোয়ার বিছানার সবকিছু দিয়ে ঢেকে গাড়ির মধ্যেই ঘুমোয় বিমল।

এত করেও যেন-বা ভাগ্যের ফেরে জগদ্দল পরের দিন সকালে রাস্তায় বেরিয়েও বিকল হয়ে যায়। যেন নিয়তির টান এসেছে জগদ্দলের। বিমলের মনে শূন্যতার ছায়া নেমে আসে। বোঝে, জগদ্দলকে এবার বিদায় দিতেই হবে। আর যখন তার এই উপলব্ধি, তখন সে-ও সমস্ত দিক থেকে নিঃস্ব, অসহায়। বিমলের সহ-ট্যাক্সিচালক

গোবিন্দ এক পুরনো লোহা-বিক্রি মাড়োয়ারি ব্যবসাদারকে নিয়ে আসে বিমলের কাছে। বিমল তার জগদ্দলকে বিক্রি করে দেয় তার কাছে। সে রাতে বিমল তার মত্ত নেশার ঘোরে শোনে সেই ব্যবসাদারের জগদ্দলকে ভেঙে-খুলে টুকরো টুকরো করে পার্টস সংগ্রহের শব্দ। বিমলের অসহায় করুণ শোক যেন বিমলেরই এক একটি পাঁজর খোলার অভিজ্ঞতায় ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এখানেই গল্পের শেষ।

আগেই বলেছি, 'অযান্ত্রিক' গল্পে লেখক কোনো নির্দিষ্ট প্রচলিত আদর্শের কাহিনী রচনা করেননি। প্লটের বৃত্ত-পরিকল্পনা বিমল ও জগদ্দলের সম্পর্কের মধ্যকার অন্তঃস্বভাবের স্বাভাবিক উন্মোচনেই সার্থকতা পেয়েছে। নায়ক বিমলের জীবনধারণ, শ্রম, গাড়ি নিয়ে আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভাবালুতা, উৎসাহ, আপত্তি, ক্লান্তি এবং নিজ জীবনাগ্রহের সঙ্গে গাড়ির স্বভাবের সাযুজ্য-ভাবনা গল্পের প্লটকে অভিনবত্ব দান করেছে। সামান্য কিছু ঘটনা তৈরি হয়েছে জগদ্দলের স্বভাব থেকেই। কেন্দ্রীয় চরিত্র জগদ্দল ও নায়ক চরিত্র বিমল— এই দুয়ের সম্পর্কে লেখক অতি সংযতভাবে, নিপুণতার সঙ্গে বিমলের মতো শ্রমিকদের শ্রমজীবনের ক্রমিক ইতিহাসটুকু রচনা করেছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিমলের জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে জগদ্দলেরও যে অসহায় অথর্ব অবস্থা— তার মধ্যেই প্লটের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব।

'অযান্ত্রিক' গল্পে চরিত্রই প্রধান হয়েছে, কিন্তু সে চরিত্র গতানুগতিক চরিত্র-ভাবনা নয়। চরিত্র মাত্র দুটি বিমল ও জগদ্দল। জগদ্দল যন্ত্র মাত্র, কিন্তু তার উপস্থাপনা, বর্ণনা, সক্রিয়তা, সমাপ্তি-চিত্র এক জীবন্ত শ্রমজীবী মানবস্বভাবের প্রতিরূপকে বিশ্বাস্য করে। আগে উল্লেখ করেছি কেন্দ্রীয় চরিত্র জগদ্দল, নায়ক বিমল। জগদ্দল কেন্দ্রীয় চরিত্রই বটে, কারণ বিমলের যা কিছু চিন্তা-ভাবনা, ক্ষোভ, ক্লেশ, দুঃখ-কষ্ট, অসহায়তা, আনন্দ, উল্লাস— সব কিছুই জগদ্দলকে কেন্দ্র করে, তাকেই মানবজীবনের তথা বিমলের পক্ষে বিশাল শ্রমজীবনের একমাত্র ভিত্তি করে।

গল্পে জগদ্দলের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই ঠিকই, বিমলের জীবনাবেগেই তার মূল্যায়ন, কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য নানাভাবে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পে। তার প্রাগৈতিহাসিক গঠন, দেখতে জবুথবু চেহারা, জটায়ুর মতো জরাভারগ্রস্ততা, পাদানিতে পা রাখলে,

মাড়ালে কুকুরের মতো ক্যাঁচ করে শব্দ করা, তেল-ছোপ লাগা সিট, ভিতরে দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গেঞ্জি ও আলোয়ানের শোভা, একচক্ষু দানবের মতো অট্টহাসি নিয়ে দৌড়নো স্বভাব, হর্নের কানফাটা আওয়াজ, রেডিয়েটরের মুখের তৃষ্ণার্ত স্বভাব এসবই তার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যকে মানব-ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত করে। জগদ্দল বাস্তবিক পক্ষে বিমলের জীবনে এক উপযুক্ত সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কিন্তু জগদ্দল যেনবা গল্পে বিমলেরই জীবনের একটি অদ্ভুত রূপক-ব্যঞ্জনা! গাড়িটি বিমলের জীবনের জীবনস্বভাবের প্রতীকত্ব পায়। তবে লেখক একে এমনভাবে বিমলের আচার-আচরণ দিয়ে উপস্থিত করেছেন গল্পে, যা তার ব্যক্তি-চরিত্রের উপযোগী বিশিষ্টতা দেয়। যান্ত্রিক বা বাস্তব ক্লান্তি ও জরাজীর্ণতা যেভাবে জগদ্দলকে পঙ্গু করে, তার প্রতিরূপ তো বিমলেরই জীবনে আছে! বিমলের পনেরো বছরের সঙ্গীটি শুধু কথা বলতে পারে , কিন্তু বিমলের পক্ষে জগদ্দলের সঙ্গে তার সংলাপ বিনিময়, জগদ্দলের এক মানুষ সুলভ আচরণ তার অস্তিত্বের সঙ্গে উপমিত করে। জগদ্দলের কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিশেষত্ব সেখানেই যেখানে সে বিমলের জীবন-অস্তিত্বের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ হয়ে যায়। বিমল থেকে সে বিবিক্ত কোনো অস্তিত্ব নয়। বাস্তব অর্থে সে রূপক বা প্রতীক-প্রতিম কোনো শিল্প কাঠামোর হতে পারে, কিন্তু এমন একটি শিল্প-মাধ্যমকে জীবন্ত চরিত্রের সঙ্গে সমন্বিত করে আঁকায় সুবোধ ঘোষ এই গল্পের চরিত্র পরিকল্পনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জগদ্দল বস্তুত বিমলেরই প্রকৃত চিত্ত-স্বভাবের প্রতিফলিত রশ্মি— যা বিমল এবং যন্ত্র দুইকে এক করে দেখাতে সক্ষম।

বিমলই এই গল্পের নায়ক। তার সক্রিয়তা ও দুর্ভোগ, তার জীবনের অসহায়তা ও শোক- এসব দিয়েই তার নায়কত্ব নির্ণীত হবে সহজেই। বিমল নিজেই জগদ্দলের মালিক ও চালক। সে একজন মোটর-বিশারদ পাকা মিস্ত্রিও। এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে জগদ্দলের সঙ্গে তার যোগ আত্মার। মানুষ যেমন বন্ধু, পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে গভীর মায়ার বন্ধনে, বড় বড় মানবতায় সংলগ্ন হয়ে যায় ক্রমশ, তেমনি বিমলও তার প্রিয় গাড়িটির সঙ্গে নানা সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ মায়া-মমতায় একাত্ম হয়ে যায়। এই একাত্মতাই এক জীবন ও যন্ত্রের যৌথশক্তি। একজন

সজীব, মুখর, অন্যটি নির্জীব, নিথর। বিমলের জীবনের সবলতাতেই তার প্রাণস্ফূর্তি। 'ত্রস্ত-ব্যস্ত কর্মী জীবনে সুদীর্ঘ পনের বছরের সাথী এই যন্ত্রপশুটা বিমলের সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা। এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং।' আসলে শ্রম-নির্ভর জীবনে জগদ্দল তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার মূল্যবান শ্রমই তার জীবনধারণে উপযোগী মূলধন। এই মূলধন যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে বিমলের মতো গরিব মানুষের অস্তিত্বই টেকে না। তার কাছে চটকদার নতুন মডেলের গাড়িগুলো বেশ্যার মতো অন্যের শ্রমে উৎপাদিত পণ্যকে টাকায় কিনে ভোগ করা। বিমলের গাড়ি নিজেরই শ্রমজাত পণ্য বুঝি-বা! তার মতো ট্যাক্সিচালক শ্রমিকের পক্ষে জগদ্দলের মতো গাড়িটা যে নড়বড়ে এক মূলধন— তার ভাবনাতেই বোঝা যায় : 'এই কম্পিটিশান বাজারে, এইসব শিকার-বাজের ভিড়ে এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে দিচ্ছে। আর তেল খায় কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরিব, জগদ্দল যেন সত্যটুকু বোঝে।

জগদ্দলের শৌখিন খদ্দের টানার ক্ষমতা না থাকলেও তাকে দিয়ে বিমল তার চাহিদাটুকু মিটিয়ে নেয়। তাকে অত্যন্ত সেবাযত্নে রাখে। নিজেই তার বিকল অবস্থা সারায়। বিমলের সমস্ত কিছু বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে জগদ্দলকে বাঁচানোর প্রয়াসের মধ্যে শ্রমনির্ভর জীবনের প্রতি গভীরতম আসক্তি। কিন্তু বিমলের যেমন বয়স বাড়ে, শরীরে ক্লান্তি আসে, একদিন জগদ্দলেরও যান্ত্রিক বা ধাতব ক্লান্তি আসে, জরা-জীর্ণতা দেখা দেয়। একজন গরিব শ্রমিকের পায়ের তলার মাটিও নরম হয়ে ওঠে। যার ওপর বিমলের গভীর বিশ্বাস, তা-ই তাকে হতাশ করে শেষে। ক্রমশ 'অক্ষম বৃদ্ধের মত জগদ্দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলতে থাকে। শেষে বিমলকে সর্বস্বান্ত করে। রোগমুক্ত হয়েও জগদ্দল বিমলকে শূন্যতার দিকে ঠেলে দেয়। পুরনো লোহা বিক্রির ব্যবসায়ী তাকে টুকরো টুকরো করে। এক গভীর আত্মহননের মতো মানসিকতায়, শূন্যতায়, বিশাল জীবনের অসহায়তায় ডুবে যায় বিমল।

বিমল চরিত্রের যে উত্থান-পতন, তার জীবনধারণ, উচ্চাশা, অসীম শ্রম বস্তুত তাকে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনবেদ রচনায় সহায়ক করে তোলে। শ্রমিক হিসেবে সে সৎ,

আন্তরিক। শ্রমদানে তার এতটুকু ক্লান্তি নেই, অবসন্নতা নেই। তার জীবনে প্রেম ও শ্রমের প্রতি গভীরতম নিষ্ঠাই তাকে অন্য মানুষ করে। কিন্তু জীবন-প্রেম তো নিয়তির নির্দেশ অস্বীকার করতে পারে না। তাকে সন্ধি করতেই হয়। নতুন ব্যবসাদাররা নতুন মডেলের ট্যাক্সি তৈরি করে তার শ্রমকে তুচ্ছ করে, আর তাই গল্পের শেষে সেই নতুন ব্যবসাদারের কাছেই তা অসহায় শ্রমটুকুর আত্মসমর্পণ। বস্তুত সমগ্র অযান্ত্রিক গল্পে বিমলের ভাগ্যের যে উহ পতন, যে নিষ্করুণ অবস্থার প্রতিচিত্রণ ও সমস্তরকম সহায়হীন অসহায়তা, তাই নিৰ একে শ্রমিকের সার্থক জীবন-স্বভাবকে বুঝিয়ে দেয়। একজন গরিব শ্রমিকের মানবতা ও মমত্ববোধ, নিষ্ঠা ও সততা, কর্মে আসক্তি ও শ্রমে শ্রদ্ধার মধ্যেই বিমলের চরিত্র-চিত্রণের মৌল তাৎপর্য। গরিব শ্রমিকের কায়িক শ্রমজীবনের যে অবধারিত ট্রাজেডি ‘অযান্ত্রিক’ গল্পের কেন্দ্র সেই দুঃখজনক স্বরূপকেই ব্যঞ্জনায় স্পষ্ট করে।

সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক’ গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতে পড়ার যোগ্য। বিমলের মতো এক গরিব ট্যাক্সিচালক ও শ্রমিকই এই গল্পের মূল লক্ষ্য। তার জগদ্দল তাকে, তার বেদনার জগৎটিকে যথাযথভাবে শিল্পের মমতায় চিত্রিত করার সহায়ক বিষয়-মাত্র। নিজ অধিকারে আপন যন্ত্র যে ট্যাক্সি, তার প্রতি মানবতার আকর্ষণ ও গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন তা বিমলের জীবন-ভাবনার সূত্রেই বড় মূল্য পায়। চরিত্রাত্মক গল্পের সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক যেমন হয়, যেমন সামাজিকও হতে পারে, হতে পারে সাধারণ মানব-মানবীর সম্পর্কে ব্যাখ্যাকার গল্প-ভাবনা, তেমনি আবার একটি বিশেষ চরিত্রের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস, সেন্টিমেন্ট, তার ক্রম-প্রকাশ্য রূপচিত্রও। এই জাতীয় গল্পের পরিণতিতে থাকে ব্যঞ্জনাগর্ভ বিস্ময়ের প্রকাশ। ‘অযান্ত্রিক’ গল্পের শ্রেণীনির্ণয়ে এই ভাবনা সত্য বলে এর বিমল চরিত্রই গল্পের মেরুদণ্ড।

প্রত্যেক গল্পেরই কোনো না কোনো জায়গায় ক্লাইম্যাক্স রচিত হয়ে যায়। অযান্ত্রিক গল্পের ক্লাইম্যাক্স জগদ্দলকে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রির সিদ্ধান্তে- ‘হ্যাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়িটাও দেব। ওটা একেবার অকেজো হয়ে গেছে।’ যে বিমল জগদ্দলকে নিয়ে এত অসুবিধের মধ্যেও ভাবতে পারেনি কোনোদিন জগদ্দলকে বিক্রি

করার কথা, বিশেষ করে পুরনো লোহার ব্যবসাদারের কাছে, সেই বিমলই ভয়ঙ্করভাবে সিদ্ধান্ত নেয় বিক্রির। বিক্রির আগে বিমলের শূন্যতাবোধ চরমে ওঠে। যা কোনোদিন হয়নি তাই হল। ইস্পাতের গুলির মতো শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু'ফোটা টলমলে উষ্ণ জল। এই মানবিক বেদনাবোধ তার গাড়ির জন্য যেমন, তার নিজের জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসার জন্যও সমান। বিমলের কাছে জগদ্দল তার জীবনীশক্তি। কোনো স্মৃতিটুকুও রাখতে চায়নি এই গভীর অভিমানে, সে গাড়ি বিক্রি করে দেয়। তার মনের দিক থেকে এবং গল্পের শিল্প-স্বভাবেও ক্লাইম্যাক্স এখানেই।

'অযান্ত্রিক' গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এতে এতটুকু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নেই, নেই কাহিনীর অকারণ বিস্তারও। এর ভাববস্তু প্রকাশের তির্যকতায় একটি কেন্দ্রেই উজ্জ্বল। বিমল গরিব ট্যাক্সিচালক, কিন্তু তার পেশার প্রতি সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। নিজেই মালিক ও চালক, নিজেই ভালো মোটর বিশারদও। সুতরাং তার যে শ্রম ও তন্নিহিত সক্রিয়তা এবং ভাবনা-চিন্তা- তা তার স্বভাবেরই রক্তমাংস। জগদ্দল নামে যন্ত্রের সঙ্গে বিমলের একাত্মতা নয়, যে শ্রম জীবন দেয়, জীবনের গতি দেয়, জীবনকে সর্বদিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার প্রতিই বিমলের মানবিক বড় বোধের বন্ধন। এই ভাবটির কেন্দ্রানুগ অভিব্যক্তির চিত্রটি অনবদ্য শিল্পরস পেয়েছে 'অযান্ত্রিক' গল্পে। সুবোধ ঘোষ গল্পের কোথাও এতটুকুও শৈথিল্য রাখেননি প্রকাশরীতিতে। গল্পের আরম্ভ বিমলের স্বভাবের একগুঁয়েমি অবক্ষয়-বৈশিষ্ট্য দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার ট্যাক্সিরও। গল্পের শেষ এই দুই অস্তিত্বের পরাজয়-বেদনায়। এমন করুণ পরিণতি মানব-ভাগ্যেরই নির্দেশক। গল্পের ইঙ্গিতময়তা যন্ত্রকে বিস্তৃত ও জীবন্ত করে স্থান দেওয়ায় অসাধারণত্ব পেয়েছে। | এই গল্পের ভাষার সংক্ষিপ্ততা, সংযম ও সারল্য লক্ষ করার মতো। জগদ্দলকে নিয়ে। কৌতুক করার দিকটিও আর এক লক্ষ করার বিষয়। 'মাড়ানো কুকুরের মতো কাঁচ করে আর্তনাদ', 'একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে', 'একটা একচক্ষু দানব অট্টহাস্যে হা হা করে', 'শুধু ধুকতে লাগল বুড়ো জগদ্দল', 'সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দূরন্ত বনহরিণের গতি', 'পালায় লোহার বাচ্চা, নির্জীবভূত', 'ইস্পাতের গুলির মতো শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখ'— এমন সব বাক্য ও বাক্যাংশে যে জগদ্দল ও বিমলের চরিত্রাত্মক ব্যঞ্জনা, তা গল্পের ভাষাচিত্রকে নানা রঙে অনবদ্য চমৎকারিত্ব দান

করে। অযান্ত্রিক গল্পের ভাষা তার নিজস্ব। তা বিবরণসর্বস্ব নয়, তা চরিত্রের আত্মার অধিগত হৃদয় ও রক্তের ভাষা। অযান্ত্রিক' গল্পের রচনা-ভঙ্গির এমন নিরাসক্ত সংক্ষিপ্ততা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক শিক্ষণীয় বিষয় নিশ্চয়ই। বাংলা সাহিত্যে গৃহপালিত পশু-পাখি নিয়ে গল্পের বড় চরিত্র করা হয়েছে। শিল্পত্ব অস্বীকার করার নয়, কিন্তু নিছক একটা যন্ত্রকে নিয়ে তার প্রয়োজনানুগ ব্যবহারকে মানব স্বভাব দিয়ে মানুষের সঙ্গে তার আত্মিক গভীর যোগাযোগে গল্প রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে প্রথম এবং সুবোধ ঘোষ এই - জাতীয় ছোটগল্পের ধারায় প্রথম একজন কৃতী পথিকৃৎ।

ফসিল' এবং 'গোত্রান্তরে' আমরা দেখেছি, সুবোধ ঘোষ যুদ্ধ-সমকালে গল্প লিখতে বসে সেই সমকালীন অন্যান্য সাম্যবাদী ভাবনা-ধারণায় শিক্ষিত লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মতো শ্রমিকদের ও তাদের শ্রমের মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন নানাভাবে। 'অযান্ত্রিক' গল্পের বিষয়ও তাই প্রমাণ করে। অর্থাৎ সুবোধ ঘোষ সে সময়ের ছোটগল্পে শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে ছিলেন। তার এই মানসিকতা তাঁর বিশিষ্ট জীবন-ভাবনার দ্যোতক যদিও, পরে তিনি গান্ধীবাদে বিশ্বাস রেখে দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলেছেন। অবশ্যই শ্রমজীবী মানুষদের কথা 'অযান্ত্রিক' গল্পের লেখক সুবোধ ঘোষের মতো এমন বড় ব্যঞ্জনায় তখন কেউ বলেননি। ফসিলের দুলাল মাহাতো, গোত্রান্তরের নেমিয়ারের থেকে অযান্ত্রিকের বিমল আলাদা জাতের শ্রমিক। সে তার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় তার শ্রম, শ্রমনিহিত উৎপাদন দুয়েরই মালিক। দুয়ের সঙ্গে তার যোগ রক্তের। তার বিচ্ছিন্নতার বেদনা বৃহত্তর মানবতার। বিমলের যে বিচ্ছিন্নতার বেদনা, অসহায়তা, শূন্যতা— তা শ্রমিক-মনস্ক দরদি সুবোধ ঘোষেরই। এই গল্পে লেখক-ব্যক্তিত্বের এমনই স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

অযান্ত্রিক গল্পের নামের তাৎপর্য কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক চরিত্ররীতি থেকে অনেক বড় ব্যঞ্জনা আনে। সাধারণভাবে জগদ্দল নামের গাড়িটি মূলত যন্ত্র-নির্ভর হলেও তার আচার-আচরণ যন্ত্রের মতো নয়, এই অর্থে নাম 'অযান্ত্রিক'– এই ব্যাখ্যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, বিমল ও জগদ্দলের মধ্যে দুজনের ব্যবহারের ব্যাখ্যা। জগদ্দল নামক যান্ত্রিক বিষয়বস্তুটির সঙ্গে বিমলের মতো মানুষের ব্যবহার যন্ত্রের মতো কৃত্রিম হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তা কোথাও হয়নি। জগদ্দল বিমলের 'ব্যস্ত-ত্রস্ত

কর্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরোটি বছরের সাথী। এই যন্ত্রপশুটি বিমলের সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা। এমন সম্পর্কের বড় তাৎপর্য মানবিকতা বোধ আনে। মানুষের যে ধর্ম প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মমত্ববোধ, আদর, রাগ, দুঃখ, ভয়, শূন্যতা— এ সবই জগদ্দলকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে বিমলের মধ্যে। তাই যান্ত্রিকতা নয়, অযান্ত্রিক মানব বৈশিষ্ট্যই এ গল্পে প্রতিপাদ্য বলে নাম সার্থক। তৃতীয়ত, জগদ্দলের সঙ্গে বাস করতে করতে বিমল নিজেও বুঝি যন্ত্র হয়ে যায়। গোবিন্দ যখন এসে সমবেদনা জানিয়ে বলে, 'কি গো বিমলবাবু, একটিও ভাড়া পেলে না?' তখন বিমলের তাৎক্ষণিক উত্তর 'এর শোধ তুলব সন্ধেয়। ডবল ওভার লোড নেব, যা থাকে কপালে।' জগদ্দল তার রুটি-রোজগারে বাধা দেয়, জীবনধারণের উপযোগী রসদ আনতে অনেক সময়েই অক্ষম হয়, কিন্তু বিমলও তাকে খাটাতে কম কসুর করে না। সে ক্ষেত্রে বিমলও যেন এক প্রতিস্পর্ধী যন্ত্র। এই ধারণায় বিমলও একটা কথা ভাবে- 'আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছে ভালো। বিমল খুশি হয়ে মনে মনে হাসে। কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষেরই মত, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না। এইটেই দুঃখ।' বিমলের এই উক্তিতে যন্ত্রের দিক থেকে মানবিক ব্যবহারে অযান্ত্রিক হওয়ার দিকের ইঙ্গিত আছে। অযান্ত্রিক নামে জগদ্দলের দিক থেকেও তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ বিমলের যখন রুটি-রোজগারের পথ বাধাগ্রস্ত হয়, তখন জগদ্দলও যেন সমবেদনায় কাত হয়ে বিমলের এমন দুর্দিনে অমানুষিক খেটে তার মানবিক কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়। সুতরাং ব্যবহারে কখনো বিমল অযান্ত্রিক, কখনো বা যন্ত্র হয়েও জগদ্দল অযান্ত্রিক। এই অর্থে নামের ব্যঞ্জনা অনেক শক্ত মাটি পায়।

৯.৪ পরশুরামের কুঠার

সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটি এই নামেরই একটি গল্প সংকলনের ন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প। গ্রন্থটির প্রকাশকাল উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল। এই গ্রন্থের প্রকাশের দ'বছর পরে বেরোয় 'ফসিল' গল্প সংকলন। দুটি গ্রন্থই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে প্রকাশিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল মানেই যেমন দেশীয় রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক, মাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে এক চরম অগ্নিপরীক্ষার কাল, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির মত্রে

এ কাল সমস্তরকম লেখক-বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে নতুন এক বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরার চিহ্নিত অধ্যায়। সুবোধ ঘোষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবাদের পথ ধরে মধ্যবিত্তের নতুন এক বাস্তব বলয়ের মধ্যে তার পাঠকদের আকৃষ্ট করেন।

এই বাস্তবতাবোধ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা থেকে জাত নিশ্চিত নতুন মাত্রার জীবন পর্যবেক্ষণ। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে তার প্রমাণ মেলে। পেশাগত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ধরে, যেমন—সার্কাসের ক্লাউন হওয়া, বোম্বে পুরসভার ঝাড়দারি করা, ঠিকাদারি করার কাজে সুদূর পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত পাড়ি দেওয়া, বাস কণ্ডাক্টরি করা, সামান্য চিঠিপত্তর লেখার কেরানিজীবন গ্রহণ— এই লেখককে মানস গঠনে এক অভিনব ব্যক্তিত্বের মানুষ করে তোলে। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে সুবোধ ঘোষের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব তারই অনুগ। একসময়ে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথায় সুবোধ ঘোষ জানিয়েছেন :

'...আমার গল্প লেখার কৃতিত্বটা বিশুদ্ধ আকস্মিকতার একটা ইন্দ্রজালের জাল নয়। ভাবনা, কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন-বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্তরিত হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল।'

'পরশুরামের কুঠার' গল্পের অসাধারণ বিষয়বৈচিত্র্য সেই সব রূঢ় বাস্তব জীবন শিক্ষার অন্যতম এক স্বাভাবিক শিল্প-স্বীকৃতি। ক্রমশ নতুন করে গড়ে-ওঠা এক খনি শহরের নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসর্বস্ব জীবনধারণ ও যাপনের উজ্জ্বল চিত্রকে বুঝিবা পোস্ট-মর্টেমের টেবিলে রেখে সর্বকালের মানব্য-ভাবনার তীব্র আলো ফেলে শ্লেষের ছুরি দিয়ে নিপুণ জীবন-ব্যবচ্ছেদ করেছেন গল্পকার। সে সমাজের মানুষগুলির পক্ষে স্বভাব-নিহিত স্বার্থান্ধ বিপরীত নীতি-বিগর্হিত আচরণের হিসেবে আত্মবিশ্বাস দেখার স্বচ্ছ আয়না হয়েছে। এই গল্পের প্লট-নিবিষ্ট খণ্ড খণ্ড কাহিনী ও ঘটনা ধীরে ধীরে গল্পের কাঠামোকে একটি পর্ণ রূপ দেয়। কোলিয়ারিগুলিকে ঘিরে যে অঞ্চলের নাম ছিল সামান্য নয়াবাদ বাজার' তা ক্রমশ নতুন কুলি, কারিগর, কেরানি, দোকানীদের ভিড়ে একটি থানার অধীন থেকে হয়ে ওঠে নয়াবাদ মহকুমা। একজন সাবডিভিশনাল অফিসারের আদালত, কিছু উকিল, ডাক্তার, একজন ওভারসিয়ার শ্রেণীর ভদ্রলোক

এদের আবির্ভাব, প্রাইমারি বা স্কুল প্রতিষ্ঠা, মিউনিসিপ্যালিটি চালু হওয়া, ক্যাথলিক মিশনের গির্জা নির্মাণ, দেশী খৃষ্ট মেয়েদের কনভেন্ট, একটি অনাথালয়, একটি জেনানা হাসপাতাল, ঝাউবনের মধ্যে নয় সব ইমারতের মাথা তুলে দাঁড়ানো, নয়াবাদ স্টেশন- এই সমস্ত দিয়ে নতুন গড়ে ওঠা ছোট শহরটা হয় কসমোপলিটান স্বভাবের।

এই শহরেরই বাঙালিটোলা থেকে সামান্য দূরে দুর্গাবাড়ির পিছনে এক আমড়াতলায় তিলকের মা ধনিয়া নামে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়ের ঘর। ঘরের সামনে একটি ছাগল সব সময়ে বাঁধা থাকে বলে বাংলা স্কুলের ছেলেরা নাম দেয় ‘ছাগল লজ’। এরই গায়ে গায়ে আছে দীর্ঘদিন জেল-খাটা আশি বছরের বুড়ো প্রসাদি দোসাদের আস্তানা। এই প্রসাদী ধনিয়ার দেওয়া অন্নেই জীবন নির্বাহ করে। ধনিয়ার ছেলে তিলক এবং তার বাবাকেও কেউ কোনো দিন দেখেনি। ধনিয়া দু-তিন বছর পর পর নিয়মিতভাবে সন্তানের জন্ম দিয়ে আসে মিশন জেনানা হাসপাতালের একটি ফ্রি বেডে। ছেলে ওখানেই ফেলে চলে আসে। তার ছেলে না-নেওয়ার যুক্তি তার ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মতো অর্থাভাব, তার ওপর তার ছেলে তার কাছে থেকে ভিখিরি হবে, দুশমন হবে এ সে চায় না। বরং নার্সদের কেউ তার ছেলেকে রাখলে সে আন্তরিকভাবেই তার আয়া হতে রাজি। তার ছেলেগুলি এইভাবেই ক্রমশ সোজা নার্সারিতে চালান হয়ে যায় হাসপাতাল থেকেই। রাতে ধনিয়া একাধিক পুরুষের সঙ্গে কাটায় বলে ছেলেদের বাবার নামও নার্স রেজিস্ট্রারকে জানাতে অক্ষম যে ধনিয়া, তা অকপটে স্বীকার করে।

বস্তুত রাতের অন্ধকারে প্রতি রাতেই রাউন্ডের পুলিশের আয় বাড়িয়ে নতুন শহরের মানুষরা ধনিয়ার কুঁড়েঘরে ভিড় জমায়। এমন যে ধনিয়া, তাকে একসময়ে খুব দরকার পড়ে নয়াবাদের ভদ্রবাড়ির প্রসূতিদের জন্য। প্রসূতিদের আধি-ব্যাধি-জর্জর সূতিকা রোগ, রক্তহীনতা, বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এবং কোনো ওষুধ নয় সদ্যোজাত বাচ্চাদের মায়ের বুকের দুধের ভাইটালিটির প্রয়োজনে ধনিয়া নিজের বুকের দুধ দিয়ে বেড়ায় তাদের সন্তানদের মুখে। বদলে পায় দু’বেলার রেট নগদ মাসিক ছ’টাকা, দৈনিক এক পো চালের সিধে আর ঠিকে শেষ হলে বিদায় নেবার দিন একটা

নতুন শাড়ি। এই বরাদ্দে ধনিয়া বাড়ি বাড়ি খেটে যায় প্রতিদিন সকাল বা সন্ধের আগে পর্যন্ত। ধনিয়ার হাতের ভাজ-করা তোয়ালে, সুগন্ধ তেল মাখানো মাথার বাঁধা চুল, লাল সায়ার ওপর পাতলা বোলাই শাড়ি, চলার সময় পায়ের চুটকিগুলোর খই ফোটার মতো শব্দ, মুখের মৃদু হাসি, প্রসাধনের থেকে পরিচ্ছন্নতা, সুশ্রী চেহারা- এসবই তার যেমন বড় রকমের আকর্ষণ, তেমনি ভদ্রবাড়ির গৃহিনীদের রসাল জটলার বিষয়ও।

এইভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায়। ধনিয়ার আমড়াতলার জীবনে কোনো ছেদ পড়েনি। এখন ধনিয়ার চল্লিশ বছর বয়স। এর তিন বছর আগে শুধু শেষবার জেনানা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল ধনিয়াকে। বিলিতি গুঁড়ো দুধের আমদানি হওয়ায় ধনিয়ার ভদ্রবাড়ির শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর আর প্রয়োজন নেই। তাই ধনিয়ার এখন অভাব পয়সার। তেলেভাজার দোকান করে উপায় করে, চেহারায় জৌলুসের অভাব ঠিকই, কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য এখনো অটুট আছে বলে এখনো ধনিয়া হঠাৎ-হঠাৎ কোনো কোনো লোককে রাতে ঘরে ঢুকতে দেয়। ধনিয়া এর মধ্যে বড় দিনের পরবে আগের চেনা বাবুদের বাড়ি কিছু বকশিশের মতো ভিক্ষে করতে যায়। তাতেই পাড়ায় কথা ওঠে— ধনিয়ার মতো গণিকাকে ভদ্র পাড়া থেকে সরিয়ে তাদের নির্দিষ্ট পল্লীতে পাঠাতে হবে। বড়দিনের ছুটিতে ধনিয়া রাস্তায় শোভাযাত্রার মধ্যে ব্যান্ড-বাজিয়ে যাওয়া অনাথালয়ের ছেলেদের দেখে গভীর মাতৃত্বের গোপন মমতায় সজল অন্যমনস্ক। তখনো সে জানে না তাকে গণিকাপল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

অনেক চেষ্টা করেও, পুলিশকে টাকা দিয়েও ধনিয়া শেষ পর্যন্ত তাকে সেই পল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারল না। শেষে কান্নাকুল হয়ে ধনিয়া দু'দিন ধরে অভুক্ত বুড়ো প্রসাদী দোসাদকে বুকের দুধ নিঃশেষ করে খাইয়ে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে মুক্ত হয়। চলে আসে গণিকাপল্লীর আলো ঝলমল নির্দিষ্ট দোতলা ঘরে। নতুন করে সারা শরীরে উদ্দাম উত্তাল কামের আগুন জ্বেলে, পানের পিকে ঠোট লাল করে, দুহাত তুলে জানালার গরাদে বুকে চেপে এক সন্ধেয় দাঁড়ায় ধনিয়া। ওর সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে তখন এক বিদঘুটে অস্থির আনন্দের জ্বালা। তার এমন প্রতীক্ষা মাঝ রাত, শেষ রাত পর্যন্ত। কারণ নীচে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরই বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হওয়া সেই

ঘোষালবাবুর লম্বা চেহারার বড় ছেলে, আছে খাজাঞ্চি বাবুর ছেলেদের ইঙ্গিতময় ইশারা!

গল্পের প্লটবৃত্তে ঘটনার সমবায়ে কাহিনীর সময়ের মাত্রা (duration of time) অনেক বড় মাপে :

'বছরের পর বছর ঘুরে গেছে।...নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি জাঁকিয়ে উঠেছে। নতুন টাউন বাড়ানো হয়েছে প্ল্যান করে। ... পাঁচ সাত দশ বারো ষোল আঠারো বছরের পর বছর ভেসে গেছে। ধনিয়া প্রায় চল্লিশ বছরে পা দিল।'

এমন চল্লিশ বছরের ধনিয়ার যৌবন বয়স দিয়ে, এক ছেলে তিলকের মা হয়ে গল্পের শুরু হয়েছে। সময়ের এই ব্যবধানই গল্পের প্লটে এনেছে বিবৃতিমূলকতা (descriptive method)। কিন্তু এই বিবরণ-ধর্ম গল্পের প্লটে এনেছে বিবর্তিত ইতিহাসের স্বভাব। সামান্য নয়াবাদ বাজারের রূপ এক খনি অঞ্চলের বিশাল শহর হয়ে ওঠার চিত্রে সেই সভ্যতার বিবর্তনকেই দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার।

তাই 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের প্লটের পরিণামী বক্তব্যের প্রয়োজনে কাহিনী ও ঘটনার স্বাভাবিক বিস্তার। তিলকের মা, এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধনিয়ার স্বভাবকে আঁকতে এমন বিবর্তিত ইতিহাস-চিত্র সংক্ষেপেই এ গল্পে প্রয়াোজন। কিন্তু গল্পকার অতি সংযতভাবে অপ্রয়োজনীয় মেদ-মাংসহীন স্বভাবে প্লটের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। ছোট ছোট চিত্রাত্মক ঘটনায় ধনিয়ার জীবন ধারণ ও যাপন, এর পাশাপাশি নয়াবাদ শহরের শিক্ষিত স্বার্থসর্বস্ব ধনীদের বাড়ির চিত্র, অন্দরমহলের বাস্তব রূপ ও স্বভাব কাঠামোয় গেঁথেছেন গল্পকার। কাহিনীর প্রথম দুটি ভাগ—১.রক্তিম যৌবন থেকে ধনিয়ার চল্লিশে পা দেওয়ার আগের জীবন, ২. চল্লিশ বছরের পক্ষে গল্পের প্রয়োজনীয় আর এক জীবন। মাঝখানে যে সময়ের ব্যবধান গল্পকার বিবরণে জানিয়েছেন, তা গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে এতটুকুও বাধা দেয়নি।

অর্থাৎ গল্পের প্লটের যে কঙ্কালের মতো সুশৃঙ্খল কাঠামো-- তার ওপর ধনিয়া চরিত্র ভদ্রশ্রেণীর মানুষগুলি প্রয়োজনীয় মদ-মাংস-মজ্জা চাপিয়ে শিল্পের সজীব প্রাণের লাবণ্য

ছড়িয়েছে। তাই কাহিনী ও ঘটনা মিলে গল্পের প্লট এই গল্পের বড় সম্পদ। অবশ্যই গল্পের প্লট তার কাহিনী ও ঘটনার সম্মিলিত রূপে 'চরমমুহূর্তে'র জায়গাটি নিশ্চিত চিনিয়ে দেয়। বিবরণ নয়, কিছু খন্ড চিত্রের সমাহার নয়, ধনিয়াকেই সামনে রেখে গল্পের 'চরমমুহুর্তের উপযোগী ধনিয়ার সেই স্বতঃস্ফূর্ত মহৎ মাতৃত্বের বোধ ও বোধির জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণের দৃশ্যেই এক আলো-আঁধারি দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। গল্পের 'চরমমুহুর্ত' এক জীবন্ত চিত্রের বাস্তবতায় বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আনে পাঠকের মনে। শুরু এই রকম :

'ধনিয়া কাঁদছে। এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মতো প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা। এ কি ? তুই ধনিয়া?

হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী!'

যে ধনিয়াকে গল্পে কোনোদিন কাঁদতে দেখা যায়নি, যে ধনিয়া কেবল মাতৃত্বের গর্বে সুস্বাস্থ্যে, তথাকথিত নীতিবাদী সমাজের মাপের বাইরের এক গর্বিত রমণী, তার এমন অসহায় কান্না দিয়ে গল্পটির 'চরমমুহূর্তে'র শুরু, শেষ ধনিয়ার মাতৃত্বের বুবুক্ষা ও মর্যাদাকে চিরকালের মতো বিদায় জানিয়েঃ

'ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজর্জর শরীরটাকে বেড়ালের ছানার মতো কোলের ওপর তুলে নিল! কাঁচুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথার পাকা চুলের জট-গুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

এক ঘণ্টা পর। পরিতৃপ্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রসাদী। ক্লান্ত সিক্ত চোয়াল দুটো এলিয়ে পড়েছে। প্রসাদীকে ধুনীর কাছে মাটিতে শুইয়ে দিল ধনিয়া।'

চল্লিশ বছরের মধ্যবয়সী মা ধনিয়া মাতৃসত্তা থেকে চিরকালের বিদায় নেয় এক শিশুর মতো বৃদ্ধ প্রসাদীর প্রতি মাতৃত্বের শেষ পরিচর্যা করে। এই পরিচর্যায় আপাত-বিকার থাকতে পারে, কিন্তু অসহায় মাতৃ-অনুভব সক্রিয়। গল্পের এই চরমমুহূর্তের চিত্রটির মহিমা সমগ্র গল্পের যেমন, তেমনি ধনিয়া চরিত্রেরও এক বিষন্ন রমণী-প্রাণের 'সোয়ান

সঙ'! এর পরেই ধনিয়া অন্য রমণী, সে গতানুগতিক গণিকা নয়, সে যেন এক সদ্য শান দিয়ে উজ্জ্বল ধারালো করা ভারী লোহার উদ্ধত কুঠার। কাহিনীর এমন পরিণতির জন্য মহামুহুর্ত পর্যন্ত গল্পের যে প্লটবৃত্তের জট-- তা শিল্পন্যায়ে নিখুঁত, বিশ্বকর্মার নির্মাণের মতো!

'পরশুরামের কুঠার' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও অন্যতম লক্ষ্য ধনিয়া নিঃসন্দেহে। তার

চরিত্রকে স্বচ্ছ আয়না করে সে সময়ে ভদ্র, স্বার্থান্ধ সমাজের ও মধ্যবিত্ত মানুষের নিতিহীনতা, অবক্ষয় ও মানুষ হিসেবে সর্বদিকের অক্ষমতাকে, সভ্যতার বিকৃতিকে, অবক্ষয়কে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার। তাই ধনিয়া একালের গল্পকারের কলমে যেন এক চিরকালের শিল্পীর নিষ্ঠুর প্রশ্ন! ধনিয়া চরিত্রের মাতৃসত্তায় আছে লক্ষণীয় বৈপরীত্য। সে নিজের সন্তানকে কাছে রাখে না, অন্যদের সন্তানকে মাতৃত্ব দিয়ে বাঁচায়। মাতৃত্ব বিক্রয় তার জীবিকা! মাতৃত্ব হয় পেশা! দেহ তার পণ্য নয়, মাতৃত্ব নামক মূল্যবান সম্পদ সঞ্চয় ও আহরণের প্রধান উপায়।

তাই ধনিয়াকে সাধারণ দেহোপজীবিনীর স্তরে রাখা যায় না। সে একাধিক অপরিচিত ও সদ্য-পরিচিত পুরুষকে দেহ দান করে ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে সে অর্থ জমায় না, বড় মানবতাবোধকে বুকের গভীরে লালন করে উষ্ণ স্বভাবে। এখানেই সে সাধারণ গণিকা নয়। জেনানা হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছে তার মূল্যায়ন সঠিক :

'ধনিয়া অদ্ভুত মানুষ। হাসপাতালের নার্সরা আশ্চর্য না হয়ে পারে না। লেডি ডাক্তারও হতবুদ্ধি হয়ে বলেন "জানিস্। আমি সত্যি ঘাবড়ে গেছি। এই মেয়েটা আমার বাইবেল ও বিজ্ঞান উলটে দিয়েছে। জানতাম পাখির বাচ্চাই বড় হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম পাখিই পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে দিয়ে।"

প্রশ্ন ওঠে, ধনিয়ার ক্ষেত্রে কোনটা বড়? রমণীর বহুভোগ্যা হয়ে-ওঠার স্বভাব, না, বহুভোগ্যা এক সুস্থ রমণীর সর্বজনীন মানবিক মাতৃসত্তা? সভ্য সমাজ ও মানুষ তো প্রথম বিষয়কে সমর্থন করবে না, কিন্তু দ্বিতীয় দিকটিকে কি তারা অস্বীকার করতে পারে? সুবোধ ঘোষ এমন এক জটিল প্রশ্নকে ধনিয়া চরিত্র পরিকল্পনার মূলে সক্রিয়

রেখেছেন বলেই আমরা মনে করি। এ ধনিয়ার সর্বজনীন মাতৃসত্তা তার যেমন জীবিকা সত্তার সমর্থক, তেমনি তার মানবিক সত্তারও পোষক। তার একান্ত নিজস্ব মাতৃসত্তার প্রকাশ দুভাবে গল্পে ধরা পড়ে। তার বুকের দুধ নিয়ে যে জীবিকা, সেখানে তার মাতৃসত্তা স্মৃতিসূত্রে এক কৌতুকের অনুভব জাগায়। সেখানে নিজের বুকের দুধ বিলিয়ে কৃত্রিম স্নেহ জাগরণের মজা পায় :

'ধনিয়া বলে— এ ঝি দিদি, তোমাদের বড় ছেলে কই? ঝি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো--ঐ যে তাস খেলছে। তা, এত খোঁজে দরকার কি তোমার ? উঃ কত বড় হয়ে গেছে। দাঁত ওঠার পরও মাই ছাড়তে পারে নি।

একবার কামড়ে দিয়ে আমাকে কী নাকাল করেছিল, মনে আছে তো ঝি?'

এখানে কৃত্রিম পেশাগত মাতৃসম্পর্কে ধনিয়ার এক হালকা মজা আছে। কিন্তু অনাথালয়ের ছেলেদের মার্চ করে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে উৎসবের আয়োজনে অংশগ্রহণের চিত্রে ধনিয়া এক অন্য-মা:

'ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বকের মত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে ছটি তারই উপহার। কিন্তু কে তার চেনবার উপায় নেই।..

কিসের ভাবে যেন দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে। .....সকল পার্থিব রজঃ মধুময় হয়ে উঠেছে।

...অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা যেন সমস্ত শরীর ছাপিয়ে বয়ে চলে গেছে- প্রিয় সঙ্গসুখের চরম ক্ষণে উৎসারিত সজলাসারের মতো। বুকের আঁচলটা ভাল করে টেনে নামিয়ে দিল ধনিয়া। কাঁচুলি ভিজে গেছে।'

এ চিত্র হল সত্যিকারের ব্যক্তি-মা ধনিয়া- যার গভীর সত্তায় আত্মার বিশুদ্ধ আলোর মতো দ্যুতিময় হয়ে আছে বিশ্ব-মায়ের অন্তর।

এমন যে ধনিয়া, সেই হল বাজারের গণিকা অক্ষম অসহায় প্রতিবাদ, আকুল কান্না ও কষ্টের মধ্যে। এখানে সে চল্লিশ বছরের মধ্যবয়সী এক অন্য রমণী। গল্পকারের বর্ণনায়:

'রূপের বেসাতিনীদের লাইন।.....

চল্লিশ বছরের আগুনে শুদ্ধ করা জীবন যৌবন, তার সব খাদ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধনিয়া মনের মতো করে সাজলো।'

গণিকা পল্লীর যে ধনিয়া, সে সোনালী চুমকিদার রুমালে জড়ানো চুড়ো করা খোঁপায়, অন্তর্বাস ছাড়া নীল রেশমি শাড়িতে, মখমলের সবুজ কাঁচুলি বাঁধা আঁটসাঁট বুকের রক্ত মাংসের আড়ালে এক সর্বধ্বংসী ক্রোধের আগুনে জ্বলা পিণ্ড। যার মধ্যে ছিল মায়ের সর্বময়ী (benevolent) রূপ, তার মধ্যে আর এক সত্তা— সর্বধ্বংসী করাল (malig nant) রূপ। এখানে তারই সৃষ্টিকে ধ্বংস করার আনন্দে সর্বাঙ্গ ছাপানো এক বিদঘুটে আনন্দের জ্বালার অস্থিরতা। এমন দুই রূপে ধনিয়া গল্পে হয়েছে শিল্পধন্য। তার যে বিষাদময় পরিণতি চিত্র, তার মাতৃসত্তার সম্পূর্ণ অবলেপনেই মেলে। তার যে পতনের ছবি, তা পতন নয়, সর্বশেষ দধীচির মতো মৃত্যুবাণ হয়ে তথাকথিত নীতিনিষ্ঠ, স্বার্থপর সভ্যতা, সমাজ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ। তারই প্রশ্রয়ে যেসব পুরুষ বড় হয়েছে, জীবন পেয়েছে, তাদের সমূলে ধ্বংস করার অব্যর্থ মৃত্যুবাণ সে। তাই ধনিয়ার চরিত্র ন্যায় গল্পের শেষে পেয়ে যায় এক প্রসন্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনা। গল্পের অন্যান্য ছোটখাটো মানুষগুলি ধনিয়ার পাশে তুচ্ছ। গৌণ চরিত্রেরও নয়, ছোট ছোট চরিত্রচিত্রের স্বভাবে ধনিয়ার পূর্ণ রূপ তুলে ধরেই একেবারে ম্লান হয়ে যায়। তারা ব্যক্তি নয়, 'সমষ্টি'র প্রতিনিধি, তথাকথিত সভ্যতার উজ্জ্বল উপকরণ।

'পরশুরামের কুঠার' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য— যা গল্পকারের জীবনকে বিশেষভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সব সময়েই জড়িয়ে থাকে তা গল্পটির রচনাকালের সময় পরোক্ষভাবে নিয়ে চিরকালের মানব সভ্যতার এক গভীর সমস্যাকে তুলে ধরে। 'গরশুরামের কুঠার' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমসময়ের রচনা। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ নিশ্চয়ই এতে নেই, কিন্তু এই বিশেষ সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এক পরোক্ষ চিত্র-স্বভাব

আমরা কিছুটা পাই, পাই বড় শহর থেকে দূরে এক কলিয়ারির চারপাশে ছোট শহর ক্রমশ গড়ে ওঠার কথায়। এখানে আর্থ-সামাজিক দিক এসেছে বিশেষ এক অঞ্চলের কাগ চিরকালের সভ্য মানুষের, সভ্যতার উদ্ভবের প্রাসঙ্গিকতায়।

গল্পে যে সমাজ-পরিবেশে ধনিয়ার চলাফেরা, তা নিশ্চিত সভ্যতা-আলোকিত ভদ্র সমাজ। এই সমাজগঠনে যেমন কসমোপলিটন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি তার অ রে এসবের বৈপরীত্যে আর এক কৃত্রিম, স্বার্থসর্বস্ব পচা-গলা অবক্ষয়ের জীবনও মাকড় দেয়। ধনিয়া কিসের শিকার এই প্রশ্ন প্রসঙ্গত ওঠে। সে নিশ্চয়ই সর্বহারা শ্রেণীর এক রমণী। তারা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণেই তার ঘরে রাতের অন্ধকারে নয়াবাদ শহরের নতুন নতুন শ্রেণীর মধ্যে থেকে মানুষ আসে যায়। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে নারীর শরীর ভোগের উপকরণ মাত্র। ধনিয়ার অনৈতিক মাতৃত্বের সুযোগ ভদ্রশ্রেণী গ্রহণ করতে নির্দিধ। এই অর্থনীতিতে অর্থের বণ্টনবৈষম্য যেমন অভিশাপ, তেমনি নারীর কাছ থেকে সুবিধে আদায়ে স্বার্থপরতাও গভীর ক্ষতের মতো। ধনিয়া এর শিকার।

শিকার সে মধ্যবিত্ত অর্থনীতির— যা নতুন বুর্জোয়া সভ্যতার নিশ্চিত পরিণাম। গমকারের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এই ধনিয়াকে দিয়ে নবগঠিত ও সৃষ্ট সমাজের পচাগলা দিক থেকে আলোর সামনে নিয়ে আসা। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শর্তই হল, শহরে যেমন ভদ্র ব্যক্তিরা থাকবে, তেমনি তাদের বিলাসের জন্য, সুখের জন্য গণিকাপল্লীও থাকবে। ধনিয়া সেখানে ঘর নিতে বাধ্য হয়। সেই ধনিয়াই যাদের ভদ্রবাড়ির শিশুদের বুকের দুধ খাইয়ে বড় করে, সুস্থ, সবল করে, বেঁচে থাকার মতো জীবন দান করে, সে আবার তাদেরই ভোগ্যপণ্যের আকর্ষক সম্পদ হয় তাদের তরতাজা তরুণ বয়সেই। এই চরম অধোমুখ নীতিভ্রষ্টতায় আছে সমাজের আর্থ-সামাজিক বুর্জোয়া সমাজের লক্ষণীয় সীমা। এ আর এখানেই গল্পের বাস্তবতা নতুন এক শিল্প-মাত্রা আনে। ধনিয়ার একাধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া, ছেড়ে চলে-আসা, মাতৃদুগ্ধ অন্যের শিশুদের খাওয়ানো—এসবে বিস্ময়করভাবে বিষয়ের ও চরিত্রের চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু গল্পের যে লক্ষ্য, মানুষের জীবনের যে অধিতল নিহিত বাস্তব চাহিদা,

তাতে এই দিক আদৌ অবহেলার নয়। ঘোষাল গিন্নি, খাজাঞ্চি গিন্নিদের যে মাতৃত্বের পরিণতি তা স্বাভাবিক। স্বার্থভোগী, ধনী ও মধ্যবিত্তদের বিলাসী জীবনে এমনই তাদের নিয়তি। এই বাস্তবতায় ধনিয়া চরিত্রের বাস্তবতা বাড়তি শিল্পের মাত্রা আনে। ধনিয়ার অনৈতিক দেহভোগ আর অনৈতিক বাসনা মাত্র থাকে না, যখনি নিজের মাতৃদুগ্ধে শহরের শিশুদের বাঁচায়। তার চরিত্রের বাস্তবতার অভিজাত রূপ তার মাতৃহৃদয়ের মানবতায় বড় হয়ে মহিমময় রূপ পায়। গল্পের বাস্তবতা ধনিয়া চরিত্র ধরে যথোচিত।

এমন বাস্তবতার প্রতিষ্ঠাতেই গল্পকার নির্মোহ শিল্পীমনে এঁকেছেন নবোদ্ভূত শহরের শিক্ষিত মানুষগুলির সমবেত মানসিকতা— যা নির্মমভাবে ধনিয়াকে গণিকা প্রমাণ করে। সভ্য মানুষের মনোজগতের এইখানেই তার স্বার্থান্ধতা ও নীতিহীন নিল মানবতাবোধ বিনষ্ট, স্বার্থপরতায় তা আচ্ছন্ন। সভ্য শহরে সমষ্টি মানুষের এই সে মানসরূপ, তা শ্রেণীবৈষম্য চিহ্নিত সমাজেরই প্রকৃত রূপ। আইন যাদের নিজেদের হাতে সমস্ত রকম নীতিহীনতার নামে নীতিবাগীশ হওয়ার মধ্যে যাদের ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা যাদের কপালের সহজাত টিকা তারাই সভ্যতার তথাকথিত অভিজ্ঞান! ধনিয়ার মাতৃত্বের সারল্য ও সেবা, নিজের সন্তান মানুষ করায় সুস্থ বোধ ও অর্থনৈতিক সামাজিক অসহায়তা গল্পটির মধ্যে ওই চরিত্রভ্রষ্ট সভ্যতাকে চিনিয়ে দেয়।

এখানেই বাস্তবতার, সামাজিক বাস্তবতার যথার্থ স্বীকৃতি। সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে এই সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার স্বরূপকে ওতপ্রোত করেছেন। গল্পের শেষে তাই ধনিয়ার যে পরিবর্তন ও সভ্যতা ধ্বংসের প্রয়াস-চিত্রতা স্বাভাবিক শিল্প-ন্যায়ের উপযুক্ত নিদর্শন। নিজের নবজাত সন্তানকে তার কুটিরে নিয়ে যেতে চায় না। বাস্তবিকই ‘ধনিয়ার এই প্রচণ্ড নিস্পৃহা বড় নির্মম ও বিসদৃশ’। পাশাপাশি তার দেহোপজীবিনী-রূপে তার বুকের দুধে বড় হওয়া তরুণ ছেলেগুলিকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করার যে তীব্র বাসনা—সেখানেও সে সর্বরিক্ত এক নিস্পৃহ মানসিকতার অধিকারী। তার চরিত্রের বাস্তবতা তাই নিশ্চিত ভারসাম্য বজায় রাখে।

বস্তুত ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের লক্ষ্য নিশ্চয়ই ধনিয়া নয়, লক্ষ্য আধুনিক সভ্যতার স্বভাবনিহিত অবক্ষয়, স্বলন-পতনকে স্পষ্ট করে দেখানো। ধনিয়ার মতো মেয়ের কাছ

থেকে সমস্ত সুযোগ নেয় সভ্য মানুষ, তখন ধনিয়া অস্পৃশ্য নয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে সে হয় অস্পৃশ্য, অবহেলার। ধনিয়ার নিজের ছেলেরা মিশনের ধর্মীয় পরিবেশ থেকে ফাদারদের উচ্চারিত যীশুখ্রিস্টের মহান বাণীর পরিমণ্ডলে সুস্থ থেকে বড় হয়। পাঁকে যাদের জন্ম, পবিত্র পদ্মে তাদের পূর্ণ বিকাশ! আর বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের ছেলেরা বড় হয়ে গণিকার কাছে রাত্রিবাস চায়। মেকি সভ্যতার চাকচিক্যের আড়ালে পচন ধরায়। এমন যে সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি, গল্পে তাকেই নির্মমভাবে শ্লেষ-ব্যঙ্গে স্থির-চিহ্নিত করে গল্পকার। এঁকেছেন। ধনিয়া সেই সমাজ-বাস্তবতাকে চিত্রিত করার উপযোগী এক দক্ষ চিত্রীর হাতের তুলি।

তাই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য দু'দিক থেকে বিশিষ্ট : ১. তথাকথিত সভ্য মানুষদের সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে, ২. মানব প্রাণের যথোচিত স্বীকৃতির দিক থেকে। দু'দিকের লক্ষণীয় বৈষম্য গল্পটি থেকে ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে। বুর্জোয়া সমাজে সভ্য মধ্যবিত্তরা আত্মপ্রবঞ্চক, নিষ্ফল আভিজাত্যের নির্লজ্জ ধ্বজাধারী, সমস্তরকম নীতিবোধ ও সুস্থ জীবনচেতনার ভিত ও মূল্যমান থেকে ভ্রষ্ট এক সম্প্রদায়। সুবোধ ঘোষের আলোচ্য গল্পে সামগ্রিকভাবে তারাই লক্ষ্য। ধনিয়া তাদের চিনিয়ে দেওয়ার আয়না। গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে তাই চরিত্রের বাস্তবতা ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার মেলবন্ধন শিল্প-চমৎকারিত্বে অনন্য।

গল্পের প্রকরণে সুবোধ ঘোষ, অন্তত প্রথমদিকের গল্পে, যথেষ্ট সচতেন কথাকার। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের শুরুতে সমগ্র গল্পের ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতময় কোনো বাক্য বা বাক্য-চিত্র নেই। একজন সভ্যতার ইতিহাস রচয়িতার মতো ভূমিকায় থেকেছেন তিনি। এর পর একে একে এসেছে ধনিয়ার কথা, নয়াবাদ শহরের নবাগত ভদ্রশ্রেণীর চিত্র। গল্পের শেষে ধনিয়ার চরিত্র-স্বরূপ বদলে তার সিদ্ধান্ত। ভাবের একমুখিতা বলতে ধনিয়া চরিত্রের একমুখিন গতিকেই বোঝায়। কারণ ধনিয়াকে জড়িয়েই গল্পের বৃত্তান্ত হয় পরিণামমুখিন।

চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ যুবতী ধনিয়ার যে চিত্ররূপ তা অবশ্যই সংযত এবং বিস্ময় জাগায় পাঠকদের। মা হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্রকে স্পষ্ট করে। এই

ব্যক্তিত্বের প্রতিচিত্রণে গল্পকার বিবরণ ধর্মকে একমাত্র আধার করেননি, তার মনস্তত্ত্বকে নিপুণ চিত্রের স্বভাব দিয়েছেন। ধনিয়া ভদ্রবাড়ির গিন্নিদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ায় যথার্থ মায়ের মতো কুশল স্বভাবেই :

‘বারান্দায় উঠে ধনিয়া হাততালি দিল। আওয়া মেরা লাল। চীৎকার রত ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো ভূতল-শয্যা থেকে একবার ফণা তুলে তাকালো, তারপর এক দৌড়ে এসে ঝাপিয়ে পড়ল ধনিয়ার কোলে। খানিকক্ষণ ধনিয়ার হাতের বাজু নিয়ে টানাটানি উপদ্রব করলো, তারপর চুপ করে ধীর স্থির হয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়লো ধনিয়ার কোলে।’

দুদিন অভুক্ত প্রসাদীকে মধ্যবয়সী ধনিয়ার শেষতম মাতৃত্বলাভের সূত্রে এক ঘণ্টা ধরে তার বুকের দুধ খাওয়ানোর মধ্যে যে গভীরে মনস্তত্ত্ব কাজ করে, তা আগের চিত্রের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা আনে। এই চিত্র মপাসাঁর একটি গল্পের ট্রেন-যাত্রিনী নার্স-নায়িকার ঠিক একই স্বভাবকে স্মরণ করায়।

গল্পের শেষ চিত্র অবশ্যই গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী ও তীব্র শ্লেষাত্মক। উগ্র বিকৃত নগর সভ্যতার বিষ শ্বাস দিয়ে ঘেরা ধনিয়াকে দেখি গল্পের শেষে। এখানে নারীর যে রূপ, তা বুঝি malignant রূপে এক নতুন মহাকাব্য রচনা করতে পারে গল্পের শেষতম ইঙ্গিতধর্ম তুচ্ছ করে কাহিনীকে, ঘটনা, কখনো বা চরিত্রকেও। সেখানে বড় হয়ে ওঠে গল্পের নির্গলিতার্থ, শ্লেষব্যঙ্গে জ্বলে ওঠা এক জ্বালাময় অগ্নিপিণ্ড।

‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের ভাষা অনবদ্য। তার ব্যঞ্জনাময়তা গল্পকারের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ধারক। স্বর্ণকার অ্যাসিডে সোনা গলিয়ে খাদ বাদ দেয় সোনা থেকে। নতুন এক সোনার যেনবা অ্যাসিডে দ্বিতীয় জন্ম হয়। আলোচ্য গল্পের শেষে ধনিয়া আর গৃহী নয়, মা নয়, প্রসাদীর অন্নদাত্রী নয়, সে অ্যাসিডে গলা মালিন্যহীন এক রমণী! সে গতানুগতিক গণিকাও নয়, গণিকার অবয়বে এক অন্য নারী যার শক্তি সভ্যতার মূল ধরে তার নড়বড়ে দিক দেখাবার ক্ষমতা রাখে। এই অংশের ভাষায় ও চিত্র রচনায় সুবোধ ঘোষ এক অনন্য নিরাসক্তচিত্ত রক্তচক্ষু শিল্পী :

'জনতার চোখে ধাঁধা। অসম্বৃতা এক রঙিন মরীচিকার মূর্তি জ্বলছে জানালার ওপর। নীচে পাতলা রেশমী শাড়ির আড়ালে আঁকা দু'টি সুপুষ্ট জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। ওপরে একজোড়া দুরন্ত সবুজ গ্রহ, কঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মত গতিহারা। সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে এক বিদঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া। তবু প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।'

এমন যে ধনিয়ার মানসিকতার বর্ণনা, তার মূলে আছে গল্পকারের নিরাসক্ত তীব্র ব্যঙ্গ ব্যঙ্গের জ্বালা। ধনিয়ার জীবনে যে পরিহাস, তা সভ্যতার পরিহাস। গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে নাটকীয়তা, কিন্তু তা চরিত্রন্যায়ে এমনি শিল্পসম্মত যে কোথাও সচেতন পাঠককে বিরক্ত করে না। যেটুকু নাটকীয়তা, তা গল্পের প্রকরণগত স্বভাবেই সম্ভব হয়েছে। গল্পের আঙ্গিকে আছে নতুন সভ্যতার উপযোগী শহর তৈরির কথা, তাই নাটক থাকতেই পারে। কিন্তু তা গল্পের মধ্য থেকেই উঠে এসেছে, গল্পকারের বানানো নয়। গণিকারূপে ধনিয়ার স্বভাবে যে নাটকীয়তাকে – তা চরিত্র-ন্যায় ও গল্পকারের মূল লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠায় স্বাভাবিক। মনস্তত্ত্ব এর নাটকীয়তাকে স্বাভাবিকতা ও পরিমিতি দান করেছে। এই কৃতিত্ব গল্পের প্রকরণগত কৌশলে গল্পকারেরই স্বাতন্ত্র-চিহ্নিত ব্যক্তিত্বের অনুগ।

'পরশুরামের কুঠার' গল্পের নাম ব্যাখ্যাশ্রয়ী, কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। এমন ব্যঞ্জনা থাকার কারণেই গল্পটির বড় শিল্প হয়েছে এমন নাম। যেন সমগ্র গল্পের ললাটে বসানো তৃতীয় নয়নের মতো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় এমন নাম।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন, নীতিনিষ্ঠ, ধনিয়ার ওপর ক্রুদ্ধ সমাজরূপ পরশুরাম তার নিষ্ঠুর অনুশাসন-রূপ কুঠারে ধনিয়াকে গণিকাপল্লীতে পাঠায়। এই অর্থে নামের তাৎপর্য থাকতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়।

প্রথম কথা হল, গল্পের মধ্যে কোনো পুরাণ প্রসঙ্গ না থাকলেও গল্পকার লক্ষ্যবস্তুর সমান্তরাল পৌরাণিক পরশুরামের কথা ভেবে নাম দিয়েছেন পরশুরামের কুঠার। ধনিয়া গণিকা হয়ে তার বুকের দুধে-মানুষ- হওয়া ছেলেদের সামনে নিজেকে করেছে

বিষকুম্ভের মতো। তাদের ধ্বংস করতে যে ক্রোধ দরকার, পরশুরামের স্বভাবের সঙ্গে তার সমতা থাকায় এমন রাগের কুঠার প্রয়োগে গল্পের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়। তাই গল্প নাম শিল্প সার্থকতা পায়।

আরও গভীরভাবে ধরলে, নতুন নগরসভ্যতার ভ্রষ্ট মানুষগুলিকে পৃথিবী থেকে সরাতে গেলে পরশুরামের মতো ক্রোধী যেমন দরকার, তেমনি দরকার তার কুঠার। পুরাণের ব্রাহ্মণ পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করতে চেয়েছিল পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য। সে ক্রোধ ভয়ঙ্কর। সুবোধ ঘোষ ধনিয়াকে গণিকালয়ে এনে সেই ক্রোধের প্রতীকী অস্তিত্ব এঁকেছেন। ধনিয়ার যে attitude গণিকা হওয়ার পর, তার স্বভাব ভয়ঙ্করী। সে আগে ছিল শুভঙ্করী মূর্তির (benevolent)। তার malignant মূর্তি বস্তুত নব সভ্যতার ভিতরের ক্লেদ, পচাগলা দুর্গন্ধময় অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই তীব্রতম হয়। এই কাজে দরকার পরশুরামের মতো ক্রোধী ও তার কুঠারের মতো শক্তির দীপ্তি, সক্ষমতা ও ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা। গল্পকারের হাতে ধনিয়া হয়েছে সেই শক্তির প্রতীক। তার কামোদ্দীপক ভয়ঙ্কর লোভনীয় শক্তি সেই কঠার যাকে ব্যবহার করে নব্য সভ্যতার সমত তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর মুখোশ ভেঙে চুরমার করতে পারে, সদ্য ছাল ছাড়ানো পাঁঠার শরীরের মতো সভ্যতার কৃত্রিম, যান্ত্রিক রূপকে সামনে আনতে পারে। পরশুরামের কুঠারের যে শক্তি, প্রতীকী স্বভাবে ধনিয়ার দেহ দিয়ে আকর্ষণ করার শক্তি এক। তথাকথিত সভ্য মানুষের চরিত্রভ্রষ্টতা, নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা, যান্ত্রিকতা, কুৎসিত আদিম বাসনা, লোভ— এ সমস্তকেই শরীর দিয়ে ধারালো কুঠারের স্বভাবে ধনিয়া দেখাতে চায়। আসলে গল্পকার তাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চান এইভাবে। তাই গল্পের নামে আছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। ধনিয়ার গণিকা সত্তা তার আধার। নাম সম্পূর্ণ শিল্পসার্থক।

৯.৫ সুন্দরম্

সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্প সংকলনের প্রথম প্রকাশকাল উনিশশো চুয়াল্লিশ। এই সংকলনের মোট ন’টি গল্পের মধ্যে অন্যতম গল্প সুন্দরম্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালেই রচিত এই গল্প। সুন্দর’ কাকে বলে, সুন্দর’ বলতে কি বোঝায়, এমন এক

subjective তত্ত্ব-বিষয়কে গল্পকার অসাধারণ দক্ষতায় objective রসরূপ দিয়েছেন সুন্দরম্' গল্পে-- তার প্লট চরিত্র ও বাস্তবতার পরিমণ্ডলের অভিনবত্বে। গল্পটির কোথাও এতটুকুও কোনো তত্ত্ব কথা নেই, সমাজ-বাস্তবতা ও লেখক-সৃষ্ট চরিত্রের বাস্তবতায় সেই 'সুন্দর' সম্পর্কিত ভাবনা সূক্ষ্ম শিল্প-শরীর নিয়েছে। এখানে গল্পকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি চরিত্রদের দিয়ে সুন্দরের সন্ধানে পাঠকদের নিবিষ্ট করে একটি প্রচ্ছন্ন-কঠিন শ্লেষকে অবলীলায় কাজে লাগিয়েছেন, যা তারই সম-সময়ে রচিত অন্য একাধিক গল্পেও অদ্ভুত শিল্পরসে সমস্ত পাঠকদের নিবিষ্ট রাখার ক্ষমতা রাখে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, একালের এক প্রতিষ্ঠিত কবি-নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তার 'সুন্দর' নামের একটি বিখ্যাত নাটকের বিষয়ে সুন্দরের সন্ধানে ও বোধে নাট্যব্যক্তিত্বগুলিকে জটিল সমস্যায় জড়িত করেছেন। সেখানে সুন্দরের সংজ্ঞা ও সন্ধান যে তত্ত্ব তুলে ধরে, গল্পকারের গল্পে তা স্বতন্ত্র আধেয়। সুবোধ ঘোষ নর-নারীর যৌনতা দিয়ে সুন্দরের তত্ত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন, নাট্যকার চেয়েছেন ব্যক্তিত্বের অবচেতন অন্তঃস্বভাবের যথোচিত উদ্ভাসনে।

অবশ্যই 'সুন্দরম্' গল্পে টানা কাহিনী নেই, তিনটি চরিত্রকে স্থির রেখে বাস্তব সংসারের একাধিক বিষয়ী মানুষের ভিড় রচনা করে সেই তিন চরিত্রকে সূক্ষ্ম একটা কাহিনী-সুতোয় ধরে রেখেছেন। সেই তিনটি চরিত্র হল- সুকুমার, তুলসী ও সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার। সুকুমার বারো বছর বয়স থেকেই ব্রহ্মচর্যের জীবনযাপনে ছিল আগ্রহী, আসক্ত! যুবক বয়সেও তা-ই! পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে তার চাকরির দিকে মন ফেরাতেই হবে। তার বিয়ের ব্যবস্থা করাও জরুরি। কিন্তু সুকমারের মত পাওয়া দুরূহ সে কোনোদিন সিনেমা দেখে না, সাহিত্য-কাব্য পড়ে না, যোগশাস্ত্রাদি ও যোগব্যায়ামে তার সদা-নিবিষ্ট মন। ক্রমশ এমন ব্রহ্মচারীরও মন ফেরালো ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের পিতা কৈলাস ডাক্তারের নির্দেশমতো। সুকুমার সিনেমা দেখতে আরম্ভ করল, উপন্যাস পড়তে তার বাধা থাকল না। সমস্ত বৈরাগ্য ক্রমশ গেল ঘুচে। সে স্বয়ং বলতে বাধ্য হল— 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

এবার সমস্যা দেখা দিল বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচনে। সুকুমার নিশ্চয়ই বিয়ে করবে, কিন্তু একেবারে নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে চাই। দেখা হল এক এক করে অনেক মেয়ে। উকিলের মুহরি যাদব বোসের মেয়ে বনলতা, তুলনায় বংশ খাটো হলেও নন্দ দত্তের মেয়ে দেবপ্রিয়া, কৃপণ অনাদি সরকারের মেয়ে সুন্দরী সুশিক্ষিতা অনুপমা, সত্যদাসের অমাবস্যার মতো কালো রঙের, ভীষণ পরিশ্রমী, স্কুলের স্পোর্টসে প্রতি বছরে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে মমতা এদের এক এক করে দেখা হলেও কাউকে পছন্দ হয় না সুকুমারের, তার পিসিমার, ছোট বোন রানুরও।

এমন দেখাশোনার মধ্যে সুকুমারদের বাড়িতে আনাগোনা শুরু হয় তুলসী নামের একটি ভিখিরি মেয়ের সুস্বাস্থ্যবতী, কিন্তু ভয়ঙ্কর কুৎসিত-দর্শনা, অপরিচ্ছন্ন পোশাকে অস্পৃশ্যা । সে হাবু ও বসন্তে কানা ইরানি বেদিয়া হাদিমার মেয়ে। হাবুর হাতে কুষ্ঠ। ওরা আসে কৈলাস ডাক্তারের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির নির্দেশে বস্তি ভেঙে দেওয়ার ফলে ওদের শহরে থাকার হুকুম না থাকায় যাতে ওরা মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনে একটু থাকার জায়গা পায় তা ডাক্তারবাবু যেন সার্টিফিকেট দিয়ে ব্যবস্থা করে দেন সেই আবেদন জানাতে। কন্যা তুলসীই ওদের বাঁচিয়ে রাখে নিজের সামান্য ভিক্ষের পয়সায়। সেই যে একবার দরবার করতে ঢুকেছিল ওরা সুকুমারের বাড়ির বাগানে, তার পর থেকে তুলসী প্রায়ই আসে ভিক্ষে করতে।

কৈলাস ডাক্তার পুত্রের জন্য একের পর এক পাত্রী দেখতে দেখতে হতাশ, বিরক্তও। তিনি সুকুমার ও তার বাড়ির অন্যান্যদের সুন্দরের সংজ্ঞা শুনে শ্লেষে হাসেন। সুন্দর যে মানুষ বাইরে হয় না, শরীরের ভিতরেই তা ধরা পড়ে, লাশকাটা ঘরের ময়না তদন্তের নিপুণ, অভিজ্ঞ কৈলাস ডাক্তার তা বোঝাতে না পেরে, নিজের পছন্দমত একটি পাত্রী কঠিন জিলে ঠিক করে এসেও বাড়ির ও সুকুমারের প্রবল আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে বাতিল করেন। পাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব শেষমেশ বাড়ির লাোকেদের ওপর ছেড়ে সরে আসেন। সব শেষে জগৎ বোসের মেয়েকে বাড়ির সকলের এবং সুকুমারেরও পছন্দ হয়ে যায়। ঠিক হয় এক আকাশের ঘন দুর্যোগের রাতে কৈলাস ডাক্তার সেই পাত্রীকেই আশীর্বাদ করতে যাবেন। কৈলাস ডাক্তার রাজি হলেন ঠিকই, বাধা এল

লাশকাটা ঘরের অপারেশন টেবিলের সহায়ক যদু ডোমের খবরে তিনটি লাশকে আবার সে রাতেই পোস্টমর্টেম করতে হবে। কাজটা খুবই জরুরি।

এই ঘটনার আগে একের পর এক পাত্রী নির্বাচনের মধ্যেই ভিখিরি তুলসীকে নিয়ে ডাক্তারের বাড়িতে মাঝে-মধ্যেই ঝামেলার সীমা থাকত না। তুলসী কলাই-করা থালা হাতে প্রায়ই ডাক্তারবাবুর বাড়ির বাগানে আসত। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে ভিক্ষের আশায় বসে থাকত। যদু, নিতাই মাঝে মাঝে সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসা তুলসীর পিছনে লাগে, তার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে। দেখতে পেলে কৈলাস ডাক্তার বিরক্ত হন, সকলকে সাবধান করে দেন, যেন কোনো কিছু চুরি না যায়, তুলসী যেভাবে ঢুকছে বাড়ির মধ্যে! একদিন কৈলাস ডাক্তার শোনেন তুলসী নাকি সুকুমারের ঘরে ঢিল ছোঁড়ে, রহিম নিতাই-এর হাত কামড়ে দেয়। আর এক সন্ধেয় কৈলাস ডাক্তার নিজে দেখেন তুলসী ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মতো পা টিপে টিপে পালাচ্ছে, ওঁকে দেখেই দৌড়। বিরক্ত ডাক্তার ঘরে এসে দেখেন। সুকুমারের ঘরে আলো জ্বলছে, বারান্দায় আলো, বৈঠকখানা খোলা, ওঁর নিজের ঘরও তছনছ। দেখেন, ওঁর ঘরের টেবিলে নতুন বেলেডোনার শিশিটাও নেই! অবশ্য সব দেখার পর ডাক্তারের সন্দেহ ঘোচে, এমন কিছুই চুরি যায়নি।

এমন যে তুলসী তাকে নিয়েই গল্পের শেষ ঘটনা ঘটে। যদু ডোমের সেদিন রাতে লাশকাটা ঘরে আনা তিনটি লাশের মধ্যে দুটি পোড়া, ময়না তদন্তের অযোগ্য, কিন্তু একটি তুলসীর! চমকে ওঠেন কৈলাস ডাক্তার তাকে মৃত দেখে এবং পরে তার শরীর চিরতে গিয়ে। তুলসীর শরীরের ভিতরটা অসাধারণ তরতাজা, সুন্দর। কিন্তু তার জরায়ুর মধ্যে যখন একটি বিষিয়ে নীল হয়ে-যাওয়া শিশুকে দেখেন, পাকস্থলীতে দেখেন ক্লোম রসে মাখা একটি অজীর্ণ সন্দেশ-পাউরুটি-বেলেডোনার পিণ্ড, তখনি ডাক্তারের ঠোঁট থর থর করে কেঁপে ওঠে। নির্বাক, নিশ্চুপ ডাক্তার। নিতাই-এর এক প্রশ্নের উত্তরে লাশকাটা ঘরের বাইরে সে সময় যদু ডোমের শ্লেষাত্মক মন্তব্য ‘শালা, বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।’

এমন একটি গভীর চমক দেওয়া বাক্যেই গল্পের শেষ। গল্পটির মূল ভাবের যে নিষ্পত্তি, অর্থাৎ মূল বক্তব্য, তা নির্দিষ্ট করে নিশ্চয়ই একটি মানবজীবনের অন্তঃস্থ নন্দন ভাবনাকে, কিন্তু তার সন্ধানের শেষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পারিবারিক তথা সামাজিক সত্য। এই সত্য নর-নারীর সম্পর্কসূত্রেই নির্মম হয়েছে গল্পের শেষে। তাই শ্রেণী-নির্ণয়ের দিক থেকে সুন্দর গল্পটি নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কভাবনাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়। সুকুমার ও কৈলাস ডাক্তার সুন্দরকে যেভাবে বুঝতে চেয়েছে, তা নর-নারীর সম্পর্কের সীমাই প্রধান করে তোলে। পারিবারিক-সামাজিক সমস্যা ও জটিলতম মনস্তত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে আদিম জৈব ও যৌন আকাঙ্ক্ষা— এই তিনটি বিষয় সম্মিলিত থেকে 'সুন্দরম্' গল্পকে নারী-পুরুষের চিরকালীন সম্পর্কের উদার শ্রেণীতে চিহ্নিত করে দেয়।

আমাদের আলোচনার প্রথমেই বলেছি, 'সুন্দরম্' গল্পে টানা কোনো কাহিনী প্রায় নেই। যেটুকু আছে তা প্লট-বৃত্তের জটিল রূপের উপযোগী রচনার ভারে বিশিষ্ট নয়। গল্পটির প্লট-বৃত্তের অভিনবত্ব এইখানে যে, মূল কাহিনীকে একটি নির্মোকের মায়া দিয়েছে সুকুমারের পারিবারিক জীবন-পরিবেশ। মূল গল্প অবশ্যই সুকুমার-তুলসী-ডাক্তার কৈলাসের। এর মধ্যে কৈলাস ডাক্তার কেন্দ্রীয় চরিত্র- যার মধ্য দিয়ে গল্পকার সত্যিকারের 'সুন্দর'-এর এক স্থায়ী রূপকে ধরতে চেয়েছেন। সুকুমার প্রধান পুরুষ চরিত্র। তাকে নায়ক বলাই ভালো। সমগ্র গল্পের প্লটে সুকুমারের সুন্দরের খোঁজে পছন্দ-অপছন্দ কাজ করেছে, তার প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা তুলসীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যঞ্জনা ছাড়া কোথাও নেই। তুলসীও নায়িকা নয়, সে একটি প্রধান নারী চরিত্র যে প্রকারান্তরে নির্মম হত্যার শিকার হয়ে টীকাভাষ্যে সাহায্য করেছে সুন্দরের যথোচিত স্বরূপ উদঘাটনে। প্লটের শেষের অংশে আছে সর্বাধিক সক্রিয়তা কৈলাস ডাক্তারের। তার যে ক্রমিক পরিণামমুখিন অভিজ্ঞতার খণ্ডগুলি, তারা তার সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণাকে প্রবল আঘাত দেয়, তাদের এক বোধের জগতে নিয়ে যায়।

সুকুমারের কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন-বাসনা ও প্রয়াস, তা থেকে ভগ্নীপতি কানাইবাবুর সনিষ্ঠ প্রয়াসে স্বাভাবিক জীবনে তার ফিরে আসা, বিবাহ বাসনার প্রকাশ ও সুন্দরী স্ত্রী

নির্বাচনে অনড় দ্বিধা ও দোলাচলচিত্ততা, এসবের মধ্যে পিসিমার বৈষয়িক ভাবনা, পরিবারের অন্যান্যদের পছন্দ-অপছন্দের দিক, আবার পুরুত ভটচায্যির আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন প্রয়াস ও দৈবজ্ঞী মহাশয়ের জ্যোতিষ নির্ভর ব্যাখ্যার যুক্তি— এসবই ছোট ছোট চরিত্রের স্বভাবে গল্পের মূল প্লটকে বক্তব্যের উপযোগী একমুখিনতা দিয়েছে, প্লটের যে সামান্য কাহিনী ও ঘটনার সূত্র, তাকে তেমন জটিলতা দেয়নি। আসলে সুন্দর গল্পের প্লট-গঠনের অভিনবত্বই গল্পের গৌরব। কাহিনী আছে অন্তঃশীল, ঘটনা প্লটের উপযোগী ঘটেছে গল্পের শেষে তা-ও আভাসে-ইঙ্গিতে। বিকৃত যৌন চেতনায় তুলসীর দেহভোগচিত্র গল্পকার দেখাননি, বুঝতেও দেননি। কৈলাস ডাক্তারের সেই বেলেডোনারই আবিষ্কার- প্লটের উপযোগী ঘটনার সমর্থন পায়। সব শেষে তুলসীর গর্ভে শিশু-ভ্রূণের অস্তিত্ব প্লটের জটিলতাকে উতরোল ঘটনা থেকে ঘটনার গভীরতম ব্যঞ্জনাকেই বাজায়।

আমাদের মতে, সুন্দর গল্পের যে মূল কাহিনী-ঘটনা-সমন্বিত প্লট, তা আছে সুকুমার-তুলসীর গোপন সম্পর্কের মধ্যে এবং কৈলাস ডাক্তারের কাছে সব কিছু ধরা পড়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে। আর এই মূল প্লটকে খণ্ড কয়েকটি চিত্রের স্বভাবে আবরণের মায়া দিয়েই সুকুমারের পারিবারিক মানুষগুলির তৎপরতা। এই অবস্থায় গল্পের 'চরমমুহূর্ত' অংশটিও ধরা পড়ে ব্যঞ্জনাগর্ভ 'সিচুয়েশন' রচনায় :

'অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ী ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়ছে তুলসী।

কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল।'

সুকুমার-তুলসী-কৈলাস ডাক্তারের কাহিনী-স্বভাব ধরলে এখানেই গল্পের মহামুহুর্তের শুরু, শেষ হল কৈলাস ডাক্তারের এমন একটি সংলাপ বাক্যে :

'টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায় ?

আবার যদি সুকুমারের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়কে প্রধান করে সুকুমারের প্রসঙ্গে গল্পের বিষয়গত 'চরমভাবনার' জায়গাটি দেখানো যায়, তাতে আসে শেষ পর্যন্ত সুকুমারের ও

বাড়ির সকলের দিক থেকে জগৎ ঘোষের মেয়েকে যথার্থ সুন্দরী হিসেবে পছন্দ করার খবরে ও কৈলাস ডাক্তারের রাতেই মেয়ে আশীর্বাদে যাওয়ার সম্মতিদানে। এর পরেই আসে তুলসীর পোস্টমর্টেমের ঘটনা ও তার গর্ভে সুকুমারের জন্ম দেওয়া সন্তানের খোঁজ। অর্থাৎ একজাতীয় সুন্দরের সন্ধানের শেষ, আর এক সুন্দর ভাবনার কঠিন জিজ্ঞাসা- দু'য়ের মাঝখানেই 'মহামুহূর্ত'--- যা সুকুমারের চরিত্রই বুঝিয়ে দেয় তার স্বভাবের বৈপরীত্য দিয়ে।

'সুন্দরম্' গল্পে সাধারণভাবে ও কখনো কখনো বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে চরিত্রের পরিচয় মেলে। তারা হল সুকুমারের মা, পিসিমা, ছোট বোন, ভগ্নীপতি কানাইবাবু সহিস, পুরুত ভটচায্যি, দৈবজ্ঞী মশায়, নিতাই, যদু ডোম, এমনকি বাড়ির ঝি পর্যন্ত। কিন্তু এরা কেউ কেউ বিশেষ নামে চিহ্নিত হলেও সকলেই চরিত্র হয়নি, গৌণ চরিত্রও নয়, সম্মিলিতভাবে চিত্রের কাজটুকু করেছে মাত্র। বিশেষ করে পিসিমা পারিবারিক জীবনের চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে, উপযুক্ত বিষয়ীর ভাবনা দিয়ে সুন্দরকে অভিনন্দিত করতে চায়। দৈবজ্ঞী মশায়ের বিচার প্রাচীন জ্যোতিষী দিয়ে, পুরুত ভটচায্যির আধ্যাত্মিকতা দিয়ে, সুকুমারও সুন্দরকে দেখতে চেয়েছে বাইরের দেহ সৌন্দর্যের নিকষে পাত্রীদের যাচাই করে। ছোট বোন রাণু এবং আর সকলে সুন্দরের সন্ধানের খড়ির গণ্ডীর মতো সংস্কারের গণ্ডীর বাইরে আদৌ যেতে পারেনি। সমস্ত মিলিয়ে সুকুমারের সৌন্দর্যবাসনাকেই লালিত করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। তাদের আলাদা কোনো শিল্প-অস্তিত্ব নেই। অবশ্যই তারা এ থেকে যে আর বেশি প্রয়োজনীয় নয়, গল্পকারও বুঝেছেন।

আসলে গল্পের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র কৈলাস ডাক্তারের ব্যক্তিত্বই প্রধানত লক্ষ করার মতো। এর পরে আলোচ্য সুকুমার চরিত্র। যথার্থ সুন্দর-এর অন্বেষণে চরিত্রগুলির ভাবনার cross-current-এ গল্পের মধ্যে যে প্রবল ঘূর্ণি ওঠে, তার কেন্দ্রে আছে সুকুমার ও কৈলাস ডাক্তার প্রধানত এই দুটি চরিত্রই। কৈলাস ডাক্তারের নিজের বাইরের অবয়ব আর শারীরিক সৌন্দর্য এবং তার মনের জগতের সৌন্দর্যভাবনা ও ব্যাখ্যায় নিশ্চিত বৈপরীত্য রেখেছেন গল্পকার। তিনি নিজে যে আদর্শ সৌন্দর্য বিষয়ে

ভাবেন, তাঁর নিজেরই বাইরের রূপ-সৌন্দর্য তার সমর্থক নয়। বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে কৈলাস ডাক্তারের নিজের সম্পর্কে গল্পকারের ভাবনা-চিত্রটি এই রকম :

'কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্বল্য তার আর নেই।

এমন যে কৈলাস ডাক্তার, তার চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। পুত্র সুকুমারের সুন্দরী গান নির্বাচনে যে রূপতত্ত্ব সামনে আসে, ডাক্তার সে তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। তার নিখুঁত যুক্তিঃ

১. 'চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই ব্যাখাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?'

২. 'এই রূপতত্ত্ব তার কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়না ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না- কাকে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ-- এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মতো আর কে জানে। কিন্তু তার এই ভিনজগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মতো দ্বিতীয় মানুষই কই? দুঃখ এইটুকু।'

এমন যে কৈলাস ডাক্তার, তিনি 'সুন্দরম্' গল্পের মধ্যে গল্পকারের যথার্থ সৌন্দর্য সন্ধানের ভাষ্যকার। তাঁর চিন্তাভাবনার পাশে সুকুমারের ও সমগ্র পরিবারের রূপজিজ্ঞাসা এবং তত্ত্বভাবনা নিষ্ফল হয়ে যায়। কৈলাস ডাক্তার চরিত্র যেন যথার্থ সৌন্দর্য যাচাই করার কষ্টিপাথর। চরিত্রটির পরিকল্পনায় এখানেই সবচেয়ে বড় শিল্পভিত্তি। যে চৌদ্দ বছরের তুলসী কুদর্শনা, কোনো ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মতো কালি-মাড়া শরীরের অধিকারিণী, তাকে দেখে কৈলাসবাবুর উক্তি- দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো? মানুষের রূপ সম্পর্কে এ্যানথ্রপলজিস্টদের ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কৈলাসবাবু বলেন :

'আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশ বিদ্যের মুরোদ!...

....আমাকে আড়ালে সবাই কালো জিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে? আধুনিক হয়েছে, যত সব ফাজিলের দল।'

সত্য দাসের মেয়ে 'ঘুটঘুটে' অমাবস্যার মতো গায়ের রং-এর মমতাকে পাত্রী নির্বাচনে কৈলাসবাবুর দৃঢ়চিত্ততা তার সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশিষ্টতার প্রমাণ দেয়।

ময়না ঘরে তুলসীর লাশ পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে সেই আদর্শবাদ-চকিত সৌন্দর্যতত্ত্বের উপলব্ধিতে কৈলাস ডাক্তার এক গভীর বিস্ময়ে বিশুদ্ধ রোমান্টিক নিজস্ব অনুভবে নিবিষ্ট হয়ে গেছেন, দেহের আভ্যন্তরীণ নিখুঁত সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় ডাক্তার তার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সন্ধানের নির্ভুল দৃষ্টান্তের মুখোমুখি ;

'কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। এ নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন।'

কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিকাশের স্তরে কোনো 'মহামুহূর্ত' বলে যদি ক্রান্তিরেখার আভাস থাকে, তবে এখানে কৈলাসবাবুর রূপসন্ধানী মনোভঙ্গির সার্থক পরিচয়।

এর পরেই আসে রোমান্টিক, আদর্শবাদী, সৌন্দর্যের সত্যসন্ধানী কৈলাসবাবুর উপলব্ধির জগতে নিদারুণ আঘাত। এর ক্রমিক চিত্র রচনার স্তর দুটি :

১. '... কৈলাস ডাক্তার দেখলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটি অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ—পাউরুটি বেলেডোনা।

২. '... ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন— পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।'

সৌন্দর্যভাবনার রোমান্টিক জগৎ থেকে কৈলাস ডাক্তার সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন রূঢ় বাস্তব জগতে। এখানেই চরিত্রটির কঠিন বাস্তবভূমি রচনা। ডাক্তার সমস্ত সংস্কার থেকে বিমুক্ত হয়ে রূপতত্ত্বকে সত্যভূমি দিয়েছেন। তার উপলব্ধি তার ময়না ঘরের অভিজ্ঞতার বাস্তবতায় উজ্জ্বল ধ্রুবতারা যেন। গল্পকার কৈলাস ডাক্তারের মধ্য দিয়েই 'সুন্দরম' গল্পের সৌন্দর্যতত্ত্বের সত্যরূপের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তব হয়েছে তার তুলসীর শরীর ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যে এই চরিত্রের বাস্তবতা গল্পের মধ্যে ভাববস্তুর বিবর্তনে রক্ষিত। রূপতত্ত্বে কৈলাস ডাক্তার আদর্শবাদী, রোমান্টিক, তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের এক টীকাকার। কিন্তু তার সব কিছুই নিখুঁত বাস্তবতায় শিল্পধন্য।

সুকুমার চরিত্রটি বস্তুত গল্পের পারিবারিক মানুষগুলির ভিড়ে আড়াল করা, কিন্তু গল্পের অভ্যন্তরে সে-ই যে গল্পের কাহিনী-আভাস ও ঘটনাখণ্ডকে পাঠকদের মনে এনে। দিতে সহায়ক ব্যক্তিত্ব হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। গল্পকার গোড়া থেকেই তাকে প্রচ্ছন্ন অতি সূক্ষ্ম শ্লেষের উপকরণ করেছেন। তার চরিত্রের যে বিবর্তন অবশ্যই বাহ্যিক— তার তিনটি স্তর : ১. তার তথাকথিত ব্রহ্মচারী মানসিকতার প্রাথমিক রূপ, ২. ব্রহ্মচর্য থেকে সরে এসে সংসারী হতে গিয়ে সুন্দরী পাত্রী নির্বাচনের কঠিন মানসিক দিক, ৩. তুলসীকে সর্বনাশা গোপন স্বার্থসর্বস্ব যৌনতার ও ভোগের সম্পর্কের সূত্রে বাঁধার বাসনা এবং নিজেরই চক্রান্তে তুলসীকে নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণে বাধ্য করানোর প্রয়াস।

এই তিন স্তরে সুকুমার গল্পকারের হাতে হয়েছে শ্লেষের উপকরণ। তার রূপতত্ত্ব তার অভিজ্ঞ পিতার সৌন্দর্য-সম্পর্কিত টীকাভাষ্যের পাশে নিষ্ফল। সুকুমারের চারপাশের মানুষগুলি, আত্মীয়-পরিজন সুকুমারের রূপতত্ত্বকে চিরন্তন সংস্কারের দিক থেকে সত্য

করে। সুকুমার সে সবের সমর্থক। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মতো কালো পাত্রী মমতার সঙ্গে কৈলাসবাবু সুকুমারের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলে সুকুমারের উক্তি :

১. 'ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে আগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।'

২. 'সুকুমার মারমূর্তি হয়ে বললো—সেই দৈবজ্ঞীটা এলে আমায় খবর দিবি তো!

—কোন দৈবজ্ঞী?

—ঐ যে-বেটা রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

এমন সব কথা প্রমাণ করে, সুকুমার 'সুন্দর' বলতে বোঝে সংস্কারের ব্যাখ্যাই ঠিক। অর্থকৌলীন্যে বিষয়ভাবনা, দেহের রূপ, জ্যোতিষীর গণনা, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস-এসবই সুকুমারের সৌন্দর্যসন্ধানের প্রধান ও একমাত্র পথরেখা।

এমন সুকুমার সব শেষে তার নিজের রূপবিষয়কে নিষ্ফল করে দেয় তুলসীর সঙ্গে অসামাজিক স্থূল দেহভোগে, বিকারগ্রস্ত যৌনাচারে এবং স্বার্থসর্বস্ব নির্লজ্জ আভিজাত্য বাঁচানোর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। সুন্দরকে নিয়ে সুকুমারের মেকি আভিজাত্যের গর্ব বুঝিবা তাকেই ব্যঙ্গ করে গল্পের শেষের ঘটনায়। গল্পকার সুকুমারকে কোথাও প্রকাশ্যে তেমনভাবে আনেননি। তুলসীর সঙ্গে তার যাবতীয় ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কগুলিকে অতি দূরের বস্তু করে ইঙ্গিতময়তায় গল্পের শেষ দিকে এঁকেছেন। সুকুমার 'সুন্দর' গল্পের কাহিনী আভাস এনেছে, তুলসীর গর্ভে অবৈধ সন্তান দিয়ে, স্বার্থসর্ব যৌনাচার দিয়ে বড় ঘটনা তৈরি করেছে, কিন্তু গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে সে নিজেকেই নিজেরই রূপতত্ত্বের সংস্কারজড়িত নিষ্ফলত্বের মধ্যে বিসর্জন দিয়েছে। সুকুমারের রূপের অভিমান যে মূলত পারিবারিক ও সামাজিক কৃত্রিম পরিবেশে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের অন্ধ সংস্কারের পচাগলা, ভণ্ড-রূপের ভাবাবেগেরই নামান্তর মাত্র, গল্পকার সুকুমারের মধ্যে তাকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন। ভিখিরি, অভাবী, সরল, নিস্পাপ তুলসীকে সন্দেশ-পাউরুটির সঙ্গে বেলেডোনা খাইয়েছে স্বয়ং সুকুমারই। এমন তার তৎপরতাতেই আছে তার

মধ্যবিত্ত চরিত্রের আকাঙিক্ষত আভিজাত্য ভাবনার ভণ্ডামি ও বাস্তবতা। ভদ্র, শিক্ষিত যুবকের সৌন্দর্যসন্ধান যে কৃত্রিম কালচারের লোকদেখানো শোভনসুন্দর খোলসমাত্র, ভিতরে তার 'বিষকুম্ভ', সুকুমার তারই প্রতিনিধি। সুকুমারের বাস্তবতায় আছে গল্পকারের হাতে ধরা ছুরি দিয়ে সমাজ ব্যবচ্ছেদের তীক্ষ্ণ শ্লেষ দৃষ্টির তির্যক আলোর প্রতিসরণ। সুকুমার ও কৈলাস ডাক্তার রূপতত্ত্বের সন্ধিৎসায় দুই মেরুর দুই অভিযাত্রী। প্রথম জন গল্পকারের শ্লেষব্যঙ্গের লক্ষ্য, দ্বিতীয়জন গল্পকারের সুস্থ জীবনের দর্শনের প্রধান পরিপোষক।

সুবোধ ঘোষ তাঁর প্রথম জীবনের গল্পে মূলত ছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের একজন সার্থক রূপকার। মধ্যবিত্ত জীবনের অসামান্য প্রয়োগ ও পরীক্ষা করেছেন তিনি 'ফসিল' গল্পের মিঃ মুখার্জির চরিত্রে, 'গোত্রান্তরে'র সঞ্জয়ের মধ্যে, 'শুক্লাভিসারে'র পুষ্কর মিত্র, 'গরল অমিয় ভেল'-এর মালা বিশ্বাস ইত্যাদি চরিত্রের অন্তর্লোক উন্মোচনে। মধ্যবিত্ত জীবনের ও মানসিকতার অন্তর্বর্তী আদর্শ-ভাবনা, রোমান্টিকতা, দীনতা, বিকারগ্রস্ত লোভ, যৌনতা আপন সামাজিক স্তর-সচেতনা—এসবই মিলিয়ে-মিশিয়ে গল্পগুলির কেন্দ্রীয় বক্তব্য সুবোধ ঘোষের এক বিশেষ ব্যক্তিত্বকেই নির্মাণ করেছে।

'সুন্দরম্' গল্পে সেরকম এক ব্যক্তিত্বের ও দেশ-কাল-নির্ভর জীবনদর্শনের পরিচয় অ দৃশ্য নয়। সুন্দর-এর সত্য রূপসন্ধানে সুবোধ ঘোষ যে আধার নিয়েছেন এবং সেই আধারে যে আধেয়কে পরিবেশন করেছেন, তা সব মিলিয়ে সেই মধ্যবিত্ত জীবন ভাবনাকেই প্রকট করে। অন্যতম চরিত্র সুকুমারের মানসিকতা, তার পারিপার্শ্বিক পরিবার জীবন ও তার বাবা কৈলাস ডাক্তার—সকলেই মধ্যবিত্ত জীবন ও মনের চক্রে ঘূর্ণাবর্ত আনে। কৈলাস ডাক্তার এসবের মধ্যে সৌন্দর্যের সত্যসন্ধানী মুক্তমনের মানুষ, কিন্তু তাকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে বিস্ময়ে, স্তম্ভিত, অবিশ্বাস্য তার পক্ষে অভাবনীয় এক পারিবারিক জটে। এসবে স্বাভাবিকভাবে এসেছে সর্বহারা তুলসী-ভিখারির কাহিনী।

সুবোধ ঘোষের জীবনকে দেখার বিশেষ attitude এই গল্পে রূপ পেয়েছে মূলত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধিৎসু মানসিকতায়। একদিকে সুকুমারের রূপতত্ত্ব, আর একদিকে কৈলাস

ডাক্তারের সুন্দরের সংজ্ঞায় উদার আদর্শলালিত সৌন্দর্যভাবনা—দুই মিলে গল্পের কেন্দ্রীয় সত্য গল্পকারের লক্ষ্যকে দেখায়। সাংসারিক ও বিষয়ী মানুষের কুসংস্কার দিয়ে গড়া সুকুমারের রূপতত্ত্ব। তার মা, পিসিমা বিষয়ভাবনা দিয়ে রূপের মূল্যায়ন করে। সুকুমার করে নারীর বাইরের দেহতত্ত্বে, পুরুত ভট্টচায্যির বিচার সংসারী মানুষের মনগড়া। আধ্যাত্মিকতার সূত্র ধরে, দৈবজ্ঞী মশায়ের জ্যোতিষচর্চা তাকে আর এক সংস্কারে বাঁধে। অন্যদিকে কৈলাস ডাক্তারের সুন্দরকে দেখা একেবারে মুক্তমনের নির্মল আকাশকে আয়না করে।

অর্থাৎ সুবোধ ঘোষ সুন্দরকে ভেবেছেন এক মেরুতে পারিবারিক-সামাজিক কুসংস্কারের মাপে, অন্য মেরুতে সর্ব সংস্কার নির্মুক্ত মহৎ সৌন্দর্যের অস্তিত্বের রূপতৃষ্ণায়। কৈলাস ডাক্তারের চোখে অসুন্দর কেউ নয়। কিন্তু তিনি এই সত্য-ভাবনার মানসিকতায় পান চরম আঘাত। তার রোমান্টিক মন বাস্তবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। একালের প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুবোধ ঘোষের গল্পকার মানসিকতার সাধারণ আলোচনায় 'সুন্দরম্' গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

'সৌন্দর্য নামক ব্যাপারটা সম্পর্কে যে-সব সংস্কার আমাদের চিত্তে নিয়ত | ক্রিয়াশীল, এই গল্পের উপসংহারে সেগুলিকে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং একটি দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে—সাহিত্যে যতটা স্পষ্ট করে জানানো যায়, ততটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, অসুন্দর বলে বস্তুত কিছু নেই। সংস্কারের দাসত্ব থেকে যে-মুহূর্তে যার মুক্তি মিলছে, সেই মুহূর্তে তার কাছে সবই সুন্দর। কিন্তু এই যে বিনিশ্চয়, যা কিনা সৌন্দর্যতত্ত্বের একেবারে মৌলিক একটি সত্যের দিকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে দেয়, এটাই আমাদের প্রত্যাশার বৃত্তে ছিল না,'..। 'সুন্দরম্' গল্পের সর্বশেষ বাক্যটি তাই তীব্রতম শ্লেষ-ব্যঙ্গে কৈলাস ডাক্তারের সেই বিশেষ মানসিকতাকে অসহায়তার মধ্যে নিয়ে আসে। তা একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবন, মন ও ধারণার মূলে মারে ঘা। মড়ার শরীরের ময়না তদন্তের ডাক্তারি শবব্যবচ্ছেদে মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য দেখেন দেহতত্ত্বের পাকা জহুরি কৈলাস ডাক্তার, তা কৃত্রিম নয়, বাইরের সংস্কারের রূপ থেকে তা পরিচ্ছন্ন, আদিম ও নিষ্পাপ। শরীরের ভিতরের সমস্ত যন্ত্র সুশৃঙ্খল

সাজানো, পরিচ্ছন্ন সুস্থ জীবনের প্রমাণ থাকে তার মধ্যে। তুলসীর যুবতী শরীরে তারই সহজ প্রতিবিম্বন। তুলসীর শবব্যবচ্ছেদের মধ্যে কৈলাস ডাক্তারের গোপনতম অনুস্মৃতি:

'তাকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধু, কত রূপজীবা নটীর লাশ পার হয়েছে তার হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের, অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত!'

সাজানো সংসারে, বা বহু পুরুষের দ্বারা ভোগ্য হয়েছে সে যব রমণী-শরীর, তার অভ্যন্তর-সৌন্দর্য কৃত্রিম হয়ে যায়। কিন্তু তুলসী নিষ্পাপ, তার মধ্যে আছে সত্যিকারের সৌন্দর্য। সে বাইরে কুৎসিত কিন্তু ভিতরে মন্দিরের বেদীর মতো পবিত্র। তাই :

'আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন।'

এই যে তুলসীর শরীরের অভ্যন্তরের সৌন্দর্যদর্শনে ডাক্তারের ইউটোপিয়া, তা গল্পকারেরই রোমান্টিক সৌন্দর্যদর্শনের প্রধান লক্ষ্য, তা তার জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যদর্শন।

গল্পের শেষে যে আঘাত এর পরেই আসে, তা স্বাভাবিক এই কারণে যে, সৌন্দর্যদর্শন পরীক্ষাগারে এসে বাস্তবতায় যাচাই হয়ে যায়। রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতায় এলে তা ছোটগল্পের অবধারিত বাস্তবতার প্রামাণ্য হয়। সুকুমারের রূপতত্ত্ব দেহতত্ত্ব, তীব্র বিকারগ্রস্ত যৌনকামনা সব এক হয়ে গেছে। সুকুমার অবশ্যই আত্মজীবনস্তর সচেতন, মিথ্যা আভিজাত্যের আশ্রয়ে লালিত মধ্যবিত্ত মানুষ। সে স্বার্থপর আদর্শহীন। মধ্যবিত্ত জীবনের এই দিক থাকায় গল্পের সমাজ-বাস্তবতা চমৎকার রূপ পেয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জন্য কৈলাস ডাক্তার তথা গল্পকারের তীব্র আর্তি। অর্থাৎ সুন্দর' গল্পের দুটি প্রধান দিক—১. এর মধ্যবিত্ত পারিবারিক-সামাজিক কৃত্রিম স্বভাবের

রূঢ় বাস্তবতার দিক,২. এর সর্ব-বিচ্ছিন্ন রোমান্টিক আদর্শবাদ চিহ্নিত সৌন্দর্যের সত্য সন্ধানের দিক।

এই দুটি দিক এক হয়েছে গল্পের শেষে—তুলসীর গর্ভে সুকুমারের সন্তান ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। গল্পের শেষতম বাক্যের যে মোচড়, তা গল্পের শিল্প-আত্মার কেন্দ্র থেকে উঠে আসা, তা আদৌ সস্তা চমক নয়। গল্পকারের জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠার জন্যই এই অংশ অতি প্রয়োজনীয়। এই দর্শন থেকেই বিদ্যুতের আলোর মতো আকস্মিকতায় দেখা দেয়, গল্পকারের চাপানো নয়। গল্পের শেষে যাবতীয় মধ্যবিত্ত সমস্যা থেকে তীব্র ব্যঙ্গের আশ্রয়ে জীবনভাবনার এমন যে জীবনদর্শনে উত্তরণ, তা-ই গল্পটির বড় দিক। লেখক ব্যক্তিত্ব এখানে মহৎ মর্যাদায় ধরা পড়ে বলেই একে বলা যায় 'a special distillation of personality।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কঠিন বুর্জোয়া সমাজ, তার রীতিনীতি, তার পারিবারিক-সামাজিক জীবনধারণ ও যাপনের প্যাটার্ন 'সুন্দরম্' গল্পের প্রেক্ষাপটে পরোক্ষে আছে। আর তাতেই গল্পকারের দেশ-কাল চেতনা সক্রিয় থেকেছে স্বাভাবিকভাবেই। তাই 'সুন্দর'-সন্ধানের প্রয়াসে দেশ-কাল নিয়ন্ত্রিত জীবনস্বভাব গল্পকারের ব্যক্তিত্বের লালন-কর্তা ও ধারক নিঃসন্দেহে।

'সুন্দরম' গল্পের মধ্যে, আগেই বলেছি, টানা কাহিনী নেই, কাহিনী-আভাস আছে। ছোট ছোট চিত্র জুড়ে গল্পের অবয়ব রচনা। শেষ দিকে আছে কাহিনী ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত সংযত এক রূপ। একটি নির্দিষ্ট ভাববস্তু গল্পের বিষয়কে চিহ্নিত করে দেয়। সুকুমারের সুন্দরী পাত্রী খোঁজা ও তার না-পছন্দ হওয়ার একাধিক উদাহরণের মধ্যে পিতা কৈলাস ডাক্তারের সত্য সুন্দরকে দেখা ও তা নিয়ে যথার্থ গর্ব ও আস্ফালন গল্পের গতি এনেছে। সুকুমারের সুযোগসন্ধানী বিকারগ্রস্ত যৌনসম্ভোগের প্রয়োগে সেই রূপসন্ধানের ব্যর্থতা, নিষ্ফলত্ব এবং ডাক্তারের সত্য সুন্দর-সন্ধান ও তত্ত্বকে তার আঘাতের চিত্র গল্পের ভাবের একমুখিতাকে এতটুকু বাধা দেয়নি। নিশ্চয়ই কোথাও এতটুকু প্রয়োজনহীন অতি-বিস্তার নেই।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করতে পারেন, বিবাহের জন্য পাত্রী খোঁজার আগে সুকুমারের নিজস্ব ব্রহ্মচর্য-বিশ্বাস নিয়ে কিছুটা বাড়তি জায়গা তাকে দেওয়া হয়েছে

গল্পে। আসলে গল্প আরম্ভ হয়েছে বিবাহ প্রসঙ্গে পাত্রী মনোনয়ন দিয়েই। আমাদের মতে, এই বিচার ভ্রান্ত। পাত্রী নির্বাচনের আগে তার যে ব্রহ্মচর্য পালন ও ভাবনা তা চরিত্রটির রূপসন্ধান প্রয়াস ও শেষতম আঘাতকে কঠিন শিল্পন্যায়ে প্রতিষ্ঠা দেয় সমাজ-জীবনে। সাংসারিক মানুষের পক্ষে ব্রহ্মচর্য, তার কৃত্রিমতা যে নিষ্ফল এবং পরে সংসারের প্রচলিত ধারায় এসে পাত্রী নির্বাচনেও যে নিষ্ফল রূপতত্ত্ব আছে—সুকুমার তার প্রমাণ দেয়। লেখক যে শ্লেষ প্রয়োগ করেছেন সুকুমার চরিত্রে—তা পূর্ণ হয়েছে তার ব্রহ্মচর্য জীবনের কথার শুরু দিয়েই। পুরুষ ব্রহ্মচারীরা নারীকে একরকমভাবে দেখে, সংসারী মানুষ সংসার প্রতিপালনের জন্য নারীর নির্বাচন ঠিক সেইভাবেই কৃত্রিম নিরাসক্তি দিয়ে বিচার করে। সুকুমারের চরিত্রন্যায়ে যে 'সুন্দর'-অন্বেষণ, তার সীমা প্রকট হয়।

বস্তুত 'সুন্দরম্' গল্পে বৃত্তান্তের সে বাড়তি দিক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আগেই বলেছি, খণ্ড খণ্ড পরিবার চিত্র বৃত্তান্তের প্রয়োজনকে মূলেই বাধা দিয়েছে। গল্পের প্রকরণে কোথাও এতটুকু বাড়তি বিষয় নেই। মেদ-বর্জিত এই গল্প ইঙ্গিতধর্মকে বড় করে চরিত্রের চালচলনে নয়, চরিত্রনিহিত ব্যবহারের মধ্যেকার তীব্র শ্লেষের উজ্জ্বল আলোয়। কৈলাস ডাক্তারের শ্লেষ-ব্যঙ্গের সঙ্গে গল্পকারের কিছু নিজস্ব মন্তব্যের ছুরির তীক্ষ্ণতা গল্পের প্রকাশভঙ্গিকে দিয়েছে দীপ্তি, দিয়েছে স্বাভাবিক অথচ অমোঘ পরিণামমুখিন চলনধর্ম। ভাষার মধ্যে তির্যকতার দিক লক্ষ করার মতো। লাশকাটা ঘরে কৈলাস ডাক্তারের শবব্যবচ্ছেদ-কালীন যে ভাষা—তা যেমন রোমান্টিক, তেমনি প্রতীকী। এই প্রতীক প্রয়োগ মানুষের আভ্যন্তরীণ শরীর গঠন ও তার বাস্তব রূপধারণা—দুয়ের বৈপরীত্যকে ব্যঞ্জনায় দেখায়। গল্পের গোড়ার দিকের ভাষায় আছে যেমন প্রচ্ছন্ন কৌতুকরস, তেমনি, তেমনি মধ্যবিত্ত বাস্তবতার উপযোগী অর্থের প্রসার। সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের বর্ণনা ত্যাগের ভাষায়, মেয়ে দেখার প্রয়াসের চিত্রগুলির মধ্যে এই জাতীয় ভাষা-স্বভাবের চমৎকার পরিচয় মেলে। সুবোধ ঘোষ একাধিক নারীর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পে। বনলতা থেকে শুরু দেবপ্রিয়া অনুপমা, মমতা—এদের বর্ণনায় আছে চরম

'সফিটিকেশান্'। কিন্তু তুলসী যে বর্ণনাচিত্র এঁকেছেন তার ভাষা ও অন্তঃস্বভাবের ব্যঞ্জনা এবং আগের মেয়েগুলির বর্ণনা দুয়ের বৈপরীত্য অসাধারণ শিল্পমর্যাদা পায়:

'পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মতো চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা বড় পরিপুষ্টি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মতো কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা চেপে টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে দস্তুর মতো একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে।'

এই চেহারা, শরীর ও রূপের মধ্যে বিকারগ্রস্ত যৌনতায় সুকুমার দিয়েছে বিষ, দিয়েছে সম্পূর্ণ অসামাজিক বিকৃত লালসা থেকে জাত পাপের শিশু। অন্যদিকে এর অভ্যন্তরে কৈলাস ডাক্তার দেখেছেন যথার্থ সৌন্দর্যের মঙ্গলপ্রদীপ। গল্পের এমন বিবিধ-বিচিত্র রূপের বর্ণনার মধ্যে তুলসীর রূপবর্ণনার ভাষা সার্থক চিত্রময় হয়েছে যথার্থ সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠার কারণেই।

গল্পটির নাম 'সুন্দরম্', একটি সংস্কৃত শব্দবিভক্তিরূপে ধরা এই নাম। নিশ্চয়ই এই নাম ব্যঞ্জনাধর্মী। গল্পের বিশেষ কোনো চরিত্র-স্বভাবের ব্যঞ্জনা নয়, একটি তত্ত্বের রূপ তুলে ধরার উপযুক্ত শব্দধ্বনি। পরিষ্কার বোঝা যায়, গল্পের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র নয়, গল্পকারের প্রতিপাদ্য তত্ত্বই গল্পের অবয়বে প্রধান হয়েছে। 'সুন্দর'কে খোঁজাই গল্পকারের যেমন লক্ষ্য, গল্পের চরিত্রদেরও তেমনি পরোক্ষ লক্ষ্য। সুকুমার যে ধরনের রূপের মোহে। সংসার গঠনে তৎপর হয়, কৈলাস ডাক্তার তার বিরোধী। এই দ্বন্দ্বের সর্বশেষ সিচুয়েশন সুকুমারের সুন্দর খোঁজার ব্যর্থতায়, কৈলাস ডাক্তারের সুন্দর বিষয়ক চিন্তায় স্থির থাকা। সত্ত্বেও নিজ সন্তানের আচরণের মূঢ়তায় ভিন্ন মাত্রা পায়। সুতরাং 'সুন্দর'-তত্ত্ব তথা 'সুন্দর'-সন্ধান গল্পের দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব এনেছে বলেই গল্পনাম সার্থক। 'সুন্দর' গল্পটি যেন একটি জটিল তত্ত্বেরই বস্তুসত্য নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের রসরূপ। এ দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত নিশ্চয়ই রাখা যায়। নারীর দেহের 'রূপ'

আর ‘স্বরূপ’--কোথায় যথার্থ সৌন্দর্য? ‘স্বরূপ’ শব্দ অবশ্যই তার চারিত্র্য ধরে এখানে আলোচ্য নয়, আলোচ্য রক্তমাংসের দেহের ভিতরস্বভাব ধরে। রূপ শরীরের সুস্থতা প্রমাণ করে। বাইরের রূপ সুন্দর, অথচ দেহের ভিতরে আছে রূপের বিকৃত স্বভাব তা কোনোক্রমেই কাম্য নয়, তা সুন্দর নয়। গণিকার দেহের ভিতরের রূপে আছে। কৃত্রিমতা, কারণ তার অসংযত লালসারিক্ত বিশৃঙ্খল দেহভোগের যৌনজীবন তার ভিতরকে অসুন্দর করে। সামাজিক-সাংসারিক মানুষ মধ্যবিত্ত জীবন স্বভাবে ও মানসে শরীর বাইরের রূপের কৃত্রিমতায় ভুলে যায়। সুকুমার ও তার বাড়ির লোকজন তা-ই করেছে। কিন্তু তুলসীর দেহের অভ্যন্তরে যে রূপ, তা সুশৃঙ্খল, যৌবনদীপ্ত, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল। তার রূপ নির্মল নিস্পাপ। তা তার শরীরের ‘স্বরূপ’। কৈলাস ডাক্তার তা দেখিয়ে আসল ‘সুন্দর’কে, অর্থাৎ দেহের ‘স্বরূপ'-কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই যেখানে সুকুমার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, সেখানে ‘সুন্দর’ বলতে ডাক্তারের বিচারেই তা প্রধান হয়ে ওঠে। দেহের ‘রূপ’ থেকে দেহের ‘স্বরূপে’র ব্যাখ্যায় ও প্রাধান্যে এমন নাম শিল্পমর্যাদা পায়।

তৃতীয় বক্তব্য, গল্পের মধ্যে গল্পকার জানিয়েছেন, কৈলাস ডাক্তারের চোখে ‘অসুন্দর তো কেউ নয়’। কথাটা ঘুরিয়ে একটা প্রশ্ন জাগায়—পৃথিবীতে অসুন্দর বলে কোনো বস্তু আছে কিনা। অর্থাৎ ‘সুন্দর’কে দেখার চোখ না থাকার জন্যই মানুষ অসুন্দরকে কল্পনা করে। আসলে কৃত্রিম সামাজিক সংস্কারের বৃত্তে থেকেই একজন মানুষ অসুন্দরকে দেখে। মূলত সবই সুন্দর। যখন বাস্তব প্রয়োজনে তাকে কৃত্রিম করা হয়, তা তাদের চোখে সুন্দর, আসলে সে অসুন্দর। স্বার্থবুদ্ধি, কুসংস্কার ও কৃত্রিমতাই অসুন্দরের জনক। ‘সুন্দর’ কখনো অসুন্দর হয় না। গল্পে কৈলাস ডাক্তারের দর্শনই সত্য। সুকুমারের বিকারগ্রস্ত যৌনতায় তুলসী ভোগ্য হয়েছে। সেখানে তার ভোগের যে আনন্দ, তা সুন্দরকে পাওয়ার আনন্দ নয়, সুবিধাভোগী মানুষরা যা করে—এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তৃপ্ত হতে চেয়েছে মাত্র। সুকুমারের যে পাত্রী দর্শন ও সৌন্দর্যের বিচার, তা-ও তার মধ্যবিত্ত কু-সংস্কারের অন্তর্গত। ‘সুন্দরম' গল্পে যে সুন্দরের সন্ধিৎসা, তা মূলত সুন্দরের সংজ্ঞাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। গল্পের শেষে যে

ডাক্তারের ব্যঙ্গাত্মক মোহভঙ্গ, তা গল্পের সার্থক পরিণামী বাস্তবতা, তা তাঁর বাঞ্ছিত সৌন্দর্যের তত্ত্বের বাইরের দিক। আসলে সুকুমারের আচরণ বিপরীতে গল্পের যথার্থ সৌন্দর্যের তত্ত্বকেই সত্য করে। এককথায়, অসুন্দর নয়, জীবন প্রাণের বিকাশে, প্রতিষ্ঠায় সুন্দরই মূল এবং সত্য। তার থেকেই তৈরি হয় বাইরের অসুন্দর দিকগুলি স্বার্থসর্বস্ব মানুষের চাহিদা মেটাতে। সুকুমার সেই চাহিদায় তুলসীকে ভোগে সুখ পেয়েছে। পাত্রী নির্বাচনে যেমন তার আছে সংস্কারের দায়িত্ব, তেমনি তুলসীর দেহভোগে আছে বিকারগ্রস্ত বিকলাঙ্গ মানবগঠনের উপযোগী যৌনতার দাসত্ব। এই দুই দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি দরকার। সুকুমার মুক্ত হতে পারেনি, সম্পূর্ণ মুক্তমন কৈলাস ডাক্তারের সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা থেকে এখানেই তার মেরুপ্রমাণ ব্যবধান, সংশোধনের অতীত ভ্রান্তি। এমন বিচারে গল্প-নামের শিল্পদায়িত্ব ডাক্তারের স্থিতবুদ্ধি মননেই থেকে যায়। গল্পের নামে এই অর্থে সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা।

৯.৬ অনুশীলনী

১। 'ফসিল' গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে কতদূর সার্থক?

২। 'ফসিল' গল্পের মুখার্জি চরিত্রটি আলোচনা করো।

৩। 'গোত্রান্তর' গল্পটি কতদূর মধ্যবিত্ত মানুষের শ্রেণী স্বভাব সুলভ বিশ্বাসঘাতকতার গল্প আলোচন করো।

৪। 'গোত্রান্তর' গল্পের প্রধান চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। 'অযান্ত্রিক' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৬। 'অযান্ত্রিক' গল্পের বিমল ও জগদ্দলের রসায়ন সুবোধ ঘোষ কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আলোচনা করো।

৭। 'অযান্ত্রিক' গল্পটি শ্রেণী বিচার করো।

৮। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের দুনিয়া চরিত্রটি আলোচনা করো।

৯। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটি কতটা ব্যঞ্জনা ধর্মী আলোচনা করো।

১০। 'পরশুরামের কুঠার' ছোটগল্প হিসেবে কতদূর সার্থক?

১১। 'সুন্দরম' গল্পের কৈলাস ডাক্তারের চরিত্রটি আলোচনা করো।

১২। মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী হয়ে উঠেছে 'সুন্দরম' গল্পটি ব্যাখ্যা করো।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। ছোটগল্পের বিষয় আশয়, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প - সুমিতা চক্রবর্তী

২। বড় বিস্ময় জাগে -উত্তম ঘোষ

৩। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প - জগদীশ ভট্টাচার্য

৪। কালের পুত্তলিকা - বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর – অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

একক ১০ নির্বাচিত গল্প - গরল অমিয় ভেল, কালাগুরু, বারবধূ, কাঞ্চনসংসর্গাৎ, মা হিংসী

বিন্যাস ক্রম

১০.১ গরল অমিয় ভেল

১০.২ কালাগুরু

১০.৩ বারবধূ

১০.৪ কাঞ্চনসংসর্গাৎ

১০.৫ মা হিংসী

১০.৬ অনুশীলনী

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ গরল অমিয় ভেল

'গরল অমিয় ভেল' গল্পটি সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পগ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির ক্রম অনুসারে চতুর্থ গল্প। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ইংরেজি উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত গল্পটির মধ্যে আছে এক মধ্যবিত্ত যুবতী নায়িকার জটিল মনস্তত্ত্বের ভাষাচিত্র। এই গল্পে গল্পকার মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যবচ্ছেদ করেছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন লেখনীবৈশিষ্ট্যে। মেয়েরা, বিশেষত শিক্ষিত যুবতী মেয়েরা সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজন্মের ব্যবধানের স্বভাবে হয়ে উঠছে উগ্র আধুনিকা। তারা আর ঘরে বন্ধ থাকে না। বাইরের সমবেত পুরুষের ভিড়ে নিজেদের স্বাতন্ত্রচিহ্নিত করতে চায়। এ এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যতার বুকে! অবদমিত কামনা

বাসনা নিয়ে পুরুষদের বল্লভী হতে তাদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, গোপনতম প্রয়াস। এই প্রয়াস মধ্যবিত্ত নারীদের মধ্যেই চোখে পড়ে বেশি করে। তাদের জটিল মনস্তত্ত্বের রূপরেখা, অবচেতন মনের রহস্যময় সংবাদ-চিত্র এঁকেছেন গল্পকার আলোচ্য গল্পে।

এই চিত্র আঁকার প্রয়াসে আছে অভিনবত্ব। গল্পের উপস্থাপনা-কৌশল আদ্যন্ত পাঠকদের রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্টতায় ধরে রাখে। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে সুবোধ ঘোষ এক ব্যক্তি নারীর মনের জগতের আধুনিকা স্বভাবের বিকারকে যেমন এঁকেছেন, তেমনি কয়েকজন যুবতী নারীদের একত্র সমবেত করে শিক্ষিত যুবতীদের মধ্যে mass psychology-র সূত্রে অসাধারণ দক্ষতায় তাদের আকর্ষক করেছেন। আলোচ্য গল্পটি অবশ্যই জটিল মনস্তত্ত্বের এক রহস্যময় অ্যালবাম—যার মধ্যে আছে পুরুষদের ভিড়ে কয়েকটি রমণীর অন্ধকার মনোলোকের ছবি। আর সমস্ত রমণীদের পিছনে সেই প্ল্যানচেটের কালো ছায়া-ছায়া হাতের মতো স্বভাবে লেখা এক আধুনিক-জীবন-নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশ।

শ্রেণীবিচারে 'গরল অমিয় ভেল' নিশ্চয়ই জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প। কিন্তু তা যুবতী নারীদের হলেও, তা প্রেমের নয়, পুরুষের জন্য প্রেমাতিজনিত বিকৃতি আত্মরতি তথা আত্মক্ষয়ের গল্প। পুরুষের জন্য অবদমিত আকাঙ্ক্ষা যে কত ভয়াবহ আত্মবিধ্বংসী হতে পারে, আলোচ্য গল্পে আছে তারই একাধিক আলেখ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পে আছে দুই রমণীর সরীসৃপ স্বভাব পরিচয় এক পুরুষ বনমালীকে নিয়ে। সে-ও এক ভয়াবহ অনন্বয়ের গল্প। আর এক প্রকরণে 'গরম অমিয় ভেল'-এর নায়িকার আত্মবিনষ্টি সেই নিরাসক্তিতেই জীবন-স্বভাবের ভিন্ন স্বাদ দেয়। সভ্যতার অগ্রগতি যেমন প্রগতিকে নন্দিত করে, তেমনি তা মানুষকে ভয়াবহ ধ্বংসের স্বভাবে অন্ধকার খাদের সামনেও আনে। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পের শুধু একা মালা নয়, আর সব মেয়েরাও এসে। দাঁড়িয়েছে সেই অন্ধকার খাদের পাড়ে, যেখানে ব্যক্তির শূন্যতাই, নিষ্ফলত্বই বড় হয়।

‘গরল অমিয় ভেল’ গল্পে নিশ্চিত কাহিনী আছে, ঘটনা আছে, কিন্তু তা একটি সুতোয় একক কাহিনী স্বভাবে নয়। ছোট ছোট কয়েকটি গল্পের স্কেচ জুড়ে জুড়ে একটি বড় গল্প হয়েছে ‘গরল অমিয় ভেল’। এতে আছে প্রাচীন কথার সৌন্দর্য। কথায় যেমন বিভিন্ন রঙের ছেড়া কাপড়ের টুকরো জুড়ে একটি সামগ্রিক শিল্পের অবয়ব রচিত হয়, যেমন সেগুলির প্রত্যেকটি সেলাইসূত্র একটিমাত্র সৌন্দর্যের উপাদান সামনে আনে, ‘গরল অমিয় ভেল’ তা-ই। গল্পটি মূলত নায়িকা মালা বিশ্বাসের। তারই মানস বিকাশের জন্য এসেছে একাধিক কাহিনী-খণ্ড। একটি মফস্বল শহর এই গল্পের পটভূমি। রাণীঝিলের ঘাসে ঢাকা মাঠ, ক্রসরোডের ধুলোয় ঢাকা একটি পাথরের টিলা, তার পাশ দিয়ে ভ্রমণকারীদের আসা-যাওয়া, আনন্দ-কলরব—এসবের মধ্য দিয়েই গল্পের আকার তৈরি হয়।

চন্দ্রবাবুর মেয়ে মালা বিশ্বাস শহরের সকলেরই চেনা। তার এমন পরিচিতির বিস্তার তার বাইরের রূপ আর সাজসজ্জার বৈচিত্র্য এবং বাড়ির জানালার সামনে একা একটানা দাঁড়িয়ে থাকা নির্বিকার চোখে দৃশ্য দেখার স্বভাবের কারণেই। সে ঘরের বাইরেও আসে চাকর রামজীবনকে সঙ্গে নিয়ে। মুখে বসন্তের দাগ, কালো মোটা চেহারা মালার। হাতে থাকে ছাতা আর চোখে অদ্ভুত ধরনের চশমা। তার শাড়ি, রঙের বৈচিত্র্য ও পরার বিচিত্র সব কৌশল তার সম্বন্ধে শহরের সকলেরই কৌতূহল জাগায়। মেয়েস্কুলের বার্ষিক উৎসবে আসে এমন সব অলংকার গলায় পরে যা চারপাশের মন্তব্য টানে, কিন্তু তাতে মালার কিছু যায় আসে না, সে নির্বিকারচিত্ত।

শহরের করবী গাছের গা ঘেঁষে আছে একটা কালো পাথরের টিলা ক্রসরোডের মোড়ে। এর এমন অস্তিত্ব এই শহরে পঞ্চাশ বছরের কাল-সীমা চিহ্নিত করে। এই টিলাতেই কোনো এক অদৃশ্য লিপি-বিশারদ গোপনে সুযোগ বুঝে বেশ কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানে এক এক করে শহরের অচেনা মেয়েদের নামে কুৎসায় ভরা কিছু কথা লিখে রেখে যায়। তাদের মধ্যে মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা, কোনো এক সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, প্রীতি মুখার্জী, মালা বিশ্বাসের বান্ধবী মুক্তি রায়—এদের নামে কুৎসা প্রচারিত হয়।

তাতে শহর সমালোচনায় তোলপাড় হয়, নীতি বিশারদ, সত্যবাদী, নিভকি প্রচারক চৌধুরী পুলিশের আশ্রয় নেয়। পুলিশও ধরতে পারে না সেই কুৎসা-প্রচারকারীকে।

মালা বিশ্বাস বেড়াতে এসে এইসব লেখা দেখে, ক্রমশ চিনতে পারে যাদের নামে কুৎসা তাদের সবাইকে। তবে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে না। শুধু দেখে, ক্রমশ টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে একে একে সেই মেয়েগুলি পরস্পরের বন্ধু হয়ে চলে আসে। গল্প করে খুশিতে ঝলমল হয়ে। ওরা কুৎসায় এতটুকু ম্রিয়মাণ না হয়ে যৌবনধর্মে উচ্ছল হয়। শহরের সমস্ত মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এখন আর লোকে মালাকে দেখে না, কালো পাথরের ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক কুৎসা ওদের মান হারায়নি, ওদের যেন নতুন করে মান দিয়েছে, জীবনে চোখেমুখে এনেছে তৃপ্তির উল্লাস। ওদের কুৎসাই যেন গরবিণী হওয়ার ছাড়পত্র দিয়ে নেয়।

মালা ক্রমশ বোঝে তার এতদিনের নিঃসঙ্গ আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এক গভীর যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতা তার দিকে রাক্ষসের মতো হাঁ করে আসে তাকে গ্রাস করার জন্য। ক্ষোভে, দুঃখে মালা বিশ্বাস তাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়ানো বন্ধ করে দেয়। কুৎসা-কলুষও ধন্য হয় যাদের আশ্রয়ের প্রসন্নতায়, যারা হয় শহরের যুবকদের চোখে দয়িতা, কামনার লীলাকুরঙ্গী, তাদের থেকে অনেক দূরের বাসিন্দা যেন মালা নিজেই। এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে মালা আজ একা, নিঃস্ব। আয়নায় নিজেকে নিপুণ চোখে দেখে নিজের ওপর অশ্রদ্ধা আসে, অস্থিরতায়, রুদ্ধশ্বাস বেদনায় সে ভেঙে পড়ে। নিজেকে প্রার্থিত জনগণ থেকে নির্বাসনে রেখে সে পলাতকা যেন। এদিকে কালো পাথরের গায়ে অনেকদিন আর কোনো লেখা দেখা যায়নি। এক চাঁদ-ওঠা সন্ধেয় মাঝে মাঝে মেঘখণ্ডে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাওয়ার ছবি দেখে মালা কি ভেবে চাকর রামজীবনকে নিয়ে রাণীঝিলের দিকে চলে আসে বেড়াতে। পরনে তার সুসজ্জিত পোশাক। বেরুবার আগে দু'চোখে ছিল অশ্রুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। ক্রমশ সব সামলে আসন্ন ঝড়ের মুখেই সে বাইরে আসে। রামজীবন বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে মালা নিজেই ঝড়ের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের আলোয় পাথরের গায়ে নিজেকে নিয়ে খড়ি দিয়ে লেখে :

'—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার... থাক্, | বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও। এখানেই গল্পের কাহিনীর শেষ। গল্পের প্লট-বৃত্ত বিশেষ একটি চরিত্রকে নির্দিষ্ট করে রচিত ঠিকই, কিন্তু তার ঘটনার মালা বিশেষ চরিত্রটির বাইরে থেকে অন্য গল্পচিত্রের খণ্ডগুলি দিয়ে তৈরি করা। কাহিনী মনোলোকের জগৎকে কেন্দ্র করে রচিত, কিন্তু তার মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে বোঝাতে গিয়ে একাধিক মেয়ের যে জীবনছবির ইঙ্গিত খণ্ডগুলি রচিত, সেগুলির গুরুত্ব গল্পের প্লটে গতানুগতিক পন্থা বর্জিত রীতি-অনুগ। গল্পের আরম্ভে মালা বিশ্বাস, সব শেষের চিত্রে মালা বিশ্বাস, মধ্যের যে কাহিনীস্রোতে ঘটনার তরঙ্গবিক্ষেপ, তা লেখকের তৈরি। লেখক স্বয়ং চিত্রখণ্ড নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ গল্পে বৃত্ত-পরিকল্পনায় লক্ষণীয় অভিনবত্ব আছে। প্রচারক চৌধুরী বা ননীবাবু অথবা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মালা বিশ্বাসের কাহিনীর কোনো যোগ নেই, অথচ গল্পের প্রকরণগত বৃত্ত-স্বভাবে জটিলতা ও সাসপেন্স সৃষ্টির জন্য এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। যা আসলে কাহিনীর সূত্রে প্লটের যে জটিল রূপ—সেখানে পূর্ণিমা বসু, সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, মুক্তি রায় ও প্রীতি মুখার্জীদের দায়িত্ব বেশি। মিথ্যা বা সত্য যাই হোক, কুৎসা প্রচারে যেসব সংক্ষিপ্ত গল্পের ব্যঞ্জনা আছে—সম্মিলিতভাবে সেগুলিই প্লটের জটিল অবয়ব গঠনে একমাত্র সহায়ক। তা আবার মালা বিশ্বাসের অবচেতন মনের স্বরূপে মেলে। সুবোধ ঘোষ গল্পের কাঠামোয় একাধিক চরিত্রের ভিড় এনেছেন ঠিকই, পটভূমিতে প্যানোরামিক বিস্তার দিয়েছেন হয়তো, কিন্তু সবটাই মালা বিশ্বাসের মনোভূমির গঠনে সত্য, অন্যভাবে নয়। পূর্ণিমা, সুমিতা ইত্যাদি প্রত্যেককে নিয়ে আলাদা এক একটি গল্প হতে পারত, গল্পকার অসাধারণ প্রকরণ-কৌশলে তাদের গল্প-স্বভাবের ব্যঞ্জনা বা আভাটুকু নিয়েছেন, বাকি সবই বর্জিত।

তাই গল্পের বৃত্ত-পরিকল্পনায় নায়িকা মালাই, তার মনের বিচরণক্ষেত্রই ও স্বভাবগত বিকৃতিই গল্পকারের একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু টানা কাহিনী-অবয়বে মালা বিশ্বাস আসেনি, তাই গল্পের চরমমুহূর্ত অংশটি চিহ্নিত করার বিশেষ কিছুটা দ্বিধা আসে। আমাদের মতে, চরমমুহূর্ত অংশের চিত্র-স্বভাব কিছু ভাঙতে ভাঙতে তৈরি হয়েছে। তা

বিস্তৃত। 'বিশ্বাস বাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তিও আর দেখা যায় না'- এখানেই চরমমুহূর্ত-ক্ষণের সূত্রপাত। ক্রমশ মালার মনের ভাঙন ধরে এক এক করে চরমমুহূর্তটির শেষ ধাপে যাবার গতি তৈরি হয় নিবিষ্ট পাঠকদের মনোলোকে :

১. 'আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালবাসে মালা।'

২. 'মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে।'

৩. 'মনে হয় বাইরের বাতাসে নিশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—কোন পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।'

মানসিক এই স্তরগুলি অতিক্রম করতে করতে আসে 'মহামুহূর্ত'র শেষতম ক্রান্তিরেখা:

'অনেকদিন পরে চাঁদ উঠেছিল আবার।

মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঝোড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাকলো। রামজীবন, আমি বেড়াতে যাব এখনি।'

এখানেই যেমন ইঙ্গিতগর্ভ মহামুহূর্তের ব্যঞ্জনা, তেমনি নায়িকার স্বভাব থেকে তার মানসিক উত্তরণের দিকও। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পের চরম মুহূর্তটি নায়িকার অবচেতন মনের রহস্যময় স্বভাবে বিস্ময়কর।

বিশেষ ব্যক্তি-নামে চিহ্নিত বহু মানুষের পরিচয় মেলে 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে। কিন্তু তারা কেউই গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠেনি, গল্পের প্লটের, বলা যায়, আনুষঙ্গিক রঙ বাহার। প্রচারক চৌধুরী অকৃতদার, সত্যবাদী, নির্ভীক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠিন, নির্মম, কর্তব্যপরায়ণ, নীতিবাগীশ, শহরের ভদ্র সমাজের নীতি রুচি ও শালীনতার অভিভাবক স্বরূপ' এ গল্পে। শহরেরই সেবক সমিতির সেক্রেটারি ননীবাবু, এমনকি পুলিশ ইন্সপেক্টরও—অল্প হলেও কিছুটা জায়গা পেয়েছে এ গল্পে। কিন্তু এরা কেউই মালা

বিশ্বাসের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত নয়। এরা সকলেই একটা মফস্বল শহরের সমাজ পটভূমির নির্মাতা। এই কারণেই এরা কেউ গল্পের গৌণ চরিত্রও হয়নি।

বস্তুত অনেক মানুষের ভিড়ে, উতরোল সক্রিয়তার মধ্যে চন্দ্রবাবুর কন্যা, গল্পের নায়িকা মালা বিশ্বাসই একমাত্র গল্পের চরিত্র। সে একা, নিঃসঙ্গ। কারণ তার বাইরের শারীরিক সৌন্দর্যের লক্ষণীয় ঘাটতি—সারা মুখে বসন্তের দাগ, কালো মোটা চেহারা। সেই সঙ্গে ধনীকন্যার প্রসাধন ও পোশাক বিলাস, সাজসজ্জা ও নিজেকে নীরব রেখে, নিরাসক্ত থাকার ভানে সাধারণ মানুষের কৌতূহল জাগানোর প্রয়াসেই ধরা পড়ে তার নিজেকে প্রদর্শনীর বিষয় করে দেখানোর প্রয়াস। সে তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখে, সকলকে দেখে, শুধু দেখেই যায়। কাউকে দেখে সে নিজেকে লুকোয় না। এখানেই প্রশ্ন এবং সমস্যাও—'এ কি শুধু দেখার নেশা? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা?' এমন যে নায়িকা, তার আরও বৈশিষ্ট্য, 'আড়ালে থাকতে মালা বোধ হয় হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু ভিড় খোঁজে যদিও ভিড়ের মধ্যে ঠিক মিশতে পারে না।'

মালা বিশ্বাসের মধ্যে গভীর প্রচ্ছন্ন ছিল শহরের আর সব ওর বয়সী সুন্দরী, সুশ্রী, স্মার্ট মেয়েদের সম্পর্কে উন্নাসিক নির্বিকারত্ব। তাদের কেউ কেউ, যেমন পূর্ণিমা বসু—ওকে দেখলে, ওর সবুজ রঙের ঝকঝকে রেশমী নেটের পোশাক দেখলে প্রতিবাদে জানালা বন্ধ করে দেয়, তেমনি রূপসী পূর্ণিমাকে নিয়ে যখন কালো পাথরের কুৎসায় সারা শহর তোলপার হয়ে ওঠে, তখন, সারাক্ষণ হেসেছে মালা। রূপসী পূর্ণিমা বসুর সকল অহংকার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে। এসবে মালা আনন্দ পায়। কিন্তু সে আনন্দ মুছে যায় যখন দেখে যারা কদর্য কুৎসার বিষয় তারাই গর্বে শহরে সমস্ত মানুষের দৃষ্টি কাড়ে—সেই তারা পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা, প্রীতি, মুক্তির দল।

মালা চরিত্রের জটিলতা তৈরি হয় এইভাবেই অবচেতন মনের বিক্রিয়ায়। মালার ঈর্ষা তাকে একা করে। আগে সে-ই শহরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, এখন তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সে আড়ালে পড়ে গেল। সে মনের গভীরে ওদের মতো একটা ছাড়পত্র চায়। শহরের আনন্দমেলায় সে উদ্ভ্রান্ত দীনতায় অতি সাধারণ

পোশাকে ঘুরে বেড়ায়। শেষে এক সন্ধেয় আসন্ন ঝোড়ো মেঘে চাঁদ ঢাকা দেওয়ার কালে, বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে চাকরকে নিয়ে। সুযোগ বুঝে নিজেই শহরবাসীর সকলের অলক্ষ্যে নিজের সম্পর্কে কুৎসা-কথা লেখে কালো পাথরের বুকে। সুবোধ ঘোষ অতি ধীরে মালার মনোলোকের দিক উন্মোচিত করেছেন। মালা আধুনিক তথাকথিত ভদ্র সভ্যতার শিকার। তার প্রসাধন-চর্চা, সাজসজ্জা, প্রকটভাবে নিজেকে সকলের সামনে উপস্থিত করার যে শামুকের গতির মতোই দুরন্ত প্রয়াস, তা উৎকট আধুনিকতার যথার্থ পরিচয়। বাইরের রূপে আধুনিকতার বিকার, অন্তরের গভীর অধিতলেও আনে আত্মবিধ্বংসী বিকারগ্রস্ততা। এটা, এই মনস্তত্ত্ব আধুনিক সভ্য সমাজের নিশ্চয়ই অভিশাপ। এ এক খেলা, যা আত্মহননের বুঝিবা কোনো আনন্দকেই তুলে ধরে। মালা চরিত্রের মধ্যে স্তরে স্তরে আছে তার নৈতিক পতনের, তার অবক্ষয়িত জীবন-ভাবনার, তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবনার নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতার, সেই সঙ্গে বিকৃত জয়ের উল্লাসের দিক।

মালা বিশ্বাসকে গল্পে প্রথম দেখি বাইরের দিকে রূপৈশ্বর্যের গর্বিত স্বভাবে, সেই গর্বে সে পূণমার কলঙ্ক রটনায় খুশি হয়। পরের স্তরে সে হারতে থাকে—যখন দেখে কুৎসাকে অমৃতবাণীর মতো নিয়ে পাঁচটি মেয়ে শহরের সমস্ত মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। এখানে সে একা। তৃতীয় স্তরে সে মনের গভীরে হয়ে ওঠে দীন, উদ্ভ্রান্ত। সাধারণ পোশাকে সে সহজ, প্রায় উপেক্ষার মতো এক রমণী। চতুর্থ স্তরে তার আশ্রয় তার নির্জন ঘরে, তার সেই খোলা জানালার সামনে নয়, তার নিজস্ব ঘরের অন্ধকারে। এই ঘর তার নিজের বাড়ির যেমন একটি অংশ, তেমনি তার মনেরও গোপনতম এক কুঠুরি, সেই কুঠুরিরও একটিমাত্র অদৃশ্য দরজা। সেখানে সে একা, সে নিঃস্ব। সে বুঝিবা সমস্ত কামনার ওপারে, এক বেদনাহীন চিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে। শেষ স্তরে মালা নিঃসঙ্গ মনের, যন্ত্রণাবিদ্ধ অন্তরের বাইরে বেরুনোকে উপলক্ষ্য করে আর এক বিকৃত চাপা আনন্দের রূপাবয়ব। সন্ধের খণ্ডালোকিত আকাশের বুকে ঝড়ের মেঘ দেখে অনেকদিন পরে প্রথম বেরিয়ে আসার আনন্দের উদ্ভাস। আর এরই পাশাপাশি আছে সেই করুণ মূর্তি :

'সাজসজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল আয়নার সামনে।

চোখের জলে দু'দুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল।'

কুৎসাকে প্রশস্তির মর্যাদা দিয়ে পূর্ণিমাদের মধ্যে ছাড়পত্র পেতে, ওদের অহংকার ভাঙতে, গরলকে অমৃতের স্বাদে গ্রহণ করতেই মালা নিজের হাতে নিজের কুৎসা লেখে কালো পাথরের গায়ে।

অর্থাৎ সমগ্র গল্পে মালার মনের আছে বিস্ময়কর বিবর্তন, যার মূল ভিত্তি ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় এক মনস্তত্ত্ব। উগ্র আধুনিকতার কাছে কোনো নারী আধুনিক হয়ে পরাজয় মানতে চায় না। তার পক্ষে এতদিন যা ছিল নিরন্তর পরাজয়ের, তার প্রতি অবহেলার, তাকে চ্যালেঞ্জ জানায় প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ দিয়ে। এমন প্রতিশোধ স্পৃহা যে চরিত্রের ও জীবনের বড় নৈতিকতার পক্ষে অবক্ষয়, আত্মধ্বংসী তথা সুস্থ জীবন-প্রাণের মহতী বিনষ্টি, আধুনিক সভ্যতার উগ্রতা তা বোঝায় না। এই যে মানবমনের স্খলন-পতন, এই যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার নিষ্ফল আভিজাত্যবোধ ও দম্ভ, মিথ্যা অপমানবোধের জ্বালা আগুনের হলকা আনে রহস্যময় মনের গভীরে, উৎকট সভ্যতার সেটাই উপসংহার। উগ্র আধুনিক মনের বাস্তবতার ও জীবনের পক্ষে সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচিত্রণে সুবোধ ঘোষের মালা বিশ্বাস চরিত্রটি এক সার্থক ছোটগল্পের নিখুঁত শিল্পপ্রকরণের নায়িকাই।

বিশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ যখন সারা ভারতকে উগ্র আধুনিকতার স্বরূপে সামনে আনে, সুবোধ ঘোষ সেই সময় ও দেশীয় পরিবেশের কথা মনে রেখেই জীবনকে এক দিক থেকে বুঝতে চেয়েছেন। জীবন দেখার ভঙ্গি একজন সচেতন গল্পকারের পত কখনোই আরোপিত কোনো বিষয় ধরে বিশিষ্ট হয় না, তা গল্পের মধ্য থেকেই উঠে আসে। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে সুবোধ ঘোষের attitude কোনো বিশেষ চরিত্রের কেন স্থির হয়ে থাকেনি, সেই সূত্রে তিনি আধুনিকতার উৎকট প্রভাবের দিক, উগ্র বিকার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন শ্লেষে ধরতে চেয়েছেন।

এই গল্পে আছে গল্পকারের লেখনীর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষ, আছে সাধারণ মানুষের অবুঝ যুক্তি, ধারণা। পুলিশি ব্যবস্থাকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। গল্পের শেষে ননীবাবু যখন সেবক সমিতির বৈঠকে জানান এ কাজ করেছে 'চৌধুরী মশাই', তখনি সাধারণ মানুষের মধ্যে গুজবের উৎস ও বিশ্বাস যে কি হাস্যকর রূপ নেয়, তা প্রমাণ হয়ে যায়। আবার সুধা দত্ত-র নামে কদর্য-কথা লেখার ঠিক আগে পর্যন্ত যে কনস্টেবল লাঠি হাতে পাথরের পাহারাদার, সে যখন লেখার পর বলে, সে একবারও ডিউটিতে ফাকি দেয়নি, তখন সরকারি ব্যবস্থার গলদকে গল্পকার শ্লেষ করতে ছাড়েননি। কুৎসা যদি আধুনিকাদের বাইরের লোকজনের সামনে আসার এক চমৎকার উপায় হয়—যা পূর্ণিমা বসু ও তার সঙ্গিনীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তাহলে প্রমাণ হয়ে যায় গল্পে সুবোধ ঘোষ লেখনীতে গভীর প্রচ্ছন্ন করেছেন সূক্ষ্ম শ্লেষের লাল কালি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে গল্পকার গল্পের মধ্যে তার বাঞ্ছিত শিল্প-বাস্তবতা থেকে সরে আসেননি।

এমন শিল্পের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই ধরা পড়েছে বিকৃত আধুনিক জীবনের অবক্ষয়িত রূপ। এটাই সমগ্র গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়, বলা যায়, গল্পকারের বিশেষ 'attitude to life'। আধুনিক সভ্যতা যে ঘা বা ক্ষত তৈরি করে শিক্ষিত ব্যক্তি-জীবনে ও সভ্য সমাজে, যে নীতিভ্রষ্টতা আনে, তাকে মালা বিশ্বাস, পূর্ণিমা বসু ইত্যাদির মতো চরিত্রের পোস্টমর্টেমে গল্পকার ধরিয়ে দিয়েছেন। এই কাজে শবব্যবচ্ছেদের ছুরির মতো ব্যবহৃত হয়েছে জটিল রহস্যময় মনস্তত্ত্ব। বলা যায়, গল্পের পূর্ণিমা, সুধা, সুমিতা, প্রীতি, মুক্তি—এরা সকলেই আত্মভুক এক কাল্পনিক জীবের মতো—যে প্রয়োজন হলে নিজেই নিজের শরীর ভক্ষণ করে। এ-কাজ মালা বিশ্বাসও করে শেষে। মালা নিজের কুৎসা নিজেই লিখেছে—এ ভ্রষ্টতা আত্মক্ষয়ই, মনের দিক থেকে একজাতীয় আত্মভুক স্বভাবের অনুগ। পূর্ণিমাদের কুৎসা কে বা কারা লিখেছে ধরা যায়নি, ওরা নিজেরাই কি না তা বলা বা সিদ্ধান্ত করা সম্ভবও নয়, কিন্তু এটা তো ঠিক যে এরা নিজেদেরই কুৎসা হজম করে হাসিমুখে প্রকাশ্যে দলবদ্ধভাবে জটলা করে! এ-ও তো সেই আত্মভুক এক জটিলতম স্বভাব! নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কৌতূহলী মানুষদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার কুৎসিত শালীনতাহীন প্রয়াস।

অর্থাৎ 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে যে জটিল মনস্তত্ত্বের বিচারণা, তা আধুনিক জীবনেরই এক বিকৃত উপজাত (by-product) বিষয়। মালা বিশ্বাসের মনের গতি ও সর্বশেষ দিক পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক গল্পের পরিণতিকে জীবনের অন্ধকার খাদেই নিয়ে রায় নির্বিরোধে। ঈর্ষা, সীমাহীন আত্মপ্রচার নিজেকে নিয়ে মৃত্যুবরণের মতো খেলা, জীবন-ভাষ্যের অসুস্থ ভয়াবহ রূপবিম্বন আমাদের মতো সভ্য মানুষদের প্রেতপুরীর মতো জগতে নিয়ে যায়। সুবোধ ঘোষ গল্পের কয়েকটি নারীকে নিয়ে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপকে দেখিয়েছেন। গল্পটিতে তাই আছে অসুস্থতা, বিকার-আক্রান্ত মনোলোক। যে নতুন শহর, তার মানুষ-জন ও সভ্য রূপের মধ্যে মানুষের পদস্খলনকে শিকারির অব্যর্থ শিকারের মতো নিশ্চিত করে, সে সভ্যতার আধার গল্পকার সুবোধ ঘোষকে রক্তচক্ষুর রসদ জুগিয়েছে। 'সুন্দরম' গল্পে আছে সুন্দরের সন্ধানের ব্যর্থতার মূলে সুকুমারের সমাজ-কেন্দ্রচ্যুত যৌন বিকার, 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে আছে মালা বিশ্বাসের মনোবিকারের জটিল আলোয় ধরা পঙ্ক-গন্ধের, ক্লেদের কালো রূপ। এ গল্পে জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ধারায় সুবোধ ঘোষকে উত্তরসূরিত্বের আসন দেওয়া যায়। গল্পের শেষে লেখক-ব্যক্তিত্ব তাই নিরাসক্ত স্বভাবে মালা বিশ্বাসের পতনকে একেবারে নিখুঁত নিমর্মতায় ধরেছেন। তার তীব্র বাস্তবতাবোধ, গভীর মনস্তত্ত্ব জ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার উৎকট কদর্য দিকের পর্যবেক্ষণ গল্পে সুবোধ ঘোষকে সর্বাবয়ব আধুনিক জীবনেরই রূপকার করে তোলে।

'গরল অমিয় ভেল' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু নায়িকা মালা বিশ্বাসের চরিত্র ধরেই রক্ষিত। তার যে সক্রিয়তা, মনের অবচেতনলোকের উন্মোচন, মানসিক টানাপোড়েনের জটিল বিবর্তন, তাতেই ধরা পড়ে গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাবের একমুখী স্বভাব। কিন্তু শুধুমাত্র মালা বিশ্বাসের অংশটুকু দিয়েই গল্পের ভাববস্তুর একমুখিতা বিচার ঠিক হবে না। কারণ সমগ্র গল্পে লেখকের উদ্দেশ্য আধুনিক সভ্যতার উগ্রতা ও বিকৃতির দিক দেখাননা। তাই যদি হয়, তবে মালা বিশ্বাসের পাশাপাশি চলে আসে পূর্ণিমা বসু, মুক্তি রায়, প্রীতি মুখার্জীরাও। অর্থাৎ আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমাজের অভ্যন্তরে যে এক বিষাদময় পচাগলা রূপ অলক্ষ্যে থাকে, তার প্রমাণ গল্পে আছে এদের সমবেত রূপেই।

অবশ্যই এই রূপের প্রতিচিত্রণে গল্পকার গল্পের প্রকরণে অনাবশ্যক বিষয়কে করেছেন বর্জন। কোথাও আখ্যায়িকার বর্ণনার প্রবণতা দেখা দেয়নি। গল্পের শুরুতে আছে মালা বিশ্বাসের মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। লেখকের সুনিপুণ সংযত উপস্থাপনায় তা যথাযথ। এর পরেই ঘটেছে শরতের পরিবেশে সেই কালো পাথরের ওপর কুৎসা রটনার চিত্র। একে একে এই চিত্র দিয়ে গল্পের মূল ভাবমুখিন গতি ধরা পড়ে। লেখকের টানা বর্ণনায় গল্পের অবয়ব গঠিত নয় মাঝে মাঝে লেখক নিজে থেকে গল্পের সুতো ধরেছেন এবং আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন রাণীঝিলের সমস্ত মানুষেরই মনের কথা। সে বর্ণনায় আছে যেমন কৌতুক তেমনি আছে এই শ্লেষের বাস্তবতা।

তাই গল্পের প্রকরণে লেখকে উপস্থাপনারীতি ভাবের গতিময়তাহে লক্ষ্যে রাখে, প্রকাশভঙ্গির মধ্যে নেই বিবৃতিমূলকতা। বরং ইঙ্গিতধর্মে প্রচারক চৌধুরীর ভূমিকা, সেবক সমিতির সেক্রেটারি নবীনবাবুদের সক্রিয়তা, কুৎসা-ধন্য মেয়েগুলির সমবেত উল্লসিত স্বভাব এবং সবার ওপরে মালা বিশ্বাসের মনের গভীরে আলোর প্রতিসরিত রশ্মি গল্পের মূল লক্ষ্যকে দীপ্তিময় করে। যে অবক্ষয় চেতনা, নীতিহীনতা, মিথ্যাচার, বিকারগ্রস্ত মনের আত্মভুক স্বভাব, আত্মপ্রচারের কুৎসিত রূপ উগ্র আধুনিকতার অন্তর্বর্তী স্বভাবকে স্পষ্ট করে শিক্ষিত সমাজের রূপকে তথকথিতের সীমার মর্যাদা দেয়, আলোচ্য গল্পে তা হয়েছে চরিত্রের মনোলোকে বাস্তবতায় নিশ্চয়ই ইঙ্গিতধর্মী।

গল্পের শুরু ভাষায় আছে গল্পকারের ও গল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। গল্পটির শুরু এই রকম:

‘মেহেদি গাছের বেড়ার ওপারে চন্দ্রবাবুর বাড়ির জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম মালা বিশ্বাস।

চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।’

এই যে চিত্র-- এর ব্যঞ্জনা এতই অপূর্ব যে সমগ্র গল্পে এই ব্যাখ্যার বিপরীত চিত্রে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। লেখক বলেছেন, শহরের সকলেই ওকে চেনে, কিন্তু গল্প পড়তে পড়তে বোঝা যায়, অক্ষরিক অর্থে তার যা পরিচিতি, তার থেকে সে সম্পূর্ণ অপরিচিতই শহরের লোকের কাছে। প্রথম দিকে সকলের চেনার মধ্যে কৌতূহল

জাগায়, ক্রমশ দেখা যায় সে শহরের মানুষদের আদৌ চেনা নয়। তার মনের খবর—বা তার মনোবিকলনের—তাকে শহরের মানুষ চেনে না। সেই শহরের সমস্ত মানুষের চেনা থেকে ক্রমশ সে অচেনা হয়ে যায় পূর্ণিমাদের কুৎসা থেকে জাত মানহীন আত্মপ্রচারের গৌরবের আবরণে। সে চেনা নয়, অচেনে। এবার সে ক্রমশ নিজের পরিচিতি দে পাঠকদের কাছে নিঃসঙ্গ থেকে তার নিজেরই যে পাথরের গায়ে নিজের কুৎসা লেখার গোপনতম প্রয়াস, সে পরিচয় কেউ জানত না। সে মা , গল্পের শহুরে মানুৰে কাছে অচেনা, বর্তমান পাঠকদের কাছে চেনা। অর্থাৎ গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদের যে চিত্র নিহিত তাৎপর্য, তা পাঠকদের বিপরীত অভিজ্ঞতায় অন্য আলোকে দেখার মালা না, তাই পাথরে লেখা হল। মালার লিখন-প্রয়াস আৰু মালার নিজৰ চরিত্র কলাৰ-গল্পের শুরু ৰাচিত্রে দুৰে বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনার প্রথম সূত্রপাতে প্রকরণগত কৌশল লক্ষনীয়।

গল্পের ভাষায় আছে শ্লেষ—আগেই বলেছি। পাথরের সামনে ডিউটি করা কনস্টেবলের কথায়, নবীণ বাবুদের লিপিকার হিসেবে চৌধুরী মশাইকে সন্দেহ করার মতো গুজবের ভাষায়, পাথরের লেখাগুলির মধ্যেকার কৌতুদ মিশ্রিত বক্র শ্লেষের গদ্যে গল্পের ভাষাবৈশিষ্ট্য বড় শিল্পমর্যাদা পায়। কোথাও কোথাও গল্পকার প্রকৃতির চমৎকার খণ্ডমুহূর্ত এঁকেছেন—যা গল্পের পরবর্তী ঘটনা ঘটানোর উপযুক্ত ভূমিকারই অনুগত ভাষাচিত্র।

‘ভাদ্রের ঠিক মাঝামাঝি এসে আকাশ ভরা বর্ষার ঘটা একেবারে থেমে গেল। এ রাণীঝিলের মাঠের ঘাসে, কালো পাথরের টিলাতে, টেলিগ্রাফের তারে,দুরের নিমবনের চুড়ায় প্রথম শরতের আলো চিক চিক করে উঠলো ছোট ছেলের হাসির মতো ।’

লক্ষণীয়, এমন হাসিখুশির নরম পরিবেশের পরেই আসে পূর্ণিমা বসুকে নিয়ে কালো পাথরের লেখা কুৎসার নির্মম আঘাত। গল্পের একাধিক ভাষাচিত্রে আছে পরিবেশ ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য-অনুগ ইঙ্গিতধর্ম।

সুধা দত্ত-কে নিয়ে যখন কালো পাথরের অশরীরী শিল্পী নতুন কুৎসার জন্ম দেয়, তখন সারা শহরের মানুষের মধ্যে সন্দেহের চিত্রটিকে একাধিক জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়ে ভাষায় রচনা করেছেন স্বয়ং গল্পকার রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্ট অথচ কৌতূহলী রহস্যের জাল স্বভাবে :

'সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজার ঠিক তিনমাস ধরে শহরে বসে আছে। কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেগুলি বড় বেশী গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্তিরি উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কি লাভ হয় ? তবু সপ্তাহে তিন খান রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এতো সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়।'

এই ভাষাচিত্রের মধ্যে আছে যেমন অনাবিল কৌতুকরস, তেমনি আছে এক থমথমে ভাব। গল্পকার পাথরের ওপরের এক অশরীরী শিল্পীর লেখা ভাষাগুলি সংযমে ও পরিমিতিবোধে অসামান্য আকর্ষক করেছেন। সকলকে আড়াল করে দ্রুত লিখে যাওয়ার পক্ষে সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ আঘাতের উপযোগী। কোনো বাড়তি কথা নেই, অথচ প্রত্যেকটি লেখা এক একটি নারী চরিত্রকে নিয়ে একেবারে মিনি-গল্প! পূর্ণিমা বসু, সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, প্রীতি মুখার্জী, মুক্তি রায়- এমন প্রত্যেকটি যুবতী অপরিচিত নারী সম্পর্কে লেখাগুলিতে গদ্য-ভাষার ও লোকচরিত্র স্বভাবের যে অবাক করা চমক আছে, আছে আলোর দীপ্তি, পাঠকদের অবধারিতভাবে ধরে রাখে গল্পপাঠে। সর্বশেষ মালা বিশ্বাসের নিজের লেখাটি আগের লেখাগুলির সঙ্গে যেমন লক্ষণীয় তফাতকে দেখায়, তেমনি মালার মিথ্যে স্বভাব-চিত্রকে সত্যের মর্যাদাদানে কার্পণ্য করে না। লেখাটা মালার নিজেরই তৈরি গদ্য, কিন্তু গল্পকার তার কলমে মালা চরিত্রের ও সমগ্র গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনাকেও একসঙ্গে মিলিয়ে এমন এক মনোরম আঘাত হেনেছেন পাঠকদের উপলব্ধির জগতে, যা এই গল্পের ভাষাচিত্রগুলির পক্ষে অনবদ্য উদাহরণ হয়ে থাকছে :

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার ...

থাক, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না।তোমার চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।'

আত্মভুক স্বভাবে নায়িকার এই মনের ভাষা গল্পের প্রকাশরীতি ও গদ্য ভাষা বৈশিষ্ট্যের অনবদ্য নিদর্শন হয়ে আছে। গদ্যে আছে যেমন আবেগ, তেমনি উপমা, তেল আছে একটি নারী সম্পর্কে মিথ্যা কুংসার কদর্যতা। এই ভাষা গল্পটির কেন্দ্রীয় শঙ্কর প্রতিষ্ঠার সহায়ক। 'গরল অমিয় ভেল' বড় গল্প, কিন্তু প্রকাশরীতি ও ভাষায় আছে টান টান রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ। এখানেই গল্পকার সুবোধ ঘোষ এক স্বতন্ত্র মর্যাদার ভাষাশিল্পী।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, সুবোধ ঘোষ আলোচ্য গল্পের নামকরণে বৈষ্ণব পদাবলীর অতগত কবি জ্ঞানদাস রচিত একটি আক্ষেপানুরাগের পদের অংশের কথা ভেবেছেন, যদিও তার তাৎপর্যগত অর্থ নেননি, নেওয়ার প্রয়োজনও হয়নি, তার কারণ, সেই অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যাই 'গরল অমিয় ভেল' গল্পের মূল লক্ষ্য। জ্ঞানদাসের পদের নায়িকা রাধা তার ভালোবাসার ঘর তৈরি করে কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে, সেখানেই তার পরম সুখের যথার্থ অধিষ্ঠান ভেবেছেন, কিন্তু তা অস্থায়ী হয় জাগতিক মানুষের বাধায়, গঞ্জনায়, নিন্দামন্দে। আরও গভীর অর্থ হল বিরহের আগুনে পুড়ে পুড়ে সেই সুখও বিনষ্ট হয়। এই ভাবনার পরেই রাধার দ্বিতীয় ভাবনা একটি রূপকের ব্যঞ্জনায় রূপ পায়- যেখানে অবস্থার বৈষম্যই প্রধান কথা। কৃষ্ণরূপ সাগর অমৃত-রূপ, সেখানে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে অবগাহনে ততা পাওয়ার কথা অমৃতই, রাধা পায় বিষ, গরল! জাগতিক বাধায়, চরম যন্ত্রণায় সেই অমৃত-প্রেম হয় বিষপানের মর্মঘাতী যন্ত্রণার প্রতিরূপ।

সুবোধ ঘোষ জ্ঞানদাসের 'অমিয়-সাগরে সিনান করিতে / সকলি গরল ভেল' পর্ভূক্তিটির সকলি গরল ভেল' পদাংশটি বদল করে নিয়েছেন 'গরল অমিয় ভেল' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। গল্পে অমৃত গরল হয়নি, গরল হয়েছে অমৃত। এই বিপরীত ভাবের ব্যঞ্জনা আছে মালা বিশ্বাসের চরিত্র ধরে। মালা নিজের প্রতিষ্ঠা চায় পূর্ণিমাদের মধ্যে। পূর্ণিমারা যেভাবে কুৎসার বিষ পান করে নিজেদের জনসমক্ষে জাহির করতে পেরেছে আত্মতৃপ্তিতে, মালা বিশ্বাস তারই অভিলাষিণী! নিজের হাতে নিজের চরিত্র

বিষয়ে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে সে জনপ্রিয় হতে চেয়েছে রাণীঝিলের মানুষজনের কাছে। এই বেপরোয়া স্বভাবটি তৈরি হয়েছে তার নিজেরই মনোবিকলনে। সকলের কাছে জাহির করার যে সুখ, তৃপ্তি, অহমিকা, আভিজাত্য, দম্ভ- সবই নিফল, মধ্যবিত্ত মানসিকতার। বিকারগ্রস্ততাই, মালা তাকেই গ্রহণ করে নিজের স্বভাবে। প্রাপ্তি হল পূর্ণিমাদের মতো স্বাভাবিক 'ছাড়পত্র। অর্থাৎ মালার স্ব-ঘোষিত নিজ চরিত্রের কলঙ্ক হল তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের কাছে বিজেতার উপহার! এই অর্থে নাম সার্থক। আধুনিকতার এই উৎকট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার উগ্র বিষাক্ত রূপ শিক্ষিত মানুষের সামনে অন্ধকূপ রচনা করে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, শুধু মালা বিশ্বাস নয়, আধুনিক সভ্য সমাজের অভ্যন্তরেই যে বিপরীত সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস-চিত্র আছে স্বার্থপরতার, সুখ-অনুভবের, আত্মগরিমার প্রকাশের মধ্য দিয়ে, পূর্ণিমা বসু, সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, প্রতি মুখার্জী, মুক্তি রায়- এদের মতো সভ্য, শিক্ষিত নারীরা তার প্রমাণ রেখেছে সমবেতভাবে। তাদের কলঙ্ক প্রচার তাদের সম্মানহানি করেনি, তাদের টেনে এনেছে বাইরে সুখের, গর্বের মাল্যভূষিত করে। তাদের কৎসা হয়েছে জনতার কাছে দেখানোর মতো গলায় পরা বিজয়িনীর মালা। এই যে সভ্য সমাজের বিপরীত অবস্থানে, এক অন্ধকার জটিল, ক্লেদাক্ত মনের বন্ধগলির মধ্যে মানুষের আশ্রয় নেওয়া— তা গরলকে অমৃতই বানিয়ে নেওয়াকে বুঝিয়ে দেয়। গল্পনামের গূঢ়ার্থ লেখকের কেন্দ্রীয় সত্যে এভাবেও টীকাভাষ্য পেতে পারে।

তৃতীয় ভাষ্যের একটি দিক নামের শিল্প যাথার্থ্যের পক্ষে আছে। 'গরল' সুলভ্য, 'অমৃত অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। আধুনিক উগ্র মেকি সমাজসুলভ বিষয়কে নিয়ে তার মধ্যে খোঁজে দুর্লভ অমৃতের। তাদের কাছে অমৃত মানে স্বার্থসর্বস্ব, জীবনের উপরিতলভিত্তিক (superficial) আত্মসুখ, নিষ্ফল দম্ভ, অহংকার, উঠতি আভিজাত্য। কুৎসার মধ্যে সুখ সন্ধান, সুযোগসন্ধানী মানুষের সুখী হওয়া তো পৃথিবীর আধুনিক সমাজের এই প্রজন্মের একান্ত কাঙিক্ষত! সভ্যতার অভিশাপ এভাবেই ধরা পড়ে। মালা বিশ্বাস, পূর্ণিমারা কুৎসা নিয়ে পুরুষদের কাছে বীরাঙ্গনা হতে চেয়েছে প্রকারান্তরে। তাদের গোপন পুরুষ-সঙ্গ আকাঙক্ষা, তথাকথিত প্রেমবাসনা জানানোর এটাই বুঝি সহজ এবং

উপযুক্ত পথ। একালের এক কবি লিখেছেন একালেরই যুবক-যুবতীর প্রেম বিষয়কে ভেবে : ‘তোমাদের বেয়াদবি বেহায়া প্রেমের বাড়াবাড়ি / ধুলায় ধূসর মর্ত্যে স্বর্গের সুলভ সংস্করণ। /মধুর বদলে গুড় অমৃতের পরিবর্তে তাড়ি । আহা, তবু তৃপ্ত হোক নগণ্য এ মক্ষিকা জীবন। (রাজলক্ষ্মী দেবী) এই কবিতার নির্গলিতার্থ কিছুটা অংশে এমন গরলের অমৃত হওয়ার ভাষ্যে মিলে যায়। গল্পের নামে একালের প্রজন্মের তথা চিরকালের তথাকথিত মধ্যবিত্ত মনস্কতা ও মানুষের বিকৃতির ব্যঞ্জনার দিক সমর্থন পায়।

১০.২ কালাগুরু

প্রায় সময়ের একই বলয়ে বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর মুখ ধরে কাছাকাছির সীমায় আসেন ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তার আগে কোনোক্রমেই কল্লোলীয় নন এমন তারাশঙ্কর স্বরাজ্যে সম্রাট হয়েছে কথাসাহিত্যে-গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল সুবোধ ঘোষের বিষয় বদল ও চরিত্রভাবনার নতুনত্বে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে। ‘কালাগুরু’র মতো বৈর নির্যাতন, ‘মা হিংসী'- ইত্যাদি গল্পেও ভারতীয় ঐতিহ্য—বিষয়ে এবং টেকনিকে রাজনীতির অন্তঃস্রোতকে নিশ্চিত করে তোলে। ‘কালাগুরু’র বৃটিশ অফিসার টেনব্রুক, মা হিংসীঃ’র ফাঁসির আসামী গিরিধারী গোপ ইত্যাদি বিচিত্র স্বভাবের মানুষজন স্ব-কাল চকিত ভারতীয়ত্ব ও অন্তঃশীল ঔপনিবেশিক রাজনীতি ভাবনার মানব্য বিরোধী দিকগুলিকে চিহ্নিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাজন ইত্যাদি ঘটনায় সমুজ্জ্বল চল্লিশের বাকি অর্ধ দশকে সুবোধ ঘোষ লেখেন মোট চারটি উপন্যাস—তিলাঞ্জলি (১৯৪৪), শতভিষা (১৯৪৬), একটি নমস্কারে (১৯৪৭) ও গঙ্গোত্রী (১৯৪৭)।

এগুলির মধ্যে লেখক আগের ভাবনা থেকে সরে এসে গান্ধীবাদে ও সমকালীন কংগ্রেসী রাজনীতির বিশ্বাসে স্থিত হয়েছেন, গান্ধীবাদী হন মনেপ্রাণে। প্রথম পর্বের যে ভারতীয়ত্ব ও রাজনীতি ভাবনা—তা উত্তরকালে গান্ধীজির জীবনাদর্শের প্রতীকে ভিন্ন

মাত্রা পায়। কিন্তু গল্পে ভারতীয়-ভাবনাকে রাজনীতির মতাদর্শে গান্ধীজিকে নানাভাবে স্মরণ করেছেন। অর্থাৎ 'কালাগুরু'র চরিত্রনির্ভর আখ্যানের 'থিমে' লেখক গান্ধীজিকে স্বল্প প্রসঙ্গে প্রতীক প্রতিম প্রেরণাস্থল করতে ভোলেননি—যদিও পূর্ব-দীক্ষিত মার্কস ও প্রগতিচিন্তা হয় শিল্পীর আত্মায় ভিন্নস্বাদী। 'কালাগুরু'র কেন্দ্রীয় পরুষ ও লক্ষ্য গান্ধীজির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবনায় হয় কুশলী বিদেশি ধূর্ত রাজনীতির পরাকাষ্ঠা।

'কালাগুরু' গল্পের চরিত্র-ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক আখ্যান অংশ সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত। মিঃ জেরোম টি এল ট্রেনব্রুক, গল্পে সংক্ষেপে মিস্টার টেনব্রুক নামে আদ্যন্ত পরিচিত, ঔপনিবেশিক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন অতি সুদক্ষ বৃটিশ অফিসার, চরিত্রের সর্বাবয়বে সে সময়ের একজন দ্বিতীয়রহিত ব্যক্তিত্ব মহকুমার অফিসার হয়ে আসেন ছোট সহর সেখপুরায়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ঋগ্বেদ ইত্যাদি ভারতবিদ্যার নিপুণ গবেষক, নিউইয়র্কের বিখ্যাত মুখপত্রে তাঁর প্রকাশিত গবেষণায় ধন্য মিঃ টেনব্রুক একজন সমস্তরকম কাজে উদ্যোগী অতি অমায়িক পুরুষ।'পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান' কিন্তু সাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে, বিপদে-আপদে, তাদের অভাব-অভিযোগ মীমাংসা করায়, দেশীয় নানান ধর্মাচরণে, খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করায় তিনি সাধারণের মধ্যে বিস্ময়করভাবে জনপ্রিয়, সনিষ্ঠ আপনজন। তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক টায়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তার দাদুর কাছ থেকে পাওয়া। দেবনাগরি লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পারেন, হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে পারেন অনায়াসে। আগের কর্মক্ষেত্র জগদীশপুর থেকে বিদায়-বক্তৃতায় তিনি অকপটে স্বীকার করেন, ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকমভাবে চিনেছি।...ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালোবাসি। অনেকদিন আগে তিনি রাজগীরের মাঠে একটি পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পান এবং তাতে কালাগুরু পোড়ান তাঁর স্টুডিওতে সযত্নে সাজিয়ে রেখে। এর স্বপক্ষে তার যুক্তি : এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধের যাদু লুকিয়ে আছে।

একবার এক স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠে স্বতঃস্ফূর্ত বাসনায় গাড়ি থেকে নেমে নিজের উৎসাহেই ছাত্রদের খেলায় মেতে যান। ছেলেদের উৎসাহ

থাকলেও করালীবাবুর ছেলে বলাই সাহেবকে অকারণ ফাউল করে ব্যতিব্যস্ত করে। খেলার শেষে মিঃ টেনব্রুক বেছে বেছে সেই বলাইয়েরই পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করেন। মনে এতটুকু মালিন্য রাখেননি। আবার দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে মিঃ ট্রেনব্রুক প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষে থেকে পুলিশের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আদেশ দানের ভাঙ্গতে বলেন, পুলিশ জনসাধারণের ভাগ্য বিধাতা, পাব্লিক ও গণমেন্টের সব যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে।.......পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙঘন করে, তন সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গভর্ণমেন্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে। ভারতীয় জনগণের সংযোগ সঙ্গে মিঃ টেনব্রুকের দিক থেকে সখ্যতায় বিস্ময়কর ছিল। যে খেলা বলাই টেনকের সঙ্গে খেলার নিয়ম থেকে সরে গিয়ে দুর্ব্যবহার করে, সেই খেলাতে সাহেব রোজ না হোক সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিত খেলতে আসেন। স্কুলের অনাদি মাস্টার সাহেবের সঙ্গে ঝামেলায় না গিয়ে বলাই ও টেনব্রুককে একই সাইডে রেখে খেলা পরিচালনা করতেন। এইভাবে নিপুণ কুশলী সহাবস্থানে মিঃ টেনব্রুক সেখপুরার জীবনকে সহজতায় সহনশীল সুখী মনোরম করে তুলতেন। আর এরই মধ্যে একদিন সেখপুরা সহর জুড়ে ঝড়ের আবেগ ও আশঙ্কা নির্মল আকাশে মেঘ হয়ে দেখা দিল। এর স্বীকৃতি মিঃ টেনব্রুক নিজেই দরবার দিবসের অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় পূর্বাভাস দেন এই ভাষায় : আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উকি দিচ্ছে, ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথায়ও বোধ হয় এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে সেখপুরা সহরে লোকাল বোর্ডের একুশ জন সদস্যের একযোগে ইস্তফা দান, তিনদিনের হরতাল, রাজগঞ্জ কোলিয়ারির ধর্মঘটের সূচনা, জৈন ধর্মশালার আঙিনায় অনুষ্ঠিত জনসভা, একটা হাজার মানুষের শোভাযাত্রার স্বরাজ পতাকা নিয়ে সহর প্রদক্ষিণের ঘটনা,—এমন সব অভাবিত প্রসঙ্গসূত্রে। এত সত্ত্বেও অবিচল টেনব্রুক কঠিন নির্দেশ দিয়ে এসবের কোনো বিরুদ্ধ আচরণই করেননি। এমন সব তিন মাসের উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে টেনব্রুক সাধারণের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করে আলোচনার মাধ্যমে সব কিছুর নিষ্পত্তি এবং ডিসিপ্লিন রক্ষার প্রস্তাব দেন। এর পর ঘটনাগুলির নির্বিরোধ প্রশমনে টেনব্রুক নিজের নৈতিক পরীক্ষার সাফল্যে বিভোর হলেন। এরই

মধ্যে সহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারি ও পাঁচজন সরকারি প্রধানদের নিয়ে শান্তি কমিটি গড়ে তোলেন টেনব্রুক এবং তাতে ডি.এস.পি পুলিশ প্রধান রায়বাহাদুর জানকী প্রসাদকে কোনো স্থান দেননি।

এত সব ব্যবস্থার মধ্যে সেখপুরার নিথর শেষ রাতের পরিবেশে অজানা প্রভাতফেরির দলের গান বন্ধ হল না। তা সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ে। গয়ারোড় ধরে পিপুলতলায় আঠারোশো সাতান্নয় সিপাহী বিদ্রোহের কোনো এক সময়ে এক কানাইল সাহেব তোপ বসিয়ে একশো জন ছাত্রী সেপাইকে মেরে ফেলেছিল। যারা আড়ালে থেকে প্রভাতফেরি গায় এবং ভোর না হতেই লুকিয়ে পড়ে, তারা সেই সেপাইদের কথা বলে, গানটা নিছক প্রভাতফেরি নয়, টেনব্রুক গোপনে থেকে এদের গান স্বকর্ণে শোনেন। গানে আছে হিন্দুস্থানী ভাইবোনদের নতুন করে জেগে ওঠার রহস্যময় ডাক। গানের সব অর্থ বোঝা যায় না, তবু এই সর্বব্যাপী, সর্বপ্লাবী গানে প্রভাবিত কচি কিশোরদের অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে দেখে টেনকের চোয়াল রুদ্ধ উত্তেজনায় কঠিন হয়ে ওঠে। বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের নিজের লেখা যীশু ভজনার গান দিয়ে শোভাযাত্রা করলেন। বলাইকে রাখলেন তার পুরোভাগে। তাদের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন টেনব্রুক। এর উদ্দেশ্য কিশোরদের এমন লোভ ও গান দিয়ে শোভাযাত্রায় ধরে রেখে ক্লান্ত করলে আর প্রভাতফেরীতে যাবে না। কিন্তু এতেও টেনব্রুকের নিশ্চিন্তি এল না। সন্ধের পর টেনব্রুক ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার খুলে দেখেন ইতিহাসের তথ্য। সত্যিই সেখানে লেখা—সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল ডুমরিচকের ডাকবাংলা থেকে এগার মাইল দূরে পিপুল গাছের তলায় একদিন কোম্পানীর ফৌজের কামানের বেদী থেকে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। জায়গাটা বিরক্ত হয়ে পড়তে পড়তে অশান্ত অবাধ্য ফকীর মহাত্মা গান্ধীর কথা। মনে পড়ে, মূর্তি যেন ভেসে আসে চোখের সামনে। অতি কৌশলে ইতিহাসের সত্যের ওপর মিথ্যা পুরাণের প্রসঙ্গ নিজে টাইপ রাইটারে টাইপ করে আগের লেখার ওপর আঠা দিয়ে ঢাকা দিলেন সন্তর্পণে। চারপাশে তখন আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরে আসার শব্দ। টেনব্রুকের কাছে ভারতের আত্মার ছবি আসলে বলাইয়ের মুখের মত বর্ণচোরা, হিংসুক ও ভীরু। টেনব্রুককে এক

বোবা বিভীষিকা ছেয়ে ফেলে। ক্রমশ টেনব্রুকের সারা মুখে এক রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি ভেসে ওঠে। দ্রুততায় রাতেই ইস্টার্ণ রাইফেলস্ দিয়ে সহর কর্ডনের আদেশ দেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশ প্রধান ডি.এস.পি জানকীপ্রসাদকে। এই ব্যবস্থার শেষ লক্ষ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ তো কেউ জানবেই না আদালতের নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থাপনায়। ডি.এস.পি-র নির্দেশে বলাই মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া পরা এক শোভাযাত্রার বন্দী নেতা। আর সব শেষে ডি.এস.পির হঠাৎ গর্জন —'ডিসপার্স, পুলিশের দিকে তাকিয়ে থাবা তোলা অর্ডার—চার্জ।'

'কালাগুরু' গল্পে টানা কোনো কাহিনী নেই, নেই ঘটনার ঘনঘটা। গল্পের শেষ দিকে যে কিছু ঘটনা আছে, সবই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, বা নায়কও বলা যায়, সেই টেনব্রুকের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মতৎপরতার অবধারিত ফল। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বৃটিশ শাসনাধীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এক মহকুমা শাসকের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে অতি সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করার ধূর্ত মনোভঙ্গির চিত্ররূপ অঙ্কন! ব্যক্তি গল্পে মূল লক্ষ্য হওয়ায় টানা কাহিনী বর্জিত। গল্পের যে প্লট, গল্পকার সুবোধ ঘোষ তাঁর সৃষ্ট টেনব্রুক চরিত্রকেই দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে জটিল করে তোলার। প্লটের জাল বিছিয়েছেন, জটিল করেছেন ছোট সহর সেখপুরায় নবাগত মহকুমা অফিসার টেনব্রুক। আর চরিত্র যখন কোনো গল্পের বিস্তারে, বিচারে প্রধান দায়িত্ব পায়, তখন তার স্বরূপ তো পাঠকদের সামনে রাখতেই হয়।

তাই প্রথমদিকে গল্পকার টেনব্রুকের ইন্ডোলজিস্টের ভিতর-স্বভাবকে বিস্তারিত করেছেন, টেনব্রুকের ভারত প্রীতি ও ভারতের জনগণের প্রতি সখ্যতা, দরদকে অসাধারণ সহনশীলতায় আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই 'কালাগুরু' গল্পে সাধারণ গল্পের মতো কাহিনী বা আখ্যান আড়ালে চলে গেছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্বের কাঠামোর প্রকরণে। গল্পের যেখানে টেনব্রুকের বক্তৃতায় এমন কথা শুনি আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে, ... এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেয়ে ঘনিয়ে উঠছে।'—এবং এসবের পরে লেখক স্বয়ং প্রথম পুরুষের লেখককৃত

বিবৃতিধয়ে প্রকাশ্যে জানান : তবু মেঘ দেখা দিল, তখন গল্পের মধ্যে ক্রমশ নায়কের মনের স্বভাবের পাশাপাশি একটা চাপা কাহিনী-আভাস ধরা পড়ে। তা গল্পের প্লটের শক্ত বাঁধনি দিয়ে একটা আখ্যানেরও আস্বাদ দেয়। এর পরেই তো আসে টেনব্রুকের বিরুদ্ধে উস ভারতীয় প্রতিপক্ষ, সাধারণ জনগণের সমবেত প্রতিবাদী স্বভাবের রেখাচিত্র। এভাবেই গল্পের শেষ দিকে ভারতীয়দের আন্দোলনকে তীব্র করে গল্পের উপযােগী অস্বাদ্য ঘটনানির্ভর আখ্যানের রসাভাস গুরুত্ব পায়। গল্পের প্লটের জটিলতা ‘থিম’কে সামনে এনে পাঠকদের পক্ষে কাহিনী বয়নের চমৎকারিত্ব আনে। আমাদের মতে, গল্পের প্রথম দিকে আখ্যান থেকেছে নায়ক চরিত্রের আড়ালে, শেষ দিকে ঘটনা ও সমবেত জনগণ মিলে প্লটের থিমে রুদ্ধশ্বাস রহস্য ও আকর্ষণ আনে অন্তঃশীল কাহিনী-অবয়বের। গল্পের প্লট হয়েছে সচিত্র, সংযত, ‘থিম’-নিদের্শক। প্রথম দিকে টেনব্রুকের যে সাধারণের পক্ষে শোভন ও লোভন ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, গল্পের ক্রমগতিতে শেষ দিকে তা হয়েছে অন্য মেরু-ব্যক্তিত্বের বিপরীত ফলক। কাহিনীর সামান্য যেটুকু আভাস, তা চরিত্র ধরে মূল বিষয়কে করেছে বিশ্বাস্য, একান্ত-গ্রাহ্য! যে কোনো ছোটগল্পের বড় শিল্প প্রকরণ হল এর মহামুহূর্ত’ (climax) রচনার চমৎকারিত্ব। ক্লাইম্যাক্সের আকস্মিকতা ও অবধারিত effect এবং বিস্ময়রস যে কোনো ছোটগল্পের মর্যাদা বাড়ায়। ‘কালাগুরু’ গল্পের climax এসেছে টেনব্রুক চরিত্র ধরেই। ভারতীয় প্রতিবাদী জনগণ মিলে যখন কিছু ঘটনার জন্ম দিয়েছে প্রভাতফেরির গান, ধর্মঘট, মিটিং মিছিল এসবের মধ্য দিয়ে, তখন ক্লাইম্যাক্স গল্পের মূল রূপের আশ্রয় পেয়েছে ইন্ডোলজিস্ট টেনব্রুকের নিঃসঙ্গ চিন্তায়। কাহিনী তথা আখ্যান, যদি কিছু তৈরি হয়ে থাকে,—তা বহির্মুখী না হয়ে রূপ পেয়েছে চরিত্রের অন্তর্মুখিতায়, তা টেনব্রুকের খোলস ঠাকা নৈতিক দিকের নিষ্ফলত্বকেই, মিথ্যাচারকেই স্পষ্ট করে।

ইতিহাস ও কিংবদন্তী, লোককথার স্বভাব ধরে যা লেখা ছিল গেজেটিয়ারের পাতায় পিপুল গাছের তলায় মিউটিনির সময় সেপাই বন্দিদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল—এমন খবর, সেখানে টেনব্রুক একজন কৃতী ইন্ডোলজিস্ট হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েমের নিশ্চিত

স্বার্থে নতুন করে স্বকপোলকল্পিত পৌরাণিক কাহিনীর প্যারা লিখে যোগ করলেন। এখানেই ক্লাইম্যাক্স শুরু। ক্লাইম্যাক্স চিত্র এক কুশলী ইলেজিস্টের অপকীর্তি :

‘টাইপরাইটার সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটা কাগজের শ্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন, পুরনো প্যারাগ্রাফের ওপর খাপে খাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চারপাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোন ফঁক না থাকে।..... আশ্বস্ত হলেন। আর কোন ফাঁক নেই।..........

তারপর ল্যাম্পের ওপর নীলকাচের ঘেরাটোপ টেনে নিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামের সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

•••••• হঠাৎ শিউরে উঠলেন টেনব্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনব্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ ঘোলা হয়ে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।’

এমন পরপর দুটি বিপরীত অনুভব ও উপলব্ধির চিত্রই গল্পের পরিণতির ব্যঞ্জনাকে নিশ্চত করেছে। নায়ক চরিত্রই ‘কালাগুরু’ গল্পের একমাত্র মেরুদণ্ড। তার নৈতিক পতন ও কপট কৌশল এবং যাবতীয় চক্রান্ত গল্পের ‘চরমণ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক স্বভাবে গল্পের ‘থিম’কে দিয়েছে বিস্ময়কর ঘনত্ব। ছোটগল্পের প্রেক্ষিত, লক্ষ্য, ব্যঞ্জনার অভিনবত্বে সুবোধ ঘোষের ‘কালাগুরু’ গল্প সর্বভারতীয়ত্ববোধের এক উজ্জ্বল শিল্প অভিজ্ঞান।

গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের তথা থিমের দিক থেকে প্রেক্ষাপটে আছে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ও সময়ের তাৎপর্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পে। তেভাগা আন্দোলনকে পরোক্ষে রেখেছেন প্রেক্ষিতের প্রেরণার স্বভাবে। সুবোধ ঘোষও ‘কালা গুরু’ গল্পে পরোক্ষে সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপকে ও উত্তেজনাকে আড়ালে প্রেরণার। উৎস-স্বভাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৫৭ সালের ইতিহাসকে গল্পে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগে নতুন গল্পধারার স্বাদ দিয়েছেন পাঠকদের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তার গল্পেও ময়নার মায়ের ও তার জামাই জগমোহনের বিদ্রোহের কথায়, সমভাবে সেই রাজনীতির এনেছেন স্বাদ-স্বাতন্ত্র্য।

যে কোনো কারণেই হোক, মূলত ইংরেজদের পক্ষ থেকে ধর্মনাশের আশঙ্কা ও বিক্ষোভ থেকেই প্রথমে দমদমের পরে ব্যারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের। বীজের অঙ্কুর স্বভাব, উদ্ভব ও বিকাশ চিহ্নিত হয়। ব্যারাকপুরের ৩৪ নং রেজিমেন্টের অন্যতম সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে,—ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের বর্ণনায় যিনি ছিলেন। 'ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু' এবং সর্বদা আপনার ধর্মানুগত অনুশাসনের অনুবর্তী'—তিনি ঐতিহাসিক সত্যেন সেনের মতে 'যুদ্ধ ঘোষণা করেন একাই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শাসনব্যবস্থার গোপন জটিল কৌশলে ৮ এপ্রিল, ১৮৫৭-য় ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদান করেন। কিন্তু শুধু ধর্মবিষয়ক চিন্তা দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের কারণকে সঠিক যুক্তিতে মানা যাবে না। এর সঙ্গে বড় কারণ ছিল ইংরেজদের পক্ষে ভারতীয়দের সামনে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের কৌশল। সে বিষয়ে যে প্রয়াস ছিল নিখুঁত উদ্দেশ্য সামনে রেখে, তার প্রমাণ মেলে ব্যারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে লেটেন্যান্ট কর্ণেল হুইলালের খ্রিস্টধর্ম প্রচার প্রয়াসে, সেই উপলক্ষে প্রচারপত্র বিলি করার একাধিক উদ্যোগে। এই বৃটিশ কর্ণেল সে সময়ে সিপাহীদের বাংলোয় গিয়ে যীশুখ্রিস্ট-ভজনায় নানান ধরনের প্রেরণা দিতেন। এই সূত্রেই মাদ্রাজের এক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী*দের* মধ্যে যুক্তি দিতে*ন* সমগ্র ভারত যেহেতু একটি সরকারের অধীন তাই ভারতের পক্ষে একটিই যথার্থ ধর্ম তা খ্রিষ্ট ধর্মই।

এইসব তথ্যের সঙ্গে 'কালাগুরু' গল্পে *টেৈব্রুকের* তৎপরতার অন্তর্নিহিত সৌসদের বিস্ময় জাগায়। গল্পকার সুবোধ ঘোষ গাঙ্গের কেন্দ্রীয় বিষয়ে ওতপ্রোত স্বদেশীর রাজনৈতিক দ্রোহভাবনার অনুগ ইতিহাসের সত্যতার শিল্পনায়ার মিলমিশ পরেছেন। বৃটিশ বিরোধী প্রভাতফেরির রহস্যকে বুঝতে, ঠেকাতে টেন নিজে গোপন কৌশল নিয়েছেন। ঐতিহাসিক মঙ্গল পাণ্ডের ভাষা, আৱেগ ও উত্তাপের ছায়া-স্বভাবকে গন্তকর গল্পে ব্যবহার করেছেন এইভাবে : 'নয়া জমানার সূর্য উঠছে। জাগো হিন্দুস্থানী ভাই

আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর। যে প্রভাতফেরির পরোক্ষ স্বভাবে আবছা চেহারা আছে গল্পে, তার মধ্যে টেক যেন দেখলেন

'গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ স্পষ্ট ছায়ামূর্তি, চেনবার জো নেই।... কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হা উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি ধ্বনি তার অতি পরিচিত।... পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড় ওপাড়া এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে গানটা আর একবার বিজয় প্রণাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো। তারপরেই আকরিক একটা বিরাম।...অনেকক্ষণ পরে আবার গুমরে উঠলো—
একেবারে অন্যদিকে।.....চটুল ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা যেন উড়ে যাচ্ছে।'

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় চরম দমননীতির বিরুদ্ধে *কৌশলে* প্রভাতফেরির চিত্রের মধ্যে টেনব্রুক পেয়েছেন তাদের স্বাধিকার হারানোর ভয়, অসহায়তা! এসবই সেই সিপাহী বিদ্রোহ-জাত পরিবেশে ঐতিহাসিক তথ্য সূত্রে লেখকের সঠিক চিত্র অঙ্কনের দিক। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে এসবের আছে নিবিড় যোগ।

এর পরেই বিকেলে বিদ্যাপীঠের কিশোর ছেলেদের মুখে টেক নিজের লেখা খ্রিষ্ট ভজনার গান—এর ভাষা আমি যীশুর ছোট মেঘ প্রতিদিন মোর সুখ আশেষ দিয়ে এমন এক ফেরীর শোভাযাত্রা বের করার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রস্তাবও – যেখানে কিশোররা রাত দশটা পর্যন্ত ব্যস্ত থেকে ক্লান্ত হয়ে অন্য কোনো প্রভাতফেরীতে যোগ দিতে পারবেই না। এইভাবে সুপথে চলে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে। লেখক টেনব্রুক এই কৌশলের চিত্র এঁকে যেমন খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কুশলী বন্দোবস্ত করেন, তেমনি রহস্যময় স্বদেশীদের মনোবল ভাঙতে আমূল চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেন! এই নতুন শোভাযাত্রায় বলাইকে দেন পুরোভাগের *নেতৃত্ব*। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক কৌশল নিস্ফল হলে টেনব্রুক চরম দমননীতি প্রয়োগ করেন সরকারি সৈন্য দিয়ে গোটা সহর কর্ডন করে। এমন কৌশল ও নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থাপনাতেই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য পায় শিল্পের তির্যক স্বভাৰ। সুবোধ

ঘোষ বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্বের বোধে উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-দমন-শোষণ ব্যবস্থার তাৎক্ষণিক সফল প্রতিচিত্রণের পরিচয় রেখেছেন গল্পের পরিণামী 'মোটিভে'।

'কালাগুরু' গল্পের সমগ্র থিমটাই, টেনক নামের কেন্দ্রীয় চরিত্রের একক কমদক্ষতার উত্থান-পতন ধরে উপস্থাপিত। টেনব্রুকই সমগ্র গল্পের সব কিছুর আরম্ভ ও শেষ। তার তৎপরতা, কৌশল, সিদ্ধান্ত সমগ্র গল্পের প্রাণ। সেই সঙ্গে তার মধ্যে করুণ ট্র্যাজেডির বীজও অঙ্কুরিত হয়েছে। ইন্ডোলজিস্ট সার্থক গবেষক এক ব্যক্তিত্বের মিথ্যাচার, সত্যকে বিকৃত করার প্রয়াস তাকে তার সম্মান থেকে পদস্খলিত করেছে। এখানেই টেনব্রুক চরিত্রের ট্র্যাজেডির বিষাদময়তা ও নৈতিক পতন—যা তার রাজনৈতিক লক্ষ্যকে করেছে সাময়িকভাবে সফল।

অনেকটা চরিত্র প্রধান গল্পের মতো লেখক প্রথমদিকে টেনব্রুকের বিচিত্র স্বভাব নিয়ে বিবরণধর্মে লেখচিত্র এঁকেছেন। এই সেখপুরার নবাগত মহকুমার অফিসার 'পদগৌরবে মহীরুহ সমান', নিজ পদের দায়িত্বে বশংবদ থেকে সহরের হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদির উন্নতি আনেন, ধর্মীয় সাধারণ মানুষদের অনুষ্ঠানে তাদের মতোই গভীর নিষ্ঠাবান থেকে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের তিনি যেমন এক নতুন নক্ষত্র, তেমনি প্রমাণিত ইন্ডোলজিস্ট। তার বিনীত স্বীকৃতি: ...ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি।... সেই আত্মাটিকে আমি ভালোবাসি। একজন এত বড় মর্যাদার মানুষ হয়ে বিদ্যাপীঠের কিশোর ছেলেদের সঙ্গে দু-দিন অন্তর নিয়ম করে তাদের মতো খেলায় অংশ নিতে একেবারে নির্দিধ ছিলেন। সাধারণ মানুষ ও সরকারি প্রশাসনের যৌথ প্রয়াসে তিনি অকপটে সাধারণের পক্ষে সব সময় কথা বলতেন।

কিন্তু এই সব শুভঙ্কর দিকগুলি সমগ্র গল্পে টেনব্রুকের পক্ষে তাঁর 'মুখ' হয়ে থাকে , হয় 'মুখোশ'! এসবের পিছনে ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী কৌশলী ভারতীয়ত্বের মধ্যে শোষণ ও শাসনধর্মের চতুর প্রয়োগকর্তা টেনব্রুকেরই কঠিন মুখবিম্ব। গল্পের প্রথম দিকে টেনব্রুকের 'মুখোশে'র মোহে ও বিস্ময়ে সাধারণ মানুষ অভিভূত। ক্রমশ মুখোশের রং মুছে যেতে থাকে। মুখোশের একাধিক বীভৎস ভাঁজের রেখা-চিহ্নিত

মুখোশের ত্বক। এই যুগ ও মুখোশের রং-বদলানোর মধ্যে টেনব্রুকের ট্র্যাজেডির আপাত-সফলতার বকলমে করুণ বিষাদময়তা গভীর ছায়া ফেলে।

পরাধীন ভারতের গ্লানি নিয়ে একাধিক প্রতিবাদী আন্দোলন কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে কঠিন ইস্পাতের ঔজ্জ্বল্য পেতে থাকে। আসন্ন ঝড়ের আবেগ, লোকাল বোর্ডের সব সদস্যের পদত্যাগ, তিন দিনের টানা হরতাল, কোলিয়ারির ধর্মঘট, জৈন ধর্মশালার প্রাঙ্গণে জনসভা, হাজার মানুষের শহর-প্রদক্ষিণ টেনব্রুকের ট্র্যাজেডির বীজের অঙ্কুরস্বভাব স্পষ্ট করে। টেনব্রুকের তখন যাবতীয় কৌশল সাধারণ মানুষের অন্তঃশীল স্বভাবের পরিচয় পেয়েও অবিচল নীরবতা ও দমনহীন আপোসে স্পষ্ট হয়। তথাকথিত ডেমোক্রেসির সূত্রে ডিসিপ্লিন জিঈয়ে রাখার দিকে 'কম্প্রোমাইজ' মানসিকতায় নায়ক স্থির থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এত কিছুর মধ্যে গল্পের নায়ক তার নৈতিক এক্সপেরিমেন্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুশীতে 'বিভোর' হলেও অন্যদিকে 'থামছে না প্রভাতফেরীর গান।'

এবার টেনব্রুকের মুখোশ গেল সরে, ধীরে ধীরে প্রধান হল সেই মুখ যা সাধারণ মানুষের ওপর, ডি-এস-পি জানকীপ্রসাদের—টেনব্রুকের নির্দেশেই গর্জন ওঠে—''ডিসপার্স', পুলিশের প্রতি নির্দেশ—'চার্জ'। এ তো গল্পের শেষ, এর আগে টেনব্রুক যে গোপনতম শয়তানির কাজ করেছেন, তাতে তার শিক্ষিত ব্যক্তিত্বে পড়েছে কলঙ্কিত কালো ছায়া। চিরস্থায়ী, পুরনো গেজেটিয়ারের সত্য 'কিম্বদন্তী' কেটে দিয়ে যোগ করেন নিজের বানানো পুরাণ-ধর্মী ইতিহাসের কিছু কথা :—'পিপুলগাছের তলায় ... একদিন কোম্পানীর ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটেনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।'—এর ওপরে নিজের লেখা নতুন প্যারা আঠা দিয়ে ঢাকলেন :

'ডুমরিচক ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে, নদীর ধারে, পিপুল গাছের তলায় (প্রথম পৌরাণিক যুগে-খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল........এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্মে রাজ্যের সুখ ও শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়র সেবায় প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই

কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন। লেখার সময় দেশের সমকালীন বিরোধী রাজনীতির নায়ক মহাত্মা গান্ধীর কথায় তিনি নিস্থল উত্তেজনা প্রকাশ করেন ।

'এই মূর্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী।

কে এই গান্ধী? এক অশান্ত, অবাধ্য দুষ্ট ফকীর গান্ধী? কি ভেবেছে সে? এই যে গোপনতম কাজ টেনব্রুকের—তা-ই তার মুখের আসল রূপ। গোড়ায় তা মুখোশে ঢাকা ছিল।

ট্র্যাজেডির নায়কের এমন নৈতিক ধিকৃত পতন! টেনকের শেষ যাবতীয় স্বার্থসর্বস্ব সক্রিয়তা (doing) তা আপাত-সাফল্যের দিক দেখালেও ট্র্যাজেডির ভিতরের স্বভাবে ঘুনপোকার ছবি ও স্বভাব সামনে আনে। টেনব্রুকের শেষ সাফল্যের চিত্র ব্যঙ্গাত্মক (satirical)। গল্পের প্রথম দিকে টেনব্রুক এক সময়ে ইস্তাহার বিলোন এবং তার ভাষা:

'সভ্যতার চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রেসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। গল্পের শেষে টেনব্রুকের স্বভাবের ছবি–'বোবা বিভীষিকার ছটফটানি'তে। স্বদেশীদের যখন শায়েস্তা করতে সক্রিয়, তখন দমননীতির আশ্রয় নেন। ডেমোক্রেসীর এই সংকটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা।'—এটা গল্পকারের কথা। সেই মোকদ্দমায় যদি যুক্তি ওঠে, তাদের গেজেটিয়ারের মিথ্যা ভাষ্য সত্য হয়ে স্বদেশীদের প্রবঞ্চিত করবে। তা ছাড়া তার বিবরণ যে জানার উপায় নেই সেখানেও সেই দমন, শাসন ও শোষণে আইন বহির্ভূত বিদেশি অত্যাচার : 'কে ঢুকবে আদালত এলাকায়? যে ভয়ানক লাঠি আর লাল পাগড়ীর আস্ফালন!' টেনব্রুক শেষমেশ বলাই-এর পরিণতি আনেন এমন চিত্রে: বলাইয়ের 'মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া।' (১) আহত বলাইকে বন্দী করে, (২) গেজেটিয়ারের ভাষ্য বদল করে, (৩) শোভাযাত্রার ওপর লাঠিচার্জ ও ছত্রভঙ্গ করে টেনব্রুক যে সফলতার স্বপ্ন দেখে, তা প্রতীকী! এ সফলতা দম্ভীর, শোষকের দমনশক্তির আত্মসন্তুষ্টি, পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণ করে।

টেনব্রুকের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের পতন ও কর্মকুশলতা আন্তর নিষ্ফলত্ব ও করুণ ও ব্যর্থতার দিক-যৌথ তাৎপর্যে ও ব্যঞ্জনায় যা নায়কের বিষম বিষাদময়তার অণুভাবনা আনে সহৃদয় পাঠকের মনে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবলে একটা কথাই প্রমাণ হয়, টেনব্রুক একই সঙ্গে নিজের 'doing and suffering' (কৃতকর্ম ও দুর্ভোগ)দুয়ের থেরথ মানাসক ও মানবিক যুদ্ধে এক জীবন্ত ও ব্যর্থ নায়কই। অন্তত নিখুঁত ভারতীয়ত্বের দিক থেকে গল্পকার তাকেই বড় শিল্পমহিমায় এঁকেছেন ‘কালাগুরু’ গল্পে।

আমরা আগেও বলেছি, কালাগুরু' চরিত্রাত্মক গল্প। একটি বিশেষ চরিত্রের মন, ক্রিয়াকর্ম ও ব্যক্তিত্বের পরিণতি সমগ্র গল্পকে এক নিটোল শিল্পরূপ দেয়। চরিত্রাত্মক গল্পে সমস্যা আছে, সে সমস্যা অনেক সময় চরিত্র-ব্যক্তিত্বের একান্ত নিজস্ব মনোভঙ্গির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বড় করে। আবার এমনও হতে পারে লেখকের নিজস্ব কোনো বিশেষ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতেই চরিত্রকে নানা ঘটনা ও ভাবনায় অলংকৃত করে বিশেষ ঐতিহাসিক বা জাতীয় অধ্যায়কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে টীকাভাষ্যে অলংকৃত করা হয়। ‘কালাগুরু’ গল্পের চরিত্রাত্মক শিল্পরীতির অনুগ হয়েছে আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্যের অনুসরণেই। টেনকের নায়ক-বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, পরিণতির ব্যঞ্জনা গল্পকার পরিকল্পিত একটি বিশেষ সময়ের পরাধীন দেশীয় মানুষের সর্বভারতীয়ত্ব বোধের প্রতিবাদী আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই এর শিল্পীত চরিত্রাত্মকতা বা চরিত্রমুখ্যতা অপূর্বত্ব পেয়েছে প্রসারিত ইতিহাস ও শশাষক-শাোষিতের দ্বন্দ্বময় প্রতিবাদী রাজনীতির উত্তাপে, শোষিতের অসহায় অবস্থা চিত্রণে। এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাৎপর্য পেয়েছে টেনক চরিত্র ধরেই!

‘কালাগুরু’ গল্পের ‘মহামুহূর্ত’ (climax) রচনার বিষয় আমরা আগে গল্পের প্লট আলোচনায় বিস্তারিত করেছি। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ইন্ডোলজিস্ট টেনব্রুক যখন এবং যেভাবে সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ক কিংবদন্তীকে ঢেকে দেন নিজের বানানো কথা দিয়ে, সেখানেই চরিত্রের নৈতিক দিকের অবলোপ ঘটে, সেখানেই স্পষ্ট হয় চরমক্ষণ। গল্পে টেনব্রুক ভাবিত ডেমোক্রেসির সংকটের শেষ ঘটনার তথ্যাদি—‘সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা’ আদালতে শুরু হবে, শুরু হবে সাধারণকে আদালতে আদৌ ঢুকতে না দিয়ে

শোষকের নিজস্ব কৌশলে। আর তখনি পরিবর্তিত গেজেটিয়ারের প্রমাণ বিদেশি শাসকদের কাছে মূল্যবান তথ্য হবে। তাই মহামুহূর্তের গুরুত্ব এখানেই। এর পরেই গল্পে আসে উপসংহার---বলাইদের গ্রেপ্তার ও তাদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালানোর ঘটনা। তখনি ক্লাইম্যাক্সের পরিণতি হয় ঘটনাশ্রয়ী, সেই টেনকের বিশেষ চরিত্রধর্মের প্রকাশমূলক চিত্ররূপ। এই ঘটনার তীব্রতা যেমন গল্পের স্বাভাবিক নিখুত শিল্প-পরিণতি, তেমনি গভীর ব্যঞ্জনাধর্মীও।

গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের একমুখিতা রচিত হয়েছে সেই টেনব্রুক চরিত্র ধরেই! সমস্ত আখ্যান মূল চরিত্রের ভিতরের আলোয় হয়েছে আলোকিত, উজ্জ্বল। টেনব্রুক প্রধান হওয়ায় ভাবের একমুখিন স্বভাব হয়েছে মেদহীন, অনাবশ্যকতার বৈশিষ্ট্যহীন। আখ্যায়িকাও একক চরিত্রকেন্দ্রিকতায় হয়েছে সংক্ষিপ্ত, সংযত। গল্পের গতিমুখে কোন বাধা বা অন্তরায় হয়নি।

গল্পের প্রকরণে মেলে চরিত্র ধরে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতধর্ম। কোথাও সামান্য বিবরণ অংশ প্রয়োজনীয় হয়নি, বরং হয়েছে গল্পের গতি-সৃষ্টিকারী শক্তি। আর তা গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের একান্ত অভিমুখীন। গল্পকার টেনব্রুকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন টেনব্রুক ‘পদগৌরবে মহীরুহ সমান’, ‘ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নতুন নক্ষত্র। টেনকের ভাষায় ‘চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়ার মত ভারতের আত্মা। এইসব বর্ণনায় গদ্যের মধ্যে এবং চরিত্র ধরে বিশেষ এক 'positive attitude' শিল্পমান পায়। নায়ক যখন বলেন, কুড়িয়ে পাওয়া ধূপদানে কালাগুরু পুড়লে এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌন্দর্যের যাদু লুকিয়ে আছে। তখন গল্পের থিম ও চরিত্রের মনোভঙ্গি চমৎকার মিলমিশ হয়ে ওঠে।

‘কালাগুরু' গল্পের নাম, যদিও চরিত্রাত্মক গল্প, কিন্তু সোজাসুজি নায়ক চরিত্র ধরে নয়, নায়কের মনোভঙ্গির প্রতীকে শিল্পমূল্য পায়। নামটি মূল বক্তব্যের পরিপোষক।

প্রথম কথা হল, নায়ক টেনব্রুক অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে কুড়িয়ে পান একটি পাথরের ধূপদান। সেটি এক লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মের মতো। সেটি নায়ক তার স্টুডিওতে তেপায়ার ওপর রেখে তাতে কালাগুরু পুড়িয়ে আরাম বোধ করেন

সুগন্ধে। আক্ষরিক অর্থে এই ধূপদানের ধূপ নায়কের আরামের বিলাসের কারণ হওয়ায় এবং প্রত্নবিষয়ক গুরুত্ব পাওয়ায় নাম মান্য।

দ্বিতীয় কথা, নায়ক দেখেছেন এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধের জাদু। ভারততত্ত্ববিদ নায়কের এই বিশেষ প্রীতির চোখে ও অনুভবে ধূপদানটি দেখার মধ্যে ভারতপ্রীতির প্রকাশরূপ মেলে। গল্পে এর ধূপের যে গন্ধ তা বুঝিবা নায়কের কীর্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ। নামে তার ব্যঞ্জনা কিছুটা যুক্তি রাখে।

তৃতীয় কথা, 'কালাগুরু' শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরলে আর একটি তাৎপর্য উঠে আসে। 'কালাগুরু' শব্দটি এসেছে আদি 'কৃষ্ণাগুরু' অর্থাৎ 'কালো অগুরু' অর্থে। কালাগুরু একটি বৃক্ষ। তার কাঠ পুড়লে সুগন্ধ ছড়ায়। এর গুঁড়ো 'ধূপিত' বা 'ধূপবাসিত'। টেনব্রুকের ভারত প্রীতির প্রতীক এটি। সাধারণ মানুষ ও ভারতীয়দের কাছে টেনব্রুকের এই প্রীতি তাঁর প্রতি সম্ভ্রম ও বিশ্বাস জাগায়। নায়কের ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকে যথার্থতা দেয় এই কালাগুরু ধূপ ও তার আধার ধূপদান। নামে এর স্বীকৃতি অস্বীকার করা যায় না।

চতুর্থ কথা, গল্পের গভীরতম তাৎপর্যে এই ধূপদানের বুকে ধূপ যেভাবে দগ্ধ হয়, তা এক সময় বোবা বিভীষিকার ছটফটানি আনে নায়কের মনে। যে ভারত তার প্রিয় এবং রিসার্চের প্রিয়তম বিষয়, সেই ভারতবর্ষ তাঁকে অস্থিরতায়, ভয়ে, বিষাদে মূক করে দেয়। যে ধূপ জ্বলে তাকে আরাম, বিশ্বাস, কর্মক্ষমতা দিত, তা তাঁকে বিরক্ত করে। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি রক্তের উন্মাদনা দেখে অসহায় বোধ করেন। তাঁর বিশ্বাস চলে যায়, তার অন্যরূপ উঠে আসে। তার মুখ থেকে মুখোশ খুলে যায়। আসল মুখে নায়ক এক ছায়াচ্ছন্ন জরা লক্ষ করেন। শিকারির স্বভাবে তিনি নিরীহ ভারতীয়দের ওপর লাফিয়ে পড়তে চান। তখন ধূপের গন্ধ আরামের নয় আশঙ্কার, স্থৈর্যের নয় বিকৃত বীর্যের। এক্ষেত্রে নামের প্রতীকপ্রতিম প্রয়োগ নন্দিত।

১০.৩ বারবধূ

বারবণিতাদের নিয়ে গল্প লেখার মানসিকতার প্রমাণ্য বাঙালি লেখকদের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'বিচারক' গল্প দিয়ে তার প্রথম পথিকৃৎ দায়িত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার পর থেকে কে না লিখেছে এ শিল-সমৃদ্ধ পল্লি। লাল কালিকলম পত্রিকার আবির্ভাবের পর প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু এবং আরও অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল ও উত্তরকালে এই বিষয়গারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সংসার সীমান্তে, মহানগর, বিকৃত ক্ষুধার দে (প্রেমেন্দ্র মিত্র), ইতি (অচিন্ত্যকুমার), রাত্রি (নবেন্দু ঘোষ), অঙ্গার (প্রবোধ সান্যাল), আঙুরলতা (লিমল কর)

-এইসব গল্প বিশেষ বিষয় চিহ্নিত ছোটগল্পের পূর্ণ মর্যাদার অভিজ্ঞান। সুবোধ ঘোষের। 'বারবধূ' এই ধারার এক মুল্যবান সংযোজন।

সমাজে দেহজীবা রমণীদের নিয়ে গল্প লিখতে বসে প্রত্যেক জন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে স্বক্ষেত্রে ভিন্ন স্বাদদানে অনুসন্ধানী। কেউ সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন, কেউ সময়ের দ্বারস্থ হয়েছেন, কেউ মানবিক সম্পর্কের নষ্টভুমি রচনা করেছেন, কেউ নীতির মাপকাঠি নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন, কেউ বা ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের কথা মনে রেখে নারীমুক্তির, পুরুষতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নির্মমতা—এসকে উজ্জ্বল স্বভাবে দেখাতে চেয়েছেন। বস্তুত বিগত বিশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধে নারীদের দেহব্যবসার অবধারিত উৎকট দিক ও নিয়তিকে দেওয়াল লিখন ভেবে এমন টীকাভাষ্য করেছেন নবাগত একাধিক গল্পকার।

সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের অব্যবহিত পরবর্তী রচনা। সুস্থ দাম্পত্যের লাবণ্য ও মায়া, মানবতা ও পবিত্র মমত্ব থেকে সরে এসে এই বারবধুদের মনের অন্তঃশীল নষ্ট দাম্পত্যের দিকে ইঙ্গিতময় করেই এমন সব বিষয়চিহ্নিত ছোটগল্পের সমাবেশ। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে একেবারে জন্মান্তরীণ অনুভূতি। উপলব্ধির গঠন, তা অস্বীকৃত হয়, ভেঙে যায় যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে।

সত্যসন্ধী, জীবনপ্রেমী, মানবপ্রেমী লেখকদের কলমে পূর্ণ নারী হয় ভাঙা মানুষ, হয় নারীর নয় 'মেয়েমানুষের গল্প'! তাকেই লক্ষ্যে রেখে সুবোধ ঘোষ তাঁর বারবধূ গল্পের আখ্যানকে ইঙ্গিতময় করেছেন। নায়ক প্রসাদ ও দেহজীবা লতার কাহিনীর সম্পর্কচিত্র তাই রুদ্ধশ্বাস ও স্বতঃস্ফূর্ত চমৎকৃতির স্বভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

জামিদার প্রসাদ রায় তারকেশ্বরের মুড়িওয়ালীর মেয়ে পঞ্চীবিবি ওরফে ভদ্রনামের লতাকে নিয়ে বরাকর কলোনির একান্তের নিরালা বাংলো বাড়িতে এসেছে ফেলে বিলাসের ফুর্তির জীবন কাটাতে। এ সেই যেনবা উনিশ শতকীয় বাগানবাড়ির বিলাস। প্রসাদ রায়ের এমন বাংলো বাড়ির অস্থায়ী সংসার—সময় কেটেছে দেড় মাস হল। এর মধ্যেই চেঞ্জে আসা কয়েকটি ঘরমাত্র, বাঙালি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রসাদ লতার সঙ্গে। গল্পের শুরু সেইরকম দু-তিনটি পরিবারের মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, নাতি নাতনীরা মিলে এসেছে প্রসাদ রায়ের বাড়ি আড্ডা জমানোর আবদার জানিয়ে। সময়টা ওদের সন্ধের আলোয় উভয়ের ধূমপানসহ নেশার বোতল নিয়ে বৈঠক করার। প্রসাদের মান বাঁচাতে অতিথি আপ্যায়নে ভদ্রতা রক্ষায় হতে হবে সংসারী বধূ। এর আগে এমন বাইরের অতিথির সামনে বারতিনেক লতাকে অভিনয় করতে হয়েছে। অসহায় প্রসাদের বিপর্যস্ত মুখের ভাবে লতা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। দ্রুত অতিথিদের গোছানো ঘরে বসার সুযোগ করে দিয়ে লতা ঢোকে স্নানঘরে। আগন্তুকদের নিয়ে প্রসাদ প্রাথমিক কথাবার্তা বলে চলে, লতা ঢোকে একেবারে বদল ভব্য পোশাকে চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি পরে। প্রবীণদের শ্রদ্ধা জানাতে বধূবেশী লতা সসম্ভ্রমে মাথার কাপড় বেশি করে টানে। লতার সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই, আছে দু'পায়ে সরু আলতার টান।

প্রসাদের স্বস্তির মধ্যে অন্যতম এক অতিথি রণজিৎবাবুর বিধবা বোন আভার তৎপরতায় ও সহযোগিতায় লতা ও প্রসাদ দুজনেই নিখুঁত আতিথেয়তায় ওঁদের মুগ্ধ করে। রাত বাড়লে অতিথিরা বিদায় নেওয়ার পরে প্রসাদ বিয়ারের বোতল নিয়ে বসে। লতা ইতিমধ্যে প্রসাদের কথামতো তাঁতের শাড়ি ছেড়ে পাজামা পরে, আলতা সিঁদুর মুছে পায়ে চটি গলিয়ে প্রসাদের কাছে এলেও এমন রাতের সহবতে যোগ দিতে

অনিচ্ছা জানায়। সিগারেট ধরিয়ে লতা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে জানালার সামনে। বিয়ারে বিভোর প্রসাদের মধ্যে একসময় প্রতিবাদী লতার প্রশংসা করেও শ্লেষে জানায় : 'তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়।...আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিস দেব। একটু আগের লতার কথা যখন তখন অসভ্যতা করো না। এমন কথার উত্তরে প্রসাদ শাসন করে লতাকে '-- তুমি কিন্তু আমাকে এই মাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্ট—মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোমাকে জুতিয়ে.....।'.... 'যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে। তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র। ....তুমি আভার চাকরাণী হবারও যোগ্য নও।' ইত্যাদি। লতা প্রমত্ত প্রসাদের আগের সব হুংকার, সিদ্ধান্ত নেশাড়ি মানুষের মূঢ়তা হিসেবে মেনে নিলেও শেষ কথায় হঠাৎ আভার প্রসঙ্গে জ্বলে ওঠে। এর মধ্যেই লতার মনের গভীরে একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে যায়। তীব্র ক্ষুব্ধ লতা ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শোয়, সেখান থেকে জানায় কালই সে তারকেশ্বরে চলে যাবে। গভীর রাতে বন্ধ দরজার সাত প্রসাদের অবসাদের মধ্যে ভালোমানুষী ভীরুতার মিনতি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়ে লতা থেকে যাওয়ার কথাই জানায়।

প্রসাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই লতা সংসারী বধূর মতো অবাঙালি প্রতিবেশিনীর সুবেদারবাবুর বালকপুত্র বিক্রমের প্রতি সস্নেহ সম্পর্কে যুক্ত হয়। প্রসাদ দেখে লতার এমন সব আচরণের মধ্যে গর্হিত দিক, সত্যের আবরণে এক মিথ্যের দিক, আলো অন্ধকারের মধ্যে এক ফাঁক তৈরি হওয়ার সম্ভাব্যতা! ক্রমশ প্রসাদ-লতার মধ্যে মনের জটিলতায় আড়ষ্টতা দেখা দেয়। চেঞ্জার রাখালবাবুরা লতাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। লতার মনে এক জটিল অস্বস্তি ভার হতে থাকে। প্রসাদ-লতা যেখানেই যাক—যেন এমন কাজ না করে যেখানে তার প্রশংসা আরো বাড়ে—এমন সব সাবধান করেন। যদিও লতার প্রশংসায় প্রসাদের কাম্য মান বজায় থাকবে ও বাড়বে—লতার এই মত তবু প্রসাদের এদের কাছে সত্যি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় বাড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে লতা-প্রসাদের সম্পর্কে কিছু ফাঁক রচিত হয়েছে দৈনানুদৈনিক জীবনযাত্রার সূত্র ধরে। এখনকার সন্ধেগুলি প্রসাদের কাটে আভাদের বাড়ি। আভা মাস ছয়েক আগে বিধবা হয়েছে। শিক্ষিত। সে জেনেছে প্রসাদের স্ত্রী লতা অশিক্ষিত। যে কোনো

অসুখ বিসুখের কারণে—আভাদের বাড়ি যাওয়ার কথা থাকলেও—লতার যাওয়া হয়নি। আভা অবশ্য একাধিকবার প্রসাদের বাড়ি আসে। প্রভাদের বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়ে লতা প্রভার স্বামীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। প্রসাদ তার মধ্যে নিজের পাপবোধে কেঁপে ওঠে। একবার লতা ভাবে এই বোধে প্রসাদ জব্দ হোক, পরে সেই ভাবনার বিরোধী হয়। ঘরের মধ্যে সেই উগ্র বারবধূর পোশাক ছেড়ে বধূর পোশাক পরে থাকে। সিগারেট খায় না। এই নিয়ে তীব্র সংঘর্ষ হয় প্রসাদের সঙ্গে।

আভার সঙ্গে প্রসাদের সম্পর্কের গভীরতায় লতা মনের মধ্যে এক গভীর জটিল দ্বিধায় দিন কাটায়। আভার জ্বরে প্রসাদ তার ওখানেই দিন কাটায়। এর মধ্যে লতার অবস্থা বেপরোয়া স্বভাবে জটিল। লতার চিন্তার অণুক্রম:

'আভার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলে। তার এক মেকি আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয়, হোক, তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবী সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব ছাপিয়ে গেছে।.... চোরাবালির ওপর কত বড় দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও তার সংসার তার প্রমাণ।'

প্রসাদ বুঝে যায়, তার বরাকরে মানমর্যাদা রক্ষার প্রধান চাবিকাঠি লতার হাতেই। তাই লতা এখন প্রসাদের ভয়। প্রসাদ এটাও ভাবে—লতার দিক থেকে আভা সম্পর্কে কোনো নিন্দে রটনার ঘটনা না ঘটলেও সেটাই আভাকে একধরনের অপমান করার পরোক্ষ দিক! নানা কথার মধ্যে প্রসাদ একসময়ে জানায়, লতাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। প্রসাদ আর চায় না লতা তার সঙ্গে জড়িয়ে আর বেশি নাটুকে খেলা খেলুক। লতাকে চলে যেতে হবে এমন কথায় লতা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়।

পারস্পরিক প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে প্রসাদ লতাকে শেষমেশ জানায়, যে কারণে এসেছিল, তার প্রয়োজন প্রসাদের নেই। সে রুচিও নেই আর। তাই লতার ওর কাছে মিথ্যে পড়ে থেকে কোনো লাভ নেই। ছেড়ে চলে যাবার আগের রাতে লতা নানা দিক থেকে প্রসাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু তাতে তার গোপন আত্মা সায় দেয় না। প্রসাদের প্রতি এখন লতার এমন ঘৃণা যা কণ্ঠরোগীর মতো

অস্পৃশ্যতার। লতার সিদ্ধান্ত : 'বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে তার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকক চিরকাল।' লতাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে কুশলী প্রসাদ তাকে রাগাতে চাইল না। শেষ বিদায়ে প্রসাদ মোটা অঙ্কের টাকা দেয় লতাকে। বলে, লতা যেন তার ওপর কোনো রাগ পুষে রাখে। প্রসাদ তো তাকে ঠকায়নি, কোনো ক্ষতিও করেনি তার! নিশ্চুপ মাথা হেট লতার শেষ কথা শুনতে চাইলে লতা মাথার ওপর বড় করে কাপড় টেনে বলে শান্ত কণ্ঠেই: 'না তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভা ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করল।' এখানেই গল্প শেষ।

'বারবধূ' মূলত মনস্তাত্ত্বিক গল্প। নায়ক-নায়িকার জটিল মনস্তত্ত্ব ধরেই এই গল্পের আখ্যানের গতি ও বিস্তার এবং সর্বশেষ ব্যঞ্জনাময়তার সিদ্ধি ঘটেছে। তাই কাহিনী বা আখ্যান রয়েছে দুই প্রধান চরিত্রের অন্তর্গূঢ় জটিল মনস্তত্ত্বের চমৎকারিত্বে। গল্পকার প্রধানত চরিত্রের ভিতর-স্বভাব, দুই চরিত্রের বৈপরীত্য এবং সংঘাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই আখ্যানের অবয়ব তৈরি করার সূচনা ও প্রয়াস নিয়েছেন। আখ্যানের বাস্তবতা ও স্বাভাবিকত্ব মাটি পেয়েছে গল্পকারের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ধরে ছোট ছোট চিত্রের জুড়ে দেওয়ার মধ্যে। গল্পের আখ্যানে প্রথাগত বিবরণধর্ম নেই, নেই লেখকের সশরীর উপস্থিতি। চরিত্রগুলি যা কিছু বলে, তারই ব্যঞ্জনাগত তাৎপর্যে আখ্যান উঠে আসে।

গল্পের ভূমিকা-অংশে অর্থাৎ আরম্ভে ছোট মাপে আছে গল্পের নায়িকা লতা ও নায়ক প্রসাদ রায়ের পারস্পরিক মনোগত সক্রিয়তা। একদল অতিথি এসেছে বাড়িতে, তাদের ঘরে এনে বসাবার প্রস্তুতির আগে সলতে পাকানোর মতো লতা-প্রসাদের অস্থিরতা এমনভাবে দেখানো হয়েছে—যাতে দুই প্রধান ব্যক্তিত্বের সম্পর্কের উজ্জ্বল ছবি আখ্যানটিকে উজ্জ্বল করে। সংলাপ বিনিময়ের পর সিদ্ধান্তের মতো লতা যায় তোয়ালে আর শাড়ি নিয়ে স্নানের ঘরে, প্রসাদ তার বদ্ধ শ্বাস ফেলে অতিথিদের জন্য বাইরের দরজা খুলে দেয়। এই চিত্রখণ্ডে কোথাও গল্পকার বিবরণের আশ্রয় নেননি। কিন্তু বোঝা যায়, লতা একজন বারবধূ এবং তাকে নিয়ে বাইরের লোকের কাছে সম্পর্ক গোপন করতে নিজের এবং লতারও মান বাঁচাতে রীতিমতো তটস্থ। এবং কাহিনীর এই অংশেই মেলে সমগ্র গল্পের মূল চাবিকাঠি, প্রসাদ রায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি,

মানসম্মান প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাইরের লোকের কাছে একজন বারবধূর ভয়কাতর সংসর্গের আড়ালে স্বস্তি-সন্ধান।

এর পরের চিত্রখণ্ডেই আমরা দেখি চেঞ্জার রণজিতের বিধবা বোন শিক্ষিতা। আভাকে—যাকে ধরেই গল্পের শেষ পর্যন্ত এক তীব্র মানসিক ঝড় তোলপাড় করে প্রসাদ রায়-লতার মনোলোককে। কিন্তু এই চিত্রে আভা এখনো পূর্ণ বিকশিত নয় গল্পের পক্ষে।

লতার ভদ্র বধূর বেশে সকলের সামনে অভিনয় ও পরে পুরনো চেহারায় ফিরে যাওয়া মদ্যপ প্রসাদের মান বাঁচার স্বস্তিতেই একসময়ে লতাকে বকশিশ দেওয়ার কথা দেওয়া আরও, প্রসাদের সঙ্গে তার পণ্য সম্পর্কের বিকারকে লতার সাময়িকভাবে না মানা এ আভার প্রসঙ্গ হঠাৎ তুলে প্রসাদের 'আভার চাকরাণী হবারও যোগ্য নও'- এই সংলাপ গল্পের আখ্যান ক্রমশ মনস্তত্ত্বের এক জটিলতর গিট-এ পাক খেয়ে যায়।

ক্রমশ লতাকে রাখালবাবুর সস্নেহে নিমন্ত্রণ, প্রসাদ রায়ের ক্রমশ ভয় পাওয়া লতাকে লতার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মতো বন্ধু হয়ে বহুজনের মন জয় করা, প্রভাদির স্বামীর প্রণাম নেওয়া, আভার অসুস্থতা ও তার সঙ্গে প্রসাদের সম্পর্কের বাহির ধর্মে বাড়াবাড়ি প্রসাদকে যেমন লতা থেকে ব্যবধানে সরায়, তেমনি প্রসাদের মধ্যে সব কিছু জেনে গেলে কি হবে—এ বিষয়ে বিকৃত বিভীষিকা আনে। আখ্যান ক্রমশ জটিলতার চরম দুতে এগোয়, তৈরি হয়। শেষমেশ লতাকে প্রসাদের বলা—তোমার চলে যাওয়া উচিত, লতার কথা সত্যি বলছো, আমাকে যেতে হবে' —এই বিরুদ্ধ মনের দ্বন্দ্বে আখ্যানে ক্লাইম্যাক্সের চরম শীর্ষে পৌছনোর অবস্থা আসে। কাহিনীর শেষে গল্পের সিদ্ধান্ত দুটি প্রধান চরিত্রই নিজ নিজ মনোভাবনায় নির্মাণ করে। প্রতিশোধের প্রশ্নে ও উত্তরে লতা, কূটকৌশলে প্রসাদের লতাকে নিশ্চিত চলে যাওয়ার সত্যকে জানিয়ে দেওয়ার দিক বড় ব্যঞ্জনায় থমকে যায় কাহিনীর জটিল স্বভাবেই চরিত্র ধরে লতার এমন কথায় : 'আভা ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করল।'

'বারবধূ' গল্পের আখ্যান ক্রমশ ওপরের আবরণ সরাতে সরাতে মনের গভীরে প্রবেশ করে। প্রথমে ছিল গল্পে চেঞ্জারদের ভিড়, সুবেদার বাবুর ছোট ছেলে বিক্রম, মহাবীর চাকর, লালাবাবুর স্ত্রী এদের গৌণ স্বভাবে ভিড়। সব পরিত্যক্ত হতে হতে আখ্যান হয়

এক জটিল ভাবনার উদ্দীপক বিষয়। আখ্যানের সংক্ষিপ্তির মধ্যে লতা ও প্রসাদই সম্পর্কের ব্যবধানে নিঃসঙ্গ হতে হতে আখ্যান মূল 'থিমে' উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বস্তুত বারবধূ' গল্পের আখ্যান নির্যাস দেখিয়ে দেয়—গৌণ চরিত্র নয়, কোন ঘটনা নয়, মূল চরিত্রই তাদের মনের গভীর অন্ধকারে একসঙ্গে আলো-অন্ধকারের বিদ্যুৎ চমকের বিস্ময়কর।

গল্পের চরমক্ষণ' বা 'মহামুহূর্ত এসেছে লতা ও প্রসাদ—দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকেই। প্রসাদের সিদ্ধান্ত লতার কাছে : তোমার চলে যাওয়া উচিত। এর পরের নায়ক-কৃত ব্যাখ্যা : 'তুমি যে জন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচিও আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছ।'...এমন সব কথা লতার কাছে 'এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মত, নিঃসহায়ের আবেদনের মত...' ক্লাইম্যাক্স যে কঠিন এক জায়গায় নিশ্চিত 'falling action' (নাট্যতত্ত্বের ভাষার বিমর্ষ সন্ধি)-এর দিকে এগোবে তা লতার সংশয়চিত্ততার কারুণ্যে বিষাদময় এখন :

'সত্যি বলছো, আমায় যেতে হবে?'

'প্রসাদ—হাঁ। শুধু ভাবছি কার সঙ্গে যাবে!'

লতা উঠে দাঁড়ালো—প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো—তার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি একাই যাবো।.....কাল ভোরেই যাচ্ছি।

লতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।'

এর পরেই গল্পকার একটিমাত্র রাতের সংক্ষিপ্ত ও সংযত যে সর্বশেষ চিত্র এঁকেছেন, সেখানেই আছে গল্পের মোক্ষম উপসংহারের ব্যঞ্জনা। প্রাসাদের ওপর কোনো দিক থেকেই প্রতিশোধ না নিয়ে লতার একান্ত নিজস্ব শুভময় বাসনা; বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে তার এহ ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল। অন্যদিকে প্রসাদ লতাকে ছেড়ে দেওয়ার কৌশলে নিজেকে নরম করে মনের দিক থেকে। বেশি খুশি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার বিদায়ের ব্যবস্থা করে। মোটা টাকা দেয়, যেন লতার মতো এক

আহত সাপকে সামলায়: 'আমার ওপর মনে মনে রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাই নি-ক্ষতি করিনি।

অন্য মেজাজে যেনবা লতার নববোধের 'কফেশান্': 'না তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভা ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করলে।' গল্পের আখ্যান 'থিম' ধরে এমন গভীর। মনস্তাত্ত্বিক আচরণের চমৎকারিত্বে বড় শিল্পমানের কাঠামোয় নিবিড় ও ব্যঞ্জনাগর্ভ থাকে।

সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে মেলে বিষয়-বৈচিত্র্যের দু'বেণী সমন্বয় জাত এক উজ্জ্বল ব্যঞ্জনার চমৎকৃতি ১. সামন্ততান্ত্রিক স্বাধিকার বোধ ও ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া অর্থনীতির স্বার্থসর্বস্বতা একদিকে, ২. আর একদিকে লতার মতো বারবণিতাদের নিজের শ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অসহায়তা—এই দু'য়ের টানাপোড়েন ও মিলমিশে প্রসাদ-লতার কথায় গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা জীবন সম্পর্কে নতুন মাত্রা আনে। গল্পে লতার মনোলোকের লক্ষণীয় রূপান্তর ঘটেছে ক্রমান্বয়ে, আবার প্রসাদের সুবিধাভোগী মনের ক্রিয়াকাণ্ড মধ্যবিত্তের স্বভাবে লেখকের নিজস্ব জীবন ও সমাজভাবনাকে কঠিন মাটি দেয়। এই দু'য়ের যুগ্ম-বেণী-স্বভাবেই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের উজ্জ্বলতম উদ্ভাস 'বারবধূ' গল্পে। কোনো একটিকে বাদ দিয়ে যেমন লতা ও প্রসাদ রায় কাউকেই সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়, তেমনি গল্পকারের একমুখিন লক্ষ্যের আয়না স্বচ্ছতা পাবে না।

প্রসাদ রায়ের কাছে লতা পণ্য নারী মাত্র—যাকে টাকা দিয়ে ভোগের কারণে কাছে রাখে। 'তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র!' আভাকে কেন্দ্র করে যখন প্রসাদের সময় মানসিকতায় তার ব্যবধান বাড়ে, তখন প্রসাদের যে অধিকার প্রতিষ্ঠার মনোভঙ্গি সেখানেই প্রতিষ্ঠা পায় প্রসাদের লতাকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করার বাসনা । নিশ্চিত অধিকার। নারী ঘরের দামী সাজানো আসবাবপত্রের মতো। বাড়ির মালিকের কাছে তার যা প্রয়োজন, পুরনো হলে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকারের মূলেও সেই স্বার্থবোধ। প্রসাদের সংলাপ: --তুমি যে জন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচি আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছিমিছি পড়ে আছ।' নারীদেহের

ভোগে অরুচি তাে জমিদারের কাছে স্বাভাবিক! জমিদার প্রসাদ রায় লতার সম্পর্কের মধ্যে অঢেল অর্থের লাে ভকে নিশ্চিত লক্ষ্যের অস্ত্র করে। চলে যাবার জন্য অঢেল টাকা দেয়-দেহ-সম্পর্কের বাড়তি বকশিশ, আর মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের মান বাঁচানোর নৈতিকতায় আরাম, আশ্রয়, নিশ্চিন্তির জন্য খেসারত। প্রসাদের মনের যুক্তি: 'আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোন না। কোন দিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন এই ধরনের একটা শঙ্কায় ভরে উঠলো। রাগানো উচিত নয়, বরং বেশি খুশি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত। এ সেই কৌশল যেখানে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পারস্পরিক যৌথ গাে পন খেলার উপায়!

'বারবধূ' গল্পে চরিত্রের ভিড় আছে, কিন্তু যারা ভিড় জমিয়েছে তারা সকলেই গৌণ। রণজিতের বিধবা বোন আভা ঠিক চরিত্র হয়ে ওঠেনি, বরং রসায়ন বিজ্ঞানের ক্যাটালিস্টের মতো গল্পের সীমার লতার মধ্যে বদলের বীজস্বভাব স্পষ্ট করে প্রায় আড়ালেই থেকে গেছে। তাকে গল্পকার নিজের সংযত সংক্ষিপ্ত চিত্রস্বভাবী বর্ণনার বিষয় করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। চেঞ্জার গৌণ চরিত্রগুলি হয়েছে মূলগত অর্থে নায়িকা লতারই দৈনানুদৈনিক জীবন-স্বভাব ও মনোলোকের প্রেক্ষিত। এরা গল্প-আখ্যানের বিষয় বিভার উপায়মাত্র, স্থায়ী উপকরণ নয়। সামগ্রিক চরিত্রসৃষ্টিতে এখানে সুবোধ ঘোষ সার্থক এবং গল্প প্রকরণ মানায় আধুনিক।

গল্পের প্রধান চরিত্র লতা—অবশ্যই নায়িকা, প্রসাদ এখানে নায়ক। দুটি চরিত্রই সমগ্র গল্পটিতে অসামান্য গতি এনেছে। মনে রাখতে হবে একেবারে ছোট পরিসরে তহ ছোটগল্পের প্রাণ। মানব শরীরের রক্তকণিকার মতো গল্পের আখ্যান, ঘটনা, চরিত্র, লক্ষ্য, প্রেক্ষিত, সংলাপ, বাক্যবন্ধ—এসবের মধ্যে প্রত্যেকটি সেই গতি নামক রক্তকণিকার ধারক ও বাহক। ছোটগল্প হল এক সপ্রাণ মানবদেহের মতো। শরীরের গতিময়তা (dynamicity) নির্ভর করে অগণন রক্তকণিকার চলনধর্মে, তার প্রাণের প্রতিনিয়ত উত্তরণে যৌবনশক্তির প্রকাশ ঘটায়। ছোটগল্পের সর্বাবয়বে রক্তাক্ত শিরা-উপশিরার জটিলতায়, ওপরে উক্ত উপকরণগুলি সেইভাবেই গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ।

'বারবধূ' গল্পে প্রকরণগত সমস্ত দিকগুলির স্বভাব তা-ই! এই গল্পের হৃদয় হল লতা প্রসাদের যুগলমূর্তি—যা কখনো মিলনে—কখনো বিরহে, কখনো আনন্দে, কখনো বিষাদে হৃদযন্ত্রের উচ্ছ্বাস-উল্লাসের প্রকৃতি বোঝায়। আমাদের আলোচনায় প্রথমে প্রসাদ রায়ের নায়কত্বের প্রমূর্ত প্রসঙ্গে আসি। আগে ছাড়াছাড়া ভাবে বেশ কিছু চরিত্রব্যক্তিত্বের ভাবনা নায়ক প্রসাদ প্রসঙ্গে বুলেছি। প্রথমত প্রসাদ রায় সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি এবং সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের ভোগদখলের অন্যায় শক্তি—যা অর্থনীতিগত বুর্জোয়া বৈষম্যে প্রসাদের হাতে আছে—সেই সব মিলিয়ে লতা প্রসাদের কাছে বড়লোকের ভোগ্যপণ্য। কিন্তু এই ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে বাজারি লাভ-লোকসানের হিসেবই সত্য। নিরন্তর প্রেমহীন দেহসম্ভোগে এক শূন্যতা হাঁ করে থাকে। সুবোধ ঘোষ সেই অবাধ ভোগ্যা লতার কথায় চিন্তাভাবনায় এমন কিছু ভাবনা বসিয়েছেন—যেগুলি দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বভাবের মানুষের ভিতরের নিষ্ফলত্ব স্পষ্ট হয়। পরিবর্তিত লতা প্রসাদ রায় সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত কী ভাবনা পোষণ করে? পয়সা নিয়ে শারীরিক সম্ভোগের অধিকার দিয়েও তা অন্তর্হিত। লতার ভাবনায় 'লোকটা কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য', প্রসাদ হল, লতার শ্লেষে 'উঁচুদরের প্রেমে রঙীন ভদ্র রক্তবীজের পাপমুক্ত পৌরুষ', আর তাতে 'পঞ্চীবিবির ভাষায় থথ ছিটিয়ে চলে যাওয়ার' ঘৃণার প্রকাশ!

দ্বিতীয়ত, বাইরের ভদ্রলোকদের কাছে মান বাঁচানোর জন্য প্রসাদের যে অস্থিরতা , গোপন ভয় সে বিষয়ে লতাকে—যেখানে স্বার্থ ছাড়া আর কী-ই বা আছে! এক অশিক্ষিত দেহসর্বস্ব বেশ্যাকে নিজের কাছে রেখে সে কোনো সম্মানের কথা চিন্তা করে, এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক স্বভাবের পুরুষ নিজেকে মাপে, নিজেকে শুদ্ধ স্বভাবের নকল ঢেকে রাখতে চায়। তৃতীয়ত, প্রসাদ রায় নিজের শ্রেণী সম্পর্কে সচেতন কম নয়! লতায় মনে করায়—"তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র। তাই মানমর্যাদা রক্ষার কথা যেমন ভাবে পাশাপাশি সমানভাবে বাঁধা মেয়েমানুষের কাছে ভোগের জন্য ভাগও সমান পেতে চায়। তার দেহভোগের প্রসঙ্গ লতার একটি কথাতেই সুবোধ ঘোষ ব্যঞ্জনাগর্ভ করেছেন লতার সক্রিয়তা ও স্বীকৃতি দিয়ে:

'প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মত তবু যেন থেকে থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভাল করে এ-রোগের ওষুধ জানে। এখনি। প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে যদি একটু ফষ্টি করা যায়— দুটো ছড়া গেয়ে ওঠে, ঐ মেজাজের আগুন ঠাণ্ডা ছাই হয়ে উড়ে যেতে কতক্ষণ?'

এই ভাষাচিত্রের গভীরে মেলে কামকলার এক বিশেষ যৌনতার আবেদন। এটাই লতার সঙ্গে বরাকরে আসার মূল লক্ষ্য প্রসাদের। লতা সেখান থেকে যেন ক্রমশ গুটিয়ে নিতে থাকে—যদিও বোঝে ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। চতুর্থত, আভার সঙ্গে মেলামেশার, তার বাড়িতে সারাদিন কাটানোর মধ্যে প্রসাদের বিবর্তন মেলে। ব্যক্তি, ভোগী, স্বার্থপর প্রসাদ রায় বহু সামাজিক মানুষের ভিড়ে বদলে যাচ্ছে। তার দুটো সত্তার দ্বন্দ্ব—১. সামন্ততান্ত্রিক ধনী পুরুষ প্রসাদ—যে লতাকে অধিকারে ধরে রাখতে চায় টাকার জোরে, ২. বহু মানুষের মধ্যে ভদ্র প্রেমের নতুন আস্বাদে নিজেকে আপন করে দেখতে চায়। এর মাঝখানে প্রসাদের মনে লতাকে নিয়ে ভয় জমাট বাঁধে। পঞ্চমত প্রসাদের রক্ষণশীল নীতিভীরু মন তাকে মনের গভীরে আঘাত দেয় নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রভাব স্বামী শ্রদ্ধায় লতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। প্রসাদ যে প্রয়োজনে লতাকে এনেছে, সেই প্রয়োজনই তার সম্পর্কের একমাত্র সূত্র, লতা সিগারেট ছাড়ে, বাড়িতে শুদ্ধাচারে থাকে এই পরিবর্তন কাম্য নয় প্রসাদের। এক সময়ে মনে হয়—তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটুকু যেন লতা হাত করে ফেলেছে।'

গল্পের শেষে যেখানে দুজনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়েছে, সেখানেই লতা চরিত্রের বড় দায়িত্ব আদৌ অস্বীকার করার নয়। লতা চরিত্রের গুরুত্ব এখানে সর্বাধিক। লতার মোট তিনটি সত্তা তাকে বুঝিবা তিন ডাইমেশানের চরিত্র করে তা‍ালে। ১. লতা প্রতিষ্ঠিত যোগ্য স্বাধীন বারবধূ, ২. লতা তার 'বাবু' অর্থাৎ প্রভুর বাঁধা মেয়ে প্রসাদের পক্ষে পরাধীন; ৩. এই দুই ছাড়িয়ে লতার আছে এক চিরকালের নারীর উপযোগী ব্যক্তিগত মানবিক সত্তা।

লতার বারবধূ হিসেবে স্বাধীন সত্তার প্রকাশ ঘটেছে তার নিজের কথাতেই গল্পের প্রথমে প্রসাদকে কৈফিয়ত দেওয়ার মধ্যে—এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে

বাধা থাকবো কেন? থিয়েটারে খাটলে দু-দশ'শো হতো।' তুমি আভার চাকরানী হবারও যোগ্য নও।এই কথা প্রসাদের মুখে শুনে রাগে, ক্ষোভে দরজা বন্ধ করে লতা বলে: তোমার কাছে বাঁধা থাকতে আমার কোন গরজ নেই। আমি কালই ফিরে যাব তারকেশ্বরে। লতার অভিনয় মিথ্যে হয়ে যদি ভদ্রজনের কাছে ধরা পড়ে যায়, প্রসাদের দিক থেকে তার ভয়ের উত্তরে লতা বলে: 'আমার আর কি ছাই খোয়া যাবে? বনের পাখি বনে ফিরে যাবো। বাস্। লতা রাখালবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাওয়ার আগে প্রসাদের দিক থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে—এমন ভাবনায় স্বগতোক্তি করে-তাড়িয়ে দেবে? দিক তাতে ক্ষতি কি? সেই মাড়োয়ারী বেনিয়াটা এখনও আছে—তু করে ডাকলেই চলে। আসবে?' বেশ্যা হিসেবে লতা অবশ্যই স্বাধীন নির্বাচনে দক্ষ।। এ গল্পে সেই স্বাধীন লতা হয়েছে প্রসাদ রায়ের বাঁধা রক্ষিতা। সেখানে সে প্রসাদের সব রকমের ফুর্তির সহচরী হতে বাধ্য। এই পরাধীনতার অর্থ তার পেশার নিরঙ্কুশ আনুগত্য। এখানেই সে জড়িয়ে যায় প্রসাদের আভিজাত্য, মান-সম্মান, ভোগ-লালসা—সব কিছুর সঙ্গে।

প্রথমদিকে চেঞ্জারদের সামনে সম্পূর্ণ বধূর বেশে যে সাংসারিকতার অভিনয় করেছে তাতে তার অভিনয় শুধু থাকে না কোথাও বুঝি মনের নতুন দরজা খুলে দেয়। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না লতা—এটার মধ্যে ছিল 'আলম্বন' স্বভাবে, 'উদ্দীপন' বিভাব হয়ে চেঞ্জারদের ভালোবাসা। বিক্রমের প্রতি স্নেহ, ভৃত্যের প্রতি তদারকি—এসবে সেই নবজীবন উপলব্ধি পরিপুষ্ট হয়েছে। আভা ও তার সঙ্গে প্রসাদের গোপন প্রেম তাকে নানান দ্বিধাদ্বন্দ্বে সম্পূর্ণ অন্য মেয়ে করে দেয়।

এই শেষ ডাইমেনশানেই লতা আর বেশ্যা থাকতে চায়নি, মনের ও জীবনের মধ্যে এক নতুন স্বাদ, অর্থ বুঝিবা মোহের সন্ধান পায়। এখানেই প্রসাদের স্বার্থসর্বস্ব ভয়। লতা পরিপার্শ্বের সঙ্গে যা কিছু করেছে তা অভিনয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা এক স্থলিতা রমণীর কঠিন জীবনস্বভাবের বাস্তবতার নির্যাস। সেই নির্যাসের স্বাদের স্বাতন্ত্রে লতা নতুন। তাই গল্পের আখ্যান যত পরিণতির দিকে এগোয় ততই লতার যেন নিখুঁত

নিষ্ঠায় দীপ্ত মনের শুভপ্রকাশ ঘটে। নিজের মনের একান্ত নিঃসঙ্গ আয়না হল এমন একটি বাক্য :

'বহু জনের স্মরণে ও সমাদরে তার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল।'

এই উপলব্ধিতেই বুড়ো মানুষ রাখালবাবুর—পাতানো মেসোমশাই-এর আত্মার অধিতলে উপলব্ধি ঘটেছে ঠাকুর দেবতার মত শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের! মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক।' বস্তুত এই 'পাপ' তো লতার নব উপলব্ধ জীবন পুণ্যের চন্দন। সেই চন্দনের গন্ধ নিয়েই লতার বাস্তব শিল্পসম্মত চরিত্র পরিণতির চিত্র। গল্পের শেষের চিত্র এই রকমঃ

'আলোর ধাঁধানি থেকে দৃষ্টিটাকে আড়াল করার জন্যেই বোধ হয় হেঁট মুখ হয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে নিয়ে লতা বললো—'না, তুমি। ক্ষতি করবে কেন, আভা ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করল।'

এখানে লক্ষ করার বিষয় লেখক লতার হেঁটমুখ চিত্রে মাথার কাপড়কে ঘোমটার মত ঢেকে রাখার ব্যঞ্জনাচিত্র এঁকেছেন। এই বড় করে কাপড় টানার ঘোমটা কেন? ১. ভবিষ্যৎ এমন ঘোমটার জীবনে যাবার প্রত্যয়ের প্রতীক কি? ২. হয়ত প্রসাদ রায়কেই সে স্বামী মেনে নিয়ে গোপন বাসনায় থেমে গেছে?—এসব আমাদের চিত্রের ব্যঞ্জনায় অনুমান। আভা ঠাকুরঝির দিক থেকে লতার সর্বনাশ' আসলে তার কাম্যই বর্তমানে! সে বুঝি 'বারবধু' থেকে 'গৃহবধু'র জীবনার্তি মনের গভীরে পোষণ করে! পুরনো জীবন ছাড়তে চায়। ব্যবসার, অর্থ উপায়ের জীবন ত্যাগেই একজন বেশ্যার সর্বনাশ তো নিশ্চয়ই! আবার আভার প্রেম প্রসাদকে টেনে নেওয়া বিকল্প হওয়ায় যেমন প্রসাদের বিকল্প হল, তেমনি লতাও বর্তমান জীবনের বিকল্পে সুস্থ জীবনের একজন আর্ত রমণী হওয়ার যন্ত্রণায় নিমজ্জিত থাকার সুযোগ পেল। প্রসাদ রায়ের মত খদ্দেরদের কাছ থেকে অর্থ-উপায়ের পথ চলে যাওয়ার 'সর্বনাশ', অন্যদিকে লতাকে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সুযোগ আনন্দের আশ্বাস এনে দিল। তার 'বারবধূ' গল্পে সুবোধ ঘোষ নারী মন ও জীবনের পূর্ণ স্বরূপকেই একমাত্র সত্য মূল্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

'বারবধূ' অবশ্যই সমাজ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্প। গল্পটির 'মহা মুহূর্ত' (climax) রচিত হয়েছে লতা ও প্রসাদের চরিত্র ধরেই। গল্পে বাইরের ঘটনা কম, যা কিছু ঘটেছে গল্পের সমবেত মানুষজনদের ভিড় থেকে উঠে-আসা বেশ্যা লতা ও জমিদার প্রসাদ রায়ের মানসিক অভিজ্ঞতার আলো-আঁধারি জটিলতা ধরে। নায়িকা বেশ্যা লতা জমিদার প্রসাদ রায়ের ভাড়াকরা রক্ষিতা। এই লতার যে বিবর্তন—তার মূলে যেমন চেঞ্জারদের অ-সচেতন আচরণ আছে, তেমনি আছে প্রসাদ রায়ের সচেতন সংঘাত-সংঘর্ষ রক্ষিতার সঙ্গে। বাহির থেকে ক্রমশ মনের গভীরে চরিত্র ব্যক্তিত্ব আশ্রয় নিয়েছে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের রহস্যময় সম্পর্ক-টীকায়।

গল্পে লেখক এতটুকু বিষয়ের বিস্তারের বাড়াবাড়ি ঘটাননি। চেঞ্জারদের হঠাৎ আগমনে অপ্রস্তুত প্রসাদ যেভাবে বেশ্যা লতার সাহায্যে তার মান-সম্মান সাময়িকভাবে বাঁচিয়েছে, তাতে খণ্ডচিত্রগুলি নিখুঁত হয়ে ওঠে। লতা শুধু বেশ্যা নয়, একজন জাত অভিনেত্রীর মতাে আচরণ করে। যদিও কোনো অভিনয়ের এমন সুযোগ ইতিপূর্বে লতার জীবনে আসেনি। লতা-প্রসাদের সংঘর্ষের চিত্র, সংকট ও সংশয়ের উদ্ভবে চরিত্রন্যায়ই (logic of character) গল্পকারের কলমে মহৎ শিল্প হয়ে ওঠে। কাহিনী ও ঘটনা এখানে। নেই, যা আছে সম্পূর্ণত 'mental and delightful'। প্রথম দিকে লতা ও প্রসাদ দুজনেই পারপাশ্বের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, কিন্তু অদ্ভুত সংযমে ও সংহতিতে লতা প্রসাদের সম্পর্ক বাইরে থেকে দুই চরিত্রের মনের সংকট ডেকে আনে। যত সংঘাত তীব্র হয়, তত উভয়ের মধ্যে যুক্তি তির্যক হয়; তাতে সাহায্য করে আভা-প্রসাদের প্রেম সম্পর্ক ভাবনা ও লতা-প্রসাদের অনন্বয় দেখা দেওয়ার দিক। লতার নতুন জীবনবোধের জাগরণই গল্পের মূল লক্ষ্য, কিন্তু প্রসাদ রায়ের ভয় ও নিস্ফল মান-সম্মান বাঁচানোর আর্তি লতার মনের বিকাশের চমৎকার সহায়ক হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিকভাবেই মনস্তত্ত্বের অন্ধকার কাটানোর, আলোর মুখোমুখি হওয়া ও আবার নতুন অন্ধকারে ডুব দেওয়ার মানসিক খেলায় গল্পটির বিবৃতিমূলকতার দিক বর্জিত হয়। প্রকাশ-প্রকরণে গল্পকার গল্পের শুরুতেই পরবর্তী গোটা গল্পের চমৎকার পটচিত্র

অঙ্কন করেছেন বা! বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে লেখক ভাষা ব্যবহার করেছেন সংযত কথ্যভঙ্গির।

১০.৪ কাঞ্চনসংসর্গাৎ

'গোত্রান্তর', 'পরশুরামের কুঠার', এমনকি 'কালাগুরু' গল্পেও সুবোধ ঘোষ চরিত্র প্রধান আখ্যানের দিকে বিশেষ নজর দেন। 'মা হিংসীঃ' গল্পের নায়ক গিরিধারী গোপও এই বিষয়সূত্রের আর এক অভিজ্ঞান। এই নায়ক-চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পের ধারায় 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের অটলনাথ চৌধুরী আর একটি মাইলস্টোন প্রায়। কিন্তু গৌণভাবে, এবং প্রধান ভাবেও যথাক্রমে জয়ার বাবা প্রতাপবাবু এবং কান্তিকুমার ও জয়া স্বয়ং বড় তাৎপর্যপূর্ণ অংশ নিয়ে নেয়। আসলে 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের আখ্যান বেশ কিছুটা বিস্তৃত এবং কালাগুরুর নায়ক টেনব্রুকের মতো প্রত্যেকের কম-বেশি জীবনবিকাশ কেন্দ্রিক শিল্পরূপ স্পষ্ট করে। টেনব্রুক সব দিক থেকে পরিণত জীবন, মন ও রুচি, উদ্দেশ্য-এর স্বভাব নিয়েই গল্পের প্রধান মেরুদণ্ড হয়, অন্যদিকে অটলনাথ চৌধুরীর আখ্যান সদ্য-যৌবন বয়স থেকেই শুরু।

রামগড়ের জীবনধারণের শুরুতে অটলনাথের প্রতিদিনের পোশাক ছিল বাঙালির মতো ধুতি-কোটে শোভিত। মাথায় বেশ বড় মাপের পাগড়ি, বগলে তালিমারা ছাতা। কোনো এক জংলী পরগণার ডিহিতে মাসের পঁচিশ দিন কেটে যেত অটলনাথের বেশ। কিছু পয়সা কমিশনের লোভে গিরমিটিয়া কুলি রিক্রুট করার কাজে। তখন দিনযাপন হত কোন মাহাতোর বাড়ির খড়ের মাচানের ওপর শুয়ে, ছাতু খেয়ে। এইভাবেই পঁচিশটা দিন কেটে যেত। শেষে কাজের জন্যে বাড়ি আসাই বন্ধ করে দেন। অটলবাবুর অর্থ-উপার্জনের এই অবস্থায় দুটি ছোট ছোট মেয়ে জনা আর প্রীতিদের নিয়ে গোঁসাইপাড়ার চার টাকা ভাড়ার এক মেটে বাড়িতে থাকতে থাকতে মণিমালা স্বামীকে যুক্তি দেন ওই কাজ ছেড়ে দিতে। অটলবাবু বুড়ো বয়সের ভবিষ্যৎ-এর কথা বলে টাকা জমানোর যুক্তিতে স্ত্রীর কথা আদৌ শোনেন না। বছরের পর বছর মণিমালা নানারকম পরিশ্রম করে মেয়েদের বিয়ে দেন। কিন্তু মণিমালাকে এক জটিল অসুখে ধরে। মেয়েদের বিয়ের সময় অটলবাবু যদিও দু'দিন এসেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর এমন অসুখে তার পাত্তাই

পায় না রামগড়ের প্রতিবেশীরা। তিনি তখন দালালির কমিশনে প্রায় হাজার গৃহস্থকে গিরিমটিয়া করে এত ব্যস্ততার জীবনে থাকেন ঘরের ধর্ম তার কাছে একেবারে মিথ্যাই। এক প্রতিবেশী শেষমেশ অটলবাবুকে মুমূর্ষ_মণিমালার কাছে আনতে সক্ষম হলেও অটলবিহারী স্ত্রীর সুচিকিৎসার জন্য অর্থব্যয়ে প্রমাদ গুণলেন। তার গায়ের রক্ত জল-করা পুঁজি বাঁচাতে বন্ধুর ছেলে সৎ শিক্ষিত কান্তিকুমারের কাছে গভীর বিশ্বাসে তা গচ্ছিত রেখে শান্তি পান। এই কান্তিকুমারই একদিন লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

এদিকে রামগড়ে এক কানাঘুষো চলে কান্তিকুমার আর প্রতাপবাবুর একমাত্র সাতাশ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে জয়া—দুজনকে নিয়ে। জয়ার জীবনে ইতিমধ্যে কোনো পুরুষ আসেনি। প্রতাপবাবুর অবস্থা আগে ভাল ছিল, এখন কোনো রোজগারই নেই। কান্তিকুমার দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে, হাজারিমল অটোমোবাইল স্টোরে কলম পিষে যা রোজগার করে, তার বেশির ভাগ অংশই প্রতাপবাবুর নানান দাবি মেটাতে খরচ করে। কান্তিকুমার অবশ্য প্রতাপবাবুর কেউ নয়। প্রতাপবাবুর বর্তমানে সামান্য একটা কাজ মুন্সেফ আদালতের বারান্দার এক কোণে বসে দরখাস্ত লেখা। তাতে যা আসে তা-ই লাভ! কেউ কেউ প্রতাপবাবুকে মেয়ে জয়ার কান্তিকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার যুক্তি দিলে অপমান বোধ করেন। তা বলেন মেয়েকেও। স্বীকার করেন কান্তিকুমারের বড় হৃদয় আছে, টাকা চাইলেই ধার দেয়। শোধ অবশ্য একদিন দেবেন, তবে কান্তির পয়সায় মদ খেয়ে, দামী সিগারেট ব্যবহার করে, নতুন আলোয়ান কিনে গায়ে দিয়ে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আত্মসম্মানে বাধে! কান্তির সঙ্গে বাড়িতে জয়ার নিঃসঙ্গ পরিবেশে বাবার কথামতো তার বিয়ের কথা জানালে কান্তি প্রতীক্ষার কথা বলে। অটলনাথের দশহাজার টাকা ওর কাছে জমা রাখার কথা বলে। জয়া যুক্তি দেয় ওই টাকাটা নানাভাবে ব্যবহার করে কারবার করতে, নিজের ভাগ্য ফেরাতে। সে কারবার যদি—কান্তির প্রশ্নমতো উঠে যায়, জয়া তার দায়িত্বও নেয়। কিন্তু অসৎ পথের কথা না ভেবে কান্তিকুমার জয়াকে সান্ত্বনা দেয় ধৈর্য, সৎপথ, ভালোবাসার মধ্যে থেকে, তার বাবা প্রতাপবাবুর একদিন, বদলানোর আশার কথা জানিয়ে ভবিষ্যতের সম্পর্ক গড়ার প্রতিশ্রুতি।

এদিকে অটলনাথ বুড়ো বয়সের একটা শখ নতুন কারবার করার কথা বলে ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলে কান্তিকুমারকে। কথা দেন কান্তিকুমারের দেওয়া পলি যুক্তিতে কারবার দাঁড়ালে তিনি কান্তিকে আশীর্বাদ দেওয়ার মতো উপহারে খুশি করবেন। ক্রমশ প্রথম ক'মাসের মধ্যেই দালাল অটলনাথ কন্ট্রাক্টর অটলনাথ হয়ে অফিস খোলেন। তার সহায়ক এক দারোয়ান ও তার একান্ত বিশ্বাসী কান্তিকুমার। সূর্যপুরা থেকে চৌধুরীঘাট নতুন সড়ক তৈরির কন্ট্রাক্ট। মুনাফা কম করে তিরিশ হাজার টাকা নিশ্চিত। একাধিক জায়গায় যথাযথভাবে ঘুষ দিয়ে, পাওনাদারদের কাছে বর্তমান থেকেও নিজেকে লুকিয়ে রেখে, কান্তিকুমারের একাধিক ক্ষেত্রে অটলনাথ সম্পর্কে মিথ্যাভাষণে, কান্তিকুমারকে অটলনাথের প্রতিমাসে নিয়মিত পারিশ্রমিক দিয়ে অটলনাথ একদিন বিরাট, বাদশাহী মহলের মতো ‘মরকতকুঞ্জ’ নামে-সাধারণ লোকের কথায় ‘রাজাবাবুর বাড়ি’—সম্মানের মালিক হলেন। এ সময়ের কুলিরাও সেই ছাতুখোর অটলনাথকে সহজেই ভুলে গেল। এর মধ্যে কান্তিকুমারের যুক্তি-অটলনাথের যে এত সমৃদ্ধি তাতে তাকে কোনো কলষ ছোঁয় না। কারণ অটলনাথ তার কারবারের অধিকর্তা, কান্তিকুমার উপদেষ্টা মাত্র, তার যাবতীয় কূটনীতির দূতমাত্র। এই দূতিয়ালীর সম্মানটুকুই তার প্রাপ্য, তৃপ্তির কারণ, অন্য কোনো দাবি নেই--বিবেকে বাধে। জয়াকে কান্তিকুমার তার প্রশ্নের উত্তরে বলে-অটলনাথের কারবারের ভাগীদার সে নয়। তার পাপের ভাগীদারও হবে তার হাতে আইনের হাতকড়া পড়বে না। জয়া একসময়ে কান্তিকুমারকে জানায় তাকে নিয়ে কান্তিকুমার অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক। সৎ, ধৈর্যশীল, শুদ্ধাচলে স্থির কান্তিকুমারের কথা: ‘ভুল করো না, অধীর হওয়াটাই ভালোবাসার প্রমাণ নয়। প্রতীক্ষার শক্তিতেই ভালোবাসার প্রমাণ হয়।.... একটু ধৈর্য ধর জয়া।’

অটলনাথ ক্রমশ কারবারের উন্নতিতে এক হাজার কুলি কেরাণি ও কারিগরের অন্নের আশ্রয় হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে দশটা জয়েন্ট স্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্টের শিরোপা পান অটলনাথ। এক হাজার লোকের জনসভায় নির্ভীক জনহিতৈষী অটলনাথ নির্দ্বিধ হয়ে বক্তৃতা করেন--বাণিজ্যে বসতে মুক্তি! বক্তৃতা লেখা, নানান যুক্তি ইত্যাদিতে

কান্তিকুমার অটলনাথের সেক্রেটারি, তার ওপর কর্তার ওপরে মাস্টারি করার জন্য কান্তিকুমার পায় আরও মাসিক বিশ টাকা দক্ষিণা। অটলনাথ মদের দোকানেরও এজেন্সি নিতে উৎসুক হন। একসময়ে কান্তিকুমারকে বলেন—চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, নোটিশ, রিপোর্ট—সব জায়গায় শুধু অটলনাথ নয়, নামের আগে বসাতে হবে 'বাণিজ্যবীর' কথাটা। একসময়ে আদেশটা অনুরোধের ভাণে বলেন, ওঁর জীবনীটা যেন এবার লিখতে শুরু করে কান্তিকুমার।

এদিকে জয়ার জ্বর, প্রতাপবাবুকে আর সাহায্য দিয়ে পারছে না কান্তিকুমার। কান্তিকুমার জয়াকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার অধৈর্যকে শান্ত হবার সান্ত্বনা জানিয়ে। এখন টাকা কোথায়? তাই রাত জেগে অটলনাথের জীবনী লিখে চলে কান্তির মতো এক নির্লজ্জের কলমে আনন্দিত মোসাহেবীতে। এ ছাড়া যে কান্তির আর কোনো উপায় । অটলনাথ যুক্তি দেয় মেয়েস্কুলের বক্তৃতায় যেন এমন কথা থাকে: পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের গতি নেই। সে অভিভাবক বাপই হোক, বা স্বামীই হোক, বা...বা যেই হোক।' ক্রমশ কান্তিকুমার লেখায় উত্তেজিত হয়ে কৌশলে 'দেহতত্ত্বে'র আভাস দেয় বাক্যে। পড়ে শোনায় অটলনাথকে—তার নির্দেশমতো। মদের নেশার মধ্যে অটলনাথ একসময় প্রতাপের কথা তোলেন। নানান প্রসঙ্গের মধ্যে জানান-প্রতাপের মেয়ে বয়স্কা, তার এখনো বিয়ে দেবার সাধ্য নেই প্রতাপের। তাকে রাঁচির গালা স্টোরের মুন্সিকে বিদায় করে, ওই জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। প্রতাপের সংসারের অনেক ধার-দেনা উনি শোধ করে দিয়েছেন। প্রতাপ রাঁচি গেলে মেয়েটা আপাতত ওঁর কাছেই থাকবে। শেষমেশ যেন আসল খবর জানান অটলনাথ কান্তিকুমারকে:

'প্রতাপ প্রথমে একটু চালাকি চেলেছিল। বলে কিনা—তার মেয়েকে বিয়ে কর, আমি নাকি সাক্ষাৎ শিব। আমি বললাম—তা হয় না। অন্নদাতা হিসেবে তার মেয়েকে রাখতে পারি, বিয়ে করতে পারি না।'

ইতিমধ্যে আগেই জয়াদের সংসারে তার বাবার কথামতো ও হিসেবমতো সব ধার শোধ করে দেওয়ার কথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে 'আহত জানোয়ারের মত আচমকা হিংস্র

মূর্তি ধরে, একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে' এতক্ষণ অটলনাথের কথা শুনছিল কান্তিকুমার, সব শুনে চলে যাচ্ছিল ও, এতক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে সব কানে এলে অটলনাথের শেষ কথা:

'..আর একটা কথা আছে মাস্টার।.... বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয় মাস্টার। আর ভালো লাগে না। ওটা বদলে

দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্য ঋষি।

'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের আখ্যানের এখানেই শেষ।

'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট আখ্যান আছে যা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধরেই নির্মিত এবং গল্পের ছকের জটিলতা সৃষ্টির অনুপন্থী। কেন্দ্রীয় চরিত্র অটলনাথ বসু চৌধুরী। এই চরিত্রের অর্থনৈতিক চরম ও পরম উচ্চাশার জীবনই আখ্যানকে বর্ণবহুল করেছে। আর অটলনাথের প্রয়োজনেই এসেছে তিনটি গৌণ প্রসঙ্গ ১. কান্তিকুমার, ২. প্রতাপবাবু, ৩. জয়া। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র উপকাহিনীর স্বভাবের দিকে ঝুঁকতে পারত, কিন্তু তা হয়নি, এবং তার যে প্রয়োজন নেই গল্পকারও বুঝেছিলেন। কান্তিকুমার অটলনাথের এক বন্ধু-পুত্র, সে অটলনাথের সেক্রেটারি এবং অটলনাথের সঙ্গে গোপন সম্পর্কে 'মাস্টারমশাই'—যাবতীয় যুক্তি ও ক্রিয়াকর্মের একমাত্র উপদেষ্টা। এর আর কোনো পরিচয় গল্পে নেই। প্রতাপবাবু জয়ার বাবা, তার অর্থনৈতিক অবস্থার পরনির্ভর (dependent) জীবন এবং তার মালিন্যই কান্তিকুমার ও অটলনাথের সত্রে দেখানো গল্পকারের একমাত্র শিল্প-উদ্দেশ্য। তৃতীয়, সাতাশ বছরের অবিবাহিতা জয়ার সঙ্গে তার বাবা ও কান্তিকুমারের যথাক্রমে পিতৃস্নেহ এবং প্রেম সম্পর্কের জটিলতার দিয়ে অটলনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার চরম ও পরম দিকের প্রতিচিত্রণ আখ্যানে অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রতাপসহ ও জয়াকে নিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সম্পর্ক টুকু ছাড়া , কোন উপকথা গল্পের আখ্যানে নিষ্প্রয়োজন।

এই তিন ব্যক্তিত্বের রূপাবয়বে উপকাহিনীর (sub-plot) বৈশিষ্ট্য নেই।
অটলনাথের প্রসঙ্গে গঙ্গার তার একেবারে গোড়ার কথা থেকে শুরু করেছেন। তাঁর

কুলি রিক্রুট করা, স্ত্রী মণিমালার মৃত্যু, নিজস্ব সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অর্থ ও তার বাড়ি পাওনার বাসনায় কান্তিকুমারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, দালাল থেকে অটলনাথের 'বাণিজ্যবীর' হয়ে শেষে বাণিজ্য 'ঋষি' হয়ে ওঠার সময় বাসনার চিত্রে জীবননির্ভর আখ্যানধর্ম যথাযথ চিত্রিত। আবার পরিণত বয়সে জয়াকে স্ত্রী নয় রক্ষিতার মর্যাদায় ঘরে স্থান দেওয়ার লালসায় আখ্যান হয়েছে স্বাভাবিক এবং জটিল। অটলনাথের জীবনে ঘটনা আছে, কিন্তু মোটা দাগে নয়, চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম বিকাশে ও সৃজনে ঘটনার সংক্ষিপ্ত ও সংযম শিল্পগুণ সমন্বিত ছোটগল্পের প্রকরণ মাপে।

অন্যদিকে কান্তিকুমারের সততা, শিক্ষা ও সব ব্যাপারেই দ্বিধা, প্রতাপবাবুর বিলাসের নিষ্কর্মা কান্তি-নির্ভরতা, জয়ার প্রেম তথা জীবনবাসনা—সবই অটলনাথের জীবনবাসনা ও অসীম অর্থলালসা, ভোগবাসনা ও খ্যাতির প্রতি অপরিমেয় আকর্ষণকে অভিনব করে তুলেছে। তাই 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের আখ্যানের প্রবাহ ও জটিলতা গল্পের পরিকাঠামোকে একাধিক গ্রন্থিতে দৃশ্যময় করে তুলেছে। গল্পের যে পরিকল্পনা তা অনেকটাই জীবনী স্বভাবের ভিতকে দেখায়, অথচ সে জীবনী অটলনাথ চাইলেও কান্তিকুমারের আর লেখা হল না। সে তার সারাজীবনেরই ব্যর্থতার, নৈরাশ্যের হতাশা নিয়ে অটলনাথের কাছ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

গল্পের প্রকরণগত প্লটে ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ মহামুহূর্ত এসেছে দু'ভাবে ১. কান্তিকুমারকে নির্ভর করে অটলনাথের 'বাণিজ্যবীর' থেকে 'ঋষি' হয়ে ওঠার পথে। ২. জয়াকে অটলনাথের নারীভোগে রক্ষিতার মর্যাদা দিয়ে কাছে রাখার নিশ্চিতি ও নিশ্চিন্তির সূক্ষ্ম কৌশলে। এমন দুটি ক্লাইম্যাক্স এ আখ্যানে সহায়তা করেছে—প্রধানত কান্তিকুমার ও দ্বিতীয়, প্রতাপবাবু—অটলনাথের নিজস্ব বাসনার ক্রমানুসারে। গিরমিটিয়া কুলি রিক্রুটের দালাল অটলনাথ ক্রমশ 'বাণিজ্যবীর' থেকে শেষে হন স্বঘোষিত 'বাণিজ্য ঋষি'। অটলনাথ নিখুঁত অঙ্ক কষে 'গোরক্ষ সমিতি থেকে শুরু করে আদি ভারত প্রত্নমালা পর্যন্ত, সর্বঘটে তিনি বিরাজ করেছেন—কোথাও সদস্যরূপে, কোথাও সচিবরূপে এবং কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্ট ও পেট্রনরূপে। গত পয়লা বৈশাখেও সুরাপান নিবারণী

সভার বার্ষিক বিবরণ তিনিই পড়েছেন, সভাপতি রূপে। শেষে বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকার প্রফিট-এর জন্য নেন মদের ভাটির ঠিকে। এমন প্রতিষ্ঠার গৌরবের শেষ চিত্রেই মেলে অটলনাথের জীবনাকাঙক্ষার climax :

'...কান্তিকুমার... দরজার দিকে পা চালিয়ে চললো, অটলনাথ ডাক দিলেন আবার—আর একটা কথা আছে মাস্টার।

কান্তিকুমার দাঁড়ালো। অটলনাথ বললেন--বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয় মাস্টার। আর ভালো লাগে না। ওটা বদলে দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে--বাণিজ্য ঋষি।'

অটলনাথের উদগ্র ন্যায়-অন্যায় বা ে ধশন্য উচ্চাশার কতী ব্যক্তিজীবনের এটাই গল্পের অন্যতম ক্লাইম্যাক্স। গল্পের শেষ এই চিত্রেই!

দ্বিতীয় ক্লাইম্যাক্স এসেছে গল্পের উল্লিখিত চিত্রের আগেই ধীরে ধীরে।

'প্রতাপ তো রাঁচি চললো। কথা হচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা কোথায় থাকবে? আপাততঃ আমার এখানেই থাকবে। কি বল মাস্টার?.... আহত জানোয়ারের মত আচমকা হিংস্র মূর্তি ধরে, একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার।....

অটলনাথ বললেন—উঠো না মাস্টার, কথা আছে।.... প্রতাপ প্রথমে একটু চালাকি চেলেছিল, বলে কিনা তার মেয়েকে বিয়ে কর। আমি নাকি সক্ষাৎ শিব। আমি বললাম—তা হয় না। অন্নদাতা হিসেবে তার মেয়েকে রাখতে পারি, বিয়ে করতে পারি না'।

এই চিত্রেই সমগ্র গল্পের দ্বিতীয় মহামুহূর্ত। প্রথম ক্লাইম্যাক্স থেকে এই দ্বিতীয় চিত্রেই আখ্যানের ক্লাইম্যাক্সের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। প্রথম ক্লাইম্যাক্সে মেলে শুধু অটলনাথের একান্ত উচ্চাশাময় ব্যক্তিজীবন, দ্বিতীয় ক্লাইম্যাক্সে ধরা পড়ে সত্যিকারের এক জটিল গল্পের অন্ধকার নিয়তির জীবন। দ্বিতীয় ক্লাইম্যাক্সের গুরুত্ব বেশি কারণ অর্থের বিপুলতম কৌলীন্যে নারীভোগ, রক্ষিতার উত্তাপই তো একমাত্র কাম্য হবে! সাতাশ বছরের এক যুবতী বুদ্ধিমতী নারী জয়ার মতো রক্ষিতা রেখে তবেই তো কাঞ্চনসংসর্গের অফুরন্ত রূপের পর কেন্দ্রীয় চরিত্রের শান্তি! ছোটগল্পের জটিল 'থিম'-

এর বিচারে, আমাদের মনে হয়, গল্পের আখ্যানে অটলনাথের উচ্চাশার সাফল্য চাপা পড়ে যায় দ্বিতীয় ক্লাইম্যাক্সের নারী-সংসর্গের উজ্জ্বলতম শিল্পগুরুত্বে ও অভিনবত্বে। এখানেও কান্তিকুমারের পাশে অটলনাথের অনায়াস জিৎ, গল্পের নিখুঁত পরিকল্পনাগত বিদ্যুৎছটা, নিবিড় ব্যঞ্জনা।

'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য দুটি ধারার মিলিত রূপেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদা দালাল, অমানবিক, অশিক্ষিত, কৌশলী অটলনাথের অর্থকৌলীন্যে যে ক্রমশ দেশীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে ধীরে ধীরে উচ্চস্থানে আসীন হওয়া—তা দেশীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে জীবন্তচিত্রের বর্ণবাহার দেখায়। একেবারেই নকল-শিক্ষিত অটলনাথ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হন কান্তিকুমারের ওপর। কান্তিকুমার অটলনাথের একমাত্র বিশ্বাসী, শিক্ষিত, নিরীহ সেক্রেটারি, মূল পরামর্শদাতা, সেই সঙ্গে বাইরের জগৎ থেকে আড়াল করা অটলনাথকে শিক্ষিত করার মাস্টারও। এই অর্থে শিক্ষাহীন নকল 'বাণিজ্যবীর' হন 'বাণিজ্য ঋষি'। এই যে পরিণতি—তা আধুনিক নেতা, ধনপতিদের জীবন ধারণ যাপনের সঙ্গে ওতপ্রোত! সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত গভীরভাবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যে অটলনাথকে এঁকেছেন।

কিন্তু তাতেই গল্পের শেষ টানেননি। হাতে অফুরন্ত অর্থ থাকলে অর্থ উপায় বাণিজ্যিক লেনদেনের মতোই নারীকে পণ্য করা যায়। মদের মত্ততায় নারীকে তো সম্পত্তির মতো দখল করা যায়। অর্থ তা-ই শেখায়। অর্থের উদ্বৃত্তের মতো নারীও ভোগ্যপণ্যের উদ্বৃত্ত উপহার! গল্পের শেষে জয়া হয়েছে সেই জমি দখলের মতো দখল বিষয়। এখানেই কেন্দ্রীয় বক্তব্যে যুক্ত হয়েছে আরও এক বড় মাত্রা। টাকা দিয়ে অটলনাথ কিনেছেন জয়ার বাবা প্রতাপবাবুকে। আবার জয়ার মতো ভালোবাসার বেদনার প্রতীক জয়াকেও। যাকে অটলনাথ তার জীবনী লেখার জন্য একেবারে নিজের পছন্দমতো নির্দেশ ও আদেশ দেন সেই কান্তিকুমারকেও ত্যাগে নিস্পৃহ ও নির্দ্বিধ থাকেন।

'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের চারটি মুখ্য-গৌণ মিলিয়ে যথার্থ শিল্প-উপযোগী বাস্তব চবিত্র। অটলনাথ কেন্দ্রীয় চরিত্র, কান্তিকুমার অবশ্যই অটলনাথের একান্ত ছায়ার মতো সহযোগী চরিত্র। আবার গৌণ স্বভাবে ও অধিকারে কিন্তু বড় দায়িত্বে বিশিষ্ট জয়া ও

কার সূত্রে পিতা প্রতাপবাবুর সক্রিয়তার বিশিষ্টতাও গল্পকারের চরিত্রসৃজনের মৌলিকতা প্রমাণ করে। ‘কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পটি অবশ্যই চরিত্র প্রধান রচনা। সামাজিক সমস্যা, প্রেম মনস্তত্ত্ব—এসবও গল্পের বিষয়ে নিবিড়। আমরা আগেই গল্পের দুটি climax-এর দিক দেখিয়েছি। এই দুই ‘মহামুহূর্ত’ পাশাপাশি থেকে চরিত্রের প্রকাশমূলকতায় চমৎকারিত্ব এনেছে। তা শিল্পের চমৎকারিত্ব। দুটি ক্লাইম্যাক্সের যোজক স্বভাবে বড় দায়িত্ব কান্তিকুমারেরই! কোনো বিশেষ ঘটনাশ্রয়িতা নয়, ভাবের পরিবাহক দিকও নয়, গল্পে চরিত্রই যথোচিত তীব্রতা ও গভীরতা এনেছে।

অটলনাথ বসু চৌধুরীর 'দালাল' থেকে 'কারবারী’ হয়ে বাণিজ্যবীর’ থেকে ‘বাণিজ্যঋষি’ হওয়ার যে চাপা আখ্যান অংশ গতি পেয়েছে, তাতে অনাবশ্যক বিস্তৃতি নেই। আটলনাথের যে জীবনকথা গল্পের সামগ্রিক অবয়বে মেলে, তা গল্পেরই প্রসঙ্গ-সম্পদ। অবশ্য বক্তব্যের একমুখিতা একা অটলনাথ, অটলনাথ-কান্তিকুমার, প্রতাপবাবু-জয়া কান্তিকুমার--এদের এক একটি প্রসঙ্গ ধরে গতিপ্রাণ (dynamic) হয়েছে। গল্পের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বিবরণ থাকলেও তা মনোরম। অথবা, 'ফসিল' গল্পে দেখেছি সুবোধ ঘোষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পের কল্পিত ‘মহারাজের ভাবনায় বর্ণনায় শ্লেষাত্মক পরিবেশ রচনা করেছেন। প্রকরণরীতির এই অভিনবত্ব গল্পকারের নিজস্ব। সেই রীতি ‘কাঞ্চনসংসর্গাৎ’ গল্পে আদ্যন্ত থাকায় গল্পে বর্ণনায় কোথাও বিবৃতিমূলকতার দিক ধরা পড়েনি। সেখানে রয়েছে পরোক্ষে ইঙ্গিতধর্ম। গল্পকার অটলনাথের শিক্ষার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক শিল্পকুশলতায় ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের—কত লাখ টাকা বই লিখে মুনাফা করেছেন, তার প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুগ থেকে একাধিক শরনিক্ষেপ করেছেন সুবোধ ঘোষ মূল বক্তব্যের প্রতিষ্ঠায়। শর হল ব্যঙ্গের, শ্লেষের। হঠাৎ ধনীদের রক্ষিতা রাখার মনোভঙ্গি—আজও সমাজে প্রচলিত কখনো পরোক্ষে কখনো প্রত্যক্ষে, এই দিক জয়া প্রসঙ্গে থাকায় গল্পের স্কিমে অটলনাথের শেষ ‘ডিসিশান্’ আধুনিকোত্তম। অর্থের বিপুলতা দেখা দিলেই মদ্য ও ব্যাপক অর্থে পণ্য নারীর প্রয়োজন হয়। অর্থ ভোগ আনে, বিলাস আনে। গল্পের এই বিষয়ের চিত্রে লেখকের ছবি আঁকার সংযম ও যোগ্যতা গভীর বিস্ময় জাগায়। গল্পের

ভাষায় আদ্যন্ত আছে তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গ। কান্তিকুমারের কথায়, অটলনাথের স্বঘোষিত 'বাণিজ্যবীর' থেকে 'বাণিজ্য ঋষি' বনে যাওয়ার মধ্যে তার বীজাভাস ও বীজের উন্মেষ! বিষয়বস্তু ও ভাষা ছায়া কায়ার স্বভাবে গল্পের সামগ্রিক রমণীয়তা আনে।

পাচ 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পের নামে সংস্কৃত শব্দ ধরে বিষয় বোঝানোর প্রয়াস আছে। 'কাঞ্চন' অর্থে 'সুবর্ণ', 'সোনা। কাঞ্চনের আর একটি অর্থ ধন। 'কাঞ্চনসংসর্গ' এমন একটি শব্দ মেলে 'হিতোপদেশে'র কথারম্ভে।

অর্থের বিপুলতা, ধনের গৌরব, সোনার মতো সম্পদের জৌলুস ব্যবসায়ী মানষের কাছে বুঝিবা সোনার হরিণের মায়া আনে। সোনার হরিণকে নিজের কুক্ষিগত করা সম্ভব নয়, কিন্তু অর্থসম্পদের বৈভব, প্রাচুর্য, তার জীবনভর সান্নিধ্য একটা মানুষকে উন্মাদ করতে পারে, করতে পারে মোহময়, বিলাসী। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অটলনাথ সেই তো সম্পদের, অর্থের সান্নিধ্যে যেভাবে মানবতাবোধহীন ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়, তা সমাজের পক্ষে অভিশাপ। অটলনাথ বুদ্ধিমান ভদ্র কান্তিকুমারকে নিজের করেছে, অশিক্ষিত হয়েও সমাজে শিক্ষিতের অভিমান ও মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। তার জীবনে ভোগের প্রয়োজনে সুন্দরী রমণীও একান্ত কাম্য হয়। এসবের মধ্যে নিজের প্রচারকে কখনোই ক্ষান্ত করেন না। এমন মানুষ সভ্য সমাজে পণ অভিশাপ। অটলনাথ তারই যোগ্য প্রতিনিধি। স্বার্থসর্ব, ভণ্ড শিক্ষিত, অর্থলোলুপ শেষে পণ্যনারী ভেবে জয়াকে জীবনে নিয়ে আসে। তার এই মানসিকতা এক অর্থে তাকেই ব্যঙ্গ কলে। লজ্জাহীনতা তো মানবিক সভ্যতার এক গভীর সংকট। অটলনাথের অর্থের জন্য যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ, শিক্ষিত মানুষকে নিজের তৈরি যন্ত্রের মতো ব্যবহার করার বাস থাকায় গল্পের নাম ব্যঞ্জনা পায় চরিত্র ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নেই। নামের শিল্প রূপ তাই মান্য। অটলনাথ, প্রতাপবাবু, কান্তিকুমার, জয়া সকলেই কাঞ্চনচক্রে ভাগ্যতাড়িত ঘূর্ণায়মান অস্তিত্ব। কাঞ্চনসংসর্গ তাদের প্রত্যেকের স্বভাৰমত নিষ্ঠুরতম নিয়তি।

১০.৫ মা হিংসীঃ

সুবোধ ঘোষের 'মা হিংসীঃ' গল্পটিতে বিষয়গত বিস্তার বেশি নেই। একটিমাত্র চরিত্রের ফাঁসির মৃত্যুবরণের আগে তার কৃতকর্ম, ফাঁসির প্রত্যক্ষ ঘটনার আগে মানসিক নানান টানাপোড়েনের দিক, তার অবোধ ভাবনা, তার ফাঁসি হবে না এই বিশ্বাসে স্থির থাকা এবং শেষে তার অন্তিম বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া—এসবই বর্তমান গল্পের একমুখিন দিক চিহ্নিত হয়েছে। একজন ফাঁসির আসামী গিরধারী গোপ। তার মৃত্যুদণ্ড দানের পর থেকে স্ত্রীর জন্য যে আর্তি, মানসিক নানান জটিলতা গভীর কোনো মনস্তত্ত্বকে সামনে আনে না পাঠকদের, বরং তার নিয়তিই যেন পাহাড়ের মতো কঠিন, দুর্ভেদ্য হয়ে দেখা দেয়। এ গল্পের আখ্যান একচরিত্রকেন্দ্রিক। বিবাহিত গিরধারীর অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি ও তাকে খুন করার ঘটনাই গিরধারীর জীবন-নিয়তির নিশ্চিত নির্দেশ।

গল্পের শুরু কোর্টের বিচার-প্রসঙ্গে দায়রা জজের অন্তিম রায়দানের আগে গিরধারীর জীবনের নিষ্ঠুর ঘটনার দিক বিস্তারিত করার মধ্য দিয়ে। আসামী গিরধারী গোপ প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী স্ত্রী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এটা সে ইঙ্গিত এবং স্পষ্টভাষায় নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়ে শনিচরীকে তার প্রণয় প্রস্তাব জানায়। শনিচরী তাতে রাজি হয়নি। গিরধারীর ধারণা হয়েছিল তার বিবাহিত স্ত্রী রাধিয়া কাছে থাকায় তার। বাসনা সফল হবে না। কোর্টে গিরধারীর স্বীকৃতি—রাধিয়ার চরিত্রে তার সন্দেহ জাগে, কারণ, তার স্ত্রী তাকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। তাই তাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এর উত্তরে জেরায় রাধিয়ার কোর্টে স্বীকৃতি—আসামী তাকে কখনো মারধোর করেনি। কোর্টের মতে এই দুটি উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে শেষ পর্যন্ত রাধিয়া অত্যাচার অসহ্য হলে তার বাপের বাড়ি যায়।

যাই হোক, এদিকে অক্টোবর মাসের ভোরে কুয়াশার মধ্যে শনিচরী গ্রামের ইদারায় জল আনতে বেরুলে পথের ধারের আখের ক্ষেতের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাতের ধারালো হেঁসো দিয়ে তিন পোচ দেয়। সেখানেই শনিচরী চিৎকার করে প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়। এই কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক সাক্ষী ছিল গ্রামের তিন চাষী। গিরধারী পালিয়ে ফেরার হলে পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোর্টে আসামী

তিনবার তার অপরাধ স্বীকার করে। আবার তিনবার অস্বীকারও করে। কোর্টের শেষ সিদ্ধান্ত গিরধারীর প্রতিহিংসাবশতই এমন নির্মম খুনের ঘটনা। আদালতের এক্ষেত্রে চরম শাস্তি হল প্রাণদণ্ড।

এই দণ্ডাদেশে পচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের রোগা চেহারার আসামী জজের দিক থেকে এই শাস্তির বয়ান ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে, গিরধারীর বিদ্রুপাত্মক উক্তি—'বহুৎ আচ্ছা।' গিরধারীকে বিচারক্ষেত্র থেকে জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ লরি প্রস্তুত। কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, আগে-পিছে দু'দিকে প্রহরী, দু'পাশে তিন তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিশ বেষ্টিত হয়ে গিরধারী সেই গাড়িতে ওঠে। বাইরে কাউকে যেন খোঁজে দেখা পায়নি। ভগীরথ পাণ্ডে যখন গাড়ির মধ্যে বসে গিরধারীকে রাম নাম করতে বলে, তখন আসামীর তাচ্ছিল্যভরা সহাস্য উক্তি: '...জেনে রাখুন আমি ফাঁসি যাব না। একসময় হাবিলদারকে ঠাট্টার ছলে সাহস দিয়ে বলে, সে এখন মরবে না, হাজত পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় পৌঁছে যাবে। সচেতনভাবে একথাও জানায়: 'কিছু আমি চাইব না, কিছু দরকার নেই। আমি সব পেয়ে গেছি। বড় খুশী লাগছে সিপাহিজী'। সঙ্গে থাকা পুলিশদের নিজেদের মধ্যেকার ফাঁসির আগের কষ্ট-যন্ত্রণা বিষয়ে আলোচনার কথা কানে এলে গিরধারীর সেই এক কথা: 'যত খুশী আপশোষ করুন আপনারা। কিন্তু আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না। সে সত্যি খুন করার মত ভুলের কাজটা করেছে কিনা অর্জুন সিং জানতে চাইলে, তার উত্তরে গিরধারীর কথা—তার ভুল হয়েছে ধরা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় খুন করা! প্রাণদণ্ডে তার কোন দুঃখ নেই। রাধিয়ার চরিত্র খারাপ এই কোর্টে বলা কথার সত্যতা জানতে চাইলে আসামী—তা তাদের স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার বলে এড়িয়ে যায়। হাজতে ঢোকার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝেই গিরধারীর স্ত্রী রাধিয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

পাঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া পাথর আর কংক্রিটের তৈরি ঘরে গিরধারীর স্থান হাজতে। হাজতে গিরধারী ইচ্ছেমতো গান করে। মাঝে মাঝে ফাঁসিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। খাবার নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। যত সময় এগিয়ে আসে তত নানা আবদার জানায় জেলের রক্ষী পাঁড়েজির কাছে। একসময়ে রাধিয়া দেখা করতে এলে গিরধারী

অফিসঘরের পাশে আসে। কান্নাক্লান্ত রাধিয়া গিরধারীকে জানায় সে গিরধারীর জন্যে সামান্য গুড়ের হালুয়া আর পেঁড়া পাতায় মুড়ে এনেছিল স্বামীকে খাওয়াতে, তা আনতে দেয়নি, ফটকের শান্ত্রীর কাছে তা জমা রাখতে হয়েছে। এই রাধিয়াকে দেখেই গিরধারী মৃত্যুর আগে দেখা ছোট ছেলের মত কেঁদে ওঠে, চিৎকার করে। তার কণ্ঠে নতুন কথা-বাঁচার জন্য তীব্র আর্তি, প্রার্থনা।

গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে গিরধারীর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাধিয়া জড়ানো কম্বল সরিয়ে স্বামীকে দেখল। এক সময় গলা নামিয়ে স্বামীকে সে বাঁচাতে পারল না বলে অসহায়তার জন্য মাপ চাইল, তার পরেই বীভৎস চেহারা দেখে গভীরতম শোকে চিৎকার করে বলে—এর চেয়ে আমার বিষের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল রে! জলের কলসী ভেঙে খই ছড়িয়ে চলে যাবার সময় রাধিয়াকে ওয়ার্ডারেরা ঘিরে ধরে, যেতে দেয় না, আটকে দেয়। পুলিশের হাতে তাকে দিতে প্রস্তুত। রাধিয়ার কি দেৰি-জানতে চাই ওয়ার্ডার জানায়, তার উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে বিষ খাইয়ে খুন করা।

রাধিয়ার কান্নাকুল চিৎকারে স্বীকারোক্তি দিয়ে গল্প শেষ: 'তাতে তোদের কি ? মুখপোড়া।' আমার স্বামীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম রে মুখপোড়া'।

'মা হিংসী' গল্পের টানা কোনো ঘটনাসমৃদ্ধ আখ্যান নেই। ছোট ছোট আখ্যানচিত্র একে জুড়ে দিয়ে একটি প্লটের জটিলতা সৃষ্টির দিক—যা 'কাঞ্চনসংসর্গাহ' গল্পে মেলে তা-ও নেই। প্লট প্রধান হয়েছে গিরধারী গোপ চরিত্রমূল ধরেই। আখ্যানের জট ও চমৎকারিত্ব শিল্পের লাবণ্য পেয়েছে গিরধারী ও তার স্ত্রী রাধিয়ার গভীর মনোলোক ধরেই! বড় ঘটনা দুটি—প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী স্ত্রী শনিচরীর খুন, দুই, কেন্দ্রীয় চরিত্র গিরধারীর ফাঁসি। সহদেব-শনিচরীদের নিয়ে কোনো আখ্যানও সামান্য রূপেও নেই, কিন্তু তা একটা ঘটনামাত্র—যা গল্পটির বিস্তারের মূলে উদ্দীপন বিভারে কাজ করেছে। কিন্তু এমন একটি ঘটনা গিরধারীর জীবনবাসনাকে আসন্ন ফাঁসিজনিত মৃত্যুর পাশে তীব্র অথচ অসহায় নিয়তির মতো ভয়ঙ্কর করেছে। আখ্যানের প্রথমে মেলে বিবরণ—যা গিরধারীর বর্তমান জীবনস্বভাবের নির্দেশক এবং পরিণতির চুম্বক গল্পের প্লটে তাই দুটি চরিত্র মূল লক্ষ্যে সত্য-গিরধারী ও রাধিয়া। গল্পের ঘটনার

সংক্ষিপ্ত ও সংযম পূর্ণতা পেয়েছে আসামী ও রাধিয়ার মনোলোক উদঘাটনে। এই দুই চরিত্রে দ্বিবেণী স্বভাবের অন্তিমে রাধিয়া শেষ সূত্রটি ধরায় যা সমগ্র গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা- ‘শেষ হয়ে না হইল শেষ!’ মৃত্যুতে গিরধারী শেষ হল, কিন্তু রাধিয়ার আচরণের অন্তর্গূঢ় স্বভাবের ব্যাখ্যা তো পাঠকদের আন্তর স্বভাবের সীমা পায় না। তাই ‘মা হিংসীঃ’ গল্পের প্লটের জটিলতা চরিত্রের মনস্তত্ত্বে এবং এক নারী চরিত্রের সারল্য-শোধিত স্বামী-প্রেমের সহনীয়তায়! গল্পের প্লট গল্পটির মূল্যবান অলংকারের মত উজ্জ্বল। তার পরিকাঠামোর জটিলতা চরিত্রের আলো-অন্ধকারে রহস্যময়, সেখানে আখ্যানের টানা কথা, তার বিস্তার ও সংখ্যাগণনা নিস্থল হয়ে ওঠে।

‘মা হিংসীঃ গল্পে ক্লাইম্যাক্স’ অর্থাৎ ‘মহামুহূর্ত’ চিহ্নিত হয়েছে জেলে বন্দী গিরধারী ও দর্শনার্থী স্ত্রী রাধিয়ার মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের নিঃসঙ্গ স্বভাবের মধ্যে। গল্পে প্রথম থেকে বেশ কিছু অংশ পর্যন্ত আমরা গিরধারীকে পাই, সেখানে রাধিয়ার সশরীর উপস্থিতি নেই। শুধু পুলিশ লরি ও হাজতের প্রহরীদের মধ্যে কথোপকথনেই রাধিয়ার প্রাসঙ্গিকতা মেলে। রাধিয়া ও গিরধারীর প্রথম সাক্ষাতেই ‘চরমক্ষণে’র সূত্র স্পষ্ট হয়। সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়ায় গিরধারীর মন ও স্বভাবের বদলেই সেই ক্লাইম্যাক্সের তীব্রতা, সুষম ও ঔজ্জ্বল্যঃ

“গিরধারী তাকিয়েছিল অদ্ভুতভাবে, একটা মৃত মানুষের মূর্তির মধ্যে চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়ার নিজের হাতে তৈরি মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌঁছল না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কটকটু করে বাজছে, জীবনকাঠি ভাঙছে। ভয়ার্ত ছোট ছেলের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো গিরধারী।-বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!’

এর পর থেকেই যে আসামীর নিশ্চিত পতনের বেদনা তীব্রতম হয়—যা এই চিত্রের আগে আসামীর অবুঝ ব্যক্তিত্ব ধরে আদৌ ছিল না! ‘সেদিন সমস্ত জেলের কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনলো ফাঁসির আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চীৎকার আর কান্নার শব্দ।

বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন সেলের ভেতর আর্তনাদ করছে।' এই চিত্রই ধরায় প্লটে ক্লাইম্যাক্স থেকে গগের পরবর্তী শেষ পরিণাম—উপসংহার এগিয়ে আসছে দ্রুত। ছোটগল্পে যে শেষ থাকে—তার দায়িত্ব বর্তায় রাধিয়ার ক্রিয়াকর্মেই। আগে গিরধারী কোর্টে বলেছিল রাধিয়া তাকে বিষ খাইয়ে মারতে চায়। শেষে তাই তো সত্যি! কিন্তু এখানে যে বিষমেশানো খাদ্য দিয়ে মারতে চায় রাধিয়া তা তো বীভৎস মৃত্যু থেকে মধুর মৃত্যুর উপায়! তার তাৎপর্য স্ত্রী চরিত্রের গভীর জীবনমুখী মানবতার তাৎপর্যে শিল্পের চমৎকৃতি আনে। গল্পের পরিণামী শিল্পব্যঞ্জনায় অসীম স্বভাব সৃজনে রাধিয়ার অকপট সরল তৎপরতা বড় জীবনের ও চরিত্রের প্রতিমা মূর্তি আঁকে।

'মা হিংসীঃ' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য দেশের ফাঁসির প্রচলন ও তাকে মান্য করার মধ্যে যে বিচার-ব্যবস্থার অমানবিক সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য তাকে সূক্ষ্ম সহানুভূতির মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া! ফাঁসির লক্ষ্য গিরধারী, তার দোষ' (fault), ভ্রান্তি' (error) অন্যের স্ত্রীর প্রতি সরল আকর্ষণ নয়, তাকে সেই সূত্রে প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় নির্মমভাবে খুন করার মনোভঙ্গি। কিন্তু যে খুন করল, তার মানসিক রূপের মধ্যে সেই 'মোটিভ' কতটা ফঁসির শাস্তির যোগ্য, তাই মানবিকতা ধরে বিচার প্রয়োজন। দায়রা জজ যখন গিরধারীর সামনে ফাঁসির দণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন, তখন গিরধারী তার অর্থই বোঝে না! দায়রা জজ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেও গিরধারী আপন বিশ্বাসে স্থির থাকে।

গিরধারী হত্যা করেছে শনিচরীকে, কোর্ট হত্যা করে গিরধারীকে। গিরধারীর অন্য নারীর প্রতি আসক্তির তীব্রতায় আছে আদিম মানবিক উদ্দামতা, ঈর্ষা, অন্যদিকে গিরধারীর প্রাণ নিয়ে নেওয়ার মধ্যে আছে অ-মানবিক শাসনযন্ত্রের কৃত্রিম সাধারণ নিয়মের নিষ্ফলত্ব। গল্পে গিরধারী পুলিশ-লরিতে ওঠার সময় কাউকে খোঁজে। সে সঠিক অনুমানে তার স্ত্রী রাধিয়াই। গল্পের ক্লাইম্যাক্স অংশে আমরা প্রথম দেখি রাধিয়াকে স্বামীর মুখোমুখি। তাতে গিরধারীর সেই মানবিক কান্না তো এক আসামীর মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়, ক্ষোভ নয়, জীবনকে বরণ করার ভালোবাসার এক চরম-পরম আর্তি। স্ত্রীর প্রতি তার বিশ্বাস ভালোবাসা তাকে অন্য মানুষ করে। শনিচরীকে সে খুন করেছে,

সমাজ-ন্যায়ের দিক থেকে ভুল ভাবনায়। কিন্তু স্ত্রীকেও সে চেয়েছে সমাজনীতির ঊর্ধ্বে জীবনবাসনার বড় শ্বাস ও আশ্বাসে।

স্ত্রী রাধিয়া তো তাকে তার অন্যায়ের জন্য ত্যাগ করেনি! আসামীর স্ত্রী হিসেবে কোর্টে জেরার উত্তরে সে বলেছে: 'আসামী তাকে কখনো মারধর করেনি। এটা মিথ্যে হলেও কোর্ট কথাটা বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে না এই কথার পিছনে তার অকপট স্বামী প্রীতি এই মানবতাতেই রাধিয়া জেলে আনে বিষাক্ত হালুয়া—নিজের হাতে তা তৈরি করে। জানে মৃত্যু তার স্বামীর অবধারিত, তবু মৃত্যু এত বীভৎস হোক, কষ্টদায়ক হোক—সেই অ-মানবিকতা থেকে বাঁচাতেই তো এই কৌশলের কথা ভেবেছে। এখানেই সেই সামাজিক স্বামী-স্ত্রীর এক মনোজীবনের মধ্যে জ্বলে থাকা আলো! যে মনের আলোয় আকাঙক্ষায় গিরধারী শনিচরীর সান্নিধ্য চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাকে খুন করে, সেই মনের আলোয় সে রাধিয়ার সান্নিধ্যে আকুল কেঁদে জীবনভিক্ষা চায়। কোর্টে তার স্ত্রীর নামে কুৎসিত অপবাদ দিয়েও তাকে বাড়ি-ছাড়া করে একসময়ে। অর্থাৎ ফাঁসির নিয়মে। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের থেকেও বড় মন, মনের জীবনবাসনা বড় হয়েও ওঠে। 'মা হিংসী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য তা-ই দেশের বিচার-ব্যবস্থার সব শেষের বিচারও যে ঠিক নয়, জীবন বিরোধী, নৃশংস, ভয়াল, বীভৎস, নিষ্ঠুর, জীবনগতির থেকে মুখ ফেরানো! গিরধারিয়া-রাধিয়ার যৌথ জীবনের ওপর বিষাদঘন কালো ছায়ার সম্পাত শনিচরীদের মতো অসহায় নারীর মৃত্যুর, খুনের থেকেও আর এক জীবনাতীতের মাত্রা আনে। হত্যায় হত্যা, খুনে খুন জীবনের বিচারে কখনোই একমাত্র হতে পারে না, সমাজ তা থেকে শিক্ষা ও সংশোধনে নেমে যাবে, না এগিয়ে যাবে—প্রশ্ন থেকেই যায়। 'মা হিংসী' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য জীবনগতির সূক্ষ্ম সুস্থতার সন্ধান দেয়।

'মা হিংসী' গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র গিরধারী গোপ আদৌ অস্থিত ব্যক্তিত্ব নয়, তার মধ্যে সামাজিক স্থিত মন স্পষ্ট। সমগ্র গল্পে চরিত্রটির দুটি প্রধান রূপ: ১. স্বাভাবিক রূপ মোহ এবং তার অতৃপ্তিতে যে কোনো মেরুতে যেতে উৎসাহী, সক্ষম। ২. তার। মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর তার ক্রমশ জীবনমোহের অতিশায়িতার দিক। প্রতিবেশী

সহদেব গোপের স্ত্রী তরুণী শনিচরীর প্রতি নিজে বিবাহিত ও রাধিয়ার মতো স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও অ-সামাজিক আকর্ষণ তাকে চরম ব্যবস্থা নিতে স্বভাবের গভীরে প্রণোদিত করে। সে শনিচরীর প্রতি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে তাকে নির্মমভাবে খুন করে। এটা তার মনের এক দিক, আর একদিকে সে সারল্যে, অ-বুদ্ধিতে তার ফাঁসিতে মৃত্যু হবে না—এই বিশ্বাসে— হাজতে কঠিন বিশ্বাসে স্থির থাকে।

আবার জেলের মধ্যেই তার মৃত্যুদণ্ডদানের পর পরিবর্তিত অবস্থায় স্বরূপের দুটি ভাগ স্পষ্ট হয়। একদিকে তার বিশ্বাস—সে কোনোদিন ফাঁসিতে যাবে না— 'আমি জানি আমার ফাঁসি হবে না'—এমন ঘোষণায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করার পৌরুষ। বিপরীতে জেলে রাধিয়াকে দেখার পর রাধিয়া যখন কাঁদতে কাঁদতে লোহার গরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঝেতে জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম করে, সে দৃশ্য দেখে ভয়ার্ত কান্নায় কেঁদে ওঠা ও বাঁচার তীব্র বাসনার প্রকাশচিত্র। যে গিরধারী কঠিন বিশ্বাসে নির্বিকার ছিল মৃত্যুভাবনার ব্যাপারে, সে স্ত্রীর সামনে এমন ভেঙে পড়ে—যার মধ্যে তার মনের অন্য ছবি সামনে আসে।

তার স্ত্রী রাধিয়াই তার এমন চরিত্র বদলের মূল শক্তি। রাধিয়ার মানবিক কান্না, আবেগ, আত্মীয়তা গিরধারীর এক নতুন অবয়ব সামনে আনে। গিরধারীর যে এক সামাজিক মন আছে, তার প্রমাণ মেলে, সে পুলিশ লরিতে আসার সময় রক্ষীদের নানা সশর উত্তরে কোনোমতেই তাদের স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের কোর্টে মিথ্যা ভাষণের দিকগুলি শোনায় না। তা তাদের স্বামী-স্ত্রীরই প্রসঙ্গ। গিরধারী শনিচরীকে খুন করায় কোনো অনুতাপ জানায় নি, বরং সে যে খুন করার কাজটা আড়ালে করতে পারত, তা হলে এমন জেলে থাকার, ধরা পড়ার ব্যাপার ঘটত না, এতেই তার আফসোস ।

গল্পে প্রধানত গিরধারীরই বিষাদঘন ট্র্যাজেডির কালো ছায়া নেমে আসে কার্যকারণ পরম্পরায়। যত ফাঁসির সময় এগিয়ে আসে, তা টের পায় না অবোধ সরল গিরধারী। তার প্রাণশক্তি তার নিজস্ব। সে জেলে রক্ষীদের শেষ কথাগুলির মধ্যেই শান্তি থেঙ্গে। জেলরের ঘুম ভালো হয়েছে কিনা, শরীর ভালো আছে কিনা, খাওয়া-দাওয়া নির্বিঘ্নে করেছে কিনা—এসবের উত্তর একেবারে সুস্থ মনে দেয়। কোনো ক্ষোভ বা অভাব নেই

সে বিষয়ে। গিরধারীর গান শোনার বাসনা জাগে জেলের মেয়েদের হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাওয়ার শব্দ শুনে। জেলে শান্ত্রী পাঁড়েজীর কাছে তুলসী শুনতে চায়। একসময়: ‘সীতারাম! সীতারাম!’ নিশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করলে গিরধারী।

এমন যে গিরধারী, তার সর্বশেষ কথা ও নির্মোহ নিশ্চিন্তি তা কিন্তু মৃত্যুভাবনায় নয়। সে অবোধ, বুঝতেই পারছে না সামনে তার কি ভয়ঙ্কর সেই শেষ দিন! তার মৃত্যুর আগের কোনো কোনো চিত্র পাঠকদের চোখে জল আনতেই পারে:

‘গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবন-যন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাল রেখে কোটি কোটি মানুষের মত ঘুমোতে থাকে গিরধারী। দু-মিনিট পরেই জেগে ওঠে। শান্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—খুব ভালো ঘুম হ’লো সিপাহী জী! আঃ!’ একজন প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসন্ন বীভৎস মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষ এত নিশ্চিন্ত হতে পারে কি করে! এখানেই লেখকের আঁকা গিরধারীর নতুন বৈশিষ্ট্য। গিরধারীর ট্র্যাজেডি তার একান্তভাবে নিজেরই সৃষ্টি। তার রূপমোহ তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। আর তাতে একমাত্র সহায় হয়েছে সামাজিক দণ্ডবিধির কঠিন অনুশাসন। তার রূপমোহ ও অবোধ সারল্য একই সঙ্গে চরিত্রের ট্র্যাজেডি ঘটার রন্ধ্র পথ (tragic flaw)। গভীরতর অর্থে প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় নিয়তি-চিহ্নিত গিরধারী কৃত্রিম সমাজের কঠিনতম অনুশাসন-আনুগত্যের সূত্রে সাধারণ আইনের নিষ্ফলত্বের বড় মাপের মানবিকতা বিনাশের অভিজ্ঞান।

গল্পে রাধিয়ার প্রসঙ্গ মেলে পরোক্ষে গল্পের প্রসঙ্গ ধরে কয়েকবারই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ মেলে গল্পের ক্লাইম্যাক্স অংশে এবং গল্পের শেষ উজ্জ্বল উপসংহারে।

গল্পের নাম ‘মা হিংসীঃ’। সংস্কৃত অর্থবোধক শব্দযুগ্মে গল্পটির এমন নাম ‘মা হিংসী’।

শব্দের আভিধানিক অর্থ বধ, প্রাণবধ, প্রাণীপীড়া, ঈর্ষা, মারণ, প্রাণহারক, স্বভাবের দিক থেকে শাপদের মতো। এই সমস্ত অর্থ ধরে একটি অর্থ ‘অন্যকে হত্যা’ তাৎপর্যগত অর্থ দ্যোতিত করে। আলোচ্য গল্পে গিরধারীর এক হিংসাসলভ কর্মকাণ্ডের পরিচয় আছে। সহদেব গোপের সুন্দরী তরুণী স্ত্রী শনিচরীকে গিরধারী মোহবদ্ধ হয় হত্যা করে। এর

মধ্যে ঈর্ষা আছে, আছে অসূয়া ধর্ম। তাকে না পেয়ে, তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গিরধারী হত্যা করে। এই ঘটনা ধরেই গিরধারী গল্পের নায়ক হয়, এই মূল সূত্রে নামের সঙ্গে গিরধারী যুক্ত হয়। নামের কিছু তাৎপর্য এতে মেলে।

দ্বিতীয় যে ব্যাখ্যা, তা গল্পের লেখকের attitude ধরে সমর্থন পায় গল্পনামে। একটা খুনের বদলে গিরধারীর হয় মৃত্যুদণ্ড। এটাও এক অর্থে হত্যা। সমাজনীতি রক্ষার জন্য গিরধারী বীভৎস মৃত্যুর মুখে পড়ে। তার মোহ সামাজিক দিক থেকে অবৈধ সমাজনীতির হানিমূলক হতেই পারে, কিন্তু তা কি তার মৃত্যুবরণেই সংশোধিত হবে? গিরধারী অবোধ, অশিক্ষিত, শক্তিশালী। কিন্তু তার যে চাওয়া তা তো মুক্তমনের। তা শোধরানো যায়, সমাজ সেই শিক্ষাবৃত্তির অনুগ বিশ্বাস লালন করে। কিন্তু তার জন্য অপরাধীর মৃত্যু কাম্য হয় না হওয়া উচিত নয়। গিরধারী নিশ্চয়ই খুন করে বড় অন্যায় করেছে। কিন্তু তার শাস্তি এমন বীভৎসতায় ঘটলে মানবতাকেই অস্বীকার করতে হয়। মৃত্যুদণ্ড মানেই পরিকল্পিত হত্যা। জেলজীবন ও তার মৃত্যু-আদেশ তারই পোষক। এটা কাম্য কিনা সভ্য সমাজকে ভাবতে হবে। এই বক্তব্যই গল্পকারের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। তাই 'মা হিংসীঃ' অর্থাৎ 'হত্যা করো না' এই নির্দেশের মানবিক ব্যঞ্জনায়, সর্বজনীন শুভ বাসনায় গল্পনাম সার্থক।

তৃতীয়, একজন শিল্পী জীবনকেই শিল্পের একমাত্র এবং বড় উপকরণ মনে করেন, তাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চান। আলোচ্য গল্পে সেই আবেদন আছে সকরুণ অকাতর স্বভাবে, শিল্পীর সমগ্র জীবন দেখার পরম ও চরম মাধুর্যে। তাই এমন নাম গল্পকারের জীবনাগ্রহই, জীবনদর্শনই।

১০.৬ অনুশীলনী

১। 'গরল অমিয় ভেল' কতদূর জটিল মনুষ্যত্বের গল্প হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

২। বিশেষ ব্যক্তি নামে চিহ্নিত বহু মানুষের পরিচয় মিলে 'গরল অমীয় ভেল' গল্পে তারা কেউই গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠেনি হয়ে উঠেছে প্লটের আনুষাঙ্গিক ঘতনা। আলোচনা করো

৩। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু নায়িকার চরিত্র ধরেই রক্ষিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

৪। 'কালাগুরু' গল্পের চরিত্র ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রিক কিন্তু আখ্যান অংশ সংক্ষিপ্ত - আলোচনা করো।

৫। 'কালাগুরু' গল্পের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

৬। 'কালাগুরু' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

৭। 'বারবধূ' কি প্রকার গল্প আলোচনা করো।

৮। বারবধু গল্পের লতা চরিত্রটি সম্পর্কে লেখ।

৯। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট আখ্যান আছে যা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধরে নির্মিত - আলোচনা করো

১০। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে কান্তি কুমারের চরিত্র আলোচনা করো।

১১। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা লেখ।

১২। 'মা হিংসি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।

১৩। 'মা হিংসি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

১৪। 'মা হিংসি' একটি চরিত্র প্রধান এবং সামাজিক সমস্যা ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প - ব্যাখ্যা করো।

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। ছোটগল্পের বিষয় আশয়, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প - সুমিতা চক্রবর্তী

২। বড় বিস্ময় জাগে -উত্তম ঘোষ

৩। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প - জগদীশ ভট্টাচার্য

৪। কালের পুত্তলিকা - বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর – অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

একক ১১ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

বিন্যাস ক্রম

১১.১ সাধারণ আলোচনা

১১.২ নরেন্দ্রনাথ ও ছোটগল্প

১১.৩ নরেন মিত্রের গল্পে নারী চরিত্র

১১.৪ নরেন মিত্র ও বাস্তববাদ

১১.৫ কয়েকটি গল্প বিচারে সমসাময়িকতা

১১.৬ নতুনধারা

১১.৭ মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার

১১.৮ অনুশীলনী

১১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ সাধারণ আলোচনা

বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তিনি একে সমৃদ্ধি এবং পূর্ণতাও দান করেছেন। কিন্তু ছোটগল্প সেখানেই থেমে থাকেনি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার সাহিত্যের এই কনিষ্ঠতম শাখাটি নূতন নূতন লেখকের হাতে ক্রমাগতই জীবনের নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কারে এগিয়ে চলেছে। এই লেখকেরা জীবনের বহু অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত কিংবা অনালোকিত অংশের উপর আলো ফেলে তাকে নিরীক্ষণ করতে উৎসাহী হয়েছেন, জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করে এনেছেন।

সেই বহুল উপকরণ নিয়ে নানাধরনের কাহিনি পরিবেশ চরিত্র গড়ে উঠেছে, যার পরিচয় এর আগে বাংলা কথাসাহিত্যে আর এমন স্পষ্ট করে পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের চেষ্টা ব্যাপক ও গভীর।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্বে কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিক চেতনা, এককথায় সমগ্র জীবন সম্পর্কে এক সংশয়পীড়িত মূল্যবোধ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রভাবনা থেকে স্বাতন্ত্রের দাবি নিয়ে এই সময়ের যে গল্পকাররা আসরে নেমেছিলেন, যুদ্ধোত্তর কালের প্রচ্ছন্ন সংশয়, নৈরাশ্য, হতাশা ও ব্যর্থতাকে পুঁজি করেই তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তবে এই পর্বের অধিকাংশ লেখক শুধুমাত্র এই গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ থাকেননি। নানাভাবে তারা ছোটগল্পের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন, গল্পে এনেছেন সজীব প্রবহমানতা। ছোটগল্পের এই বিবর্তনের পথ ধরেই আমরা এসে যাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দোরগৈড়ায়। সেই আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল, যুদ্ধ-সমকাল ও যুদ্ধ পরবর্তীকাল ভারতবাসীর জীবনে চিন্তায় সাহিত্যে সংস্কৃতিতে যে বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তাতে এই সময়ের সর্ববিধ সাহিত্য কর্মে নূতন মাত্রা সংযাোজিত হয়েছে। বিশেষত জীবন বাস্তবতার সর্বাধিক ভূমিসংলগ্ন রূপ কথাসাহিত্যে এই পরিবর্তনের প্রভাব হয়েছে সর্বব্যাপী।এযাবৎ পরিচিত ছোটগল্পের ধারাও তাই অনিবার্যভাবে নূতন মোড় নিয়েছে।

সমালোচকের ভাবনায় দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর সমাজ ও দেশের চেহারা যখন ভিতরে বাইরে আমূল বদলে যেতে লাগল, তখনি বোধহয় ছোটগল্পের জাত বদল হল, নতুন গল্পলেখকরা এলেন নতুন কলম হাতে নিয়ে। বাংলা ছোটগল্পের এই জাত বদলে যাঁরা সক্রিয় অংশ নিলেন, তাদের অন্যতম প্রধান হলেন কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অব্যবহিত পূর্বসূরী সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার ঘোষ, এবং কাছাকাছি সময়ের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু প্রমুখ লেখকবৃন্দ যুদ্ধোত্তর যুগের বাংলা ছোটগল্পে নতুন ভাব-ভাবনা, নতুন রূপ-রীতির সংযোজনে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথ ঠিক ততখানি সামনে না

এলেও এই সময়ে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে বাংলা ছোটগল্পের একটি বিশিষ্ট ধারা তার লেখার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল একথা একটি স্বীকৃত সত্য।

১১.২ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও ছোটগল্প

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) বাংলা কথাসাহিত্যের এক বরণীয় শিল্পী। উপন্যাস ও গল্প, কথাসাহিত্যের এই দুই ধারাতেই নরেন্দ্রনাথ সাফল্যের সঙ্গে পরিক্রমা করেছেন। ‘দ্বীপপুঞ্জ’ (১৯৪৭), ‘চেনামহল’ (১৯৫৪), ‘সূর্যসাক্ষী’ (১৯৬৫), প্রভৃতি উপন্যাস একসময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবুও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ছোটগল্পই নরেন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বক্ষেত্র। নরেন্দ্রনাথ যে সময় সাহিত্যের আসরে এসেছেন, বহু খ্যাতিমান লেখকের ভিড়ে বাংলা গল্পের ধারা তখন ভাদ্রের ভরা নদীর মতই পরিপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে নবাগত কোনো লেখকের পক্ষে নিজের স্থান খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই কঠিন কাজটি নীরবে, নম্রভাবে অথচ আয়াসশূন্য দক্ষতায় সম্পন্ন করলেন। কল্লোলযুগের পরবর্তী কালের কথাসাহিত্যিক রূপে সেই চারের দশকের শুরুতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজের প্রতিষ্ঠার পথ অভ্রান্তভাবে তৈরি করে নিলেন।

অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতোই নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনও শুরু হয়েছিল কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৬ খ্রিঃ ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মূক’ কবিতাটিই নরেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা, যদিও তাঁর লেখালেখির সূচনা হয়েছিল আরও আগে, সেই ছেলেবেলাতেই। এই ‘দেশ’ পত্রিকাতেই সেই একই বৎসরে (১৯৩৬) তার লেখা ‘মৃত্যু ও জীবন’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ অসমতল’ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে বাংলা ছোটগল্পধারায় এক শক্তিশালী শিল্পীর আবির্ভাব বিষয়ে সাহিত্যরসিক পাঠক সমালোচক সহমত প্রকাশ করেন। চারের দশকের কাছাকাছি সময় থেকে লেখা শুরু করে ১৯৭৫-এ চিরবিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় চারদশক ধরে নরেন্দ্রনাথ অজস্র গল্প লিখে গেছেন। সংখ্যায় তারা প্রায় চারশো’র কাছাকাছি। এসব গল্পের একটা বড় অংশই নানা পত্রপত্রিকার পাতায় আত্মগোপন করে রয়েছে। কোনো কোনো গল্পের ফাইল কপিটিও আর পাওয়া যায় না। বহু গল্পগ্রন্থও

পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথকে বাংলা ছোটগল্পের এক স্বাতন্ত্রচিহ্নিত অসাধারণ শিল্পীরূপে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয় না।

সাহিত্য সংসারে নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম ছিল কবিতা। ১৩৩৬ সালে প্রথম কবিতা প্রকাশের পর প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি বহু কবিতাই লিখেছেন। মাঝখানে সে ধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলেও জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে কবিতার প্রতি তার আগ্রহ আবার নতুনভাবে জেগে উঠেছিল। তার অপ্রকাশিত রচনার ভাণ্ডারে বেশ কিছু কবিতার সন্ধানও পাওয়া গেছে। আত্মকথায় নরেন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন, "যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তারাই জানেন কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি। কবিতা যতই দুর্বল, আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হোক না তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায় তেমন আর কোনো রচনায় পাওয়া যায় না।" কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি ঘটনা যে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ কবি নরেন্দ্রনাথকে বহুদূর পেছনে রেখে এসেছেন। আর একথাও সত্যি যে কবিতার মতোই তাঁর অজস্র গল্পেও তিনি ব্যক্তিসত্তাকে ঢেলে দিতে পেরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যাদের আমি দেখেছি, যাদের চরিত্রের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট আমার মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করেছে, তাদের নিয়ে গল্প ও কাহিনি লিখতে আমার ভালো লাগে। নিছক কল্পনার উপর ভিত্তি করে আমি গল্প লিখতে পারি নে এই সহজ স্বীকারোক্তি তার যাবতীয় লেখালেখির মূল সূত্রটিকে ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কল্পনাসিদ্ধ লেখক নন। চেনা জগতের, চেনা মানুষের কথাই তার অভিজ্ঞতার জারক রসে নিষিক্ত হয়ে গল্প কাহিনি হয়ে উঠেছে।

১৩৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প মৃত্যু ও জীবন থেকে শুরু করে শেষ লেখাটি পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ জীবনের এই চেনামহলকেই সাহিত্যে রূপায়িত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম যে ঘটেনি তা নয়। তবে সেই ব্যতিক্রমী রচনায় নরেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয়, স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। তাই

জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতানিষ্ঠ লেখক নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের আলোচনায় এবং মূল্যায়নে তার ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

(১৩৪৩ সালে মৃত্যু ও জীবন' গল্প নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে নরেন্দ্রনাথের আগমন ঘটে। এই বছরেই তিনি পরপর আটটি গল্প লেখেন। 'মৃত্যু ও জীবন', 'বোকা', 'বিবাহ' এবং 'সহ সম্পাদক' এই চারটি গল্প দেশ পত্রিকায় ১৩৪৩/৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। আর বাকি চারটি গল্প 'লক্ষ্মী', 'কান্দু', 'কবিতা' এবং 'রসিকদাস' ১৩৪৩/৪৪ সালে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী এবং পরিচয় পত্রিকায়। নরেন্দ্রনাথ তখন কুড়ি একুশ বছরের তরুণ। তখন *থেকেই* সাহিত্যপত্র সম্পাদক এবং পাঠকমহলে লেখকরূপে তাঁর স্বীকৃতি আসতে থাকে। ১৩৪৬ সালে আনন্দবাজার রবিবাসরীয় একটি সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথের 'সংসার' গল্পটি প্রকাশিত হলে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারের তৎকালীন সম্পাদক মন্মথনাথ সান্যাল তার লেখার প্রশংসা করে চিঠি দেন। ১৩৪৩ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ মোট ৮৭টি গল্প লিখেছেন। তা থেকে ১১টি গল্প বেছে নিয়ে তার প্রথম গল্প সংকলন 'অসমতল' প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালে। লেখক তার প্রিয় দুই ভ্রাতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্রের নামে বইটি উৎসর্গ করেন। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স ছিলেন বইটির প্রকাশক। 'অসমতল' প্রকাশিত হলে বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠক সমালোচক মহল নিঃসংশয় হলেন। এই একই বছর হলদে বাড়ি নামে তার আরও একটি গল্প সংকলন ও (১২টি গল্প নিয়ে) প্রকাশিত হল। ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত হল গল্পসংকলন 'উল্টোরথ। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় গল্পকার নরেন্দ্রনাথ পাঠকমহলে জনপ্রিয় ছিলেন। সুদীর্ঘ চল্লিশবছরের সাহিত্যজীবনে নরেন্দ্রনাথ চারশোরও বেশি গল্প লিখেছেন। কিন্তু বিশেষ করে তার প্রথম ও মধ্যপর্বের ছোট গল্পই তার শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, যে সমস্ত গল্পের জন্য বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নরেন্দ্রনাথ এক অসামান্য শিল্পী, তাদের বেশির ভাগই লেখা হয়েছে ১৩৫২ সালে ''অসমতল' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের দশ বৎসরের মধ্যে।

সাহিত্যজীবনের একেবারে প্রথমেই নরেন্দ্রনাথের লেখায় মানবমনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ পাঠককে চকিত করে তুলেছিল। আমরা জানি, মানুষের সামাজিক সত্তার যে রূপ বাইরে প্রকাশ পায়, তা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের এক ভগ্নাংশ মাত্র। সমুদ্রে ভেসে চলা হিমবাহের মতো তার চূড়াটুকুই মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অন্তর্লোকের চেতন, অবচেতন ও অচেতন সত্তার সম্মিলনেই মানুষের পরিপূর্ণ সত্তা গড়ে উঠে। আধুনিক যুগের সাহিত্য সেই গভীরসঞ্চারী পূর্ণতর ব্যক্তিত্বেরই সন্ধানী। নরেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় দক্ষতার অধিকার। যৌথ' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে পৌষ ১৩৪৯) গল্পটির কাঠামো বাইরের দিক থেকে পুরনো ধরনের মধ্যবিত্ত পরিবারের হলেও মানবচরিত্রের জটিলতা গল্পটিতে অন্য মাত্রা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় পঙ্গু শিল্পী স্বরূপ বউদি মল্লিকার প্রাণোজ্জল সৌন্দর্যের গোপন পূজারি ছিল। সংসারের চাপে, স্বামী ও সন্তানদের চাহিদার জোগান দিতে দিতে মল্লিকার সে যৌবন কবে ঝরে গেছে তা কেউ খেয়ালও করেনি। স্বামী অনুরূপ গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, এমনকি মল্লিকা নিজেও সে কথা কবেই ভুলে গেছে। কিন্তু অবিবাহিত স্বরূপের নিভৃত জগতের মল্লিকা চিরযৌবনা।বড় আকস্মিকভাবে সেটি আবিষ্কৃত হল মল্লিকার স্বামীর কাছে। বেশ কিছুদিন ধরেই স্বরূপ একটি মূর্তি গড়ার কাজে মগ্ন ছিল। হঠাৎ করে দিনকয়েকের জ্বরে সংসার থেকে বিদায় নিল সে। মৃত্যুর মহার্তে দাদাকে অনুরোধ করে গেল তার অসমাপ্ত কাজটি যেন দাদা সমাপ্ত করে। ছোট ভাইয়ের শেষ ইচ্ছাটুকু রক্ষা করবার জন্যে অনুরূপ একদিন স্বরূপের ঘরে চকল। অস্থির মনটাকে কিছুটা অন্যমনস্ক করে রাখার ইচ্ছাও তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ‘স্বরূপের কাজ নিয়েই ভুলে থাকতে হবে স্বরূপকে।’ পাটের মোটা চট দিয়ে ঢাকা মূর্তিটি বের করে অনুরূপ সেটি পরিষ্কার করবার জন্যে মল্লিকাকে একটা শুকনো ন্যাকড়া আনতে বলল। ‘মল্লিকা সেনা হাতে করে এসে বলল, এই নাও। দেখি দেখি কী মূর্তি কেটেছে ঠাকুরপো !

অনুরূপ রূঢ় কণ্ঠে বলল, দেখ চিনতে পার কিনা।

অনুরূপের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা মল্লিকার কাছে চাপা রইল না। কিছুটা অবাক হয়েই সে অর্ধসমাপ্ত মূর্তিটার দিকে তাকাল। আর আরও বেশি আশ্চর্য হয়ে দেখল সেটা

মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙাচোরা ক্ষয়ে যাওয়া মল্লিকার নয়, দশ বৎসর আগের সেই যৌবনা‍োচ্ছল সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন।'

মূর্তিটি একবার দেখেই মল্লিকা লজ্জিতভাবে সরতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনুরূপ তার শীর্ণ হাত চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল। স্বরূপের শেষ অনুরোধমতো এই মূর্তির বাকিটা এখন তাকেই শেষ করতে হবে। গল্পটিতে শুধু দুই ভাইয়ের নয়, দেবর বউদির সম্পর্ককেও যেন নতুন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। অথচ বর্ণনার সংযমে নিরুচ্চার প্রেমের সুরভিতে বাতাস বিষন্ন হয়ে উঠেছে। 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে'—তার মনের গভীরে প্রবেশ করা খুব কঠিন একটি কাজ। নরেন্দ্রনাথ সেই কঠিন কাজটি অনায়াসে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। ১৩৫০ সালের ১৮ই বৈশাখ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'রোগ' গল্পের নায়ক বিভূতি এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক। স্ত্রী নীলিমার অসুখে সে ঔষধপত্র ডাক্তার বদ্যির ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু রোগীর সেবা শুশ্রুষা করা তার দ্বারা হবেনা।এই ভূতের মতো রোগীর ঘরে চুপচাপ বসে থাকা—নিজেকেই যেন রোগী বলে মনে হয় একেক সময়। মনের এই অবস্থায় একদিন নীলিমাকে দেখতে গেল সে। নীলিমা তার শীর্ণ দুর্বল হাত বিভূতির হাতের ওপর রেখে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করল-"আর চলে যেও না।" এই নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বিভূতির কেন যেন খুব ভালো লেগে গেল। রুগ্নতা যেন নীলিমাকে এক অপূর্ব করুণ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। এরপর থেকে স্ত্রী যতদিন বিছানায় ছিল, বিভূতি গভীর যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। 'এমন একান্ত করে সম্পূর্ণ করে নীলিমাকে যেন আগে কোনোদিন পাওয়া যায়নি। কিন্তু যখনই নীলিমা বিভূতির ভালা‍োবাসা আর নিজের তীব্র বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার জোরে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে উঠেছে, তখনই তার প্রতি বিভূতির সমস্ত অনুরাগ বিরাগে পর্যবসিত হয়েছে। এক অদ্ভুত ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে তার মন।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মকথা'র (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২) এক জায়গায় লিখেছেন—"সেই অল্প বয়স থেকেই গ্রামের যারা নানামাধ্যমের শিল্পী তাদের সঙ্গে আমি এক

ধরনের আত্মীয়তা বোধ করতাম। তাদের আমি সমাদর করতাম। তাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত। সবাইকে পারিনি কিন্তু তাদের কাউকে কাউকে আমি লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি।' 'যৌথ' গল্পে যেমন তিনি কাঠখোদাই'র শিল্পী স্বরূপকে নিয়ে এসেছেন, তেমনি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৫০) গল্পে এসেছে ভাস্কর অবিনাশ। পাথর কেটে মূর্তি গড়ার কাজে দক্ষ যাদুকর সে। এই শিল্প তাকে যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা সবই দিয়েছে, বিনিময়ে অবিনাশও নিজেকে উৎসর্গ করেছে শিল্পের সেবায়। নিজের জীবন, নিজের সংসার গড়ে তোলার চিন্তা দীর্ঘদিন মনে স্থান পায়নি। তারপর মায়ের মিনতিতে যখন জীবনসঙ্গিনী খুঁজতে শুরু করল, কাউকেই আর পছন্দ হয় না। সারাজীবন ধরে যে পৃথিবীতে কেবল রূপ খুঁজেছে আর রূপ সৃষ্টি করেছে, তার চোখকে তৃপ্ত করার আর মনকে ভরে দেবার মতো মেয়ে সহজে পাবার কথাও নয়। তারপর শ্যামবাজারের এক অখ্যাত গলিতে এক মধ্যবিত্ত কেরানির ঘরে অবিনাশ তার দোসর খুঁজে পেল।'পাথর কেটে যে সব মূর্তি গড়ে অবিনাশ, তারই একখানা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।' মেয়ের তুলনায় পাত্রের বয়স অনেক বেশি বলে মেয়ের মা মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু তাকে বুঝানো হল 'রেবাকে যে অবিনাশের পছন্দ হয়েছে এটা রেবার ভাগ্য আর শিল্পীর খেয়াল। কেননা রূপ ছাড়া রেবার আর কিছুই নেই। বিয়ের পর রেবা এসে অবিনাশের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হল, সাড়ম্বরে তা জানালও কিন্তু অবিনাশের তৈরি অপরূপ সব মূর্তির চাইতে রাস্তায় দু'পা কাটা ভিখারিই রেবার উৎসুক দৃষ্টিকে বেশি আকর্ষণ করে, স্টুডিওতে অবিনাশের কাছে সময় কাটানোর চাইতে চাকর মণিরামের বরিশালী ভাষা শুনতে এবং শুনে হাসতে ভালোবাসে রেবা। অবিনাশ ভাবে যার কেবল রূপই আছে, রূপবোধ নেই, তাকে দিয়ে কি হবে অবিনাশের?' অবিনাশের এই স্টুডিও দেখে কত মানুষ মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু রেবা তার সৃষ্টিকে তার শিল্পকে একটুও ভালোবাসল না, একথা অবিনাশকে অস্থির করে তোলে। আবার এই রেবাই যেদিন অবিনাশের তৈরি অপরূপ মদনমোহনের মূর্তিটিকে ভালোবেসে ঠাকুরঘরে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে, সেদিনও অবিনাশ কেন যেন খুশি হবার বদলে প্রচণ্ড রেগে যায়। তারপর মাথা ঠান্ডা হলে স্থির করে মূর্তিশিল্প আর না, এবার থেকে জীবন শিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রেবার কাছে মার্জনা চাইবেঠিককরে

রাখে সে। আর রেবা ওপরে এসে অবিনাশের ঘুমন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে এত অসুন্দর তার স্বামী আর সত্যিই এত বুড়ো! হতাশায় মুখ ফেরাতেই দেয়াল আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে চোখ পড়তে চোখের পলক আর পড়ে রেবার। সে এত সুন্দর! তার মনে হল অবিনাশের কুশ্রী ব্যবহারের একমাত্র প্রতিশোধ তার যৌবন, তার সৌন্দর্য। তাই সেই গভীর রাতে প্রসাধনে নিজেকে অপরূপ করে তুলল রেবা। এমনসময় শাশুড়ি বললেন ঠাকুরঘরের দরজা খাোলা রয়েছে, রেবা যেন বন্ধ করে আসে, অমনি মদনমোহনের সেই দিব্য রূপ রেবার চোখে ভেসে উঠল। এর কিছুক্ষণ পর অবিনাশের ঘুম ভেঙে গেলে রেবাকে ঘরে না দেখে সে স্ত্রীর মানভঞ্জনের তাগিদে বিছানা ছেড়ে উঠল, আর মদনমোহনের মূর্তির সামনে মর্মরমূর্তির মতো রেবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। রেবা তার খোঁপার বেলকুঁড়ির মালা দুলিয়ে দিয়েছে মদনমোহনের গলায়।'রেবা! অবিনাশের কণ্ঠ করুণ আর্তনাদের মত কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হল।' স্বামী স্ত্রীর মানসিকতার এই অনতিক্রম্য দূরত্ব গল্পের শেষে এক বিষন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

১১.৩ নরেন মিত্রের গল্পে নারী চরিত্র

নরেন্দ্রনাথ তার ছোটগল্পে নারী চরিত্র চিত্রণে যে বৈচিত্র্য, যত্ন মনোযোগর পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি বিশ্বাস করতেন। পুরুষের মতোই নিজের জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব যে নারীরও থাকা উচিত এ মতে তার সায় ছিল। নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারী তাই উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছে।সমাজের তথাকথিত অনুশাসন তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। যুগের জটিলতা, জীবনের জটিলতাকে সে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই গ্রহণ করেছে, কখনও সাফল্যে দীপ্ত হয়েছে, কখনও ব্যর্থতায় ম্লান হয়েছে। কিন্তু কখনওই শুধুমাত্র নারী বলে কোনাে সমস্যার পাশ কাটিয়ে যেতে চায়নি। নরেন্দ্রনাথের এই সচেতন দরদি মনের পরিচয় তার লেখার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তার বেশ কিছু গল্পে বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাকে সমাজে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সংস্কার আর নীতিবোধের

দোহাই দিয়ে তার জীবনকে অংকুরেই শেষ হয়ে যেতে দেননি। আর নিজের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথ এসবের জন্যে কোনো উচ্চকণ্ঠ প্রচারের আশ্রয় নেননি, নীরবে এবং সহজভাবে যুগ প্রগতিকে গ্রহণ করেছেন, সাহিত্যে তাকে শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন। এমনই একটি গল্প মহাশ্বেতা, মাঘ ১৩৫০ সালে 'অলকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর পাঁচ বছর ধরে অমিতা বৈধব্য পালন করছে, নিয়মনিষেধের এই কঠিন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে অদ্ভুতভাবে। কিন্তু বিধবার আচার নিষ্ঠায় বাইরে থেকে কোনো ত্রুটি না থাকলেও তার শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল নেই। নতুন আরেকটি সম্পর্কের রঙে মন তার রঙিন হয়ে আছে। চিন্মোহনকে সে ভালোবেসেছে, তার ভালোবাসা পেয়েছে অমিতা। চিন্মোহন অপেক্ষা করে আছে কবে অমিতা তার এই শুভ্রবেশ বদলাবে সেই দিনটির জন্য। প্রথমে অমিতা একথা চিন্তাও করতে পারত না। কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পেরেছে চিন্মোহনকে ফেরানো যাবে না, ফেরাতে চায়ও না সে। নিজের মনকে যাচাই করে দেখেছে সেখানে মৃত অমূল্যর চাইতে চিন্মোহনের অধিকার অনেক বেশি। অমিতা এই পরিবর্তনে তার বাবা ভুবনবাবুও খুব খুশি হয়েছেন। নিজের সংস্কারবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিয়ে ভেবেছেন এই সম্ভাবনার কথা যদি আরও আগে তাঁর মনে আসত তাহলে বৃথা কৃচ্ছসাধনে অমিতার জীবনের এতগুলি দিন নষ্ট হয়ে যেত না। তবুঅভিভাবক হিসেবে তার কিছুটা দায়িত্ব থেকেই যায়, তাই চিন্মোহনের কাছে জানতে চাইলেন এ বিয়েতে তার বাড়ির লোকদের মত রয়েছে কিনা। চিন্মোহন জানাল তার দাদা রাজি আছেন, অনেক বুঝিয়ে মা'র সম্মতিও আদায় করেছে যদিও তা সানন্দ সম্মতি নয়। ভুবনবাবুকে সে আরও বলল—এ ধরনের কিছু কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অনিতার আছে বলেই আমি জানি। যদি নাই পারেন, তাতেই বা ক্ষতি কি, বর্তমান যুগের বিবাহটা ব্যক্তিগত, পরিবারগত নয়। বিয়ে হল রেজেস্ট্রি করেই, তবু চিন্মোহনের পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্যে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিও সংক্ষেপে পালন করতে হল। অমিতাকে দেখে সবাই মুগ্ধ হলেন, তুষ্ট হলেন তার নম্র আচরণে। কিন্তু অমিতার এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানাতে পারা সহজ হল না। নিরামিষ খেতে অভ্যস্ত অমিতা সকলের অনুরোধে মাছভাত মুখে দিয়েই আবার ফেলে দিল মাটিতে, লজ্জায় আর অস্বস্তিতে অসহনীয় হয়ে উঠল প্রতিটি মুহূর্ত।

তারপর ফুলশয্যার রাতের প্রস্তুতিতে বড়জা এবং ছোট ননদ অমিতাকে মনের মতো করে সাজাল। সিদুরে, আলতায়, শাড়ি গয়নায় রাজেন্দ্রানীর মতো অমিতা গিয়ে ঢুকল চিনেমাহনের ঘরে, তাদের ঘরে। কিন্তু অমিতাকে দেখে চিন্মোহন দুঃসহ ভঙ্গিতে বলে উঠল, "তোমাকে এমন সঙ সাজালো কে? সব্যঙ্গে হেসে উঠে আরও যোগ করে দিল 'অতি চমৎকার! দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ।' চিন্মোহনের ব্যবহারে হতবাক অমিতা চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল চিন্মোহনের বিছানার একটু উপরের দেওয়ালে। কিছুদিন আগের তোলা অমিতার একখানা ফটো রয়েছে। তার সেই নিরাভরণ শুভ্র সাজের ছবিটির নীচে চিন্মোহন তার নিজের হাতে সযত্নে লিখে রেখেছে 'মহাশ্বেতা' কথাটি, সর্বশুক্লা অমিতাকে ভালোবেসে যে নামে ডাকত চিন্মোহন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধু ধু করছে। জটিল মনস্তত্ত্বের সুষ্ঠু চিত্রণে গল্পটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কঠিন কঠোর বাস্তব এবং প্রেম ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্বে প্রেমের শোচনীয় পরাভবর চিত্র নিয়ে প্রকাশিত হল নরেন্দ্রনাথের গল্প 'মদনভস্ম' ১৩৫০ সালের মাঘ সংখ্যা 'রূপান্তর' পত্রিকায়। বুড়ো বয়সে বউ মারা যাবার পর ধনঞ্জয় ধূপী বিয়ে করে এনেছে মালতীকে। মালতী তরুণী, রূপসী। ধনঞ্জয়ের চাইতে তার অল্পবয়সি ভাগ্নে মানিকের সঙ্গেই তার বেশি ভাব। একদিন সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ধনঞ্জয় দেখলে কালো পাথরের একটি বড় বাটিতে পায়েস নিয়ে মালতী মানিককে সাধাসাধি করছে। কিন্তু মানিকের তাতে রুচি নেই। বরং বাহুবন্দি মালতীর অধরসুধা পানেই তার আগ্রহ বেশি। ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয় মানিককে মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। মালতীও বাদ যায় না। ধনঞ্জয় বোঝে তরুণী স্ত্রীকে খুশি করার সাধ্য তার নেই। তবু অন্ধকারে বিছানায় মালতীর খোঁপায় মানিকের বাগানের গন্ধরাজ ফুলের স্পর্শে তার হাত আর বুক দুই-ই পুড়তে থাকে। সময় দ্রুত বদলায়, আসে দুর্ভিক্ষ। বাজারে চালের আকাল পড়লেও ঘরে কিছু সঞ্চয় থাকায় ধনঞ্জয় প্রথমে তেমন চিন্তা করেনি। কিন্তু একদিন তার সব চুরি হয়ে যায়। গ্রামের লোক প্রথমে একবেলা, পরে আধপেটা আর শেষে শাপলা ও

কচুসেদ্ধ খাওয়া শুরু করল। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ধনঞ্জয় আক্রান্ত হল ভেদবমিতে। আর মালতী বের হল চালের খোঁজে। একসময় হঠাৎ আচ্ছন্ন ধনঞ্জয় ঘরে কথাবার্তা শুনতে পেল। একটা লাঠি নিয়ে সে কোনোমতে এগিয়ে যায়, আজ সব কিছু শেষ করে দেবে সে। ধনঞ্জয় দেখল, 'সেদিনের মতো আজও ওদের মধুর কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে।' কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। আজ মালতীর হাতের সেই পাথরের বাটি ধরবার জন্যে মানিক প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু মালতী তা কিছুতেই দেবে না। টানাটানিতে মালতীর আঁচল খসে পড়ে। কিন্তু সেদিকে মানিকের চোখ নেই। কংকালসার চেহারা নিয়ে সে বলে 'একমুঠো ভাত দিবি তাই প্রাণ ধরে দিতে পারিসনে এই তোর ভালোবাসা। আজ চার পাঁচ দিন ধরে ভাতের মুখ দেখিনে।' উত্তরে মালতী বলে ইস্ কি সাধের নাগর রে আমার। এক মুঠো কুড়িয়ে আনবার শক্তি নেই, মেয়েমানুষের খিদের গ্রাসে ভাগ বসাতে এসেছেন। বের হ'দূর হ'এখান থেকে।মানিক বাটিটি হঠাৎ ছিনিয়ে নিতেই মালতী তার হাতে কামড় দিল। ভাত ছিটিয়ে পড়ল মাটিতে আর সে ভাত নিজের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টায় শুরু হল দুজনের মধ্যে হাতাহাতি। লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে এই মজার দৃশ্য দেখতে দেখতে শুধু জিভে নয় দুটো চোখেও জল এসে পড়ল ধনঞ্জয়ের। তারপর দু'গাল বেয়ে সেই জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

নরেন্দ্রনাথের গল্প জীবনের বহিরঙ্গের কাঠিন্যকে যেমন বাস্তবনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরে, তেমনি মানুষের নিভৃত মনের নানাবিধ জটিলতাকেও তিনি গল্পের ঠাস বুনটের মধ্যে সুন্দরভাবে জুড়ে দেন, তার গ্রন্থিমোচনের মধ্য দিয়ে পাঠকের বিস্ময় তীব্র হয়ে ওঠে। জীবনের ভেতর বাইরের এই সুষ্ঠু সমন্বয় নরেন্দ্রনাথের গল্পের এক বড় আকর্ষণ। 'অলকা' পত্রিকায় ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'দুয়ে' নামের গল্পটিতে নরেন্দ্রনাথ বাস্তুহারার ভিড়ে জনাকীর্ণ কলকাতা শহরের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মেয়েকে গল্পে এনেছেন, যার কুশ্রীতা শুধু চোখকেই পীড়িত করে না, অস্তিত্বকে পর্যন্ত দুঃসহ করে তোলে। গল্পের শুরুতেই রয়েছে কঠিনকঠোর বাস্তব—এই বছর খানেকের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশটা যেন এই কলকাতা শহরে এসে জড়ো হয়েছে। আর তার চারআনি লোক অন্তত কাটাপুকুর লেনের এই জীর্ণ বাড়িটায়। ওপরে নীচে

সাত ঘর বাসিন্দা। রান্নাঘর বলে আলাদা কোনো জিনিস নেই। শোয়ার ঘরের মধ্যেই বেঁধে নিতে হয়, কিংবা ঘরের সামনে যে দেড়হাত প্রস্থের বারান্ডার তিন হাত করে একেক শরিকের ভাগে পড়েছে তাতেও কেউ কেউ রান্না করে। সকাল সন্ধ্যায় সাতটি চুল্লির যে যজ্ঞধূম উথিত হতে থাকে তা কাশী মিত্রের ঘাটের ধোঁয়াকেও হার মানায়। নর্দমার ব্যবস্থা নেই। উঠানের মাঝখানে দিনরাত এক ডাস্টবিন খাড়া রাখতে হয়। ভাতের মাড়ে, তরকারির খোসায় সমস্ত আকাশ বাতাস সৌগন্ধে ভরে ওঠে। সুখ সুবিধার চূড়ান্ত এই পরিবেশে অসম্ভব রকমের নির্লজ্জ আর শ্রীহীন একটি মেয়ের গায়ে পড়া অনুরাগ পরিতোষকে অসহ্য করে তোলে। দাদা বউদির সঙ্গে ভাড়াটে বাড়িতে বাস করে পরিতোষ। পাশের ঘরের মেয়েটি তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মুচকি হাসে, আর ভাঙা হারমোনিয়াম নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় তারস্বরে প্রেমসঙ্গীতের চর্চা করে। অবিবাহিত যুবক পরিতোষের প্রতি রানির বাবা-মা'রও একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দেখা যায়। ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টায় মাঝেমধ্যেই রানির হাত দিয়ে তার মা রান্না করা তরকারি পাঠান, অবসর সময়ে এসে গল্পগুজব করেন, আর মেয়ে রানি নানাভাবে পরিতোষের বউদি পারুলের কাজকর্মে সাহায্য করে।

কিন্তু পরিতোষ এতে খুব বিরক্ত হয়। প্রতিবেশীর এই সহৃদয় ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য সে বুঝতে পেরেছে। তাই রূঢ় ভাষায় বউদিকে সে নিষেধ করে রানিদের দুর্বলতাকে এভাবে কাজে লাগাতে। শিক্ষাহীন, রুচিহীন কুশ্রী এই মেয়েটি যদি নীরবে তাকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত হত তাহলে হয়তো পরিতোষ তাকে করুণা না করে পারত না। কিন্তু ভালোবাসার এই সরব ঘোষণা পরিতোষের মন ঘৃণায় ভরিয়ে তোলে, এই কুশ্রী মেয়ের অনুরাগ যেন তার যৌবনের, পৌরুষের অসম্মান। রানির বাবা-মা পরিতোষের মন পাবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন, দুই পরিবারের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠল। তারপর ক্রমশ সব থিতিয়ে এলে রানির বাবা মেয়ের অন্যত্র বিয়ে ঠিক করলেন, অবস্থা আবার সহজ হয়ে উঠল, পরিতোষের দাদা প্রতিবেশীসুলভ ভদ্রতায় নব বরবধূর বাসরের জন্য পরিতাষের ঘরখানা একরাত্রির জন্য ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দিল। বিয়ের দিন হঠাৎ খবর এল বউদি পারুলের মা অসস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই সরোজ

পারুলকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আর বরকনেকে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে দাদার ঘরে এসে আশ্রয় নিল পরিতোষ। শুয়ে শুয়ে পরিতোষের কানে আসতে লাগল ওদের অস্ফুট মৃদু কথাবার্তা। চাপা হাসির শব্দ আর চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ। ঘরখান হঠাৎ যেন এক অপূর্ব রহস্যে আর ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে। আর হঠাৎ করেই কেন যেন এক অনির্দেশ্য বেদনায় পরিতাোেষের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সুশ্রী শিক্ষিত কোনো মেয়ের অতিঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সেও একদিন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু এই নির্লজ্জ শ্রীহীন অশিক্ষিত মেয়েটির দেহের উত্তাপ আর হৃদয়ের স্পর্শ কত বিচিত্র আর রহস্যময় তা জানার সুযোগ কোনোদিনই পরিতোষের আসবে না।

মেয়েদের প্রতি নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির পরিচয় পতিতাদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে পতিতাদের নিয়ে গল্প রচনার একটি বিশিষ্ট ধারা বহুদিন ধরেই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' (সাধনা, পৌষ ১৩০১) গল্পে যার সূচনা, শরৎচন্দ্র, কল্লোল গোষ্ঠী, বিচিত্রা গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্য দিয়ে তা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেও নরেন্দ্রনাথ শুধু আর পাঁচজনের একজন হয়ে থাকেননি, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায় স্বতন্ত্র হতে পেরেছেন। শ্রাবণ ১৩৫২ সালের বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত পুনশ্চ'গল্পের ফতিমা দেহব্যবসায়ে এসেছে অনেকটা অনিবার্য নিয়তির তাড়নায়। অল্পবয়সি রূপসী ফতিমা মৈনুদ্দীনের ঘরনি হয়ে আসার পরই দেওর জৈনুদ্দীনের লোভের দৃষ্টি পড়েছিল তার ওপর। ঘরে নিজের বউ বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও জৈনুদ্দীন ফতিমাকে তার মুগ্ধতার কথা জানাতে দ্বিধা করেনি, কিন্তু ফতিমা তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। অথচ হঠাৎ করে মৈনুদ্দীন মারা গেলে ফতিমাকে দ্বিতীয়বার নিকায় বসতে হল জৈনুদ্দীনের সঙ্গেই। প্রথম প্রথম জৈনুদ্দীন তাকে আদরে আহ্লাদে ভাসিয়ে দিল, কিন্তু সর্বনাশা যুদ্ধের ছোঁয়া লেগে জিনিসপত্র যখন আগুন হয়ে গেল, চাল হয়ে গেল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, তখন দেখা গেল ফতিমার চাইতে প্রথম পক্ষের স্ত্রী সাকিনা আর তার ছেলের প্রতিই জৈনুদ্দীনের বেশি পক্ষপাত। সাকিনা বেশি পরিশ্রম করতে পারে, পটের বিবি ফতিমার চেয়ে স্বামীর ব্যবসায় সাহায্য করতে পারে বেশি, তাই কয়দিন উপবাসের পর ফতিমা সোজা চলে গেল বুড়ো আবদুল খাঁর বাড়ি। রূপসী ফতিমাকে গ্রহণ করতে ধনী আবদুল খাঁর কোনো আপত্তি হল না। তবে তারও আগে

ফতিমাকে সে তার খাসিমুরগির চালান নিয়ে শহরে যাত্রার সঙ্গী করল। আর তারপর একসময় ফতিমাকে দেখা গেল সন্ধ্যারাতে রাস্তার পাশে খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কলেরায় স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুর পর জৈনুদ্দীন শহরে পালিয়ে এসেছিল, বহু দুঃখ দুর্ভোগ পার হয়ে এখন সে গণিকা পল্লীর দালাল। বিলাসী ধনীর জন্য নারীদেহের সন্ধানে এসে রাস্তায় দাঁড়ানো ফতিমাকে দেখল জৈনুদ্দীন, দেখল ফতিমাও। তারপর কোনো কথা হবার আগেই ফতিমা দ্রুত ঘরে চলে গেল। কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ চলল না, একটু পরেই জৈনুদ্দীন এসে হাজির হল তার ঘরে। তারপর ক্রমশ দালাল জৈনুদ্দীনের সাহায্যে ফতিমার ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠল। নতুন এক অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠল তাদের মধ্যে। জৈনুদ্দীনের পরামর্শ মতোই ফতিমা খদ্দেরের মন ভোলাতে নিত্যনূতন কায়দায় সাজে, কিন্তু জৈনুদ্দীনের নির্বিকার ভাব ভেতরে ভেতরে তাকে অস্থির করে তোলে। জৈনুদ্দীন তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না, কিন্তু তাকে ঘৃণা করার অধিকার জৈনুদ্দীন পেল কোথায়, সে নিজেও তো কম পাপী নয়। এসব প্রশ্ন ফতিমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। তারপর একদিন নির্দিষ্ট খদ্দেরের বদলে জৈনুদ্দীন নিজেই আসে ফতিমার ঘরে, আর বিছানায় বসে ফতিমার নরম হাতের মুঠিতে পাঁচটি টাকা গুঁজে দেয়। বিস্ময়কর আনন্দে ফতিমা সেই টাকা আবার জৈনুদ্দীনের পকেটেই তুলে রাখে। কারণ এত কাণ্ডের পর আবার মোল্লা মুন্সীদের মুখ বন্ধ করতে অনেক টাকার দরকার তাদের। গল্পের এই পরিণতি লেখক নরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির পরিচায়ক।

সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়ার দিকগুলি নরেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন আর সহানুভূতির জারক রসে সিক্ত করে তাদের গল্পরূপ দিয়েছেন তিনি। ‘সেতার’ গল্পের (বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫২) নীলিমা হাসপাতালে অসুস্থ স্বামীর পথ্যের খরচ জোগানোর জন্য গানের টিউশনি নিয়েছে। খবরটি জেনে সুবিমল খুব একটা অবাক হল না। তার যে বাবা-মা নীলিমাকে বিয়ের পর মাত্র কয়েক মাসের জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে দেননি, ছেলের বন্ধু-

বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করেছেন, তারাই যে আজ নীলিমাকে বাইরে বেরিয়ে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিয়েছেন, সুবিমল জানে সাংসারিক দুরবস্থাই এর একমাত্র কারণ। একমাত্র রোজগেরে ছেলের অসুখে বাবা প্রথমেই স্ত্রী আর বউমার গয়নায় হাত দিয়েছেন তারপর আত্মীয়স্বজন বন্ধু সকলের সাহায্য নিয়েছেন তবু ছেলের রোগ সারাতে পারেননি। সুবিমল নিজেও তার বন্ধু বান্ধবদের কাছে হাত পেতেছে সাহায্যের জন্য। দূরের বন্ধুদের কাছে চিঠিতে সাহায্য চেয়েছে। আর একেবারে শেষে নীলিমাকে নিতে হয়েছে দুর সম্পর্কিত আত্মীয়ের বাড়িতে গান শেখানোর চাকুরি। নীলিমা কোনোদিন সেভাবে গান শেখেনি। রেকর্ড রেডিয়ো শোনা বিদ্যা তার। তাই গান শুনিয়ে শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলেও অনেকটা মানবিক কারণেই তাকে চাকুরিতে সুযোগ দিলেন আত্মীয় রায়সাহেব। রায়সাহেবের ছেলে পুরন্দর সেতার বাজায়, নীলিমাও একসময় এক বান্ধবীর কাছে কিছুটা সেতার শেখার সুযোগ পেয়েছিল। তাই পুরন্দরের সাহায্যে তার সেতার নিয়ে পুরন্দরের একসময়ের ওস্তাদের কাছে সেতার শিখতে শুরু করল নীলিমা, কারণ সেতারের টিউশনিতে পয়সা বেশি পাওয়া যাবে। কিছুটা muর পরই নীলিমা খুঁজে খুঁজে সেতারের টিউশনি নিল। রেডিয়ো স্টেশনের কাব্যক্তিরাও নীলিমার যন্ত্রণা আর চেষ্টার কথা শুনে তার অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে সযোগ দিলেন বাজাবার। গান আর সেতার শিখিয়ে সুবিমলের খরচ চালিয়েও কিছু টাকা জমাল নীলিমা, ইচ্ছা সুবিমল বাড়ি এলে এটাকা দেখিয়ে তাকে চমকে দেবে, আর চেঞ্জে নিয়ে যাবে সুবিমলকে। এরমধ্যে হঠাৎ একদিন উত্তর কলকাতার একদল ছেলে বন্যাত্রাণের এক জলসায় নীলিমাকে আমন্ত্রণ জানাল। অবাক হয়ে গেল নীলিমা। জীবিকার দায়ে যা করতে বাধ্য সে হয়েছে, তার মধ্যেও যে শিল্পের ছোঁয়ায় অন্যকে আনন্দ দিতে পেরেছে, একথা জেনে অভিভূত নীলিমা সানন্দে সম্মতি জানাল। পরদিন সুবিমল বাড়ি আসবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে, তাই ঘর দোর যত্নে সাজাল নীলিমা। এদিনই আবার তার জলসায় অংশ নেবার কথা, তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেতারে তুলতে লাগল তার সবসেরা গান। কাল জগৎ জানবে সে ছোট নয়, দীন নয়, অকৃতার্থ নয়। পরদিন সুবিমল এল, বাড়ি ভরে উঠল সম্মিলিত আনন্দ উচ্ছ্বাসে। এত আনন্দের মধ্যেও নীলিমার মনের এক অংশ অধীর হয়ে রইল সন্ধ্যার সেই সময়টার

জন্য। এক সুযোগে সুবিমলকে মৃদুকণ্ঠে নীলিমা জানাল তাকে একবার একটু বাইরে যেতে হবে। কিন্তু সুবিমল প্রবল আপত্তি জানাল। এতদিন পরে, এত রোগভয় মৃত্যুভয় পার হয়ে আজ সে ফিরে এসেছে তার প্রিয়জনদের কাছে, নীলিমাকে আজ সে মুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করতে রাজি নয়। বরং আজ নীলিমা সেতারের সুর শুধু তাকেই শোনাবে। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে নীলিমার সমস্ত অস্তিত্ব সচকিত হয়ে উঠল। দরজার ওই ধ্বনি যেন তার সেতারের ধ্বনির চাইতেও মধুর। কিন্তু তখনি এল সুবিমলের অনুরোধ ' কি হ'লনাওনা সেতারটা। নীলিমা নিষ্প্রভ শূন্য দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর সেতারখানা টেনে নিল হাত বাড়িয়ে। আজ তাকে বাজাতেই হবে।' নীলিমার এই ঘরে থাকাটা পুরোপুরি থাকাই কিনা সে প্রশ্ন লেখকের মতো পাঠকের মনেও অনিবার্যভাবে জেগে ওঠে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে নারী চরিত্রের প্রাধান্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তার গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের পার্শ্ববর্তী নারীদের তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রভ। নারীকে তিনি বিভিন্নরূপে বিচিত্র পরিবেশে দেখিয়েছেন। তারা কখনও সেবিকা, কখনও লীলাসঙ্গিনী, কখনও প্রেমের সাহসে অশঙ্কিনী, কখনও ছলনাময়ী কখনও দুঃখদিনের সঙ্গিনী কখনও বা অভিনেত্রী। ঘরের চার দেওয়ালের বন্ধন থেকে বৃহৎ বিশ্বে নারীকে মুক্তি দেবার চেষ্টা নরেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পসাহিত্যে নিষ্ঠার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন। নারী যেন পুরুষের নমসহচরী মাত্র হয়ে না থেকে তার যথার্থ কর্মসহচরী হয়ে উঠতে পারে এই আশা তিনি মনে পা্েষণ করতেন। বহুগল্পে এর পরিচয় রয়েছে। আবার পাশাপাশি নারীর সীমাবদ্ধতার কথাও তার অজানা ছিল না। একটি কামুক পুরুষের অবাঞ্ছিত লালসার স্পর্শ একটি নারীর সমস্ত সাধ ও স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে, যাতে সব পেয়েও কিছুই সে ধরে রাখতে পারে না, জীবনব্যাপী হতাশাকে সঙ্গীকরেই কঠিন কর্তব্যের পথ ধরে তাকে চলতে হয়। এই যন্ত্রণারই এক মর্মস্পর্শী রূপ তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'কন্যা' (দেশ, পূজাসংখ্যা) গল্পে। যশোহরের প্রতিপত্তিশালী পসারওয়ালা উকিলের মেয়ে রূপসী নলিনীর বিয়ে হয়েছিল শহরেরই আরেক প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ভাবী ডাক্তার ভবেশের সঙ্গে। সবাই

একবাক্যে বলেছিল এ বিয়ে রাজযোটক। বাসর ঘরে নতমুখী নলিনীর অশ্রুজলের উৎস অনুমানে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও ভবেশ সেটাকে তেমন আমল দিয়ে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক পরেই জানা গেল নলিনী দু মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। ভবেশের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে নলিনী মুখ নিচু করে শুধু বললে আমি তো তাকে ভালোবাসিনি, সে জোর করে চোখের জলে বাকি কথা আর বলা হল না, কেউ শুনতেও চাইল না। মেয়ের বাবাকে এসে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে হল, নানাভাবে মিটমাটের অনেক চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু সফল হলেন না। প্রতারিত, বঞ্চিত ভবেশ এম. বি পাশ করে বিলাত চলে যায়, ফিরে এসে কলকাতায় জীবন শুরু করে এবং নিজের ক্ষমতায় আজ সে বাড়ি, গাড়ি, যশ প্রতিপত্তি, সুন্দরী, স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান সন্তান সবকিছুই অধিকারী।

এমন সময়, দীর্ঘ উনিশ বছর পর সাধারণ বেশ বাসে সাধারণ চেহারার নলিনী প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকবেশের কাছে এক অদ্ভুত আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে। তার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে পিতা হিসাবে ভবেশের নাম ব্যবহার করার অনুমতি চায় সে। ভবেশ না বলে পারল না অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব যদি স্বীকারই করতাম তাহলে উনিশ বছর আগেই তা করে ফেলতাম। ব্যর্থকাম নলিনী ম্লানমুখে ফিরে গেল। কিন্তু ভবেশের শান্তি, স্বস্তি সবই যেন সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মনের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত ভবেশ এক বিকেলে গাড়ি চালিয়ে উপস্থিত হল নলিনীর ঠিকানা দিয়ে যাওয়া বাড়িতে। নলিনী তখনো স্কুল থেকে ফেরেনি, শ্যামবর্ণা তন্বী একটি মেয়ে দরজা খুলে ঘরে বসালো তাকে, ঘরের চেহারায় অভাব থাকলেও অরুচি কোথাও নেই। ভবেশ নিজের পরিচয় দিতেই নম্র নতমুখী মেয়েটি 'বাবা' বলে একবার ডেকেই লজ্জিত মুখ ফিরিয়ে নিল। মুগ্ধ ভবেশ মনে ভাবল এই মেয়েটিকেসসারে প্রতিষ্ঠিত করতে সে কোনোকিছুই দিতে কার্পণ্য করবে না।কিন্তু তখনি নলিনী ফিরল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা। ভবেশকে জানাল মেয়ের ভাবী স্বামীকে সে নিজের পূর্ব ইতিহাস খুলে বলেছে। এবং সিদ্ধান্ত নেবার ভার তার ওপরই ছেড়ে এসেছে। কারণ সতা গোপন করে অল্পবয়সে নলিনী নিজের যে ক্ষতি করেছে কোনোভাবেই সে চায় না মেয়ের জীবনে তার পুনরাবৃত্তি হোক। গল্পের এখানেই শেষ। ভবেশ নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে

ফিরে গেল, কিন্তু নলিনী আর তার মেয়ে গীতার জীবন নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ, এর উত্তর এই সমাজে কারোরই হয়তো জানা নেই।

সমালোচকের মতে 'প্রেমের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নারীরা অনেক বেশি। উদ্যোগী ও সাহসিক উন্নত চেতনার পরিচয় দিয়েছে। ভুল আর শুদ্ধ যাই করুক না কেন, নিজের বিশ্বাসের পক্ষে থেকেছে প্রায় সবসময়।' বিকল্প গল্পের সুধা তার বাবাকে প্রশ্ন করেছিল মন্ত্রপড়া বিয়েটাই কি সব? এই চেতনারই ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছে 'পুরাতনী' গল্পে (আনন্দবাজার পূজা সংখ্যা ১৩৬৩)। চিত্রার বাবা শ্রীপদবাবু ছিলেন মিশনারি কলেজের অধ্যাপক। জাতিতে বামুন কিন্তু ধর্মে খ্রিস্টান এই মানুষটি ধর্মের অনুষ্ঠানের দিকটা তেমন না মানলেও নীতির দিকটা বিশেষ করেই মানতেন। চিত্রা শ্যামলা রঙের ছিপছিপে গড়নের মিষ্টি মেয়ে, শান্ত, বিষন্ন আর গম্ভীর। ছাোটবেলাতেই মা মারা গেছেন, বুড়ি পিসিমার হাতে সংসারের ভার ছিল। তিনিও মারা যেতে চিত্রার বাবা কলেজ থেকে এক বেয়ারাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, সে হল একাধারে ঠাকুর চাকর মালি আর দারাোয়ান। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এই অভয়ের চেহারাটি যেন পাথর কুঁদে তোলা। চিত্রা অভয়ের চুলের ছাঁট, জামাকাপড়ের ধাত সবই বদলে দিল, বাইরে চাকর দারোয়ানদের সঙ্গে আড্ডা আর তাস খেলাও বন্ধ করল। একদিন রান্নাঘরে অসাবধানে চিত্রার কাপড়ে আগুন লেগে গেলে অভয় নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে রক্ষা করল। চিত্রা অসুস্থ হয়ে পড়লে পোড়া ব্যান্ডেজবাঁধা হাত নিয়ে তার সেবাশুশ্রুষাও করল সে। আর চিত্রা সুস্থ হবার পর বাবা একদিন বললেন এবার অভয়কে ছাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ তার মেয়ে একটা চাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে একথা ভাবতেও তার গা ঘিন ঘিন করে।

'বিকল্প' গল্পের সুধার বাবা হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে এই গল্পের চিত্রার বাবা শ্রীপদবাবুর বাইরের দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও অন্তঃস্বভাবে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। তিনি মেয়ের সঙ্গে যুক্তিতে না পেরে প্রথমে অভয়কে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর পাড়ার ছেলেদের বললেন এই চোর চাকরটা আর এমুখো হলে তারা যেন উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়। যথারীতি পাড়ার ছেলেদের হাতে অভয় একরাতে চোরের মার

খেল। আর পরদিন চিত্রা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অভয়কে নিয়ে পড়া ছেড়ে পালাল। অভয়কে চিত্রা রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। কিন্তু সে জানে ওকে প্রেমিকের পর্যায়ে স্বামীর পর্যায়ে তুলে আনা দু'চার বছরের কাজ নয়। অফিসের চাকরিও চিত্রাকে অভয়ের অভদ্র ব্যবহারের জন্যই ছাড়তে হয়েছে। অভয়কে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা চিত্রার সফল হয়নি। আবার বউয়ের চেয়ে ছোট কাজ অল্প মাইনের কাজও সে করবে না। চিত্রা অনেক ভেবে বুঝেছে, অভয়ের সহকর্মী হওয়া ছাড়া ওকে কাজে লাগাবার আর কোনো পথ নেই। তাই সে মার্কেটের কাছে একটা ছোট ঘরভাড়া নিয়ে অভয়ের সঙ্গে মিলে দর্জিখানা আর লন্ড্রির ব্যবসা খুলেছে।

খবরাখবর আদানপ্রদান, কলেজস্ট্রিটে বইপাড়ায় গিয়ে শশা কেসে সাজানো বইয়ের মলাট দেখা আর পরম প্রিয়জনের মতো প্রিয় লেখকদের নামগুলি উচ্চারণ করা—এসবের মধ্য দিয়ে জীবনের যে ছক সহদেব তৈরি করে নিয়েছে, তার সঙ্গে দোকানে বসে মেয়েদের গয়না গড়ানোর ব্যাপারটা সে কিভাবে মেলাবে ভেবে পায় না।

তবু বাবার কটুকথা অসহ্য হয়ে উঠলে সহদেব মনস্থির করে নেয় পরদিন থেকে দোকানে যাবে সে। সে সারা দিন ছোট হাতুড়ি দিয়ে, ছেনি দিয়ে কাজ করবে, সোনা দিয়ে গয়না গড়াবে, আর সারারাত অক্ষরে অক্ষরে গড়বে কবিতা। সে অক্ষর সোনার নয় রক্তের অক্ষর। কিন্তু পাঠকের মনে তা রস হয়ে গিয়ে পৌছবে। পাঠকের জন্য রক্ত নয়, তার জন্য রস। ঠিক জীবন নয়, জীবনের নির্যাস। তাই শেষবারের মতো একবার কলেজস্ট্রিটে বই পাড়ায় ঘুরে এল সে। তারপর বাড়ি ফিরে বসল কবিতা নিয়ে। হয়তো এই তার শেষবারের কবিতা। স্বর্ণকার হওয়ার পর সে হয়তো আর বর্ণকার থাকতে পারবে না। শিল্পের দেবী বড় নিষ্ঠুর। ঈর্ষাতুর প্রণয়িনীর মতো সে অন্যের ভজনা সয়না।কবিতা লিখতে লাগল সহদেব।কাটাকুটি ছেঁড়াছিড়ি। এই খাটনিতে আস্ত এক উপন্যাস হয়ে যায়। কিন্তু একটি কবিতা তার কাছে একটি উপন্যাসের চেয়েও বেশি। একটি মহাকাব্য।...প্রকাশের বেদনার চেয়ে বড় বেদনা নেই, প্রকাশের আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দও অসম্ভব। —যে নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মকথা'য় (সাহিত্যসংখ্যা দেশ, ১৩৮২) লিখেছিলেন—যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তারাই জানেন কবিতা

লেখায় আনন্দ কত বেশি। কবিতা যতই দুর্বল, আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হা োক না তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায় তেমন আর কোনা ো রচনায় যায় না, তাকে যেন এই গল্পের নামচরিত্রে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করা যায়। উত্তরণ'(দেশ, কার্তিক ১৩৬৪), জন্মদিন' (বসুধারা, ফাল্গুন ১৩৬৫), লেখিকা (জনসেবক, পূজাসংখ্যা ১৩৬১) আর কিছুটা ভিন্নভাবে সুদর্শন চৌধুরী (মন্দিরা, পূজাসংখ্যা ১৩৫৭) গল্পেও এই স্পর্শকাতর বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন নরেন্দ্রনাথ।

আত্মিক যন্ত্রণার এই চিত্রের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের দিনগত জীবন যন্ত্রণা আর নানাবিধ সম্পর্কের ভাঙাগড়ায় মানুষের মনের বিচিত্র রং বদলানোর গল্পও নরেন্দ্রনাথ প্রচুর লিখেছেন। তার প্রথম দিকের গল্প 'মহাশ্বেতা'য় (অলকা, মাঘ ১৩৫০) বিধবা মেয়ের আবার ভালোবেসে বিয়ে করা ও নতুন সম্পর্কের শুরুতে যে জটিলতার পরিচয় দেখা গেছে, তাকেই আরও কঠিন করে তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ তার 'স্বত্ব' (উলটোরথ, শ্রাবণ ১৩৬৪) গল্পে। গল্পের নায়ক প্রতুল তার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। দেড় বছরের একটি সন্তানসহ এই বিধবা বিয়েতে প্রতুলের বিধবা মা সুভাষিণী প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু প্রতুল তার কথা শোনেনি। তাই নিয়ে প্রায় দু'বছর ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখেননি তিনি। তারপর আস্তে আস্তে তার জেদ, বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ অনেক কমেছে, অনেক নরম হয়েছেন তিনি। সংসারের হালচাল দেখে বুঝেছেন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মায়ের কথা না মেনে অনাচার কদাচার করলেও বিধবা মাকে মানসম্মান নিয়ে থাকতে হলে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে না থেকে সেই ছেলের আশ্রয়েই থাকতে হয়। তাই তিনিও প্রতুলের কাছেই ফিরে এসেছেন। মানসীও সেবাযত্নে শাশুড়ির বিরূপতা কমিয়ে আনতে পেরেছে। তবে মানসীর চার বছরের ছেলে বাবলুকে এখনো তিনি আপন করে নিতে পারেননি। এজন্য মানসীর মনে গোপন ব্যথা রয়েছে, যা স্বামীর আদর সোহাগেও দূর হয়নি।

মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটে যাওয়ায় খুশি প্রতুল বিয়ের তৃতীয় বৎসর প্রথম বিবাহবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করে। উৎসাহটা মানসীরই বেশি। সুভাষিণী প্রথমে ব্যাপারটা না বুঝলেও পরে বাবলুই ধরিয়ে দেয় তুমি কিছু জানো না ঠাকুমা। আজ মা

আর বাবার বিয়ে। ফ্ল্যাটবাড়ির প্রতিবেশীরা উপহার হাতে এলেন, নানারকম খাওয়া দাওয়া আনন্দ আহ্লাদে আসর জমে উঠল। মাঝখানে একবার প্রতুল মানসীর বিয়ের বয়স আর বাবলুর বয়সের অমিল জেনে বিস্মিত এবং চকিত প্রতিবেশীদের সুভাষিণী সহজভাবে জানিয়ে দিলেন বাবলু প্রতুলের প্রথম পক্ষের সন্তান। বউ মারা যাবার পর তিনি ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন।

শ্বাসরোধকারী একটি পরিস্থিতি থেকে তাদের এভাবে বাঁচিয়ে দেবার জন্য মায়ের উপর কৃতজ্ঞতায় প্রতুলের মন ভরে উঠল। তারও পরে সুভাষিণী ছেলে বউকে অনুষ্ঠান শেষে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসতে বললেন, এমনকি বরাবরের বিতৃষ্ণা ভুলে বাবলুকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় ঘুমাতে নিয়ে গেলেন। ঠাকুমার মন জয় করতে পেরে বাবলুও খুব খুশি, মার দিকে সে যেন তাকালইনা। প্রায় ফুলশয্যার মতো সাজানো ফুলের বিছানায় প্রতুলের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও মানসী কিন্তু খুশি হতে পারছে না। কিসের এক কাঁটা যেন তীক্ষভাবে বিদ্ধ করছে তাকে। একসময় আর না থাকতে পেরে মানসী অস্ফুটে বলে উঠল, 'দেখ আমার মনে হচ্ছে মা অত সহজে ছাড়বেন না। আমি যেমন তার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছি, তিনিও তেমনি আমার ছেলেকে কেড়ে নেবেন।...ওঁর অসাধ্য কোনো কাজ নেই। দেখলে না, একদিনের মধ্যে বাবুলকে কি রকম বশ করে ফেলেছেন। বাবলুকে এখন থেকেই হয়ত শেখাতে থাকবেন, আমি ওর আসল মা নই, সৎ-মা।' মনোগহনের এই জটিল গোলকধাঁধায় আমরাও যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার নরেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরুতেই দিয়ে রেখেছিলেন। নানা অবস্থায়, নানাভাবে সেই অধিকার প্রয়োগ করেছে তার গল্পের নায়িকারা। সাহিত্য জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেও নরেন্দ্রনাথ সেই উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছিলেন। বরং সময়ের স্রোতে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে তা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ফিরে দেখা (আনন্দবাজার পত্রিকা পূজা সংখ্যা ১৩৮১) গল্পের নায়িকা সর্বাণী পরপুরুষের হাত ধরে স্বামীর ঘর ত্যাগ করেছিল। অথচ সেই স্বামীকে সে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। 'বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে'—কথাটি

হয়তো ভিন্নধরনে এখানেও সত্যি হয়েছে। সুরপতি আর সর্বাণী একই পাড়ায় ছোট থেকে বড় হয়েছেন, কিন্তু বড় হওয়ার পর দেখার ধরন যে বদলে গেছে তা দুজনেই জানে, দুজনেই সে সম্বন্ধে সচেতন।'সর্বাণীর গরিব বাবা পণ যৌতুক দিতে না পারলেও বিশেষ করে ছেলের ইচ্ছাতেই সুরপতির বাবা অপূর্ব সুন্দরী সর্বাণীকে বউ করে ঘরে এনেছিলেন। কিন্তু বিয়ের আগে সর্বাণীর মুখে যে হাসি ছিল যে আনন্দ ধারা ওর চোখে মুখে উপচে পড়ত তা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। স্বামীর আদর সোহাগ না চাইতেই রকমারি জিনিসের যোগান, কিছুই সর্বাণীকে খুশি করতে পারে না। সর্বাণী স্বামীকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদ্ধ করে—তোমার কী হয়েছে বলত। দিদি বউদি সবার কাছেই শুনেছি ফুলশয্যার রাতেই তাদের—আর আমাদের এতদিন গেল—'। সুরপতি তার সংযমের কারণ ব্যাখ্যা করে বলে এক সন্ন্যাসীর উপদেশ একবছর এভাবে থাকলে তাদের খুব ভালো হবে। কিন্তু সর্বাণী সে কথা মানতে পারল না। প্রায় রাগ করেই সে বাপের বাড়ি চলে গেল, সুরপতিও অন্যত্র বদলি হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু তিনমাসের মাথায় সর্বাণী দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল। ভালো বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেই বাড়ি মনের মতো সাজাল সর্বাণী। তারপর স্বামীকে একদিন সোজাসুজি বলল "তোমার সন্ন্যাসী উন্ন্যাসী সব বাজে কথা, ভালো ডাক্তার দেখাও তুমি।" সুরপতি অনেক আগেই ডাক্তার দেখিয়েছেন, আর সে ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলেছে এ তার জন্মগত অর্গানিকে ডিফেক্ট, এই অসম্পূর্ণতা সারবার নয়। ডাক্তার তাকে আরও দায়ী করলেন জেনেশুনে একটি মেয়ের সর্বনাশ করার জন্য। সুরপতি নিজেও জানেন বিয়ে করা তার ঠিক হয়নি, কিন্তু বাল্য প্রণয়িনীকে হাতছাড়া করার মতো মনের বল তার ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

ক্রমশ সর্বাণীর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল। সে অতিথিদের সামনে প্রতিবেশীদের সামনে হাসি খুশি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি আর সুরপতির সামনে হয়ে যায় বিষকন্যা। তারপর নীরদ নামে এক অল্পবয়সি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলল। প্রথমে গোপনে পরে প্রায় প্রকাশ্যেই তাদের আদর সোহাগ শুরু হল। সুরপতি একদিন আর সহ্য করতে না পেরে নীরদকে ঘাড় ধরে বের করে দিলেন বাড়ি থেকে।

আর তার পরদিনই সুরপতির অফিসে থাকার সুযোগে সর্বাণী যাবতীয় সোনাদানা নগদ টাকা এমনকি ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিয়ে নীরদের সঙ্গে পালিয়ে গেল। সুরপতি প্রথমে ভেবেছিলেন মামলা করবেন, চুরির দায়ে ওদের নামে থানায় ডায়েরি করবেন কিন্তু কিছুই করেননি। শুধু চেষ্টা করে এক অখ্যাত অজ্ঞাত ছোট স্টেশনে বদলি হয়ে এসেছেন।

গল্প কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দীর্ঘদিন পর সর্বাণী আবারো একবার সুরপতির কাছে এসেছিল, তিনি তখন অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী। ভাই, ভাইপো, নাতি নাতনির সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকলেও মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ সুরপতি রাস্তার ধারের ঘরখানিতে নিজের একাকীত্ব নিয়েই থাকেন, সর্বাণী গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সচ্ছল গৃহিণীর ছাপ তার সর্বাঙ্গে। সর্বাণী সুখী হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে সে 'মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে বলল, একথা কি কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে? জীবনে পুরো সুখ কি কারো হয়?' জানা গেল নীরদকে বিয়ে করেও সর্বাণী সন্তানসুখ পায়নি। কিন্তু তাতে সুরপতির আর কিছু এসে যায় না। তারপর সর্বাণী এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। একদিন সে সুরপতিকে নিঃস্ব করে দিয়ে তার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে জানে আজ আর সব ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, তবু চেকবই খুলে, তার সামান্য কিছু দিয়ে দেবার অনুমতি চাইল সে। কিন্তু সুরপতি তাতে রাজি হলেন হাত বাড়িয়ে এই প্রথম পরস্ত্রীর কোমল সুন্দর হাতখানি নিজের মুঠির মধ্যে, নিয়ে বললেন না তুমি যে দিতে চেয়েছ এই যথেষ্ট। তুমি যে এসেছ এই যথেষ্ট। জীবনে যে আর একবার দেখা হল এই যথেষ্ট আর আমার কিছুতে দরকার নেই।

কিন্তু এই জীবনতৃষ্ণা সবসময় মিটে না, তা সম্ভবও নয়। 'স্ফুলিঙ্গ' (আবাহন, আশ্বিন ১৩৫২) গল্পের রাধা সমব্যবসায়িনী আর ক'জনের সঙ্গে সন্ধ্যায় লাইট পোস্টের গাঁ ঘেষে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করে। তার মুখখানি শুধু কচিই নয় সুন্দরও। রূপ যাদের উপজীবিকা সৌন্দর্য তাদের মধ্যে কদাচিৎ মেলে। রাধাকে সেই ব্যতিক্রমের মধ্যে ফেলতে হয়। রাধার শরীরে জুৎ নেই। আগের রাতে দুটো খাকি পরা শিখ বড় জ্বালিয়েছে, আজ বিশ্রাম নিতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু গরজ বড় বালাই। পেটের

তাগিদে শরীরের ক্লান্তি আর অবসাদকে উপেক্ষা করতেই হয়। শেষ পর্যন্ত রাধাকে একজনের মনে ধরে, তাকে নিয়ে রাধা ঘরে আসে। কিন্তু কেমন যেন এক অস্বস্তি ফুটে ওঠে রাধার চেহারায়। সে বার বার আগন্তুক শরতের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। শরৎও ব্যাপারটা লক্ষ্য করে,'চেনা লোকের মুখ মনে পড়ছে নাকি? কার মুখের মতো মনে হচ্ছে? রাধার মুখ দিয়ে যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল আমার মেজদার।স্বভাবতই এরপর সেদিন ব্যবসা আর জমল না। তবে রাধার মজুরি সে ঠিকই পেল। এই জীবনে আসার আগের জীবনের অনেক কথাই সে বলল শরৎকে। আর শরৎ যখন তাকে প্রস্তাব দিল কোনো আশ্রমে-টাশ্রমে যেতে চায় কিনা, ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল রাধা তাহলে দিন না একটু বলে কয়ে, আমার আর মন টেকে না এখানে। আর ভালো লাগে না এসব।

বাইরে এইসব কথাবার্তা চললেও ভেতরে ভেতরে পরস্পরের স্বরূপ বুঝতে তাদের কারোরই ভুল হয়নি। তবু পরদিন এসে রাধাকে আশ্রমে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে শরৎ বিদায় নিল। আর শরৎ বেরিয়ে যেতেই শোনা গেল পাশের ঘরের কুমুদিনীর গলা যেভাবে খদ্দের ঠকাচ্ছিস তাতে তোর ব্যবসা বন্ধ হল বলে। শরীর ততা বাপু মাঝে মাঝে সকলেরই খারাপ করে। সেদিন না বেরোলেই হল। কিন্তু বেরোবিও, টাকাও নিবি, শেষে মেজদা বলে বিদায় করবি খদ্দের!' রাধা একথার কোনো প্রতিবাদ জানাল না। মনে তারও সন্দেহ, খদ্দেরটিকে রীতিমতো ঘুঘুই মনে হয়েছিল, ঠাট্টা সে নিশ্চয়ই হজম করবে না। হয়তো আবার এসে সুদে আসলে আদায় করবে। কিন্তু তারপরই রাধার মনে হল যদি সত্যিই লোকটা এমন সরলই হয়, সত্যিই যদি আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্য আসে, তা হলে? হঠাৎ শ্বাস যেন রোধ হয়ে এল রাধার, তাহলে সে চলে যাবে এখান থেকে। এই পঙ্ককুণ্ডের মায়া সে আর করবে না। আশ্রমের সেই সুন্দর পবিত্র জীবন, যেখানে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মতো সে থাকবে পড়বে, তাতে কাপড় বুনবে, তারপর—রাধার মুখ এবার সত্যি আরক্ত হয়ে উঠে। গল্প শুরুতে যে ছিল খদ্দের ধরার প্রতীক্ষায়, গল্প শেষে তাকেই সহজ জীবনে ফেরার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল করে তুলে গল্পকার গল্পটিতে সমস্যার এক গভীর ব্যাপ্তি এনে দিয়েছেন।

‘পটক্ষেপ’ (আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৫২) গল্পের শ্রীলতাও রাধার মতই রূপোপজীবিনী, কিন্তু অভিনেত্রীর খ্যাতি ও পরিচয় তাকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব। রাধা শুধু কল্পনা করেছে, আর শ্রীলতা কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। গল্পের শুরুতে অভিনেত্রী শ্রীলতা তার নাট্যকার ও নায়ক বন্ধুর কাছে সাহায্য চেয়েছে হিমাংশুর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে। শিল্পী জীবনের সঙ্গে উচ্ছৃংখলতার আর উচ্ছৃংখলতার সঙ্গে জীবন রহস্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নিয়ে এতদিন শ্রীলতার মনে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই সে জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত রহস্য খুঁজতে চেষ্টা করেছেবিদ্বানের মধ্যে, চরিত্রবানের মধ্যে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্যে। তাই গল্প শেষে সেই শ্রীলতাই হিমাংশুর হাত ধরে নতুন জীবনে প্রবেশ করার মুহূর্তে দীর্ঘদিনের সেই বন্ধুর কাছে আবারও সাহায্য চেয়েছে। বঞ্চিত অনুরক্ত সেই বন্ধুর মনে হয়েছে জানি আজ এই সাহায্যের অর্থটা কি? কিছু বলতে পারলাম না। শ্রীলতার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ কিভাবে সম্ভব হয়েছে, তার ব্যাখ্যা গল্পে না থাকলেও গল্পকারের মানসিকতা জানা থাকলে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পতিতা চরিত্রের দূরাগত ছায়া পড়েছে নরেন্দ্রনাথের রত্নাবাই গল্পে (বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫৩)। নর্তকী রত্নাবাই একমাত্র সন্তানের জন্য খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের মোহ বিসর্জন দিয়ে শুধু মা হয়েই বাঁচতে চেয়েছে। অসংখ্য মুগ্ধ স্তাবকের ভিড়ে একবারই শুধু ভুল করে ভালোবেসেছিল সে। আর সেই ভালোবাসার ফলকে বুকে তুলে নিয়ে প্রথম যৌবনের প্রমত্ততাকে বিসর্জন দিয়ে শান্ত ঘরোয়া জীবন বেছে নিয়েছে। কিন্তু রক্তের টান দুর্বার, তাই বুঝি ছেলে চন্দনও ঘরে সাধ্বী স্ত্রীকে ফেলে আসরের বাইজীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেকে ফেরাবার চূড়ান্ত মূল্য হিসাবে রত্নাবাই তার দীর্ঘদিনের সযত্নে লালিত দেহের শুচিতাকেও বিসর্জন দিতে তৈরি হয়েছে। কিছুটা আদর্শবাদের আরোপ এই গল্পে লক্ষ্য করা যায়।

‘বিদ্যুৎলতা (‘বিজয়িনী’ নামে, ইদানীং, পূজা সংখ্যা ১৩৫৭, নূতন নামকরণ ১৩৬৮ সালে প্রকাশিত বিদ্যুৎলতা গল্পগ্রন্থে) গল্পের নায়িকা বিদ্যুতা দেহব্যবসায়ে এলেও বুচি, পাঁচি, ক্ষেন্তি, চাপা, মালতী, সোহাগির দলে সে নয়। রূপসী তো বটেই, গানবাজনার

সঙ্গে লেখাপড়াও কিছু কিছু জানে। বিদ্যুৎ চিঠি লিখতে জানে, নভেল পড়তে জানে, এমনকি বেলা আটটার গাড়িতে যখন কলকাতার ডাক এসে পৌঁছোয়, হকারের কাছ থেকে চার পয়সা দামের একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত নেয়। কাগজ থেকে খবর অবশ্য সে পড়ে না। পড়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন, আইন আদালতের কাহিনি। পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের ভিড়ে শহরে পা ফেলার জায়গা নেই, তাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা ঠিক করেছেন শহরের মাঝখানের এই পতিতা পল্লীটিকে বাইরে সরিয়ে ফেললে বেশ খানিকটা জায়গার সংস্থান হবে। সেই অনুযায়ী পল্লীতে নোটিশও এসে গেছে, তিরিশ তারিখের মধ্যে সবাইকে উঠে যেতে হবে। শুনে সকলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। সবাই মিলে হাজির হল বিদ্যুতের কাছে, কি করা যায় তাই বুঝতে। বাড়িওয়ালি মাসি সুখদার অবশ্য তেমন চিন্তা নেই দূরে যেতে হবে বলে, আমরা যেখানে শহরে সেখানে। মধু যেখানে পিঁপড়ে সেখানে এই হল তার যুক্তি।

কিন্তু বিদ্যুৎ তা মানতে রাজি নয়। ঘর তারা কিছুতেই ছাড়বে না। এ ঘর কেউ পেয়েছে মার কাছ থেকে, কেউ পেয়েছে পাতানো মাসির উত্তরাধিকারিণী হয়ে, কেউ বা এসেছে পরম বিশ্বাসী ঘৃণাভাজনের হাত ধরে। যে মেয়েরা পরস্পরের প্রতিযোগিনী, যারা একজন আরেকজনের খদ্দের ভাগিয়ে নেয়, তারাই আজ একজোট হয়ে বিদ্যুতের উপর নির্ভর করল। বিদ্যুৎ প্রথম কৃপাপ্রার্থী ক্ষিতীশ দারোগার সঙ্গে কথা বলল, তারপর উকিল ভুবনবাবুর বাড়ি গিয়ে মিনতি জানাল, কিন্তু কেউই আশ্বাস দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে বিদ্যুৎ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে গেল। মেয়েরা সাজসজ্জা শুরু করেছিল, কিন্তু বিদ্যুতের ধমকে সব ছেড়েছুড়ে সাদাসিদে আটপৌরে শাড়ি পরে খালি পায়ে যেতে হল সবাইকে। চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দুপ্রসাদ বহুদিনের চেষ্টায় শহরের বুক থেকে এই দুষিত ক্ষত সরাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাই তিনি প্রথমে দেখা করতেই রাজি লেন । পরে রাজি হলেন এই শর্তে যে শুধু একজন আসতে পারবে, দলবল নয়। বিদ্যুৎ এসে পূর্ণবাবুর পা জড়িয়ে ধরল, নিজেদের দুর্ভাগা জীবনের কথা জানাল, আর অভিভূত পূর্ণবার তাকে মাতৃসম্বোধন করে কথা দিলেন সুবন্দোবস্ত না করে অন্য কোথাও তাদের পাঠাবেন না।

খবর শুনে রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের দল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। গাড়ি বোঝাই করে হই হই করতে করতে বাসায় ফিরে এল তারা। বাড়িওয়ালি মাসির খরচে বিদ্যুতের এই জয় উপলক্ষে সবাই আজ আনন্দ করবে। কিন্তু বৃদ্ধ পূর্ণবাবুর ‘মা’ ডাক বিদ্যুতের মনের গভীরে যেন ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিয়েছে, তার চোখে ভাসছে চুরি করে দেখা ভুবন উকিলের বাড়ির অন্দরমহলের ছবি। বিদ্যুতের বয়সী একটি সুন্দরী বউ একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে জলখাবার দিচ্ছে। প্রায় জোর করেই মেয়ের দল এসে বিদ্যুৎকে সাজিয়ে দিয়ে গেল। একটু পরেই গলির মধ্যে শুরু হল কুঁচি আর ক্ষেন্তির লড়াই।

‘ক্ষেন্তি ধরেছে বঁচির চুলের গোছা, আর কুঁচি তাকে দমাদম লাথি মারছে, ‘হারামজাদি, তুই আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিবি?

ছিনিয়ে নেব কেন লো। ফটকে যেচে এসে আমার গলা ধরল না? খেদি, ধাড়ী, তোর আছে কি লো, যে ফটকে যাবে তোর কাছে?

আর এরই মাঝখানে ক্ষিতীশ দারোগা যখন হাসিমুখে বিদ্যুতের কাছে জানতে চাইল কিভাবে সে বুড়ো পূর্ণ চৌধুরীর বাসনা পূর্ণ করেছে, তখন বিদ্যুৎ আর সহ্য করতে পারল না। দারোগার পায়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল, “তাড়াও, আমাদের তাড়িয়ে দাও। মূল সুদ্ধ উচ্ছেদ করে দাও আমাদের। শুধু রাণীঘাট থেকে নয়, ছাতিমতলার মাঠ থেকে নয়, সারা পৃথিবী থেকে আমাদের একেবারে নিখোঁজ করে ফেল।” কিন্তু বিদ্যুতের মনের ঝড়ের খবর দারোগার জানার কথা নয়, চিন্তায় আসার কথাও নয়। তাই দারোগাবাবু ভাবলেন, হারামজাদি সুখদা বোধ হয় হাঁড়িখানেক ধেনো মদ গিলিয়েছে। নইলে সহজে এত মাতলামি করবার মতো মেয়ে ও নয়।

অনেক গুণ, অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎলতা সোহাগিদের দল থেকে, ওই জীবন *থেকে* বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু ‘শুভার্থী’ (দেশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫) গল্পের মালতী পেরেছিল। আদর্শবাদী স্বদেশি নেতা হেমাঙ্গবাবু অনেক চেষ্টা করেও তার বন্ধু অনিলকে বারাঙ্গনা পল্লিতে যাওয়া থেকে আটকাতে পারেন না। অথচ ঘরে অনিলের স্ত্রী পুত্র কন্যা সবই রয়েছে, সংসারটি নষ্ট হবার মুখে। অনিল হয়তো হেমাঙ্গবাবুর ক্রমাগত অনুরোধ উপরোধেই মালতীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু একেবারে বন্ধ

করতে পারেনি। তখন হেমাঙ্গবাবু নিজেই একদিন মালতীর কাছে গিয়ে অনিলের পরিবারের কথা বলে তাকে অনুরোধ করলেন সে যেন দলকে আর তার কাছে আসতে না দেয়, একটা সংসারকে যেন ধ্বংসের হাত হকে বাঁচায়। মালতী তাকে কথা দিল, এবং কথা রাখলও। তার অনেকদিন পর লতী একদিন হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলল ওই নোংরা জীবন আর তার কালো লাগছে না, সে চলে আসতে চায় সেখান থেকে। হেমাঙ্গবাবু যেন একটা কাজ ঠিক করে দেন। হেমাঙ্গবাবু তার এই পরিবর্তনে খুশি হলেন। কাজের ব্যবস্থাও করলেন, কিন্তু মালতীকে আর খুঁজে পেলেন না। সে ওই নিষিদ্ধ পল্লি থেকে কোনো এক সুযোগে পালিয়ে গেছে। গল্প শেষে হেমাঙ্গবাবু বলছেন তবু তাকে একবার দেখতে চাই, আমি যার ভালো করতে চেয়েছিলাম, যার মনে ভালো হবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছিলাম, একটি সুন্দর উন্মেষ, সার্থক সম্ভাবনা উদ্রেক করে দিয়েছিলাম তার পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করবার বাসনা আমি আজও ছাড়িনি।

এমনি পঙ্কে জন্মেও পঙ্কজা হবার আরেকটি গল্প 'জয়ন্তী' (বঙ্গদেশ, বৈশাখ ১৩৭৩)। যেখানে মাতাল খদ্দেরের গান শোনাবার অনুরোধে রূপজীবা সেই মেয়েটি হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান ধরে এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর। গলা তেমন ভালো নয়, সুরও নয় নির্ভুল। তবু চকিত শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে জানায় 'আজ পঁচিশে বৈশাখ। সকালে রেডিওতে বাজছিল। অনেকদিন আগেই গানটি আমার শেখা ছিল। ভুলে গিয়েছিলাম। আজ নতুন করে তুলে নিলাম।'

'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' (ভারতবর্ষ, পূজা সংখ্যা ১৩৬৫) গল্পের পতিতা সুধা তার ফলাও ব্যবসা ছেড়ে তার বাবু পরেশের ডাকে সাড়া দিয়ে তার গানবাজনার দলে যোগ দিল। আর পরেশকে সন্দেহ করে তার বউ গলায় দড়ি দিলে পরেশ সুধাকে রেজেস্ট্রি বিয়ে করে ঘরের বউ বানিয়ে নিল। সুধা এখন দুই ছেলে মেয়ের মা, আরও একটি আসছে। একসময়ের রাজসিক অভ্যেস সব ছেড়ে সুধা পুরোপুরি গৃহস্থ ঘরের বউ হয়ে গেছে। এক হাতে ঝি চাকর আর রাঁধুনির কাজ করে। পরেশের কাছ থেকে সে সংসার পেয়েছে, সন্তান পেয়েছে, তার মতো কোনো মেয়ের পক্ষে এ আশাতীত পাওয়া। কিন্তু তবু সুধার মনে কোথায় যেন গোপন এক কাঁটা বিধে আছে। স্বামী পরেশ এখনো সেই

গানবাজনার দল নিয়ে আছে। সুধার নামেই দলের নাম সুধা হালদার ও সম্প্রদায়, বিয়ের আগেই পরেশ দলের এই নাম দিয়েছিল। সংসারী হবার পর সুধা আর দলে থাকেনি তবু দলের নাম ওটাই রয়ে গেছে। পরেশের সংসার চালানোর রসদও ওই দলের অনুষ্ঠান থেকেই আসে। তবু সুধা মনকে বোঝাতে পারে না। সে দল ছাড়লেও পরেশের জন্যে তার মনে স্বস্তি নেই। দলের রাধাকে নিয়ে পরেশ কী যে করে, তা কি সুধা নিজে রাধা সেজে জেনে আসেনি?'পরেশ যতই বলুক সে ওসব ছেড়ে দিয়েছে সুধার তবু ভয় যায় না। সে পরেশের কথা বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই সূধা কালীঘাটের এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এক অব্যর্থ কবচ নিয়ে এসেছে। এ কবচের ছোঁয়া যার গায়ে লাগবে অন্য কোনো মেয়ে তার আর মন টানতে পারবে না, দেহ তে পারবে না। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে কবচ হাতে করে যে প্রথম ছুঁয়েছে, পুরুষ চিরকালের জন্য তার হয়ে থাকবে। তাই দলের বায়নার খবর নিয়ে মণিঅর্ডারের পিয়ন এসে দরজার কড়া নাড়লে 'সুধা আলগোছে পরেশের কপালে কবচটা দুইয়ে দিল, তারপর সদরের কড়া নাড়ার শব্দে আর একবার সাড়া দিয়ে বলল, যাই।'

কিন্তু বারবধূর কুলবধু হবার সাধ শ্রীলতা বা সুধার মিটে থাকলেও তা ব্যতিক্রম মাত্র। এই স্বপ্নের ব্যর্থতাই সাধারণত তাদের প্রাপ্য হয়। আর এই ব্যর্থতার যন্ত্রণা ও তারজন্য চরম মূল্য দেবার কথা নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন তার জামাই' গল্পে (দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৬০)। কৃপানাথদে'র গলিতে দোরের সামনে রাতের পর রাত আগন্তুকের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে হত প্রমদাকে। অবশ্য সুন্দরী প্রমদাকে খদ্দেরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না। তারপর তেইশ বছর বয়সেবকুল কোলে আসার পর সে ওই নোংরা গলি ছেড়ে বেলগাছিয়ার বস্তিবাড়িতে এসে বাসা বাঁধল। নিজের পেশায় তার ঘেন্না ধরে গেছে। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দোতলা বাড়ির অল্পবয়সি বউটির স্বামী শাশুড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের ঘরকন্না দেখতে দেখতে প্রমদা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—তার বকুলকে কিছুতেই সোনাগাছিতে পাঠাবে না সে, বোসেদের বউয়ের মতোই একটি সোনার সংসার বকুলের সে গড়ে দেবে।

লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করে, অফিস-আদালতের সামনে বসে পান বিক্রি করে মেয়েকে মানুষ করার সাধনা চলল প্রমদার। মেয়ে স্কুলে ভর্তি হল, তারপর স্কুল ছেড়ে কলেজে। বি. এ. পাশ করে এক প্রফেসরের স্বামীর চেষ্টায় সরকারি অফিসে চাকুরি পেল বকুল। মা পান বিক্রি আগেই ছেড়েছিল, এবার সে ঝি-গিরি থেকেও মাকে ছাড়িয়ে আনল। মেয়েকে ভালো ঘরে বরে বিয়ে দেবার স্বপ্ন প্রমদার, কিন্তু মেয়ে কুল সে স্বপ্ন দেখতে চায় না।নিজের অবস্থান সে ভালো করেই জানে, তাই পারতপক্ষে ওসব চিন্তাও করে না সে। প্রমদা সেটা বুঝতে চায় না। মেয়েকে পরিষ্কারই বলে আমার জামাই চাই, ঘরভরানাতি নাতনি চাই।সেই দোতলা বাড়ির বউয়ের মতো আমি তোকে ভরা সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই যে বকুল। তারপর পাঁচ ছমাস চাকরি করার পর বকুলের পরিবর্তন শুরু হল। সে এখন রঙিন শাড়ি পড়ে, সুন্দর করে চুল বাঁধে, নানা রকম প্রসাধন করে, সুর করে কবিতা আওড়ায়। ‘গোছায় গোছায় ঘরে নিয়ে আসে রজনীগন্ধার ডাঁটা। একদিন চোখে পড়ল, বকুলের খোঁপায় লাল গোলাপ ফুল গোঁজা।’

বকুল স্বীকার না করলেও প্রমদা জানে তার মেয়ে ভালোবেসেছে। কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা পেয়েছে কিনা এ বিষয়ে তার সংশয় যায় না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানে মানুষের মতো অবিশ্বাসী জীব দুনিয়ায় আর দুটি নেই। কিন্তু বকুল বলে সে বড় ভালো, অত ভালো আমি আর কাউকে দেখিনি। এতেই প্রমদার মন ভরে যায়। আর কিছুই জানার নেই তার ‘নাম নয়, ধাম নয়, অবস্থার কথা নয়। মানুষ ভালো হলেই সব হয়। ভালোবাসলেই সব পায়।’

কিন্তু বারাঙ্গনার মেয়ের গৃহাঙ্গনা হবার এই স্বপ্ন দেখতে না দেখতে মিলিয়ে গেল। বকুল আবার উদাসীন, সাজে মন নেই, কবিতা পড়া বন্ধ। অনেক চেষ্টার পর প্রমদা মেয়ের কাছ থেকে জানতে পারল যাকে সে ভালোবেসেছে তার ঘরে বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। সম্পর্কের শুরুতে বকুল যেমন তার অতীত বিষয়ে নীরব ছিল, সেও ছিল তেমনি। কিন্তু তার কথা যে এত মারাত্মক হবে বকুল জানত । প্রমদা প্রথমটায় স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল ‘অমন কত সুন্দরী গরবিনী বউয়ের স্বামী, কত সোনার

চাঁদ ছেলেমেয়ের বাপকে আমি ঘর ছাড়িয়েছি, আর তুই একজনকে ছাড়াতে পারবি নে? খুব পারবি। কি করে পারতে হয় আমি তোকে শিখিয়ে দেব। কিন্তু মার এই প্রস্তাব বকুল ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করল। প্রমদার চোখে ধরা পড়ল বকুল সন্তান সম্ভবা। সে আরও অস্থির হয়ে উঠল, নিয়ে যেতে চাইল সেই বাড়িওয়ালি বিনী মাসির কাছে, সে সব ফন্দি ফিকির জানে, ডাক্তার বদ্যির বাবা। কিন্তু বকুল তাতেও রাজি হল না। কোনো কারণেই সে ওই নরকে পা রাখতে পারবে না। তারপর বকুল অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিল। গয়না বিক্রি করে, বই বিক্রি করে টাকা জোগাড় করল। মাকে প্রণাম করে অবাঞ্ছিত এই মাতৃত্বের দায়মুক্ত হতে শহরেরই এক ডাক্তারখানায় গেল বকুল, সে নিজেই সব ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু দুদিন পর সেই ডাক্তারখানার লোকই রাতের অন্ধকারে গোপন খবর নিয়ে এল,বকুলকে বাঁচানো যায়নি। শুনে প্রমদা পাগল হয়ে গেল। মেয়ের অফিসে গিয়ে প্রত্যেক টেবিলের সামনে চিৎকার করে জানতে চাইত কে তার মেয়ের জীবন নিয়ে এই ছেলেখেলা করেছে। কাজের অসুবিধা হয় বলে অফিসে আর তাকে ঢুকতে দেয় না। ক্রমাগত দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে একসময় মাথা আবার ভালোও হয়ে গেছে প্রমদার। আবার সে ঝি'র কাজ নিয়েছে। আবার সেই বকুলের অফিসের সামনেই পানের দোকান নিয়ে বসে। পান বিক্রি করতে করতে প্রমদা প্রত্যেকটি যুবকের মুখের দিকে তাকায়। ...বকুল যাকে ভালোবেসেছিল তার মুখখানা কেমন। শুধু একবার দেখবে। 'সংস্কারক' (আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৬৪), 'পাখি' (বসুমতী, শারদীয়া ১৩৭০), ইত্যাদি গল্পও এই তালিকাভুক্ত হতে পারে।

এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম চাকুরি পেয়েছিলেন দমদম অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে। সৈন্যদের সরবরাহের জিনিস গা েনা এবং তার হিসাব লিখে রাখার কাজ। আর দশজন মজুরের মতো তাকেও হাতে কলমে কাজ করতে হত। খুব বেশিদিন তাকে সে কাজ করতে হয়নি। তবে এর মধ্যেই সেখানে থেকে কিছু গল্পের উপকরণ তিনি সংগ্রহ করে আনতে পেরেছিলেন।'নেতা' (অরণি, আশ্বিন ১৩৫১) গল্পে সেই বিশেষ সময়ে কারখানায় শাসক-মালিকের অন্যায় আচরণ, শ্রমিক দলের মনে তীব্র অসন্তোষ সত্ত্বেও ঐক্যের অভাব, মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বলা অথচ শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য, জীবিকা অর্জনের পথটুকু ভালো রাখার জন্য সমস্ত

আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে মনিবপ্রভুর তুষ্টি বিধানের চিত্র তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ। আবার শত অভাব দৈন্য সত্ত্বেও মানুষের বিবেক লুপ্ত হয়ে যায় না, নরেন্দ্রনাথ তার সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই এই বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। তাই 'নেতা' গল্পের নায়ক তার বয়স্ক সহকর্মীর অবমাননার বিরুদ্ধে নিজের চাকুরি যাবার বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত, তাই গল্প শেষে দেখি নায়কের সেই উত্তেজনা রুটি রুজির প্রশ্নে স্তিমিত হয়ে আসে। যে বন্ধুর অপমানে সে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল, সেই বন্ধুই যখন নীরবে নতমস্তকে সব সহ্য করে নিল, তখন মিছিমিছি বীরত্ব দেখিয়ে শহিদ হবার বাসনাকে কঠিন যুক্তি দিয়ে দমন করে সেও আর পাঁচজনেরই একজন হয়ে গেল।

১১.৪ নরেন মত্র ও বাস্তববাদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম চাকুরি পেয়েছিলেন দমদম অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে। সৈন্যদের সরবরাহের জিনিস গোনা এবং তার হিসাব লিখে রাখার কাজ। আর দশজন মজুরের মতো তাঁকেও হাতে কলমে কাজ করতে হত। খুব বেশিদিন তাকে সে কাজ করতে হয়নি। তবে এর মধ্যেই সেখানে থেকে কিছু গল্পের উপকরণ তিনি সংগ্রহ করে আনতে পেরেছিলেন।'নেতা' (অরণি, আশ্বিন ১৩৫১) গল্পে সেই বিশেষ সময়ে কারখানায় শাসক-মালিকের অন্যায় আচরণ, শ্রমিক দলের মনে তীব্র অসন্তোষ সত্ত্বেও ঐক্যের অভাব, মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বলা অথচ শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য, জীবিকা অর্জনের পথটুকু খোলা রাখার জন্য সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে মনিবপ্রভুর তুষ্টি বিধানের চিত্র তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ। আবার শত অভাব দৈন্য সত্ত্বেও মানুষের বিবেক লুপ্ত হয়ে যায় না, নরেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই এই বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। তাই 'নেতা' গল্পের নায়ক তার বয়স্ক সহকর্মীর অবমাননার বিরুদ্ধে নিজের চাকুরি যাবার বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত, তাই গল্প শেষে দেখি নায়কের সেই উত্তেজনা রুটি রুজির

প্রশ্নে স্তিমিত হয়ে আসে। যে বন্ধুর অপমানে সে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল, সেই বন্ধুই যখন নীরবে নতমস্তকে সব সহ্য করে নিল, তখন মিছিমিছি বীরত্ব দেখিয়ে শহিদ হবার বাসনাকে কঠিন যুক্তি দিয়ে দমন করে সেও আর পাঁচজনেরই একজন হয়ে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতিতে মানুষের মূল্যবোধের যে নিদারুণ অবক্ষয় ঘটেছিল, তার কিছুটা পরিচয় 'চোরাবালি' গল্পটির মধ্যে ধরা পড়েছে। গল্পটি সম্ভবত অন্য কোনো নামে সেই সময়ের কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মহাযুদ্ধের সমকাল ও তার পরবর্তী সময়ের বাইরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া মানুষকে নরেন্দ্রনাথ এই গল্পে তুলে ধরেছেন।'চোরাবালি' গল্পের নায়িকা রানুকে তার পিতা ও স্বামী, দুজনেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। উজ্জ্বল বখাটে যে গৌরাঙ্গকে রানু একেবারেই সহ্য করতে পারত না, চাকুরিতে উন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার লোভে বাবা অনাদি তার হাতেই রানুকে সঁপে দিয়েছে। নিজের সমস্ত বিরূপতাকে জোর করে দমিয়ে রেখে রানু যখন একটি সুখের সংসার গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই গৌরাঙ্গ নিজের চাকুরি বাঁচাতে ও হাজতবাস থেকে বাঁচতে ওপরওলা সাহেবের কাছে রানুকে ভেট দেবার পরিকল্পনা তৈরি করেছে। গল্পের শেষে আছে, অনাদির কণ্ঠই শুধু নয়, তার মুখের আদলও যেন দেখা যাচ্ছে গৌরাঙ্গের মুখে। রানু এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে, তারপর অদ্ভুত বিবর্ণ হেসে বলে, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। অনির্দেশ্য এক বিষাদ আমাদেরও আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ চোরাবালি থেকে রানুর উদ্ধারের কোনাে পথ নেই, রক্ষকই এখানে ভক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে। নরেন্দ্রনাথের লেখা সম্পর্কে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন, নরেন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস থেকে সমস্ত অবান্তরের আবরণকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে প্রধানত আমরা যে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাব, তিনি কঠিনে কোমলে মেলানো রিয়ালিস্ট নরেন্দ্রনাথ।..এ যেন এক অধর্মনস্ক, প্রায় আত্মবিস্মৃত বাস্তববাদ। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোমলতর আবরণ যখন খসে পড়ে, তখন কঠিন সত্যের এক একটা ঝলক চকিতে বিদ্যুতের ছুরির মতো বুকে এসে বাজে।তখন আর এই রিয়ালিজমের গোত্রকে

চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয় না।' নরেন্দ্রনাথের এই নিঃশব্দ বাতববাদ লেখকের নিজস্বতায় চিহ্নিত। অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখক সুবোধ ঘোষ বা কাছাকাছি সময়ের লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ তখন এক নতুন সংগ্রামী সমাজতত্ত্বের প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে কথাসাহিত্যকে বেছে নিয়েছিলেন। সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন নরেন্দ্রনাথের মতোই নতুন। কিন্তু উপনিবেশ (১৩৫১) উপন্যাসে একটি প্রায় অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত জীবনের উজ্জ্বল রূপচিত্র অংকন করে তিনি তখন পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেও নরেন্দ্রনাথ তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। ১৩৮২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে (আষাঢ়) তার শেষ বেতার কথিকা 'গল্প লেখার গল্প'তে নিজের লেখা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন-'ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক ; একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই উক্তির সূত্র ধরে আমরা নরেন্দ্রনাথের যাবতীয় লেখালেখির মূল সুরটি বুঝে নিতে পারি। প্রয়োজনবোধে ঘৃণা বিদ্বেষের যে শক্তি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের ছিল, নিজের মানসিকতায় এর অভাবের কথা নরেন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে 'সংসারে অনাচার অবিচার আর অত্যাচারের অভাব' যে নেই, এ বিষয়েও তিনি নিজের সচেতনতার কথা ওই একই উক্তিতে ব্যক্ত করেছেন। এই সময়ে লেখা নরেন্দ্রনাথের প্রতিটি গল্প সেই সচেতনতার পরিচয় বহন করছে।

১১.৫ কয়েকটি গল্প বিচারে নরেন মিত্রের সমসাময়িকতা

'রসাভাস' গল্পটি প্রথমে 'বিষক্ষয়' নামে বসুমতী পত্রিকায় ১৩৫২ সালের নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'অসমতল' গল্পগ্রন্থে (১৩৫২) সংকলিত হবার সময় নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এই গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সেই ভয়াবহ আকালের দিনে বিপর্যস্ত মানুষের চরিত্রের অবনমনের দিকটি নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য তীক্ষ্ণতায় তুলে

ধরেছেন। মজুতদার আর কালোবাজারিদের চক্রান্তে শহরে যখন চাল বাড়ন্ত, তখন গ্রামের বউ-ঝিরা পেট কাপড়ে চাল বেঁধে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে শহরে এসে নেমে পড়ে। দিনশেষে আবার তারা গ্রামের বাড়িতে ফিরে গৃহবধুর ভূমিকায় সংসার জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শহরে কখনও কখনও পুলিশের নজর পড়ে গেলে সিকিটা। আনিটা দিয়ে তাদের চুপ করাতে হয়। তবে সবাই তাতে সন্তুষ্ট হয় না। কারো কারো লোভ আরও বেশি, তারা আরও অনেক কিছু চেয়ে বসে। এমনি কাজে পোক্ত পদ্মমণি চাল নিয়ে শহরে আসার সময় তার বিবাহিত বোন ঝি সোহাগী তার সঙ্গে যাবার বায়না ধরে। আজ পর্যন্ত তার কলকাতা শহরটা দেখা হয়নি, অথচ তার মাসি নিত্যিই সেখানে যাচ্ছে। পদ্মমণি প্রথম রাজি হয় না। কিন্তু সোহাগীর কাতর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে সঙ্গে নিয়ে আসে শহরে। শহরে এসে কাজ গুছিয়ে নেবার আগেই পদ্মমণির বোনঝি সোহাগী পুলিশের গোয়েন্দা মুকুন্দর নজরে পড়ে যায়। অভিজ্ঞ পদ্মমণি বিপদ বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সোহাগীর হাত ধরে নানা গলিঘুজি পেরিয়ে এসে পৌছায় তার পরিচিত মজুতদারের দোকানে। কিন্তু চতুর মুকুন্দকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেও সেখানে এসে হাজির হয়। পুলিশি কর্তব্যের খাতিরে এই বেআইনি কারবারের কথা থানায় গিয়ে জানাবার ভয় দেখিয়ে মালিকের কাছ থেকে পাঁচটাকা নজরানা আদায় করে। তারপর পদ্মমণি ও সোহাগীকে তার সঙ্গে থানায় যাবার হুকুম করে। কিন্তু কিছুদুর গিয়েই পদ্মমণিকে ছেড়ে দেয় আর সোহাগীকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাবার নাম করে হয়তো জাহান্নামের দিকেই পা বাড়ায়। অনভিজ্ঞ সরলা গ্রাম্যবধু সোহাগী মুকুন্দর সঙ্গে যেতে যেতে আর্তকণ্ঠে তার মাসিকে ডেকে উঠে। কিছুক্ষণ পর কোথা থেকে যেন পদ্মমণি আবার তাদের সামনে চলে আসে। মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে “কোন লজ্জা করবেন না বাবু। মেয়ে কি ওতে মরবে না পচে যাবে? চোখের ওপর কত দেখলুম। কেবল একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন। রাত ন'টার গাড়ি আমাদের ধরতেই হবে।” এখানে শেষ নয়। সোহাগী তার আপন বোনঝি, সেই সুবাদে একমাত্র গার্জিয়ান হিসাবে আগাম দস্তুরির জন্য অনায়াসে পদ্মমণি মুকুন্দর সামনে প্রসারিত হাত বাড়িয়ে ধরে। বিস্মিত মুকুন্দর প্রশ্নের উত্তরে ফিক করে হেসে বলে, ‘মিথ্যে কেন বলতে যাব বাবু, আপন মাসিই তো। তাতে

কি হয়েছে, কেবল ওরই তো মাসি নয়, সম্পর্কে এখন আপনারও তো মাস শাশুড়ি। পদ্মমণির এই কথাগুলি যেন মুকুন্দর বিকৃত বিবেকের প্রতি কশাঘাত করে উঠল। নিজের দুর্বলতা তার কাছে জঘন্যরূপে ধরা পড়ে গেল। সেই পাঁচ টাকার নোটটি পদ্মমণির হাতে ছুঁড়ে ফেলে দুঃসহ ঘৃণায় মুকুন্দ চিৎকার করে উঠল যা পালা, পালা! শীগগির!'সর্বনাশা ভাঙনের মধ্যেও বিবেকের এই তাড়নার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই রূপায়িত হয়েছে।

'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই কথাটিকে নরেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এর পরিচয় সুন্দরভাবে পাওয়া যায় তার আবরণ' গল্পটিতে।১৩৫১ সালে বাংলায় বস্ত্রসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সে বছর ফাল্গুনের শেষভাগে একদিন বস্ত্রসংকটের দিনরূপেও পালন করা হল। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। গ্রাম শহরে স্ত্রী-মা-বোনদের লজ্জা নিবারণের একখণ্ড বস্ত্র জোগাড় করতে গিয়ে পরিবারের পুরুষকে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হল। এই অসহনীয় পরিস্থিতির কথা নানাভাবে সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় তুলে ধরলেন। নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ' (অরণি, আষাঢ় ১৩৫২) এই ধরনেরই একটি গল্প। পাটের ক্ষেত নিড়িয়ে দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে এসে বংশী দেখল ঘরের ঝপ ভিতর থেকে বন্ধ। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলায় ভেতর থেকে চাপাও স্বামীর চেয়ে উচ্চতর গ্রামে চেঁচিয়ে উঠল, "না বন্ধ করে থাকব কেন। নেংটা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখাব সোয়ামীর আমার কেরামতি কতখানি। ভাত কাপড়ের কেউ নয় কেবল পীরিতের গোঁসাই।" সত্যি করেই চাপা বেরিয়ে এল না, রান্নাঘরে সে আগেই বংশীর খাবার ভাত, কলমীশাক চচ্চড়ি, খানিকটা কাসুন্দি আর কাঁচা লঙ্কা সাজিয়ে রেখেছে। খেয়ে দেয়ে বারান্দায় বসে বহুক্ষণ ধরে তামাক খেল বংশী, তারপরও চাপা দরজা খুলে না দেখে কাঁচি দিয়ে ঝাপের দড়ি কেটে চুপিচুপি ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই পা আর এগুলো না বংশীর। সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহে চাপা মাদুরে ঘুমিয়ে রয়েছে। পাশে কতগুলো ছেড়া নেকড়ার টুকরো, যা চাপা সেলাই করতে গিয়েও পারেনি। মোটা আর ময়লা কথা একটা গায়ে দিয়েছিল চাপা, কিন্তু গরমে ঘুমের ঘোরে লাথি মেরে ঠেলে ফেলেছে।

বংশী তাড়াতাড়ি সেটাই আবার চাপার গায়ে তুলে দিতে গেলে চাপা জেগে উঠে এক দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকাল। বংশী দ্রুত বাঁশের চোঙার ভেতর থেকে কয়েকখানা নোট বের করে শহরে রওনা দেয়। ঠিক করল যে ভাবেই হোক চুরি করে বা ডাকাতি করে একখানা কাপড় আজ বউকে এনে দিতেই হবে। নাহলে গোকুল মণ্ডলের মেয়ের মতো চাপাও হয়তো কখন গলায় দড়ি দিয়ে বসবে।

কিন্তু নগদ টাকা হাতে নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায়ও একটা কাপড় বংশী জোগাড় করতে পারল না। কেউ-বা কটুক্তি করে উঠল কত ভদ্রলোকের বউঝি আছে নেংটা হয়ে, তার চেয়ে ওর বউয়ের লজ্জা হয় বেশি। খালি হাতে বাড়ি ফিরে কোনমুখে চাপার সামনে দাঁড়াবে ভাবতে ভাবতে বংশী আনমনে হাঁটতে লাগল। একসময় খেয়াল হতে সামনে দেখল পতিতা পল্লী, ঠিক সেসময়ই কমলা রঙের চমৎকার একখানা শাড়ি পরে সুখদা এল বিড়ি কিনতে, আর সেই সঙ্গে ভাবী খদ্দেরের কাছে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে।বংশীর চোখ আর যেন ফিরে না। মোহগ্রস্তর মতো সুখদার পেছন পেছন গিয়ে তার ঘরে ঢুকল। আর শাড়িখানা খুলে দড়িতে ভঁজ করে রেখে গামছা পরে সুখদা যখন দরদাম ঠিক করছে বংশী সেই ফাঁকে শাড়িখানা নিয়ে বাইরে রওনা দিল। সুখদা চিৎকার করে তাকে জাপটে ধরল। কিন্তু বংশী টান দিয়ে সুখদার গামছা খলে নিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল শক্ত করে, দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল হাতদুটো। তারপর নিশ্চিন্তে মৃদুহেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় চোখ পড়ল সুখদার ওপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোখের সামনে সেই উলঙ্গ অনাবৃত নারী দেহ। হঠাৎ এই রকম আর একটা অসহায় দেহ মনে পড়ে গেল। চোখ বুজে বংশী কমলা রঙের শাড়িখানা ছুঁড়ে দিল সুখদার কুৎসিত দেহের ওপর। ততক্ষণে পদ্ম আর বৃন্দারা রুদ্ধ দ্বারের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আর পিছনে পিছনে এসে পৌছেছে থানার নরহরি কনস্টেবল। আর একজন নারীকে নিরাবরণ করে বংশী তার স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের আবরণ জোগাড় করতে পারেনি।

১১.৬ নতুন ধারা

২৬ জানুয়ারি ১৩৫৩ এ প্রকাশিত 'পতাকা' গল্পের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে এক নতুন ধারার সূত্রপাত। 'পতাকা' গল্পকে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতের গল্প বললে হয়তো ভুল হয় না। গল্পটির সর্বাঙ্গে দেশকালের চিহ্ন পরিস্ফুট। স্বাধীনতা দিবসে পতাকা তোলা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ঘটনা এখনও বহু লোকেরই মনে আছে। প্রবীণ দেশনায়ক কংগ্রেস নেতা শচীবিলাস স্বাধীনতা দিবসে নিজ গ্রামে পতাকা উত্তোলন করতে পারলেন না মুসলমানদের আপত্তিতে। মৌলবি সাহেব তাদের বুঝিয়েছেন এই তে-রঙা নিশান তাদের নয়, চাঁদ মার্কা লিগের নিশান হল মুসলমানদের নিজের জিনিস। এই সমস্যার সমাধান করল শচীবিলাসের মেয়ে ইন্দিরা, যে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সে মুসলমানদের রাজি করালো সমাবেশে যোগ দিতে, কথা দিতে হল তাদের চটানে আজ পতাকা তোলা হবে না। প্রথমে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও পরে শচীবিলাস মেয়ের কথাতেই রাজি হলেন—বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যাস বশে পলকের জন্য একটু চোখ বুজলেন শচীবিলাস। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মুখে তার গভীর প্রশান্তি পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল। আর কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো বেদনা নেই তার অন্তরে। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলে দুলে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। মাঝখানটিতে খদ্দরের পবিত্র শুভ্রতা আর দুইপাশে হরিত হলুদের ঢেউ! নরেন্দ্রনাথের গল্প ভাণ্ডারে তথাকথিত রাজনীতি বিষয়ক গল্প তেমন নেই। কয়েকটি গল্পে রাজনীতি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে, তবে কোথাও তা জীবননীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।'শোক' (৯ আগস্ট সংকলন ১৩৫৪), বিষাদযোগ' (আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় পৌষ ১৩৭৭), প্রভৃতি গল্পের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। তবে ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ছোটগল্প' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অপঘাত' এই ধারায় এক ব্যতিক্রমী গল্প। এই গল্পের নায়িকা বেলা রাজনীতি আর জীবননীতিকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। একসময় স্বামী পুত্রকন্যার অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গিয়েছিল কিন্তু মৃত্যু আসেনি। পরে সেই বেলাই নিজেদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করতে চেয়েছে। পুতিবাদের মিছিলে শামিল বেলা পুলিশের

গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কোনো উচ্চকণ্ঠ প্রচার না থাকলেও খেটে খাওয়া অসহায় সাধারণ মানুষজনের প্রতি নরেন্দ্রনাথের সহমর্মিতা বুঝে নিতে দেরি হয় না।

দুর্জ্ঞেয় মানুষের মন। প্রাত্যহিক জীবনে যে নিতান্ত সাধারণ মাপের মানুষ, এমন কোনো কোনো সময় যাকে সাধারণের চাইতেও সংকীর্ণ আর তুচ্ছ বলে মনে হয়, কোনো একমুহূর্তে কিভাবে যেন সে-ইহয়ে ওঠে অসাধারণ। এমনি একটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথের 'ক্রৌঞ্চমিথুন' গল্পে। (অলকা, বৈশাখ ১৩৫৩)। স্বাস্থ্যবান ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবক মন্মথ আর একুশ বাইশের ফর্সা ছিপছিপে গড়নের বউ লতা নতুন ভাড়াটে হয়ে আসায় বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা প্রথমে খুশিই হয়েছিল। সংখ্যায় মাত্র দু'জন, জল কল-বাথরুমের ঝামেলা কম হবে। আর দেখতেও জুটিটি নয়ন শোভন। সূচনায় দুপক্ষই প্রসন্ন ভদ্রতায় উৎসুক হলেও কিছুদিনের মধ্যে অন্যদের ধারণা আর সম্বন্ধ দুই-ই পালটাতে শুরু করল। দেখা গেল মন্মথ আর লতা দুজনেই একান্ত আত্মকেন্দ্রিক, তারা কারও সঙ্গে মেশে না, অন্যরা এগিয়ে এলেও পছন্দ করে না আর এই পছন্দ না করাটা বুঝিয়ে দিতেও ভুল করে না। স্বভাবেও দুজনেই বড় স্বার্থপর, প্রতিবেশী মাসিমা লতার কাছে মাছ কোটার বঁটিটি একটু নিতে চাইলে, সে প্রথমে অজুহাত দিল তার বঁটি ভালো নয়। পরে স্পষ্টই বলল ব্যবহারের জিনিস কাউকে দেওয়া মন্মথ পছন্দ করে না। লতা আর মন্মথ দুজন দুজনকে নিয়েই ব্যস্ত। তাদের রকমসকম দেখে মনে হয় সংসারে আর কাউকে তাদের দরকার নেই, আর কিছুতে দরকার নেই। স্বামী স্ত্রীর প্রায় প্রকাশ্য আদর বিনিময়ের দৃশ্য বয়স্ক প্রতিবেশীদের ক্রুদ্ধ করে তোলে, আবার সমবয়সি কেউ এতে আগ্রহ দেখালে লতা ফিস ফিস করে বলে দিদি বলবেন না যেন কাউকে বিয়ে আমাদের হয়নি, আমরা অমনিই—আর হাসিতে ভেঙে পড়া লতার ব্যবহারে অপমানিত হয়ে উঠে গেলে লতার হাসি আরও বেড়ে যায়। স্বামী বাড়ি এলে সব শুনে সেও যোগ দেয় সে হাসিতে। কাউকে গ্রাহ্য করে না তারা— 'সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর তারা একদিকে।'

সকালবেলা একদিন লতা আর মন্মথ স্নানের বাথরুম আর বাইরের কল দখল করে বসে রইল। স্নান যাত্রীর ভিড় জমে গেলেও কারও জায়গা ছাড়বার লক্ষণ নেই। এ

নিয়ে অন্যসব ভাড়াটের সঙ্গে বিশ্রীভাবে ঝগড়া করল মন্মথ। তারপর অফিস যাবার আগে লতার হাতে দুটো সিনেমার টিকিট গুঁজে দিয়ে বলল লতা যেন ভালো করে সেজেগুজে থাকে যাতে বাড়ির সকলের চোখ টাটায়, মন্মথ এসে তাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে। কিন্তু মন্মথ আর এল না, তার বদলে জন কয়েক ছাত্র আর কারখানার কর্মী মিলে নিয়ে এল মন্মথর লাশ। পুলিশের গুলিতে মারা গেছে সে। নানা দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় ছাত্র জমায়েতের গতি রাোধ করেছিল পুলিশ। অন্যদের মতোই কৌতূহলী মন্মথও এগিয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা দেখার জন্য। কিন্তু হঠাৎই পুলিশের গুলিতে তেরো বছরের একটা ছাত্র মাটিতে লুটিয়ে পড়াতে মন্মথ যেন আমূল বদলে গেল। জনতার সঙ্গে মিশে পুলিশের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে এগিয়ে গেল সে। আর এর পরিণতিই এই মর্মান্তিক মৃত্যু। যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সকালে ঝগড়া করেছিল মন্মথ, তাদের কেউ বললেন মন্মথর মনের জোর যে অসাধারণ তা তিনি আগেই বুঝেছিলেন। আবার কেউ বললেন এই ছদ্মবেশী মহাপ্রাণকে তারা আগে চিনতে পারেননি। বাড়ির সমস্ত মেয়েপুরুষ এসে শবদেহ ঘিরে দাঁড়াল। মন্মথ আজ স্বার্থপর, স্ত্রৈণ সাধারণ একজন অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির কারিগর মাত্র নয়, সে বীর সে পুণ্যাত্মা। দেশের জন্য অবলীলায় সে প্রাণ দিয়েছে। প্রায় বোধশক্তিহীন স্তব্ধ লতাকে ছাত্রনেতা সাহস জোগাল, নিষেধ করল কঁদতে, জানাল তারা মন্মথর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। তারপর ফুলের মালায় ঢেকে মন্মথকে নিয়ে চলে গেল তারা জয়ধ্বনি দিয়ে। ‘অসহ্য আর্তনাদে লতা এবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। জয়রথ চলেছে মন্মথের কিন্তু তার পথ লতার হৃদয়ের ওপর দিয়ে।’

১১.৭ মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার

বাংলা সাহিত্যে নরেন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় হল তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার। বাঙালি মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন

জীবনের ছোটখাটো সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়ার ছবি তার বেশিরভাগ গল্পেই ফুটে উঠেছে। তার সাহিত্যজীবনের প্রায় শুরু থেকেই এই দিকটি তার রচনায় এক শক্তিশালী ধারার সৃষ্টি করেছে। ১৩৫৫ সালের পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাঠ গোলাপ' গল্পটিতে নরেন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে মহানগরী কলকাতায় চলে আসা একটি সাধারণ পরিবারের জীবন সংগ্রামের চিত্র অপরূপ সহমর্মিতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কলকাতার সওদাগরী অফিসের সাধারণ কেরানি নীরদের স্ত্রী অণিমা ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে স্বামীর কাছে এসে দ্রুত নিজেকে বদলাতে চেষ্টা করে। অল্পদিনেই পাড়ায় মিশুকে এবং গুণবতী বউরূপে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। স্বামীর সীমিত আয়ের মধ্যেও অণিমা নানা রকম শখ শৌখিনতার সাধ মেটাতে চেষ্টা করে নিপুণা গৃহিণীর মতো। এর মধ্যে টেলিফোনে অদৃশ্য পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলার ঝোক তাকে প্রচণ্ডভাবে পেয়ে বসে। বড়লোক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে অফিসে কর্মরত স্বামীর সঙ্গে গল্পগুজব করার (স্বামীর অনিচ্ছা এবং বারণ সত্ত্বেও) মারাত্মক শখের দাম মেটাতে স্বামী নীরদকে চাকুরি খোয়াতে হল। তারপর শুরু হল কঠিন দিনযাপনের পালা। নীরদের মতই অণিমাও তার সাধ্যানুযায়ী যে কোনোভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো সুযোগই পায় না। নীরদ উপায়ান্তর না দেখে ছেলেমেয়েসহ অণিমাকে আবার দেশে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু অণিমা তাতে রাজি হয় না। নীরদ কোনোমতে ষাট টাকা মাইনের একটা কাজ জোগাড় করেছে কিন্তু তাতে সংসার খরচ কিছুই কুলোয় না। তাই সে কাজের খোঁজে শহর ও শহরতলিতে ঘোরাঘুরি করে। দেশের বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় নীরদের, যারা পূর্ববঙ্গকে পূর্বজন্মের মতোই ভুলে গিয়ে নূতন করে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এক একদিন নীরদ অণিমাকে বলে ওদের মতো সেও মানমর্যাদার কথা চিন্তা না করে রাস্তায় ফিরি করার কাজে নেমে পড়বে। কিন্তু অণিমা কিছুতেই নীরদকে এত নগণ্য কাজ করতে দেবে না। মধ্যবিত্তের সেই আজন্মলালিত অর্থহীন অহংকার অণিমার সম্মতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত সংসার সমুদ্রে ভেসে থাকার চেষ্টায় স্বামীকে সাহায্য করার বাসনায় অণিমা নীরদকে না জানিয়ে তারই মতো ছিন্নমূল দুই বয়স্কা নারীর পরামর্শে কাগজের ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করে। সংসারের

সবকাজ সেরে ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, স্বামী ঘুমালে পর তার অসুবিধে হবে বলে আলোর বদলে হ্যারিকেন জ্বেলে সন্তানসম্ভবা অণিমা মেঝেয় খবরের কাগজ, কাঁচি, আঠার বাটি নিয়ে বসে। আর কাজ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে কখন নিজের অজ্ঞাতসারে সেই কাগজের ঠোঙাভরা ঝুড়ির পাশেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। অণিমার বেঁচে থাকার এই সংগ্রাম লেখক নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির স্পর্শে নতুন তাৎপর্য পায়।

নরেন্দ্রনাথের রচনায় উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ বিশেষ আসেনি। নিজের অভিজ্ঞতার গণ্ডী অতিক্রম করে সাহিত্যের উপকরণ খুঁজে নেবার প্রয়োজন তিনি কখনও বোধ করেননি। তবু মধ্যবিত্ত মানুষের মতো উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বিষয়েও নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা ছিল। 'চড়াই উৎড়াই' গল্পে (দেশ, পূজাসংখ্যা, ১৩৫৫) তিনি একই সঙ্গে এই দুই শ্রেণির মানুষের শ্রেণিগত পরিচয়ের বিভিন্নতা এবং এই পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের অন্তঃস্বভাবে এক আশ্চর্য মিলের ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পের কথক বন্ধু অসিতের বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে এসে যে সব সূক্ষ্ম অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে এই পরিবেশে সে বেমানান। বন্ধুর ধনী পিতার শীতল ব্যবহারে তার আত্মসম্মান আহত হয়। তবু তার আশাভঙ্গের বেদনার কোনো বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে নীরবেই সে বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। চলে আসার সময় অভিজাত বান্ধবীদের নিয়ে ব্যস্ত তার বন্ধু অসিত তাকে বাসেট্রামে যেতে নিষেধ করে এবং রিকশায় যাবার জন্যে দুটো টাকা জোর করে পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্ন মন নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে লেখক একটু ধা স্বস্তির আশায় আত্মীয়া/বান্ধবী মল্লিকার বাড়ি যায়, মল্লিকা সাধ্যানুযায়ী আদর আপ্যায়ন করে, তার আন্তরিক ব্যবহারে কল্যাণ কিছুক্ষণ আগের অপমানের জ্বালা অনেকটাই ভুলে যায়। আবার আসার সানন্দ প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে যখন পথে বেরিয়ে এসেছে, তখনই ছুটে আসে মল্লিকার দুই ছেলেমেয়ে, নিঃসংকোচে কল্যাণের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে যায় অসিতের দেওয়া সেই দুটো টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। একটু অস্বস্তি হল কল্যাণের, আর তক্ষুনি আবার ননী ও ময়না ছুটে এসে নালিশ করল মা তাদের পয়সা কেড়ে নিয়েছে। কল্যাণকে তারা মায়ের কাছে টেনে নিয়ে গেল বিচার চাইতে।

মা কেন পয়সা কেড়ে নিল, এর উত্তরে মল্লিকার সহাস্য উক্তি ‘কথা শুনুন ছেলের। কেড়ে নিয়ে যেন পাড়ার পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবে মা।এ যেন তোমাদেরই পেটে যাবে না। রাত পোহালে এক মুড়ি মুড়কিতেই কতগুলি পয়সার দরকার সে হিসাব আছে?’ তারপর বিমূঢ় হতবাক কল্যাণকে মল্লিকা প্রস্তাব দেয় মাঝে মধ্যে দু-এক নাইট সিনেমা দেখাতে। কোনোমতে সম্মতি জানিয়ে গল্পের কথক কল্যাণ প্রায় ছুটেই গলি থেকে বেরিয়ে আসে। এই গল্পটির মধ্য দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক সমাজের স্বরূপচিত্রণে নরেন্দ্রনাথের দক্ষতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পের চরিত্রগুলি কোথাও নিছক চিত্র হয়নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উঠতি ধনী সমাজের এবং স্বাধীনতা উত্তর কালের ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ অভিজ্ঞতার স্পষ্ট দলিল হয়েছে।

মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও মানসিকতা এবং চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশের তাদের জীবনে প্রেমের এক বিচিত্র রূপের প্রকাশ দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের ‘বিকল্প’ গল্পটিতে। এটি ভাদ্র ১৩৬২ সালে ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরিবার জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই গল্প এক নূতন আলোকপাত করেছে।

দেড়শ টাকা মাইনের কেরানি বিপত্নীক হরগোবিন্দবাবুর সংসার মেয়ে সুধা আর ছেলে হাবুলকে নিয়ে গড়া। সুধার বিয়ে কবে কিভাবে এবং কেমন ছেলের সঙ্গে হবে তা নিয়ে হরগোবিন্দের জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। মেয়েটির গয়নাগাটি সবই তৈরি, কিন্তু কোনো ছেলেকেই আর মেয়ের যোগ্য পাত্র বলে তার মনে হয় না। যে ছেলের চাকুরি ভালো সে দেখতে ভালো নয়। যার এ দুটোই রয়েছে সে আবার জাতে নিচু, তাই জোড় মেলাতে হরগোবিন্দ আর পারছিলেন না। এমন সময় বাড়িতে এল আগন্তুক, গোবিন্দর প্রাইভেট টিউটর ইন্দুভূষণ দাস। চেহারায়, চাকুরিতে, জাতে কোনোদিকেই সে সুধার যোগ্য নয়, তবু সুধা অভাবিতভাবে তার প্রেমে পড়ল, নিঃশব্দ, নিরুচ্চার সেই প্রেম সুধাকে আমূল বদলে দিল, তার বাবার চোখেও পড়ল সেটা। মেয়েকে নানা ইশারা ইঙ্গিতে অনেকবার সাবধান করলেন তিনি। কিন্তু সেই গোপন প্রেমের গতিকে রোধ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হরগোবিন্দ পাড়ার ছেলেদের সাহায্য চাইলেন। অতি উৎসাহী সেই নবনিযুক্ত অভিভাবকদের নির্যাতনে প্রচণ্ড আহত ইন্দুভূষণের মৃত্যু

হল। সুধা চোখে না দেখলেও সবই শুনল, জানল। আর এরপর পরিচিত জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে নিজেকে সে নিঃশব্দে সরিয়ে আনল, বাইরে থেকে সবই আগের মতই রইল কিন্তু ভেতরে কিছুই আর আগের মতো রইল না। বাপ মেয়ের মধ্যে গড়ে উঠল অনতিক্রম্য দূরত্ব। সুধার নীরব বৈধব্য পালন পিতার বুকে পাথর চাপিয়ে রাখে। প্রাণপণ চেষ্টায়ও দেহে কুমারী অথচ মনে বিধবা মেয়েকে তিনি বিয়েতে রাজি করাতে পারেন না। অসহায় পিতা শেষ পর্যন্ত অফিসের সহকর্মীর কাছে একটি ছেলের খোঁজ করেন, এম. এ পাশ এবং বামুন হলেই ভালো হয়, তবে বি. এ পাশ এবং অন্য জাত হলেও ক্ষতি নেই। আর বন্ধুর প্রশ্নবোধক চাহনির উত্তরে মুখ ফিরিয়ে জানান 'জামাই নয়—ছেলের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর।'

এই ১৩৬২ সালেরই পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা 'বন্যা' গল্পে নরেন্দ্রনাথ আবার তার জন্মভূমি পুববাংলাকে ফিরিয়ে আনলেন। 'আত্মকথায় (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২) তিনি লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে। তার পশ্চিমদিকে একটি ছোট নদী কুমার। এই নামটি আমার কানে বড় মধুর লাগে। শব্দটির ধ্বনির জন্যে। নামের মতো এর রূপটিও স্নিগ্ধ শান্ত। বর্ষায় এই নদী প্রতিবছরই প্লাবিত হত। খাল বিল ভরে যেত। কিন্তু দু'একবার বন্যার বছর ছাড়া গৃহস্থের উঠানে কখনও জল উঠত না। তেমনি সারা বছরই নদীতে জল থাকত। চৈত্র কি বৈশাখ মাসেও এ জল কোমরের নিচে নামত না। পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেঁষে চাষি গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেইশস্য খেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র।বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়র।'

মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প :

সাহিত্য সমাজে নরেন্দ্রনাথের পরিচিতি মুখ্যতঃ 'মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার' হিসেবে। খেটে খাওয়া মানুষের গল্পও তিনি লিখেছেন, তবু দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যবিত্ত রোমান্টিকের

মধ্যবিত্ত কথাটির উদ্ভব ইংরেজ আমলে। এমনকি ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে কিছু ছিল না। নিতান্তই চাকুরিজীবী বা তৎস্থানীয় সামান্য ব্যবসাজীবী শ্রেণি—তাকেই আমরা বলি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ..বাংলায়ও ইংরেজ আমলের

পূর্ব পর্যন্ত দুটি শ্রেণির লোককেই আমরা বিশেষভাবে জানি, তারা হচ্ছে (১) ধনী ও (২) নির্ধন—মাঝামাঝি রকমের বিত্তসম্পন্ন লোক যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল এত মুষ্টিমেয় যে, শ্রেণিগত প্রাধান্য তাদের কিছু ছিল না। ইংরেজ আমল থেকে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূত্রপাত। সমস্ত উনবিংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ ছিল আধুনিক কালের শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক, ধারক ও বাহক। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ায় নানারকম সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এই শ্রেণিটিতে ভাঙন ধরেছিল। নরেন্দ্রনাথ তার মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে এই ভাঙনের চেহারাটি বাস্তবনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা, অপরিসীম দারিদ্রের আঘাতে অন্তর্নিহিত আদর্শবোধ ও নৈতিক মেরুদণ্ড কিভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—মনোজীবনের সেই কঠিন সংকটের ছবি নরেন্দ্রনাথের গল্পে এক সংযত ও সংহত রূপ লাভ করেছে।'নেতা', (অরণি, আশ্বিন ১৩৫১), 'চোর' (বসুমতী, মাঘ ১৩৫১), দ্বিচারিণী' (সত্যযুগ, পূজাসংখ্যা ১৩৫৬), প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা যায়। 'নেতা' গল্পের কাহিনি অংশের পটভূমি যুদ্ধসমকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ। সৈনিকদের ব্যবহার্য নানারকমের জিনিস কন্ট্রাকটররা যোগান দেয়, কেউ যাতে বাজে মাল চালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য সরবরাহ ডিপোতে শ্রমিক কর্মচারীদের সেসব জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এমনি এক অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশে উপরওয়ালা সাহেব এসে কাজ ফকির জন্য দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সুরসিক চাটুয্যেকে একদিনের মজুরি ফাইন করে। চাটুয্যের অনুরোধে গল্পের কথক ভট্টাচার্য এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার দায়িত্ব পায়।ঠিক হল পরদিন কেউ কাজ করবে না। কথামতো কাজ বন্ধ রইল। খবর পেয়ে সাহেব এলেন, প্রথমেই সেদিনের দলনেতা কথক জানালো সাহেব ফাইন এবং গালাগালি তুলে না নিলে কাজ চালু হবে না। উত্তরে সাহেব তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন। এবার চাটুয্যের পালা, কিন্তু অবাক কাণ্ড, চাটুয্যে বিনা প্রতিবাদে কাজ করতে রাজি হয়ে গেলেন। চাটুয্যে বাকেট তুলে টিপতে আরম্ভ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই তার অনুসরণ করল। সাহেব খুশি হলেন এবং বলে গেলেন যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছে বাড়তি কাজ করে তা পুষিয়ে

দিতে হবে এবং সেজন্যে ওভার টাইম পাওয়া যাবে না। বরখাস্ত হওয়া নেতা বেরিয়ে আসতে আসতে চাটুয্যের গলা শুনতে পেলেন, ‘আরে বাবা, ওটা স্থান মাহাত্ম্য। প্রথমে দাঁড়ালে ভটচায যা বলেছে আমিও ঠিক তাই বলতুম, আর ভটচায যদি আমার জায়গায় দাঁড়াত তাহলে তার ফলাফল দেখে ভটচায ঠিক তোমাদের মতোই একটা করে বাকেট হাতে তুলে নিত।’ চমকের এখানেই শেষ নয়। গল্পের শেষে দেখি ভটচাও কিছুটা নত হয়ে আবার সেই চাকুরি ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করল। কারণ ঘরে তার অসুস্থ স্ত্রী রয়েছে, রয়েছে আরও কজন যারা বেঁচে থাকার জন্য তার রোজগারের দিকেই তাকিয়ে থাকে।

‘চোর’ গল্পের সদ্য বিবাহিত অমূল্য অভাবের চোর নয়, সে হল স্বভাবের চোর। একটি স্টেশনারি দোকানে কাজ করে সে। তার সামান্য আয়ে দু’জনের ছোট্ট সংসার কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অমূল্য প্রায়ই হাত সাফাই করে দোকান থেকে এটাসেটা নিয়ে আসে। স্ত্রী রেণু অমূল্যর এই স্বভাব দেখে আঘাত পায়, বার বার তাকে অনুরোধ করে এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরে আসতে। কিন্তু অমূল্য নিজের চোর স্বভাবের জন্য লজ্জা তো পায়ই না, বরং তার হাত ধরা পড়ার মতো কাঁচা নয় বলে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। এই একই মানসিকতা থেকে সে বাসে ট্রামে যাতায়াতে টিকিটও কাটে না। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অশান্তি আসে। রেণু অমূল্যকে সৎপথে চলার অনুরোধ করে আর অমূল্য রেণুকে নিজের দুষ্কর্মের সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চায়। নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হল তাকে! আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যর প্রবৃত্তি আর বদলাবে না। কেন না, এসব অভ্যাস মানুষের যায় না, বয়স হলেও না, পয়সা হলেও না, রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে। তারপর সব একাকার হয়ে যাবে ; কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ সব সে সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে?সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বউ। তারপর, একদিন চুরি ধরা পড়ায় অমূল্যর চাকুরি

গেল, এবার সেই চুরিবিদ্যার ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হল তাদের। আর আশ্চর্য, রেণু এখন আর অমূল্যকে ভালো হবার, ভালো থাকবার পরামর্শ দেয় না। বরং চুরির টাকায় কিনে আনা চাল ডাল তেল কয়লা সাগ্রহে গুছিয়ে রাখে। শেষ পর্যন্ত একদিন দোতলার বিনোদবাবুর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে রেখে যাওয়া হাতঘড়িটি চুরি করে নিয়ে আসে রেণু। মনুষ্যত্বের এই পরাভব, অভাবের কাছে বিবেকের এই পরাজয়ে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, শত অভাব দৈন্য সত্ত্বেও মানুষের বিবেক একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। তাই 'নেতা' গল্পের নায়ককে দেখি তার বয়স্ক সহকর্মীর অবমাননার বিরুদ্ধে নিজের চাকুরি যাবার বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে প্রতিবাদ করেছে। আর চোর গল্পের নায়ক অমূল্য নিজে চুরি করাটাকে খুব বাহাদুরির কাজ মনে করলেও এবং তার স্ত্রীকে একাধিকবার তার সহকর্মিনী হতে উৎসাহ দিলেও রেণু যেদিন সত্যি বিনোদবাবুর ঘড়ি চুরি করে আনল সেদিন অমূল্য এতটুকু খুশি হতে পারল না, 'আজ রেণু তার যথার্থ সহধর্মিণী। এতদিন ধরে এই তো অমূল্য প্রত্যাশা করে এসেছে। আজ তার উল্লসিত হয়ে উঠবার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দুখানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোনো সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণকনিত মৃণালভুজ নয়—তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।'

'দ্বিচারিণী' গল্পে পূর্ববাংলার গ্রাম্য গৃহবধূ তরঙ্গ অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। সরকারি সাহায্যে ক্যাম্পে থাকা খাওয়া চললেও স্বামীর ওষুধ পথ্যের খরচ যোগাতে তাকে লোকের বাড়ি ঝি এর কাজ নিতে হয়েছে। তার কাজে কামাই নেই, কাজও খুব পরিষ্কার। ক্যাম্পে তরঙ্গর প্রতিবেশিনী আরও দুই ঝি তাকে এত পরিশ্রম করতে নিষেধ করে—'এখনো আপন বুঝে চলতে শেখ, ফাঁকি দিতে শেখ, নইলে খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরে যাবি আবাগী।'... 'কিন্তু তরঙ্গ এসব মোটেই কানে তোলেনি, এরা যা বলে বলুক। তরঙ্গ তাদের মতো পেশাদার ঝি নয়। সে গৃহস্থ ঘরের বউ, অভাবে পড়ে ভদ্র গৃহস্থবাড়িতে সে কাজ নিয়েছে। তাঁরাও কেউ তাকে ঝি-র মতো

দেখেন না, বাড়ির লোকের মতোই আদর যত্ন করেন।' অথচ এই তরঙ্গই গল্পের শেষে তাদের ডেকে বলে, 'আমার মনিব গো বাসা তো দুইজনেই চেন? একজন যাও হরমোহন ঘোষ লেনে, আর একজন প্যারীমোহন সুর লেনে। যাইয়া বলবা কি, তরঙ্গ আইজ কাজে যাইতে পারবে না, কলেরায় সে মরো মরো। বেছানা ছাইরা ওঠতে পারে না। কাজ উদ্ধার কইর্যা দাও দিদিরা, পান তামুক খাওয়ামু।তার এই পরিবর্তনে পড়শি দুই ঝি খুশি হয়, তারা চলে যায় খবর দিতে। তরঙ্গ প্রাণের দায়ে যে উপায় বের করেছিল, এক মনিবের নিন্দা করে আরেক মনিবের প্রিয় হওয়া, মাইনে ছাড়াও বাড়তি উপহারের ব্যবস্থা করা, তারই পরিণতিতে আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, 'ক্ষ্যান্তরা চলে গেলেও আরও কিছুক্ষণ বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইল তরঙ্গ।...আর হঠাৎ দেখতে না দেখতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল তরঙ্গর। ঠিক এমন তো সে হতে চায়নি। কেন এমন হল?'

তিনের দশকের শেষ থেকে গোটা চারের দশক পর্যন্ত সময় বাঙালি মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের পক্ষে একটা বড় রকমের সংকটের কাল ছিল। নরেন্দ্রনাথ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে এই সংকটকালের সমাজ ও মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছেন। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ চাওয়া পাওয়ার একটি অন্তরঙ্গ রূপের প্রকাশ তার প্রায় সব গল্পেই দেখা যায়। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের জোড়াতালি দেওয়া সংসারে, সাধের সঙ্গে সাধ্যের সমীকরণের প্রাণান্ত চেষ্টায় গলদঘর্ম নারী পুরুষের ছবি নরেন্দ্রনাথ যেন তার অভিজ্ঞতার ভূখণ্ড থেকে তুলে এনেছেন। 'কুলপী বরফ' (লেখন, ভাদ্র ১৩৫৩) গল্পের নির্মলা মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কারেই প্রথমে দূর সম্পর্কিত শহুরে দেওরের কাছে স্বামীর জীবিকা গোপন করতে চেয়েছে। মনোহর যে কুলপী বরফ বিক্রয় করে, আর নির্মলাই যে বাড়িতে সেই খাবার তৈরি করে দেয়,-"এখন পর্যন্ত বাপের বাড়ির তরফের দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা এসব কথা জানে না। তাদের কাছ থেকে এ তথ্যটা নির্মলা অনেক কষ্টে অত্যন্ত কৌশলে গোপন করেছে। স্বামী আরও পাঁচজনের মতো ভদ্ররকমের চাকরি বাকরি করে এটাই সে অন্যকে জানাতে চায়। মনোহরও প্রথমে সম্পর্কিত ভাইয়ের কাছে কিছুটা সংকোচ করেছে, কিন্তু তারপর প্রায় জোর করেই সে

সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে সে। মান বাঁচাবার তাগিদের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত মানুষের সহজ অহমিকা বোধ,ভায়া বরফই বেচি, আর যাই করি, এই যা দেখছ, তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে সব নিজের। মাসে মাসে ভাড়া গুনতে হয় না, কথার তলায় থাকতে হয় না কারো।' আত্মপ্রসাদের এই সুর মধ্যবিত্ত মানুষের একেবারে নিজস্ব।

'কাঠগোলাপ' (আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৫৫) গল্পের অণিমা ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে স্বামীর কাছে এসেছে দেশ ছেড়ে। গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে অণিমার আনন্দের সীমা ছিল না। অল্পদিনেই সে শহরের চালচলন রপ্ত করে নিয়েছে। পাড়ায় তার নাম হয়েছে আলাপী আর গুণবতী বউ হিসাবে। সে 'ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আতাটা, কাটা, খাবারওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর, চিনেবাদাম কিনে নিজের হাতে জিনিস কেনার আনন্দ উপভোগ করে। মাঝে মধ্যে বান্ধবীকে নিয়ে দোতলা বাসের চূড়ায় বসে দুদিকের দোকানপাট, মানুষজন দেখতে দেখতে শহরে থাকার সুখ অনুভব করে। নীরদের কাছে সানন্দে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, 'ফুটপাথ দিয়ে তখন যারা হাঁটে, ভারি অসহায় দেখায় তাদের, তাই না ?' যাই বল, নিজেরা যে গরিব, তা আর মনে থাকে না, যখন দোতলা বাসে উঠি। অবশ্য ট্রামের ফাস্ট ক্লাসগুলিও ভালো। ফ্যানের নীচে বসে যেতে বেশ লাগে। সবচেয়ে মজা লাগে যখন লেডিজ সিটগুলি ছেড়ে ভারিক্কি ভারিক্কি সব পুরুষেরা উঠে দাঁড়ায়। তখন দয়া হয় তাদের জন্য। বুড়ো বুড়ো লোক দেখলে পাশে বসতেও দিই। তাই দেখে অল্পবয়সি ছেলে ছোকরারা কি রকম কাতর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়াও হয়, মজাও লাগে। আমি তার জন্যও যাই মাঝে মাঝে। নির্মল আনন্দ অণিমার কথায়। মধ্যবিত্ত মানুষ হাজারো দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও কত অল্পেই যে সন্তুষ্ট হতে পারে, নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে জানে, তার চমৎকার পরিচয় এখানে রয়েছে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন যায় না। ইতিমধ্যে অণিমার সখের মূল্য দিতে নীরদের চাকুরিটি খোয়াতে হয়েছে। শুরু হল যথার্থ জীবন সংগ্রাম, ফোন গেছে, ট্রাম-বাস গেছে, পাড়া পড়শি, ঠাকুরপো ঠাকুরঝিদের চা জলখাবার খাওয়ানোর পর্বও শেষ হয়ে গেছে, কেউ তারা আর এদিকে ভেড়ে না। সবাই বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা- দু'জনের মধ্যে দিনের মধ্যে দু'তিনবার করে যে ঝগড়া লাগছে, আজকাল তা ঠিক

দাম্পত্য কলহ নয়, দু'টি অধভুক্ত, বুভুক্ষু নরনারীর বিসম্বাদ-পরস্পরকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। ব্যাপারটা বুঝতে আর কারো বাকি নেই। ক্রমশ এই সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে,'খরচ যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া যায়, কমানো হয়েছে। কয়লা ধরাবার জন্যে আগে কাঠ কিনত অণিমা, এখন নিজের হাতে খুঁটে দেয়। আগে লন্ড্রিতে সপ্তাহে সপ্তাহে কাপড় যেত, অণিমার শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ সব আর্জেন্ট। এখন অন্য রকম ব্যবস্থা হয়েছে। দু'একটা জামা কাপড় মাত্র পাঠানো হয় লন্ড্রিতে। তাও অর্ডিনারি চার্জে। বাকি সব নিজের হাতে কেচে নেয় অণিমা। জানলার ধার দিয়ে ফেরিওয়ালারা এখনো যাতায়াত করে, মাঝে মাঝে ডাকে, মা লক্ষ্মী, নেবেন না কিছু? ভালো ছিট কাপড় আছে ব্লাউজের জন্য। এমন সস্তা আর কারো কাছে পাবেন না।' অণিমা কোনো কোনো দিন শুনতে না পাওয়ার ভান করে, কিন্তু যেদিন চোখে চোখ পড়ে, এগিয়ে যায় জানলার কাছে, মধুর হেসে বলে, 'না বাপু, আজ থাক, আমার সব আছে। যখন দরকার হবে, তোমার কাছ থেকেই নেব।' সবদিক বজায় রাখার জন্য অণিমার এই চেষ্টা, আত্মসম্মান রাখতে এই করুন আত্মপ্রবঞ্চনা অণিমাকে এই কঠিন সময়ের সমস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি করে তুলেছে। সমাজের এই বিশেষ শ্রেণিটি সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের কী গভীর জ্ঞান ছিল, আর কী অসাধারণ দক্ষতায় তিনি সেই অভিজ্ঞতার রসরূপ নির্মাণ করেছেন, 'কাঠগোলাপ' গল্পটি তারই প্রমাণ।

'কাঠগোলাপ' গল্পের অণিমা ফেরিওয়ালার কাছে মান রাখতে একটুখানি নির্দোষ মিথ্যে কথা বলেছে মাত্র। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের কাউকে এই মান রক্ষার, মুখ রক্ষার দায়ে আরও যে কত রকমের অভিনয় করতে হয়, তারই জীবন্ত চিত্র নরেন্দ্রনাথের 'অভিনেত্রী' গল্পটি, (যুগান্তর, পূজাসংখ্যা ১৩৫৭)। সত্তর টাকা মাইনের কেরানি বিনয়ের স্ত্রী লাবণ্য রুগ্ন সন্তানের উপযুক্ত যত্ন করতে পারে না টাকার অভাবে। স্বামী-স্ত্রীতে এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে, স্ত্রীর অনুযোগে বিরক্ত বিনয় রেগে গিয়ে বলে, 'ছেলে নিয়ে এর চেয়ে বেশি আদর আহ্লাদ করবার শখই যদি ছিল, কেরানির সন্তান পেটে না ধরে কোনো বড়লোকের ঘরে গিয়ে ছেলে বিয়োলেই হত।' এই অবস্থায় স্বামীর বন্ধু নতুন চিত্র পরিচালক তার প্রথম বইতে লাবণ্যকে সপুত্র অভিনয়ের সুযোগ দিল, ওই রুগ্ন

সন্তানের মায়ের ভূমিকাতেই। দিন তিনেকের শুটিং, তিনশ'টাকার মতো পাওয়া যাবে,—তিনশ'টাকা! রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রইল লাবণ্য। সে যে অনেক। বিস্তর চিকিৎসার জন্যে আগে যা কিছু ধার আছে তা শোধ দেওয়া যাবে। দিয়ে থুয়ে বাকি যা থাকবে তাতে ভালো ফুড হবে বির, ওর নতুন জামা জুততা প্যান্ট আসবে। ওর নামে পঁচিশটাকার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্টও খুলে রাখবে লাবণ্য। বড়লোকের ছেলেদের নামে ব্যাঙ্কে টাকা থাকে বলে সে শুনেছে। সে টাকায় হাত দিতে দেবে না বিনয়কে। কিন্তু তিনশ' টাকাই যদি একসঙ্গে আসে, বিনয়ের জন্যেও কিছু কিনে দিতে হবে বইকি, যে হিংসুটে মানুষ। বেরুবার মতো ভালো জামাকাপড় নেই, তা করতে হবে। একটা সিগারেট কেসের ভারি শখ বিনয়ের। তাও একটা কিনবে লাবণ্য ওর জন্যে। নিজের একখানা ভালো শাড়ি নেই বাক্সে। অবশ্য সে মুখ ফুটে চাইবে না, বিনয় যদি কেনে কিনবে। হাতে অত টাকা এলে বিনয় অবশ্য শাড়ির কথাই আগে বলবে, তা লাবণ্য জানে। তিনশ' টাকা দিয়ে লাবণ্য জীবনের সব সুখ সাধ স্বপ্ন কিনে নেবে, মুহূর্তের মধ্যে সে যেন সব পেয়েছির দেশে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। স্টুডিওর সেটে গিয়ে একগাদা লোকজনের ভিড়ে, নানারকম যন্ত্রপাতি আর চড়া আলোর মাঝখানে কিছুতেই লাবণ্য রুগ্ন সন্তানের মা হতে পারল না। লজ্জায় সংকোচে বারবার মাথায় আঁচল টানতে গিয়ে পরিচালকের ধমক শোনে,-"আপনার লজ্জার অত সময় কই!আপনার ছেলের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। টাইফয়েডের চেয়েও শক্ত অসুখ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে আপনার ছেলে। আপনি যান, ছেলের কাছে। মায়েরসন, তার গায়ে হাত বোলান।' তাতেও কাজ হল না। বিব্রত লাবণ্যকে খালি হাতেই বাড়ি ফিরে আসতে হল।

তারপর অন্য একদিন। সেই পরিচালক বন্ধুটি এসেছে, সেই ছবিটির দুটি পাশ বিনয়কে দেবার জন্য। ঘরে কথাবার্তা চলছে, এমন সময় বাইরে বাড়িওয়ালার গলা শোনা গেল। ভাড়া দু'মাস বাকি পড়েছে, তাগাদায় এসেছেন। বিনয় প্রথম স্ত্রীকে বলল জানিয়ে দিতে যে সে বাড়ি নেই। কিন্তু একটু আগেই সে কথা বলছিল, নিশ্চয়ই তা বাড়িওয়ালাও শুনেছেন, তাই সে বুদ্ধি টিকল না। তখন, বিনয় কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল ; তাহলে বল গিয়ে-বড্ড অসুখ। সদর দরজায় লাবণ্যর সঙ্গে

আগন্তুকের মৃদুকণ্ঠে কি একটু কথা হল। তারপর একজন প্রৌঢ় মতো লোককে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্য ফিরে এল ; আসুন কাকাবাবু। এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে উঠে যাবার পর্যন্ত সাধ্য নেই। লাবণ্য তাকে জানাল বিনয়ের গত দিনে রাত্রে বার পঁচিশেক দাস্ত হয়েছে, শেষের দিকে বমিও শুরু হয়েছিল। আরও বলল, একটু সুস্থ হলে উনি নিজেই গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসবেন কাকাবাবু। বাড়িওয়ালা চলে যাবার পর বিনোদ কাঁথা ফেলে উঠে বসল। প্রশংসা করল লাবণ্যর অভিনয় ক্ষমতার। পরিচালক বন্ধুও তা একবাক্যে স্বীকার করে নিল। তারপরেই প্রশ্ন করল, কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লাবণ্যর চোখ ছলছল করে উঠেছে। প্রাণের দায়ে করা এই মিথ্যাচারের যন্ত্রণা, তাও আবার তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে, লাবণ্যর মধ্যবিত্ত বিবেককে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে, এই লজ্জা তার রাখার জায়গা নেই।

এই মধ্যবিত্ত বিবেকের একটি পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় 'টিকেট' গল্পটিতে, (বেতারে পঠিত, আষাঢ় ১৩৫৬)। অফিস ফেরত শীতাংশু শ্যামবাজারগামী ট্রামটির দ্বিতীয় শ্রেণি লক্ষ্য করেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এককালের সহপাঠিনীর সঙ্গে। মেয়েটিও তার মতো ট্রামেরই যাত্রী। তাই যদিও আজ মাসের নাত্রশে, যদিও পকেটে পারানির কড়ি মাত্র পাঁচটি পয়সাই সম্বল তবু আর সেকেন্ড ক্লাসে ওঠা চলে না, বরং মানসী মিত্রের চোখের সুমুখ দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে গিয়েই উঠতে হয়। নিজের পরাক্রান্ত পৌরুষের পরিচয় দিয়ে কনুইয়ের গুঁতোয় সহযাত্রীদের হটিয়ে স্থান করে নিতে হয় ভিতরে।কিন্তু ট্রামে ওঠার পর শীতাংশুর মনটা হাহাকার করে উঠল। তিন পয়সায় দিব্যি সে সেকেন্ড ক্লাশে চলে যেতে পারত, বাকি দু'পয়সায় গলির মোড়ের দোকান থেকে বিড়ি কিনে নিত। 'নিজের মূঢ়তাকে, নিজের ভুয়ো প্রস্টিজ বোধকে শীতাংশু নিজেই ধিক্কার দিল। কন্ডাকটার এসে টিকেট চাইল কিজ শীতাংশু পকেট থেকে পয়সা বার করার আগেই সে আবার অন্যদিকে চলে গেল। শীতাংশু ঠিক করল আজ আর সেটিকেট কাটবে না। এমন কাজ আগে আর কখনও করেনি সে। বন্ধুদের হাসিঠাট্টায় জর্জরিত হয়েও নয়। তার মনে হয়েছে,-"দুনিয়া জোড়া দুনীতির রাজ্যে কোথাও যখন একটু মাথা গলাতে পারেনি শীতাংশু, না আছে তেমন বুদ্ধি না প্রবৃত্তি,

তখন কি হবে এই ট্রাম বাসের দু'চার পয়সা ফাঁক দিয়ে। তার চেয়ে সততায় অনেক সান্ত্বনা।” কিন্তু আজ হঠাৎ তার যুক্তির মুখ ঘুরে যায়। সে ভাবতে থাকে সে কেন পারবে না, মনে পড়ে যায় মীর বলা কথাগুলি— ‘এই তো অমলবাবু। চাকরি করেন না, বাকরি করেন না, তবু তো দিব্যি দুহাতে পয়সা আনছেন। যখনকার যা নিয়ম। সবাই পারছে আর তুমি পার না।’ কন্ডাকটার আবার ঘুরে এসে পয়সা চাইলে সে ঘাড় নেড়ে বাইরের দিকে একমনে তাকিয়ে রইল। তারপর আর ঝুঁকি না নিয়ে এক স্টপেজ আগেই নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। শীতাংশু গেরেছে, অভূতপূর্ব উল্লাসে মন ভরে উঠল শীতাংশুর। কালো বাজারে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করেও কোনো লাখপতি বোধ হয় ভ্রমণ উন্মাদনার স্বাদ পায় না। কিছুই কঠিন নয়, চেষ্টা করলেই পারা যায়। শীতাংশুও পারবে। আরও পারবে, মাল্লিকার আদর্শ পুরুষ অমলবাবুর মতো সেও অদুর ভবিষ্যতে পৌরুষের পরিচয় দিতে পারবে একদিন। উত্তেজনার মুখে চরিত্র বিরোধী ভাবেই মাসের শেষে দুটো সিগারেট কিনে একটা টানতে টানতে বাড়ি ঢুকল শীতাংশু। ঘরে চার বছরের ছেলেকে শ্লোক শেখাচ্ছে মল্লিকা, নীতি এই যথা তথা, বল সদা সৎ কথা। বাবা ঘরে ঢুকতেই ছেলে জিজ্ঞেস করল তার জন্য কি এনেছে বাবা। পর মুহূর্তে বাবা-মার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল তার ভুল হয়েছে,-“আজ বুঝি মাসের শেষ? এখনও মাইনে দেয়নি, না?” তারপর, পরিস্থিতি সহজ করে তোলার জন্যই হাত পেতে বাবার কাছে টিকেট চাইল।শীতাংশু বলল টিকেট নেই।

মল্লিকা উদ্বেগের সুরে বলল, ‘সেকি! এতটা পথ হেটে এলে নাকি?’ শীতাংশু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, টিকেট না কাটলেই বুঝি হেঁটে আসতে হয়?

মল্লিকা আর কোনো কথা বলল না, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু শীতাংশুর ক্ষুদে কন্ডাকটারটি নাছোড়বান্দা, সে হাতখানা আরও একটু। প্রসারিত করে দিয়ে ট্রামের কন্ডাকটারের গলার অনুকরণ করে পরম কৌতুকের ভঙ্গিতে আর একবার বলল, টিকেট বাবু।‘চোর’ গল্পের অমূল্য চুরি করে আনলে স্ত্রী রেণু তা হাত পেতে নিতে পারত না। স্বামীকে সৎপথে আনার চেষ্টা করত, আর এখান দেখি সৎ নিরীহ স্বামীকে মল্লিকা সংসারের অন্য পাঁচজন সুবিধাবাদী বাবকহীন মানুষের দলে ঢুকে

নিজের অবস্থা ফেরাতে প্ররোচিত করছে। এভাবে কই সমস্যাকে দুটি গল্পে দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন নরেন্দ্রনাথ। আর টিকিট প্রত্যাশী সেই ক্ষুদে কন্ডাকটার হয়ে উঠেছে লাঞ্ছিত অথচ অদম্য সেই বিবেকের প্রতীক।

মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের প্রায় সকল রকম সমস্যাকেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'ছোটদিদিমণি' (দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৬০) গল্পের রেবা চল্লিশ টাকা মাইনেতে স্কুলের অফিসে কনিষ্ঠ কেরানির চাকুরি পেয়েছে। রেবার চাকুরি সকালে আর দুপুরে স্বামী অফিসে বেরিয়ে যায়। নিজের মাইনেয় সংসারের কোনো স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পারেনি রেবা, শুধু ছেলেমেয়েরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পারছে। কিন্তু মায়ের এই বাইরে যাবার সুযোগ নিয়ে বড় ছেলে শিবু কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যায়, রেবা অনেক চেষ্টা করেও তাকে শোধরাতে পারে না। শেষে একদিন স্কুলের ছোটদিদিমণি রেবা শিবু আর তার দুই সঙ্গী মদন ও ফটিককে নিয়ে মেঝেয় মাদুর পেতে পড়াতে বসে। সামান্য একপো দুধকে কেন্দ্র করে সংসারের স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের সম্পর্কের ওপর নতুন আলোকপাত করেন লেখক।'এক পো দুধ' (মুখপত্র, পূজাসংখ্যা ১৩৫৯)। সতেরো বছরের রানু হঠাৎ জানতে পারে সে পৃথিবীতে এসেছে অবাঞ্ছিতভাবে। তার দরিদ্র বাবা-মা চায়নি বিয়ের পর পরই এতবড় দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চেপে বসুক, কিন্তু তবু সে এসেছে। এই জানা মুহূর্তে তার কাছে পরিচিত প্রিয় পৃথিবীর চেহারাটা বদলে দেয়। বাবা-মা-র আদরের ডাকে সাড়া দেয় না, ভাই বোনের শংকিত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না, সব কিছুই মনে হয় অর্থহীন। কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকে না। জীবনের টানে সব মালিন্য ভেসে যায়। মায়ের 'শীর্ণ মুখ, শুকনো ঠোঁট, তবু মা-র মুখের হাসিটুকু কি মিষ্টি।' অভিমান ভুলে রানু ভাবে, 'সে যদি না হত তাহলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়তো কিছুই এসে যেত না। কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে রানু যখন একবার এসে পড়েছে তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।' (রানু যদি না হতো'—আনন্দবাজার পত্রিকা, দোলসংখ্যা ১৩৬০)।

সাতাশ বছর ধরে সাগরপুর এম.ই স্কুলের হেডমাস্টার থাকার পর কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুকে যখন রিক্ত হস্তে স্ত্রী পুত্রকন্যার হাত ধরে ভারতে চলে আসতে হল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কেরানিগিরি থেকে কুলিগিরি পর্যন্ত সবই করবেন, কিন্তু মাস্টারি আর নয়। অথচ এককালের ছাত্র নিরুপম যখন তাকে ব্যাংকের চাকুরিতে ঢুকিয়ে দিল, তখন দেখা গেল জাত শিক্ষকসুলভ চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে কোথাও নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত অফিসে তাকে বেয়ারাদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর মাস্টার মশাই ছুটির পর নির্জন অঙ্গিদের এককোণে তাঁর বেয়ারা পড়ুয়াদের নিয়ে নিতে টোল পুলে বসেছেন। (হেডমাস্টার' দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৫৬)। বৃদ্ধ রাজমোহন দেশভাগের পরও বাস্তুভিটা ছেড়ে আসেননি, পরিবার পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন মুসলমান পরিবৃত পূর্ববলায়। রাগের মাথায় প্রায় জলের দরে বাড়ির অভিজাত আসৰাৰ পালঙ্কটি দিনমজুর মলের কাছে বিক্রি করে ফেলে তার মনস্তাপের আর শেষ নেই। রাতে ফিরে এসে হ্যারিকেন হাতে প্রথমেই পুবের ঘরখানায় ঢুকলেন রজমোহন। ঘরের আরেক খালি হয়ে গেছে। ঘরের দিকে আর চাওয়া যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজমোহন।কিন্তু সেই খালিঘর যেন পিছনে পিছনে ছুটে এল। কালি ঘর যেন বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে।বুক খালি করে দিয়েছে। পালঙ্কটি ফিরে পাবার জন্য কোনো চেষ্টাই আর বাকি রাখেননি রাজমোহন। অথচ মল বেদিন নিজে থেকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে চাইল, তিনি রাজি হলেন না। মালের ভাতা ঘরে বিশাল পালঙ্কের ওপর ছেড়া ময়লা কথায় ওয়াইনি তেল চিটচিটে বালিশে শোয়া অনাহারে মৃতপ্রায় দুই শিশুর মধ্যে তিনি আরাধ্য দেবতা রাধাগোবিন্দকে দেখতে পেয়েছেন। আজ আর তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। (“পালঙ্ক আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা ১৩৫৯)।

একসময় আমাদের সমাজে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে বউদের দরে থাকারই রেওয়াজ ছিল।কিন্তু অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেযুগবদলেছে, সেই রেওয়াজও বদলাতে হয়েছে। ঘরের মেয়েরা বউরা পুরুষের পাশাপাশি রোজগারে নেমেছে, কখনও পিতার বা স্বামীর অক্ষমতার সময় সমস্ত দারিত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। ঘরে বাইরে দুদিক সামলাতে গিয়ে কঠিন মূল্য যে তাদের দিতে হয়, নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু

গল্পে তা তুলে ধরেছেন। অবতরণিকা (আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা ১৩৫৬) গল্পের গৃহবধূ আরতি সসারের প্রয়োজনে চাকরি করতে বেরিয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ির একেবারেই মত নেই।কিন্তু একারআয়ে সংসার চলে না বলে স্বামী সুব্রতই তাকে দরখাস্ত লিখে দিয়েছে, অসুস্থ শাশুড়িকে দেখতে যাবার নাম করে ইন্টারভিউ দিতে নিয়ে গেছে। অবশেষে একটি 'সেলস গার্ল' রে কাজ পেল আরতি। এতদিনের বাঁধা রুটিন বদলে গেল, স্বামীর সঙ্গেই প্রায় পাওয়া সারে আরতি, বেরিয়েও যায় তার সামনেই। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দের, ননদ আর ছেলেমেয়েদের জন্য লজেন্স আর লেবু, শাশুড়ির জন্য এক কৌটা ভালো জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য এক ঠোঙা আঙুর, আর স্বামীর জন্য এক টিন ভালো সিগারেট, আর নিজের দুটো ব্লাউজের জন্য দু'গজ অর্গান্ডি কিনে এনেছিল আরতি। আরতির রোজগারে সংসারের চেহারা অনেকটাই ফিরল কিন্তু তবু শ্বশুর শাশুড়ির মন থেকে বিরূপতা দূর করতে পারল না আরতি। মেশিন বিক্রির কাজে নানা জায়গায় যেতে হয়, দশ রকম লোকের সঙ্গে দশরকম কথা বলতে হয়। একটু রাত করে বাড়ি ফিরলে শাশুড়ি বলেন, 'এই বোধ হয় এলেন আমাদের মহারানী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর সংসারের কথা মনে পড়ল।' আর শ্বশুরের মন্তব্য, 'এত রাত্রি অবধি কোন্ গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে। এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়—' সমস্যার গভীরে কী স্বচ্ছন্দে অবতরণ করেছেন লেখক দেখে অবাক হতে হয়।

'মহড়া' (যুগান্তর, পূজাসংখ্যা ১৩৬০) গল্পের নেপী ওরকে নীরজা নামের সেই ঝি মেয়েটি, মনিবের অনুপস্থিতিতে যে অপরিচিত সুদর্শন যুবকের কাছে বাড়ির কীরূপে পরিচিত হতে চেয়েছে, বা 'আকাঙ্ক্ষা' (দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৮০) গল্পের ছায়া, গরিব ঘরের রূপহীনা বি. এ পাশ যে মেয়ে চাকুরির দরখাস্ত করে করে ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের উত্তরে নিজের কল্পিত রূপগুণের বর্ণনা দিয়ে নতুন ধরনের আবেদনপত্র রচনা করতে বসে, এদের সবাইকেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর সহানুভূতির সূত্রে গেঁথেছেন। এই পর্যায়ের অন্যান্য গল্প 'ঋণ' (ধার নামে কালান্তর, মাঘ ১৩৫৫),

'হেডমিস্ট্রেস'(দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৫৭), দাম্পত্য'(পূর্বাশা, বৈশাখ ১৩৫৮) 'জামা' (মুখপাত্র, পূজাসংখ্যা ১৩৬০), স্বত্ত্ব (উলটোরথ, শ্রাবণ ১৩৬৪) দুই যাোদ্ধা'(দ্বৈরথ'নামে বেতারজগৎ,পূজাসংখ্যা ১৩৭৫), 'প্রবাল'(আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা ১৩৭৩), 'অনধিকারিণী' (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫৮), 'ঘড়ি' (বেতারে পঠিত, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯), 'চিঠি' দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৬০), 'সংস্কারক' (আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা ১৩৬৪), 'একটি মৃত্যু ও আমি' (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসর পৌষ ১৩৬৮), 'ঝড়ের পরে' (আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৯) ইত্যাদি।

১১.৮ অনুশীলনী

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে নারী চরিত্র কিভাবে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে আলোচনা করো।

৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে বাস্তববাদ কিভাবে ফুটে উঠেছে আলোচনা করো।

৪। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমসাময়িকতা- আলোচনা করো।

৫। মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র - প্রবন্ধ লেখ।

১১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ সাহিত্য বিহার

২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা।

৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—'আত্মকথা', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২

৪। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী

৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—‘গল্প লেখার গল্প’ (১-১৫ জুলাই ১৯৭৫) বেতার জগৎ পত্রিকায় প্রকাশিত

৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র-‘জন্মভূমি’ ভাঙ্গা হাইস্কুল শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, শান্তিনগর ঢাকা, বাংলাদেশ,

৮। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—

৯। অরুণকুমার মুখপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২

১০। বীরেন্দ্র দত্ত—বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, এস পি পাবলিশিং, কলিকাতা,

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খণ্ড—গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা,

১২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশ কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা,

১৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—অসমতল গল্পগ্রন্থ ২য় সংস্করণ

১৪। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, চতুর্থ প্রকাশ,

১৫। নারায়ণ চৌধুরী-নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প’

একক ১২ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা পারদর্শিতা

বিন্যাস ক্রম

১২.১ শহুরে জীবন ও নরেন মিত্র

১২.২ চরিত্র

১২.৩ বিষয়

১২.৪ বিদেশী প্রভাব

১২.৫ গল্পে শিল্পী চরিত্র

১২.৬ জটিল প্রেম

১২.৭ জীবন মৃত্যু ও নরেন মিত্র

১২.৮ ছোটদের নরেন মিত্র

১২.৯ অনুশীলনী

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ শহুরে জীবন ও নরেন মিত্র

পরের দিকে নরেন্দ্রনাথের লেখায় গ্রামবাংলার গল্প আর তেমন পাওয়া যায় না। শহর আর শহরতলীর মানুষ, তাদের জটিল জীবনযাত্রা, সম্পর্ক বৈচিত্র্য আর জটিলতর মনস্তত্ত্বই লেখকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। পটভূমির এই পরিবর্তন সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘পূর্ববঙ্গের

পটভূমিতে আগে যত বেশি লিখতাম, লিখতে পারতাম, এখন আর তা পারিনে। স্মৃতি ধূসরতর হয়ে আসে। পূর্ববঙ্গ যেন পূর্বজীবন। জন্মভূমিকে যেন জন্মান্তরে রেখে এসেছি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথের গল্পের পাত্রপাত্রী মুখ্যত নগরবাসী। যদিও অনেক গল্পেই দেখা যায় তারা মনেপ্রাণে নাগরিক হয়ে উঠতে তখনো তেমন পারেনি, ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি প্রায়ই তাদের চিন্তায় ছায়া ফেলে। তবু নতুন জীবনকে গ্রহণের চেষ্টায় তারা আন্তরিক। আর কিছু গল্প রয়েছে, যেখানে শহর কলকাতার নগরজীবন তার সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব নিয়ে ধরা পড়েছে। সেসব গল্পের পাত্রপাত্রীও সেই নাগরিক সভ্যতারই ধারক ও বাহক। এই পর্যায়েও নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু ভালো গল্প তার পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

‘জাল’ গল্পটি নরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আষাঢ় ১৩৫৭ সালে। কথাসাহিত্য পত্রিকার তারাশংকর অভিনন্দন সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৫৭) গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। তারাশংকরকে নিয়ে সমকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিকরা কেউ লিখেছিলেন প্রবন্ধ কেউ লিখেছিলেন কবিতা। সাহিত্যিক তারাশংকরের নাম ধাম মন মেজাজ অক্ষুন্ন রেখে নরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই ‘জাল’ গল্পটি। এদিক থেকে নরেন্দ্রনাথের বিশাল গল্পভাণ্ডারে এই গল্পটি এক অনন্য সৃষ্টি। ঠিক এই ধরনের গল্প তিনি আর কখনও লেখেননি। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নামের আর একজন অখ্যাত লেখক খ্যাতকীর্তি তারাশংকরের জায়গা দখলের সুচতুর প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। বাংলা দেশের পাঠকরা ‘শ্রীময়ী’ আর ‘অমানিতা মানবী’র লেখককে ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কবি’, ‘গণদেবতা’ আর পঞ্চগ্রামের লেখকের সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে ফেলেছিলেন। এমনকি, মাসিক সাপ্তাহিক কাগজগুলির দু'একজন সমালোচক পর্যন্ত প্রশংসাচ্ছলে তারাশংকরের নূতন এক্সপেরিমেন্টের দোহাই দিতে শুরু করেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটায় তারাশংকর খুব ক্ষুব্ধ হন। এই ভ্রান্তি নিরসনের একটা চেষ্টায় তিনি ‘পঞ্চগ্রামের ভূমিকায় বলেছিলেন, শ্রীময়ীর তারাশংকর শ্রীময় হয়েই থাকুন, আমি শ্রী ত্যাগ করলুম।'—এই গল্পটিতে সেই দুই নম্বর তারাশংকরের প্রসঙ্গ এনে আসল তারাশংকরের একটি চমৎকার পিরচিতি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ।

গীতনিপুণা একটি গৃহবধূর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা তিনি তার ‘গল্প লেখার গল্প’তে (আষাঢ় ১৩৮২, বেতারে পঠিত) উল্লেখ করেছেন। সেই পরিচয় ভিন্নরূপে রসমূর্তি লাভ করেছে তার সেতার’গল্পে (বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫২)। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি আর তার সংসার সৃষ্টি, এই দুয়ের মাঝখানে খণ্ডিত হৃদয় এক ব্যর্থ শিল্পীর কাহিনি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘অনধিকারিণী’ গল্পটি (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫৮)। গল্পের শুরু এক গানের জলসায়। উদ্যোক্তাদের অন্যতম সংগীত শিক্ষক প্রমথ তার বন্ধু গল্পকথককে সেই সংগীত সম্মেলনে নিয়ে গেছে। নামকরা গায়ক বাদক কয়েকজন আসরে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু একটু বিশ্রাম না করে কেউই মঞ্চে উঠতে চাইছেন না। সুযোগ বুঝে প্রমথ তার প্রিয় ছাত্রী সুলতাকে মাইকের সামনে বসিয়ে দিল। ‘মেয়েটি বিবাহিতা। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি..চেহারা ধরন ধারণ কোনোটিই আশাপ্রদ নয়।’ তবু আশা ছিল ‘এই সাধারণ দর্শনা কালো রোগা মেয়েটি গলা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে এক রূপবতী কিন্নরী তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে।’

কিন্তু তা হল না, মেয়েটি যখন থামল, কোনো হাততালি নেই, প্রশংসাসূচক ধ্বনি নেই, শ্রোতার দল চুপচাপ উদাসীন। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে মেয়েটি মঞ্চ থেকে নেমে এল। তার সংগীতশিক্ষক প্রমথও যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়েছে, সে সুলতাকে ক্রুদ্ধভাবে বলল, ‘গান তুমি ছেড়ে দাও সুলতা। সকলের তো সব জিনিস হয় না। তোমার ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, সে সব দেখ, গান ছেড়ে দাও। নির্বাক ছাত্রী মাথা নিচু করে তার স্বামীর সঙ্গে প্যান্ডেলের বাইরে চলে গেলে প্রমথ বন্ধুকে সুলতার সংগীতসাধনার ইতিহাস শোনাল। সাধনায় সুলতার ক্রুটি ছিল না। সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়েও সংগীত কিভাবে যেন তার মনের দোসর হয়ে গিয়েছিল।বিয়ের পরও সে তার গানের চর্চা বজায় রেখেছে। এর জন্য তাকে বহু কষ্ট, বহুরকম ত্যাগ ও সমঝোতা করতে হয়েছে বার বার। পরিবারের দাবি, স্বামী সন্তানের দাবিও পরিপূর্ণভাবে সে মেটাতে পারেনি। কারণ তার অস্তিত্বের একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে সংগীতের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। আবার গানের চর্চাও সে অব্যাহত রাখতে পারেনি, ছেড়েছে আর শুরু করেছে। সুলতার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে প্রমথ তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে, তানপুরা কেনার ব্যবস্থা করে

দিয়েছে কিস্তিতে টাকা দেবার শর্তে। ছোটখাটো নানা বাধাকে গ্রাহ্য করেনি সুলতা। কিন্তু যখন সে শুনল তার স্বামী অংকের টিচার বীরেনের সঙ্গে মেয়েস্কুলের অঙ্কের দিদিমণির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে পাড়ায় আলোচনা হচ্ছে, সে আর সহ্য করতে পারল না। তার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীর তির্যক মন্তব্য মাস্টারের পক্ষে গায়িকার চেয়ে মাস্টারনীই ভালো। দরদ বোঝে। বীরেন স্পষ্টই জানাল সীমা যদি সে ছাড়িয়েই থাকে তা সুলতারই জন্যে, আর সুলতার ওই তানপুরার জন্যে।

সুলতা গভীর দুঃখে, অভিমানে ভেঙে ফেলল তার বড় সাধের সেই তানপুরা। কিছুদিন চুপচাপকাটাল, তারপর আবার অস্থির হয়ে উঠল মন। মাস্টারমশাইর সঙ্গে যোগাযোগ করে গানের চর্চা আবার শুরু করেছে সুলতা। কখনও দৈন্যের সঙ্গে, কখনও বাৎসল্যের সঙ্গে, কখনও স্বামীর প্রেমের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে, সুলতার সঙ্গীত প্রীতির। তবু দুই কুল যথাসাধ্য বজায় রেখে চলেছে সে। ক্রমশ প্রমথ তাকে ছোটখাটো দু-একটা জলসায় গাওয়ার সুযোগও করে দিয়েছে। কিন্তু সুলতার ইচ্ছা সত্যিকারের বড় আসরে নিজেকে যাচাই করা। তাই আজ প্রমথ তাকে এখানে এনেছিল। কিন্তু সুলতা সফল হতে পারল না। সে জাত শিল্পী নয়, সঙ্গীত সরস্বতীর বরমাল্য তার জন্য নয়। কষ্ট অনেকেই করে, কিন্তু সার্থক না হলে তার কাহিনি উল্লেখযোগ্য হয় না। সিদ্ধি ছাড়া সাধনার ইতিহাসের কোনো মূল্য নেই। ভোরের দিকে গানের আসর প্রায় শেষ হবার মুখে প্রমথ তার বন্ধুকে নিয়ে বাইরে চা খেতে গেল। অবাক হয়ে দেখল সুলতা বেড়ার গা ঘেঁষে আসরের দিকে মুখ করে উৎকর্ণ দাঁড়িয়ে আছে। শীতের এই সারাটা রাত সে ভেতরে না গিয়ে এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কেন, মাস্টারমশাইর এই প্রশ্নের উত্তরে সুলতা আস্তে আস্তে বলল, 'ভিতরে আর যেতে পারলাম কই!'

১২.২ চরিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের চরিত্র প্রায় সবসময়েই সদর্থক। 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (মে, ১৯৬৮) তিনি বলেছেন, মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি অবশ্যই আছে, কিন্তু তা আমাদের গর্বের বস্তু নয়। যেখানে আমরা মহৎ, শক্তিমান, সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পরিচয় আছে। এইদিক দিয়ে 'ভুবন ডাক্তার' (আনন্দবাজার পত্রিকা

পূজাসংখ্যা ১৩৫৮) গল্পের নাম চরিত্র ভুবনমোহন নরেন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্র। কিছুটা এইজন্য যে প্রথম জীবনের ভুল পরবর্তীসময়ে সে সংশোধন করতে চেয়েছে। পরিপূর্ণ দুবৃত্ত নরেন্দ্রনাথ তাকে করতে পারেননি, করতে চাননি। মেডিসিনে গোল্ড মেডেল নিয়ে পাশ করে বেরিয়ে ভুবনমোহন প্রথম সেই মেডেল দেখাতে গেলেন ব্যারিস্টার নগেন বাঁড়ুয্যের মেয়ে প্রীতিলতাকে। প্রীতি সে মেডেল হাতে নিয়ে খুশি হল, কিন্তু সদ্য বিলেতফেরত ব্যারিস্টার অরুণের ডাকে সে মেডেল আবার সে ভুবনের হাতেই ফিরিয়ে দিল। কারণ সে জানে গ্রামের চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির একজন সাধারণ কম্পাউন্ডারের ছেলের চাইতে কলকাতা শহরে দুটি বাড়ির মালিকের ছেলে তার বাবার বিচারে অনেক বেশি সুপাত্র। আশাহত ভুবন কলকাতা ছেড়ে পৈতৃক গ্রামে চলে এল, ডিসপেনসারিও খুলল, কিন্তু পসার আর জমে না। মনের অস্থির অবস্থায় দার্জিলিং থেকে ব্যারিস্টার পত্নী প্রীতির চিঠি এল 'গাঁয়ে গিয়ে অমন করে অজ্ঞাতবাস করছ কেন? কেন জীবনটাকে নষ্ট করছ? লোকে বলে নাকি আমার জন্যেই। ছি ছি ছি! আমি লজ্জায় আর বাঁচিনে। পুরুষ মানুষের কি এমন আত্মহত্যা সাজে। চিঠির প্রতিটি কথা এমন সঁচের মতো বিদ্ধ করতে লাগল ভুবনকে, মনে হল প্রীতিকে সামনে পেলে সে নারীহত্যা করে দেখত হাতের সুখ মিটিয়ে।

ভাবনার ঘোর কাটতে না কাটতেই গ্রামের সম্পন্ন মুসলমান জনাব আলী খাঁ এল এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে। তার ভাইঝি নুরুন্নেসা প্রচুর সম্পত্তির মালিক, একবার স্বামী মারা যাবার পর আর বিয়ে করেনি। জনাবের ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাবও বাতিল করে দিয়ে এদিক সেদিকে সম্বন্ধে খুঁজছে। সেই মেয়েকে ওষুধ দিয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। রাজি হলে পাবে টাকার বান্ডিল, আর অরাজি হলে চকচকে ছোরা বুকে বসবে। রাজি হল ভুবন। কিন্তু নুরুন্নেসার মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয়, তা প্রমাণিত হওয়ায় তার সাত বছর জেল হয়ে গেল, আর বাজেয়াপ্ত হল তার ডাক্তারি সার্টিফিকেট, সোনারূপার মেডেল আর লাইসেন্স। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করল কিছুদিন। কিন্তু রাত হলেই সুন্দরী নুরুন্নেসার সেই বিষনীল মুখখানা তার সামনে ভেসে ওঠে। কোথাও শান্তি নেই। আবার সেই গ্রামেই ফিরে এল ভুবন। পৈতৃক ভিটা পরিষ্কার করল। শুরু হল একক অন্ধকার জীবন, কেউ তার কাছে আসে না, সেও

কারো কাছে যায় না। তারপর একদিন প্রেতিনীর মতো এক নারী ছুটে এল তার কাছে। কামুক পুরুষের ছলনায় ভুলে তার মেয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তারপর লজ্জা ঢাকার জন্য বিষ খেয়েছে, সেই মেয়েকে বাঁচাতে হবে। ভুবন গেল, 'নির্মলার শিরা উপশিরা থেকে সমস্ত বিষ নিঃশব্দে নিংড়ে নেওয়ার জন্যে তার সব জ্ঞান, সব বিদ্যে বুদ্ধি প্রয়োগ করল ভুবন ডাক্তার। শেষ রাত্রের দিকে জ্ঞান ফিরে এসে রোগিণী প্রশ্ন করল ডাক্তার তাকে বাঁচাল কেন, ভুবন উত্তর দিল—''আমিও বাঁচব বলে। রোগিণীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ডাক্তারের মনে হল, এ মুখ তার চেনা, এ মুখ সে দেখেছে, রোজ রাত্রে দেখেছে। এ সেই নুরুন্নেসার পরম সুন্দর মুখ। কিন্তু এখন আর মৃত নয়, বিবর্ণ নয়, প্রাণবন্ত। জীবনের রসে, রঙে, রূপময়। নির্মলার মায়ের অনুরোধে আর নির্মলার সকাতর নীরব সম্মতিতে ভুবন তাকে বিয়ে করল, আর গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য খুলল নুরুন্নেসা হাসপাতাল। পতনের পরও আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা এবং মনুষ্যত্বের জয়লাভের এই কাহিনিতে নরেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার বড় পরিচয় নিহিত রয়েছে।

১২.৩ বিষয়

আধুনিক ছোটগল্পের একটা বড় দিক হচ্ছে তার বিষয় বৈচিত্র্য। যে কোনো বিষয়ই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে। ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী চেকভ বলেছিলেন তিনি একটা 'অ্যাশট্রে' নিয়েও গল্প লিখতে পারেন। আসলে ছোটগল্পে বিষয় মুখ্য নয়, দেখার ভঙ্গিটাই আসল। নরেন্দ্রনাথ তার বেশ কিছু গল্পে নিতান্ত সাধারণ বিষয় বা সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসাধারণ কাহিনি রচনা করেছেন। সামান্য বিষয়ের অসামান্য প্রয়োগে তাঁর এই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে 'এক পা দুধ' (মুখপত্র, পূজা সংখ্যা ১৩৫৯) গল্পটিতে। এক পা দুধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পের কাহিনিবৃত্ত, এই সাদা তরল পানীয়ের প্রতিকৃতিতে ধরা পড়েছে পারিবারিক নানা সম্পর্কের ওঠানামা। নিম্নবিত্তের সংসারে সস্তাদরের মিল্ক পাউডারে চা খেতে অরুচি ধরে যাওয়ায় বিনোদ একদিন মেয়ের জন্য বরাদ্দ দুধ থেকে একটু নিয়ে চা খেতে চাইল। পরিবর্তে জুটল স্ত্রীর গঞ্জনা। কিন্তু তারপর স্বামীর বয়সের অনুপাতে বুড়িয়ে যাওয়া চেহারার দিকে

তাকিয়ে লতিকার কেমন যেন লাগল, সে স্বামীকে না বলেই গয়লাকে বলে কদিনের জন্য এক পো করে দুধ রাখার ব্যবস্থা করল। একদিন সকালে হাতলভাঙা কাপে করে সে দুধ এনে বিনোদকে দিল লতিকা। বিনোদ প্রথমে অবাক হল, পরে লতিকা যখন বলল যে এ দুধ তারই জন্যে রাখা হয়েছে, তার শরীরটা যদি একটু সারে এতে, তখন বিনোদ এই কাপের দুধে দেখল দুধ সাগর, স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেম সাগরের প্রতিরূপ।নয় বছরের ছেলে সুনীল ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করতে করতে একবার বাবার দুধ খাওয়া দেখে যেন লজ্জা পেয়েই মুখ ফিরিয়ে আরও জোরে পড়া শুরু করল। ছেলের এই বিদ্যার্জন প্রচেষ্টায় আজ আর বিনোদ খুশি হতে পারল না। বরং ধমকে উঠল ‘ওই কয়েকটা কথা মুখস্থ করতে তোর কতক্ষণ লাগবে? কাল রাত্রেও তো ওই জেন্ডার-ই পড়েছিস।’ বিনোদের ছোটভাই বিজন বি. এ. পাশ করে বেকার বসে আছে বছর দুই যাবৎ। সে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে কাপ দেখে জিজ্ঞেস করল চা খাওয়া হয়ে গেছে কিনা। লতিকা খুব কুণ্ঠিতভাবে বলল বিনোদকে এক কাপ দুধ দিয়েছে সে। চুরি করে স্বামীকে দুধ খাওয়াচ্ছে, দেবরের এই সহজ রসিকতাটুকু লতিকা আজ সহজমনেনিতে পারল না, বিনোদও কিছুটা ক্ষুন্ন হল এতে। লতিকাকে বলল পরদিন বিজনকে দুধ দিতে। এভাবে এক কাপ দুধ নিয়ে পারিবারিক সম্পর্কের নতুন সমীকরণ হতে লাগল।

বিনোদ প্রথমে দুধের ব্যাপারে কিছুটা কুণ্ঠিত থাকলেও ক্রমশ তা দূর হয়ে বরং একটা অধিকারবোধই জেগে উঠল তার মনে। সবার সামনেই সে এখন দুধ খায়, দুধ দিতে দেরি হলে হাঁকডাক করে। লতিকা ভেবেছিল বড়জোর দিনপনেরো এই ব্যবস্থা চালু রাখবে। কিন্তু মাস গেলেও বিনোদ দুধ বন্ধ করার কথা বলল না। অথচ গোয়ালা মাসের শেষে যখন বাড়তি সাড়ে সাত টাকা বিল দিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে লতিকা গোয়ালাকে কিস্তিতে টাকা নেবার অনুরোধ করে বলল বাড়তি দুধ যেন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু একথা বিনোদের কানে যেতেই সে বলল দুধ খেয়ে বেশ উপকার পাচ্ছে, আরও কিছুদিন খেতে চায় সে। দুধের দাম কোথা থেকে দেওয়া হবে, লতিকার এই প্রশ্নে রেগে গিয়ে বিনোদ বলে, ‘টাকা কি তুমি দাও যে, টাকার ভাবনা ভাবছ?

টাকা যে দেয়, সে দেবে, সারাদিন তোমাদের জন্য খেটে মরছি। আর এক ফোটা দুধ জুটবে না আমার কপালে?'

এরপর নিয়মিতই দুধ খায় বিনোদ, তবে সকালে নয়, রাতে রুটির সঙ্গে। এরমধ্যে একদিন মাছ না থাকায় ছেলের বায়নাতে তাকে দুধ দিতে হল লতিকার, আরেকদিন দেওরের খাওয়ায় অরুচি দেখে তাকেও আমসত্ত্ব ভিজিয়ে দুধটুকু দিয়ে দিল সে। কিন্তু পাতের কাছে দুধের বাটি না দেখলেই বিনোদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ছেলে বা ভাই কেউই তখন আর আপন মনে হয় না। অবস্থা চরমে উঠল যেদিন অম্বলের জ্বালায় অস্থির লতিকা প্রতিবেশীর পরামর্শে খই দিয়ে দুধটা খেয়ে নিল। এই নিয়ে একথা সেকথায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত অশান্তি হল। বিননাদের বিদ্রুপের উত্তরে লতিকা বলল তুমি তিরিশ দিন খেতে পার, আর আমি একদিনও পারি নে। বিনোদের উত্তর হল 'আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সায় খাই।' চেঁচামেচিতে পাশের ঘর থেকে দেওর উঠে এল, ছেলেও ঘুমচোখে উঠে কথাবার্তা শুনে সব বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে বিজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'জানো কাকু, সেদিন একটু দুধ খেয়েছিলাম বলে আমাকে কি মারটাই না মারলে। আজ নিজে চুরি করে খেয়েছে, আজ নিজে মার খাচ্ছে। বুঝুক মজা।গল্প এখানেই শেষ হয়নি, ঘটনার এই ঊর্ধ্বগতির পর আবার তা নীচের দিকে নেমে এসেছে। পরদিন ভােরে দুধ জ্বাল দিয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি বিনাোদকে এনে দিয়ে বলল, 'এখনই খাও, সারা দিনভর এ দুধ আমি রাখতে পারব না। কে কখন এসে মুখ দেবে তার ঠিক কি।' বিনোদ একটু হেসে দুধের কাপটি স্ত্রীর মুখের সামনে তুলে ধরল। বিজন চায়ের খোঁজ নিতে আসছিল, 'তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে'—এই কথা বলে লতিকা দুধের কাপ ধরিয়ে দিল বিজনের হাতে। বিজন সে দুধ নিয়ে বারান্দায় পড়তে বসা সুনীলের হাতে তুলে দিয়ে বলল, তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে। সুনীলের পাশে ছিল তারই এক বন্ধু, তাদের চেয়ে আরও গরিব, বই কিনে পড়তে পারে না বলে সুনীলের কাছ থেকে লিখে নিতে এসেছে। ফটিকের কালো রোগা হাড় বের করা চেহারার দিকে তাকিয়ে সুনীল বলল, 'এই ফটিক, শোন। লেখা পরে টুকিস, দুধের কাপটা ধর তো।'

‘ফটিক মুখ তুলে লজ্জিত ভাবে বলল, না ভাই, তুই খা।’

সুনীল বলল, ‘আরে দূর পাগল। আমি তো রোজই খাই, আজ তুই নে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।’

দেশ ভাগের পরই যারা উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছেন, তাদের কথা নরেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গল্পেই বলেছেন। কিন্তু যারা আসেননি, প্রাণের মায়ার চাইতেও বাস্তুভিটার মায়াই যাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষদের একজনকে নিয়ে লেখা গল্প ‘পালঙ্ক’ প্রকাশিত হয় **১৩৫৯** সালের পূজাসংখ্যা আনন্দ বাজারে। একটি পালঙ্ককে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দু অবস্থাপন্ন বৃদ্ধ রাজমোহন এবং দরিদ্র মুসলমান যুবক মকবুলের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা এই গল্পের কাহিনি অংশ। দেশভাগের অনেক আগেই রাজমোহনবাবুর একমাত্র পুত্র সুরেন দেশান্তরি হয়েছে। কলকাতায় এসে চাকুরি নিয়েছে, বাসা করেছে। তারপর হিন্দুস্তান পাকিস্তান সৃষ্টি হলে স্ত্রী পুত্রকন্যাকেও নিয়ে গেছে সেখানে। রাজমোহনকেও নিতে চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু তিনি যাননি। এক বাচ্চা চাকর ও গ্রামের লোকদের ভরসায় তিনি রয়ে গেছেন। কলকাতা থেকে পুত্রবধূ চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছে তার বিয়েতে পাওয়া পালঙ্কটি বিক্রি করে রাজমোহন যেন টাকা পাঠিয়ে দেন ছেলের কাছে। তাহলে বেলেঘাটার ভাড়া বাড়ির সাতসেঁতে মেঝেয় শোয়ার বদলে তার আদরের নাতিনাতনিরা অন্তত তক্তপোশে ঘুমোতে পারবে।

যে রাজমোহন আজ পর্যন্ত বাড়ির কোনো জিনিসই বিক্রি করেননি, করবার চিন্তাও করেন না, পুত্রবধূর এই অনুরোধ তার আত্মসম্মানে আঘাত করল কারণ পালঙ্কটি অসীমার বাপের দেওয়া যৌতুকের জিনিস। তিনি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পালঙ্কটি তখনি বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিতে অস্থির হয়ে পড়লেন। এই সুযোগে প্রতিবেশী মকবুল মাত্র পঞ্চাশটি টাকার বিনিময়ে মেহগনি কাঠের তৈরি সেই চমৎকার পালঙ্কটি কিনে নিল। রাগ কমে গেলে রাজমোহন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন চাকর কালুকে ডেকে বললেন, ‘কাউলা, এ আমি করলাম কি, আমি হাতে কইরা মাটি খাইলাম, এ্যা কাউলা?’ এরপর রাজমোহন নানা ভাবে পালঙ্কটি মকবুলের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু গরিব মকবুলও যেন এই পালঙ্কের প্রতি এক অদ্ভুত ভালোবাসায়

আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। তার বাড়িতে একবেলা খাবার ব্যবস্থা নেই, ঘরের চালে ছাউনি নেই, গরুর পেটে দানাপানি নেই, ছেলেমেয়ে অর্ধাহারে অনাহারে মৃতপ্রায়, তবু পঞ্চাশ টাকার ওপর আরও পাঁচটাকা বেশি পেয়েও সে রাজমোহনকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে রাজি হয় না।

রাজমোহন তখন নানাভাবে মকবুলকে জব্দ করতে চেষ্টা করেন। তার বাড়িতে নানা রকমের কাজকর্ম করেই মকবুলের সংসার চলত, তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গরিব মকবুল আরও গরিব হয়ে যায়। তবু গ্রামের বড়লোক মুসলমান খদ্দের এসে দ্বিগুণ তিনগুণ টাকার লোভ দেখিয়ে পালঙ্কটি নিতে চাইলেও সে তাদের ফিরিয়ে দেয়। অসুস্থ রাজমোহন একদিন চাকরের কাছে শুনলেন মকবুল পালঙ্ক বিক্রি করে দিয়েছে চড়াদামে, সেদিনই নতুন মালিক সেটি নিয়ে যাবে। সেই রাতে টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে দুর্বল শরীরে ছাতা বা আলো কিছুই না নিয়ে লাঠিতে ভর করে বিপজ্জনক এক বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে মকবুলের বাসায় হাজির হলেন রাজমোহন। মকবুল দেখে অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে ডেকে নিল। রাজমোহন বল্লেন, “আর তোর ঘরে যাইয়া করুম কি? তুই তো যা করবার করছিস’। মকবুল বলল, ‘না ধলাকর্তা, করি নাই। আসেন দ্যাখেন আইসা।’

মকবুল জানাল প্রচুর টাকা নিয়ে এসেছিল খদ্দের। কিন্তু অনাহারে থাকা সত্ত্বেও সে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে আর এই পালঙ্ক সে নিজের ঘরে রাখতে সাহস পায় না। হয়ত পরদিন পেটের ক্ষুধার জ্বালার কাছে পালঙ্কের প্রতি তার অসীম ভালোবাসাও তুচ্ছ হয়ে যাবে। তার এই পালঙ্ক সে আজই তার যথার্থ মালিক রাজমোহনবাবুকে ফিরিয়ে দেবে। তারপর কেউ আর কোনো কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি করে কেরোসিনের ডিবেটা দুজনের সামনে ধরে রইল। আর সেই ধোঁয়াওঠা ক্ষীণ দীপের আলোর মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্ক প্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্ক প্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্ক প্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। রাজমোহন পালঙ্ক ফিরিয়ে নিতে রাজি হলেন না। পালঙ্কের ওপর শায়িত মকবুলের শীর্ণ দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি তার আরাধ্য দেবতা রাধাগোবিন্দকে দেখতে

পেয়েছেন। তাই তাঁর কথামতো মকবুল কেরোসিনের ডিবা হাতে নিয়ে রাজমোহনকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে রওনা হল।

এই একই সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আরেকটি গল্প লিখলেন 'এই প্রথম' নামে। একটি কিশোরী মনের যৌবননানুখ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। বাড়ির ছোট মেয়ে মঞ্জু সবার বড় আদরের। নানারকম খেয়ালকে তার অফিসার বাবা, দাদা এবং মা ও বউদি প্রশ্রয়ই দেন। স্কুলেও সে সকলের মধ্যমণি, যেমন পড়াশুনোয় ভালো, তেমনি গান আর আবৃত্তিতেও ওস্তাদ। আবার 'সাধারণত পড়াশোনায় যারা ভালো হয়, দেখতে তারা হয় কালো কুশ্রী'—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে মঞ্জুর বেলায়। স্কুলের উৎসব অনুষ্ঠানে, ছোট ছোট নাটকের অভিনয়ে সে-ই অবিসংবাদী নায়িকা। হাতে লেখা একটা পত্রিকা বন্ধুরা মিলে বার করে, টিচাররা সাহায্য করেন লেখালেখিতে, এরও সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী। মলাটের ছবি এঁকে দেবার দায়িত্ব তার দাদার বন্ধু সুরজিৎ সেন-এর। তাই স্কুল থেকে ফিরেই তাড়াতাড়ি মঞ্জু তার বাড়িতে রওনা হল। সুরজিৎদার সঙ্গে মাসছয়েক আগে দাদাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। দেখতে সুপুরুষ নন মোটেও, কিন্তু ক্রমশ মঞ্জুর চোখে সয়ে গেছে। এমনও মনে হয়েছে যে আর্টিস্টের এমন চেহারাই হওয়া দরকার, সে যদি রূপবান হত, তাহলে তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দিনরাত নিজের মুখ দেখলেই চলত। 'তাহলে তো সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকবার কথা তার মনেই হত না।' সুরজিৎদা মঞ্জুকে বেশ প্রশ্রয় দেন, তার সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসেন। তার স্ত্রী দেখতে সুন্দরী নন, আলাপী বা মিশুকেও নন, মঞ্জুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমই হয়, তিনি অফিসে চাকরি করেন। আর ঘরে থাকলেও সংসার, ছেলে মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তাই মঞ্জু গেলে সুরজিৎদার সঙ্গেই বসে বসে গল্প করে।সেদিন কথামতো সুরজিতের বাড়ি থাকার কথা। কিন্তু মঞ্জু গিয়ে দেখল কেউ বাড়ি নেই। সে বাড়ির ঝিকে বলে সুরজিতের ঘরে এসে বসল। ঘরটা বড় অগোছালো, মেঝেয় বইপত্র ছড়ানো, কয়েকটা অসমাপ্ত পেন্সিল স্কেচ, কিছু কাগজ টুকরো করে ছেড়া। একটু পরেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল, সুধা বউদি ফিরেছেন। মঞ্জুকে দেখেই তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন—'একাই বসে আছ? তিনি ছিলেন না? তিনি কোথায় গেলেন? আমার পায়ের সাড়া পেয়ে পালালেন নাকি?' তার

কথার ভঙ্গি মঞ্জুর ভালো লাগল না। সে ম্যাগাজিনের ছবিটা আঁকা হয়ে গিয়ে থাকলে সেটা নিয়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু সুধা বউদি এত সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন 'আরও খানিকক্ষণ বসো। সে আসুক। দুজনকে একসঙ্গে দেখে নয়ন জুড়াই তারপরে যেয়ো। ...আজ সাত আট দিন ঘরে একটি টাকা নেই। কোনো রকমে ধার করে রেশন এনেছি। আর উনি আছেন ওঁর আর্ট নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে। এস নাও তোমার ম্যাগাজিন। তাকের উপর থেকে উন্মেষের বসন্ত সংখ্যা বার করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল সুধা। মঞ্জু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধুলোমাখা খাতাটা হাতে তুলে নিল। পুরোপুরি ছবিটা আঁকা হয়নি। কেবল ফুলে পল্লবে ভরা বসন্ত ঋতুর অস্পষ্ট একটা আভাস সেখানে রয়েছে। মঞ্জুর জীবনে আজকের এই অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন কবিতা আর গান, ফুল আর ছবি, ক্লাব আর ম্যাগাজিনের মাঝখানে কিছু বিশ্রী শব্দ হঠাৎ এসে পড়েছে। আর আশ্চর্য, অভিধান ছাড়াই প্রত্যেকটি শব্দের মানে বুঝতে পেরেছে মঞ্জু। কেন পারবে না? সে তো আর সত্যিই খুকি নেই। সে আজ বড় হয়েছে। বড় হওয়ার কি যে মানে, বড় হওয়ার কি যে জ্বালা তা আজ প্রথম টের পেয়েছে মঞ্জু ?

এই গল্পটির সঙ্গে একটি ঘটনা জড়িত আছে। নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পের মতে এই গল্পটি নিয়েও প্রকাশকালে সাহিত্যিক প্রকাশক মহলে যথেষ্ট আলোচনা হয়। তারপর এই গল্পটিকে আধার করে একটি বারোয়ারি উপন্যাস গড়ে ওঠে। বারোজন সাহিত্যিকের সেই সম্মিলিত সৃষ্টির নাম দেওয়া হয়েছিল 'উন্মেষ'। উন্মেষ' এর প্রথম প্রস্তাব এই প্রথম। তবে পাঠকমহল নরেন্দ্রনাথের গল্পটিকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল, পরবর্তী লেখাকে ততখানি সমাদরে গ্রহণ করেনি। নরেন্দ্রনাথের গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল দেশ, শনিবার, ১৪ চৈত্র, ১৩৫৯ সালে। এর পরের লেখক ছিলেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তার গল্প 'উন্মেষ' প্রকাশিত হয় দেশ, ৫ বৈশাখ ১৩৬০ সালে। আর ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ সংখ্যার 'আলোচনা বিভাগে পাঠকের চিঠিতে জানা যায় তারা নরেন্দ্রনাথের গল্পের সূত্রে লেখা অন্য গল্প তেমন পছন্দ করেননি।

একই বছরে প্রায় কাছাকাছি সময়ে লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এই গল্প তিনটি থেকে নরেন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রসার ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মধ্যেও জীবনের ওপর অসীম মমতায় নরেন্দ্রনাথ তার গল্পগুলিকে গভীর মাত্রা দিতে পেরেছিলেন। ‘রানু যদি না হতো’ (আনন্দবাজার, দোল সংখ্যা ১৩৬০) গল্পটি তাঁর গভীর জীবনপ্রীতির পরিচয় বহন করছে। কলেজ ফেরত রানু তার অসুস্থ মার জন্যে ওষুধ নিতে ডিসপেনসারিতে এসেছে। অথচ কথা ছিল আজ সে বন্ধু হেনার বাড়ি হয়ে ফিরবে। সেখানে হেনার মাসতুতো ভাই সুনীলদা আসবে। সুনীলকে আজকাল সে আর সুনীলদা বলে ডাকে না। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে নাম ধরে ডাকে। বুড়ো কম্পাউন্ডার মিকশ্চারটা বানিয়েও রাখেনি। কত দেরি হবে ভেবে রানু অস্থির হয়ে উঠল। বুড়ি দাই সারদা তার অস্থিরতা দেখে একটু হেসে তাকে বারান্দা থেকে ঘরে এনে বসলে। রানু একটু অস্বস্তিবোধ করলেও কিছু বলতে পারল না। কারণ বুড়ি দাই শুধু তাকে হতেই দেখেনি, হওয়ার সময় সাহায্যও করেছে। একথা সেকথার পর সারদার কাছ থেকে সাংঘাতিক একটি খবর পেল রানু যা একখানা কাণ্ড বাঁধিয়েছিল তোমার বাপ মা, তাতে তোমাকে আর এ পৃথিবীতে আসতে হত না।সংক্ষেপে যা শুনল রানুবাবা-মা তাকে চাইবার আগেই সে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। অবাঞ্ছিত এই দায় তারা এড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। আর এই জানা মুহূর্তে রানুর সমস্ত জগৎকে পালটে দিল। ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রথমেই তার মনে হল এই পৃথিবীতে সে জোর করে এসেছে। তার আসবার কোনো কথা ছিল না। তাকে কেউ চায়নি। সে যাতে না আসে তার জন্যেই সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কী হত যদি সে না হত, যদি সে না আসত। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে রানু বাড়ি ফিরে এল। সুনীলের খোঁজে যেতে আর ইচ্ছে করেনি। রানু যদি না হত, তাহলে কেইবা দেখা করতে যেত।চির পরিচিত বাড়ির পরিবেশ আজ যেন তার অচেনা মনে হল। ভাই বোন কারো সঙ্গে অন্যদিনের মতো ব্যবহার করতে পারল না। অসুস্থ মাকে দেখতে গেল না। শরীর খারাপের অজুহাতে শুয়ে রইল। শুনতে পেল মা ডাকছেন, বাবা এসে খোঁজ নিচ্ছেন ‘ডাল ভাত আর বড়া ভাজা হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিগে যা রানু। খেলেই শরীর একটু ভালো লাগবে দেখিস। কিন্তু আজ আর বাবার এই স্নেহে রানুর

মন ভিজল না। রান্নাঘরে ভাইবোনদের ঝগড়া চলছে, এই খাবার কেউ মুখে তুলতে চায় না। মার গলা শোনা গেল, 'এখন মরলেই আমার হাড় জুড়োয়। যতদিন থাকব, সবগুলি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যন্ত্রণা আর সয় না। এর চেয়ে সাতজন্ম বাজা হয়ে থাকাও ভালো বাপু।' রানু বিছানা ছেড়ে মার কাছে এসে বলল "মা, আমি যদি না হতুম, আমরা যদি না হতুম তাহলে তোমাদের কি সত্যিই ভালো লাগত? লাগতই তো, খুব ভালো লাগত বলে মা ফিক করে হেসে ফেলল। "মার এই সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে সতের বছর আগেকার কোনো অপরাধের চিহ্ন খুঁজে পেল না রানু। আর মুহূর্তে তার মন আবার হালকা হয়ে গেল। কেন বাবা মা তখন তাকে চাননি, কেন তারা এখনও সমস্ত অন্তর দিয়ে রানুদের গ্রহণ করতে পারছেন না, গরিব বাপ-মার এই যন্ত্রণা রানু পরিষ্কার বুঝতে পারল। মায়ের কাছ ঘেঁষে বসল সে। মা বলল সুনীল এসে অনেকক্ষণ বসে গেছে, গল্প করেছে তার সঙ্গে। রানু বাইরে এসে একফালি আকাশের দিকে তাকাল। মনে তার আর ক্ষোভ নেই। জীবনের টানে সব দুঃখ ভেসে গেছে। 'রানু তাকিয়ে দেখল সেই আকাশটুকু কখন যেন তারায় ভরতি হয়ে গেছে।'

১২.৪ বিদেশী প্রভাব

নরেন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে বিদেশি প্রভাবের প্রায় অনুপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে এক্ষেত্রে তার বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। যে বিশাল সংখ্যক ছোটগল্প রচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ, সেখানেও বিদেশি চরিত্রের দেখা পাওয়া খুব কঠিন। আনন্দবাজার পত্রিকায় পূজা সংখ্যা ১৩৬৭তে লেখা 'শ্বেতময়ুর' গল্পটি এদিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গল্পে নরেন্দ্রনাথ এক নীলনয়ন জার্মান যুবককে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। দুধের মতো ফরসা চেহারা, নীল নীল দুটি চোখ আর টিয়া পাখির মতো দুটি লাল ঠোঁটের জার্মান যুবক ম্যাকস ভারত দর্শনে এসেছে। সে এদেশের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চায়, আলাপ পরিচয় করতে চায়, তাই জার্মান কনসুলেট অফিস থেকে অনিন্দ্যর জানাশোনা এক ভদ্রলোক ম্যাকসকে ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। আর অনিন্দ্য তাকে নিয়ে এসেছে তার শ্বশুর বাড়িতে, তার

ভাষায় একটি আইডিয়াল ফ্যামিলিতে, যেখানে দিনকয়েক থাকলে একটি পরিবারের ভেতর দিয়ে গোটা দেশের পুরো পরিচয় ম্যাকস পেয়ে যাবে।

অনিন্দ্যর ছোট শালী সতেরো বছরের প্রাণবন্ত তরুণী শীলা ম্যাককে দেখে মুগ্ধ। অনেক দূরের ইউরোপের মধ্যে জার্মানিটা যে কোথায়, মানচিত্রে সে জায়গাটা মনে না করতে পারলেও এই প্রথম সত্যিকারের এক খাঁটি সাহেব দেখে তার বার বার এক শ্বেতময়ূরের কথা মনে পড়ছে। তার ছোড়দা সেতার শিল্পী নীলাদ্রিও যেন এই বিদেশি যুবককে পেয়ে তাকে নিয়ে পুতুল খেলার আনন্দে মেতেছে। ম্যাকস ভালো ইংরেজি বলতে পারে না, নীলাদ্রিও তথৈবচ, তবু ভাববিনিময় কোথাও আটকাচ্ছে না। শীলার বড় ইচ্ছা করে সেও ম্যাকস-এর সঙ্গে ওরকম গল্প করে। কিন্তু কি করে পারবে তা? সে তো থার্ডক্লাসের ওপরে আর উঠতে পারেনি। চেষ্টাও করেনি, মার সঙ্গে ঘর করা নিয়েই বেশ ছিল। আজ নিজের অযোগ্যতায় তার বড় কান্না পেতে লাগল। কিন্তু ছোড়দা যখন জানাল ম্যাকস বলেছে শীলার গলার স্বর নীলাদ্রির ওই ইনস্ট্রমেন্টের মতোই মিষ্টি, তখন শীলার সব কষ্ট দূর হয়ে আনন্দে মন ভরে উঠল। আস্তে আস্তে সংকোচ কেটে গেলে সাহেবের সঙ্গে তারও বন্ধুত্ব হল, ক্যারম খেলার সঙ্গী, বেড়াবার সঙ্গীও হল সে। ম্যাকসের তাকাবার ভঙ্গি, শীলার সঙ্গে তার মেলামেশার ইচ্ছা দেখে তাে মনে হয় না গুণ-যাোগ্যতা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা আছে। শীলাকে দেখেই ও খুশি, তার কথা শুনেই ওর আনন্দ। মাঝে মাঝে কথা খুঁজে না পেয়ে ম্যাকস পকেট থেকে সর্বক্ষণের সঙ্গী ডিকশনারিটি বের করে শব্দ হাতড়ায়, শীলা তাতে আরও মজা পায়।

দেশ দেখার শর্ত পুরো করতে একদিন নীলাদ্রি ম্যাকসকে তাদের এক পিসিমার গ্রামের বাড়িতেও নিয়ে গেল, শীলা হল তাদের সঙ্গী। গোরুর গাড়ি দেখে সাহেবের বিস্ময়ের শেষ নেই। গ্রামে তিনটে দিন কাটাল তারা হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে। গ্রাম দেখে ম্যাকস যেমন মুগ্ধ, তেমনি গ্রামের লোকও এমন চমৎকার সাহেব আর কোনোদিন দেখেনি। কিন্তু বাড়ি ফিরতেই ঘটল ছন্দপতন, দেশ থেকে ম্যাকসের বাবার চিঠি এসেছে, নানা ব্যাপারে তিনি কিছুটা অসুবিধায় আছেন, ম্যাকসকে যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যেতে হবে। এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে শীলা ভাবতেই পারেনি, ম্যাকস জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল, তারপর নীলাদ্রি আর সরাোজিনীর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শীলার কাছে একটানা জার্মান ভাষায় উজাড় করে দিল তার মন। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল বাড়ি থেকে। সারাদিন শীলা বিছানা ছেড়ে উঠল না, কিছু খেলও না। মার চিন্তায় নীলাদ্রি আশ্বাস দিল 'কিছু ভেব না মা। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে এর চেয়েও কত বড় বড় কথা তো আমরা ভুলি'।

১২.৫ গল্পে শিল্পী চরিত্র

নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই 'নানা মাধ্যমের শিল্পী' চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ১৩৭০ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'নেপথ্যলোক' গল্পটি এই ধরনেরই একটি রচনা। নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে এই গল্পটি খুব প্রিয় ছিল। লেখকের ডায়েরিতে (১৮ অক্টোবর ১৯৬৩) সে কথার উল্লেখ আছে। :

সন্তোষবাবু (সন্তোষ কুমার ঘোষ) ফোন করে বললেন নেপথ্যলোক তার খুব ভালো লেগেছে। তিনি পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকদিন পর প্রিয় বন্ধুর মুখ থেকে প্রিয় বাক্য শোনা গেল।

এক সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট, নাট্য পরিচালক, নাট্য শিক্ষাদাতা নীলাম্বর আজ তার পুরনো থিয়েটার রঙমহলের একখানি নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দিরা বা মেয়ে শ্যামলী চায় না তিনি সেখানে যান। ম্যানেজমেন্টের তরফের আন্তরিকতার স্পর্শশূন্য এই ছাপানো কার্ডখানা নীলাম্বরের চোখের সামনে যেন স্মৃতির সমুদ্র মেলে ধরল। বিগত অতীত রঙে রসে ভরে জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল মনের রঙ্গমঞ্চে। এই রঙমহল থিয়েটারকে তিনিই দাঁড় করিয়েছিলেন প্রাণপাত পরিশ্রমে। আজকের এই নাটকের নায়িকা সুরশ্রী হালদারও তার নিজের হাতে গড়া, এমনকি নামটা পর্যন্ত তিনি নিজে দিয়েছেন। এমন আরও কত রত্ন আরও কত অখ্যাত কুখ্যাত স্থান থেকে নীলাম্বর কুড়িয়ে এনে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। অনেক তরুণী অভিনেত্রীর প্রণাম নিয়েছেন তিনি, কিন্তু পাথরের দেবতার মতো শুধু পুজো নিয়েই তুষ্ট থাকতে পারেননি। যাদের প্রণাম নিয়েছেন

তাদের কারো কারো পায়ের তলায় নিজেকেও নামিয়ে এনেছেন।' নীলাম্বর নিজের অতীতকে চিরে চিরে দেখেন। তাঁর যে রূপসৃষ্টি তার মূলেই কি এই রূপতৃষ্ণা? এই সুরশ্রীকে তিনি দু'হাতে অনেক কিছু দিয়েছেন, বিনিময়ে সুরশ্রী তাকে দিয়েছে প্রেরণা, দিয়েছে উৎসাহ। পুরুষেরা বস্তুর মাধ্যমে দেয়, ভাবের মাধ্যমে পায়। কিন্তু নীলাম্বরের নির্বাচিত পর পর দুখানা নাটক দর্শক না নিতেই রঙমহলে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল। তবুও সুরশ্রীকে নিয়ে তিনি নূতন মঞ্চ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, সফল হননি। শেষে সুরশ্রীও তাকে ছেড়ে চলে গেল—তার যশ চাই, অর্থ চাই, প্রতি রাত্রে হাততালি চাই। শুধু একজনের হাতের মধ্যে হাত রেখে মুখখামুখি বসে থাকলে তার চলবে কেন? নীলাম্বরের প্রচণ্ড ইচ্ছা হতে লাগল আজ তিনি রঙমহলে যান। কিন্তু মেয়ে শ্যামলী আজ বাবা-মাকে নিয়ে বাইরে বেরোবে জেদ ধরেছে। উপায়ান্তর না দেখে নীলাম্বর চাকরের ঘরে ঢুকলেন। ওর ছেড়া জামা আর পাজামা পরে ঘরের কোণের খানিকটা ঝুল মুখে মাখলেন। তারপর গ্রিনরুমের মেকআপ শেষ করে মঞ্চে এসে চাকরের গলা'র অবিকল নকল করে ডাকলেন, "ঠাকরুণ। কত্তাবাবুর কাটখানা দিন।" রাগত ইন্দিরার ডাকে শ্যামলী এসে নীলাম্বরকে বাথরুমে নিয়ে গেল। সাবান জল দিয়ে নিজের হাতে বাবার মুখের কালিঝুলি ধুয়ে দিল শ্যামলী। তারপর নীলাম্বরের প্রস্তাবমতোই তিনজনে তাস খেলতে বসল। তাস বাটার অবসরে নীলাম্বরের চোখের সামনে রঙ্গমঞ্চের ছবি ভেসে উঠল। আর একদিন অবশ্যই যাবেন তিনি। 'সবচেয়ে সস্তাদামের টিকিটে সবচেয়ে পিছনের সারিতে বসবেন। আর যেখানে ভালো লাগবে সেখানে হাততালি দেবেন। এতদিন পেয়েছেন এবার তার দেওয়ার ভূমিকা। এ ভূমিকায় উৎরানো চাই।'

১২.৬ জটিল প্রেম

নরনারীর প্রেমের বিচিত্ররূপ নরেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রবলতম অনুভূতি, তীব্রতম বৃত্তি এই প্রেমের সর্বব্যাপী প্রভাব নরেন্দ্রনাথের উপন্যাসে যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ছোটগল্পে তত নয়। একটা অস্পষ্টতর আবরণ সেখানে পাত্রপাত্রীকে ঘিরে রেখেছে। অসফল প্রেমের বেদনা, অসমবয়সি প্রেমের যন্ত্রণা তার বেশ কিছু গল্পে স্থান

পেয়েছে। আর সেসব ক্ষেত্রে সমস্ত ঘটনাটি দেখা হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেসব গল্পে নায়ক প্রৌঢ় পুরুষ, আর নায়িকা কুমারী তরুণী, কখনও বা সে নায়িকা যৌবন অনভিজ্ঞা।

‘চিলেকোঠা’গল্পে (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭০) চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় অমলেন্দু আঠারো বছরের রীণার প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু রীণার বাবা মা দুজনেই অমলেন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই রীণার কাছে মন খুলতে গিয়ে হাজারো দ্বন্দ্বে তাকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। মফস্সল শহরে অমলেন্দুর বন্ধু বলতে এরাই আছেন। বিশেষ করে ছুটির দিনের বিকেল আর সন্ধ্যা তার ওই বাড়িতেই কাটে। কলকাতার ছেলে অমলেন্দু, থার্ড ক্লাস নিয়ে এম. এ. পাশ করে দীর্ঘদিন বেকার বসেছিল, তারপর একান্ত অপছন্দের এক ব্যাংকের কেরানিগিরিতে সারাজীবনের মতো আটকে গেছে। নিজের ওপর তার বিশ্বাস নেই, তাই বিয়ের কথা কখনও চিন্তাও করেনি। কিন্তু জীবনযাত্রায় কাউকে সে সঙ্গী হতে ডাকেনি বলেই হয়তো এখনো মনের গোপনে একটি প্রত্যাশা রয়ে গেছে—যদি না ডাকলে কেউ আসে! প্রকৃতি কি এইভাবেই প্রতিশোধ নেয়? যে স্বেচ্ছায় সোহাগে গিয়ে তার হাত ধরে না প্রকৃতি কি তার চুলের মুঠি ধরে খাোয়া ওঠা পথের ওপর দিয়ে তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়!’রীণার প্রতি অমলেন্দুর এই আকর্ষণ যে একতরফা নয় তাও সে জানে। রীণা একথা বোঝার অনেক সুযোগ দিয়েছে তাকে। গত দেড় বছরে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন অনায়াসে রীণার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিতে পারত সে। কিন্তু সাহস হয়নি, ‘ধরা মানে তো ধরা দেওয়া। যদি সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি ছাড়িয়ে নিত রীণা, যদি হেসে উঠে বলত, ওকি হচ্ছে ছাড়ুন, ছাড়ুন।’

রীণার বাবা মার সঙ্গে অমলেন্দুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক হলেও রীণা বাবা-মার সামনে কচিৎ কদাচিৎ ছাড়া অমলেন্দুকে কাকাবাবু’ সম্বোধন করে না। আর ওঁরা যখন না থাকেন রীণা ভুলেও কোনো সম্বোধনের দিকে যায় না, কিন্তু সম্বন্ধটা আরও গাঢ়, আরও গভীর হয়ে উঠে। মাঝে মাঝেই অমলেন্দুর মনে হয় রীণার জন্য সহজেই তার বাবা-মার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে অমলেন্দু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু পর মুহূর্তেই শঙ্কা জাগে

এমন কি কোনো নিশ্চয়তা আছে, রীণা অমলেন্দুর সঙ্গ পছন্দ করে বলে সে চিরজীবনের মতন তার সঙ্গিনী হতে চায়?’ বাধা আরও আছে। অমলেন্দুর চেহারায় এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি, এমন কি রীণাও বলেছে সে কোনোদিন বুড়ো হবে না। কিন্তু অমলেন্দু জানে যৌবনের কোনো বিকল্প নেই। দুদিন বাদে সত্যি যখন জরা এসে অমলেন্দুকে গ্রাস করবে, তখন একটি অকৃতার্থ অকিঞ্চিৎকর প্রৌঢ় পুরুষের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়েছে বলে রীণার মনে যদি অনুতাপ আসে—সে ভাবনাও অমলেন্দুকে এগোতে দেয় না।

বিনয়দা আর রেখা বউদির সংসারে রীণা আসার আগে থেকেই অমলেন্দুর একটি স্থায়ী প্রীতির আসন তৈরি হয়েছিল। রীণার জন্ম, তার বড় হওয়া সবই অমলেন্দু তার চোখের ওপর দেখেছে। অথচ কন্যাস্নেহের পরিবর্তে দুরন্ত এক বাসনাবলয় রীণাকে ঘিরে তার মনে তৈরি হয়েছে, রীণার ব্যবহারে, কথাবার্তায়, আভাসে হাসিতে সে বাসনা ক্রমশ গাঢ়তর হয়েছে। তবু অমলেন্দু ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। মনে হয় বিনয়দা রেখা বউদির এত বিশ্বাস এত স্নেহ ভালাোবাসার পরিবর্তে সে যা পেত তা সারাজীবন হয়তো ধরে রাখতে পারবে না। আরও একটি পরম সম্ভাবনার মুহূর্তকে নষ্ট করে দিয়ে অমলেন্দু তাই ভাবে—‘শেষ পর্যন্ত রীণা হয়তো এই ভীরুতার জন্যই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কথায় কথায় বলবে, এমন মানুষ আর হয় না।’ আবার একই সঙ্গে এই অহেতুক আত্মনিগ্রহের কোনো মূল্য আছে কিনা, সেই সংশয়ও মুহূর্তে মুহূর্তে অমলেন্দুকে ছিন্নভিন্ন করেছে। এই অনির্বাণ জ্বালার মধ্যেই গল্প শেষ হয়েছে।

আজকের এই জটিল যন্ত্রযুগের নরনারীর জটিলতর মানসিকতাও নরেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংশয় আর অবিশ্বাসের এই দ্বিধাদীণ সময়ে প্রেম নামক কোমল মধুর বৃত্তিটির কতটুকু আজ অবশিষ্ট রয়েছে বা থাকতে পারে, এ প্রশ্ন নরেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তাকেও জর্জরিত করেছে। এর প্রতিফলন যেসব গল্পে পড়েছে, তাদের অন্যতম হল ‘অনুচ্চ’ (চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৭২) গল্পট। সুমিতা আর প্রদীপের একটি মধুর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের যত্নে গড়ে উঠেছে। সাধারণ স্কুল মাস্টারের সাধারণ মেয়ে সুমিতা, কোনো রকমে বি. এ. পাশ করে গ্রামের হাই স্কুলে একটা

চাকরি পেয়েছে। তুলনায় প্রদীপের অবস্থা অনেক ভালো। বাবা ফুড ডিপার্টমেন্টে ভালো কাজ করেন। প্রদীপ নিজেও রূপবান, সজাগ সাতত যুবক। তা সত্ত্বেও একসময়ের সহপাঠীদের সহমর্মী হতে কোথাও আটকায়নি। এমনকি দু'বাড়ির অভিভাবকরাও অনেকদিন আগেই সব জেনেছেন, মৌন সম্মতিও পাওয়া গেছে। প্রদীপের খামখেয়ালি স্বভাবের জন্যই স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু সুমিতার এভাবে আর ভালাে লাগে না—এখন নিজেকে যেন মাত্র আধখানা বলে মনে হয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আর আধখানার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর একজনকে নিজের সবখানি ধরে দিতে না পারলে যেন তৃপ্তি নেই, স্বাস্ত নেই।'

এমন সময় উদ্যোগী উৎসাহী প্রদীপ নিজের চেষ্টায় জার্মানি যাবার সুযোগ পেল, সেখানে একটি ফার্মে কাজ করবে কাজ শিখবে। আনন্দে উৎসাহে টগবগ করতে লাগল প্রদীপ। কিন্তু সুমিতা কেন যেন তার সম অংশভাগিনী হতে পারল না। প্রদীপকে তার মনে হল বড় দূরের মানুষ, নিষ্ঠুর আর আত্মকেন্দ্রিক। নিজের মনকে সে নিজেই চিরে চিরে দেখে। প্রদীপের এই সাফল্যে সে কেন তেমন খুশি হতে পারছে না, সে কি প্রদীপের অসার্থক অসফল জীবন কামনা করে? কিন্তু তা তো সে চাইতে পারে না। এতে প্রদীপের সঙ্গে মিলন হোক আর নাই হোক, তাকে অকৃতী অকৃতার্থ করে নিজের কাছে ধরে রাখতে চায় না সুমিতা। প্রদীপ বিদেশ যাবার আগে সুমিতা একবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। প্রদীপের ঘরে বন্ধু বান্ধবের ভিড়, প্রদীপ আজ সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সুমিতা নিজেকে সে ভিড়ে মেশাতে চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ পর সবাই চলে গেলে প্রদীপ সুমিতাকে এগিয়ে দিতে বেরুল। চিঠি দিয়ে সে-ই ডেকে এনেছে সুমিতাকে। কিন্তু এখনো মনে ধরার মতো, মনে রাখার মতো কোনো কথা বলেনি।

সুমিতার বাবা মার একান্ত ইচ্ছা ছিল যাবার আগে বিয়েটা হয়ে গেলে ভালো হত। নিজের মনকেও সুমিতা ভালোই জানে। তবু মা যখন বলেন, প্রদীপ যে কথা রাখবে তেমন ভরসা কি কিছু পেয়েছিস? যাওয়ার আগে রেজেস্ট্রিটা করে গেলেও তো পারত। তবু একটা লেখাপড়া হয়ে থাকত, তখন সুমিতা বিরক্ত না হয়ে পারে । সুমিতার মুখে

নিজের উৎসাহের প্রতিফলন না দেখে প্রদীপ একবার এমনও বলল যে বিয়ে না করে চলে যাচ্ছে বলে সুমিতা যদি রাগ করে থাকে, তাহলে এখনো সময় আছে, পুরুত ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে নিলেই হয়। গ্যারান্টির ব্যবস্থা করে গেলে মন্দ হয় না। সুমিতা একথায় গুরুত্ব দিল না। প্রদীপ আবারও জানাল সে সুমিতাকে চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ি, গাড়ি, সমাজে প্রতিষ্ঠা এইসবও চায় সে। তাই নিজেকে সফল করে তুলতে সে বিদেশ যাচ্ছে, সুমিতাও যেন নিজেকে পূর্ণ করে তোলে। অনার্স দেবে, এম. এ. দেবে সুমিতা, প্রতি চিঠিতে তার অগ্রগতির খবর দেবে প্রদীপকে।

কিন্তু সুমিতা চুপ করে রইল। সে জানে প্রদীপের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সাধ্য তার নেই। তার মনে একটি সুখের নীড় বাঁধা ছাড়া আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, যা এখন প্রদীপের কাছে তুচ্ছ, মূল্যহীন। তাই সুমিতার এখন শুধু একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা। প্রদীপভুলে যাওয়ার আগে সে ও যেন সব ভুলে যেতে পারে। যেন ভুলে যেতে কষ্ট না হয়।

মনোবৃত্তির এই সমস্ত বড় সড় দিকগুলি ছাড়াও আরও যে কতরকম ছোটখাটো গলিখুঁজি রয়েছে, সেদিকেও নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। জীবনের জটিলতাকে কোথাও তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। তাঁর দৃষ্টি সবসময়েই জীবন ঘনিষ্ঠ, ভূমি সংলগ্ন। সাধারণ মানুষের জীবনে সংসারে যত রকমের সমস্যা আসতে পারে, তার অনেক ক’টিকেই তিনি গল্পে গ্রহণ করেছেন। মনের এই সজাগ সতর্ক চলিষ্ণুতা নরেন্দ্রনাথের গল্পে কালোপযোগী বাতাবরণ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। ১৩৭৬ সালের বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পুনরাবৃত্তি’ গল্পে তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় গ্রহণ করেছেন। পার্কের বন্ধু প্রৌঢ় সুরেশ্বরবাবুকে অলোকেশ একদিন বাড়িতে ডেকে এনে চা খাইয়েছিলেন। তারপর থেকেই এ বাড়িতে তার অনায়াস আসা যাওয়া। ভদ্র সদালাপী রুচিবান এই মানুষটি অলোকেশের পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গেই সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করেছেন। অকুণ্ঠভাবে তিনি সকল বয়সিরই সমবয়সি হয়ে উঠতে পারেন। প্রায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ মণিমালার স্বামীর সঙ্গে তিনি ধর্মতত্ত্বআর অধ্যাত্মবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আবার মণিমালার সবছোট মেয়ে

তেরো বছরের মিতার সঙ্গে বসে লুডো খেলেন, নাচ দেখাতে সাধাসাধি করেন। মণিমালার দুই যুবক পুত্র চন্দন আর কাজলের সঙ্গে বন্ধুত্বে তিনি আগ্রহী, তাদের সাহিত্যরুচি রাজনৈতিক আদর্শ জানতে চান তিনি, আবার মণিমালার বড় মেয়ে কুমকুমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনিই আবার হয়ে যান তরুণ যুবক, যেন কুমকুমই তার দেখা প্রথম নারী। যা কিছু তিনি করেন সবই মণিমালার চোখের সামনে, তবু মণিমালা মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে পড়ে যান। এর কতখানি কৌতুক কতখানি যথার্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

মণিমালার স্বামী তার চাইতে আঠারো বছরের বড়, যদিও বিয়ে তারা ভালোবেসেই করেছিলেন। এ নিয়ে তখন প্রচণ্ড অশান্তির ঝড় বয়ে গেছে তাদের উপর দিয়ে। তবে স্বামীর কাছে তিনি অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা পেয়েছেন। আর আর্থিক অনটন সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক শান্তির সংসার গড়ে তুলেছেন মণিমালা। বাইরের কেউ এসে সে শান্তিতে আঁচড় দিক, এটা কল্পনাও করতে পারেন না মণিমালা। তাই কখনও কখনও সুরেশ্বরবাবু তাকে চিন্তিত করে তোলেন। বয়সের দিক দিয়ে সুরেশ্বর মণিমালারই বরং কাছাকাছি। আর যত্নের অভাবে ম্লান হতে থাকলেও মণিমালা এখনো রূপের সবটুকু হারাননি। তাই মেয়ে কুমকুম যখন রাতে মাকে জড়িয়ে শুতে গিয়ে পুরুর মতো মাকে তার যৌবন দান করার অভিপ্রায় জানাল, তখন হাসিমুখে তাকে নিবৃত্ত করলেও মন থেকে কথাটা কেন জানি সরাতে পারলেন না। তার মনে হল দ্বিতীয় যৌবন পেলেও প্রথমবার তিনি যা করেছিলেন আবারও তাই করবেন! অলোকেশকেই ভালোবেসে ঘর বাঁধবেন, আর একে একে এই পঞ্চপুত্তলিকে জঠরে ধারণ করবেন, এর কোনো ব্যতিক্রম আর সহ্য হবে না। তবে, যৌবনের সেই পুনরাবৃত্তিতে ‘শুধু একটু লাভ আছে। কথাটা ভেবে মণিমালা নিজের মনেই হাসলেন। তার দ্বিতীয় যৌবন শুধু একটি কল্যাণের কাজে লাগানো যায়। তার পুনর্যৌবন একজন প্রৌঢ়ের মোহদৃষ্টি থেকে একটি অনাঘ্রাত অপাপবিদ্ধ নব যৌবনকে আড়াল করে রাখতে পারে। ঘুমন্ত মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মণিমালা এবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।’

১২.৭ জীবন মৃত্যু ও নরেন মিত্র

মান অভিমান, প্রেম-ভালোবাসা আর চাওয়া পাওয়ার এইসব গল্পের পাশাপাশি এমন কোনো কোনো গল্পও নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, যেখানে জীবন ও মৃত্যুর, জন্ম ও জন্মান্তরের আলোছায়ার খেলা ধরা পড়েছে। সহজ সুরে সহজ কথা লেখার সেই কলমে হঠাৎ এসে লেগেছে গভীর ভাবনার ছোঁয়া। রসপিপাসু মন হয়ে উঠেছে অরূপ রহস্যের উৎস সন্ধানী আর বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে দার্শনিকের প্রজ্ঞা। সংখ্যায় কম হলেও এই সমস্ত গল্পে গল্পকার নরেন্দ্রনাথের এক ভিন্নতর পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'একটি মৃত্যু ও আমি' (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসর পৌষ ১৩৬৮), 'ঝড়ের পরে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা ১৩৬৯), 'বীতশোক' (দেশ, ২৮ আষাঢ় ১৩৮১) ইত্যাদি গল্পে লেখক মনের এই প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধারারই একটি গল্প 'তৈলচিত্র' (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৭)।

পরমবন্ধু শৈলেশের মৃত্যুর পর নিরঞ্জন তার অ্যালবামখানি খুলে দেখলেন তার পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধুত্বের ভাগীদার শৈলেশের একখানা ছবিও সেখানে নেই। এই অস্বাভাবিক ঘটনা আরেক মৃত্যু যন্ত্রণার মতোই তাকে বিদ্ধ করতে লাগল। নিজের কাছে জবাবদিহি করলেন এই বলে যে এই না থাকাটা নিতান্তই একটা ঘটনা মাত্র। এর মূলে কোনো উদ্দেশ্য নেই, আর প্রিয় বন্ধুর ফটো কাছে রাখাই ভালোবাসার একমাত্র নিদর্শন নয়। তবু পুরোপুরি সান্ত্বনা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত শৈলেশের এক আর্টিস্ট বন্ধু শৈলেশের একখানি ছবি এঁকে নিরঞ্জনকে উপহার দিয়ে গেল। আর রাতে মশারির ভেতর শুয়ে টেবিলে দাঁড় করানো সেই ছবির দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন বন্ধুর সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপে মগ্ন হয়ে গেলেন। বন্ধুত্বকে বিস্মরণের দায় নিয়ে দুজনেই দুজনকে কিছুক্ষণ দোষারূপ করলেন। নিরঞ্জন বললেন প্রেম বন্ধুত্ব সবই ক্ষণায়ু কিন্তু তাই বলে তাদের মাহাত্ম্য কম নয়। আর শোকও ক্ষণস্থায়ী বলেই আমরা শোক করতে করতে বেঁচে থাকতে পারিনে, বরং কাজ করতে করতে শত বছর বেঁচে থাকতে চাই। শৈলেশের উপর তার জিৎ হল কেননা তিনি শৈলেশের ছবি দেরিতে হলেও তার ঘরে

এনে রাখতে পেরেছেন কিন্তু শৈলেশ সে সুযোগ কখনও পাবেন না। বন্ধুর কাছ থেকে একথার আর কোনো উত্তর এল না।

নিরঞ্জন নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন এই পাওয়ার লোভ আর হারাবার ভয়, এই স্বীকৃতির সাধ আর ভালোবাসার কালপনা মৃত্যুর পরও থাকবে কিনা। তিনি জানেন মৃত্যুর পর একমুঠো ধূলি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সেই ধূলিও আবার কণায় কণায় বিলীন হয়ে যাবে। একটি কণাকেও আর আলাদা করে চেনা যাবে না। তাই তিনি ভাবলেন, মৃত্যুর পরে কী যে হয় মানুষ তা নিশ্চিত করে জানতে পারে না। কিন্তু এই জীবনেই সেই মহামৃত্যুর, মহামুক্তির, মহাপাণ্ডিত্যের স্বাদ সে ক্ষণে ক্ষণে পায়।

১২.৮ ছোটদের নরেন মিত্র

সাহিত্য জীবনের শেষপর্বে এসে নরেন্দ্রনাথ ছোটদের ‘বন্ধু’ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। ১৩৬৭ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছর ছোটদের জন্য তিনি একটি করে, কখনও বা একাধিক গল্প নিয়মিত লিখে গেছেন। শিশু কিশোরদের জন্য লেখা তার অধিকাংশ গল্পই দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন শারদীয় সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। ছোটরা বড়দের মধ্যেই বড় হয়ে উঠে। বড়দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের চোখে বড়দের কার্যকলাপ, এর মধ্যেও যে চিরকালীন গল্পের উপাদান লুকিয়ে থাকতে পারে, সে সত্য নরেন্দ্রনাথের কাছে গোপন ছিল না। তাই সেইসব উপাদান গ্রহণ করে নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘অনাথের কীর্তিকলাপ’ (অপরূপা, দেবসাহিত্য কুটির শারদীয় সংকলন ১৩৬৭), ‘কানা বসিরের ঘোড়া’ (বেণুবীণা, দেবসাহিত্য কুটির শারদীয় সংকলন ১৩৭৫), ‘বাটি চালান’(অরুণাচল, ওই ১৩৭৩), ‘মধুচক্র’ (মণিহার, ওই ১৩৭৭), ‘হালখাতা (ইন্দ্রনীল, ওই ১৩৭৪), থিয়েটার’ (পূরবী, ওই ১৩৭৯) ইত্যাদি গল্প।

এইসব গল্পের বেশিরভাগেই লেখক নিজেই নায়ক। পূর্ববাংলায় কাটানো তার ছেলেবেলার সেই দিনগুলি এই সমস্ত গল্পে আবার তিনি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। নদীমাতৃক গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবন ও প্রচলিত

লোককথার সঙ্গে সঙ্গে ছোটবয়সের নানা দুষ্টুমি আর দুরন্তপনা, কিশোর বয়সের সুখ সাধ আর স্বপ্ন কল্পনা এইসব গল্পে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে এই গল্পগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ গল্পকার জীবনের শেষ দুই দশকে স্বভাবসিদ্ধ নানা ধরনের গল্প রচনার সঙ্গে সঙ্গে শিশু কিশোরদের জন্যও কিছু গল্প লিখেছিলেন। ছোটদের বন্ধ হবার ইচ্ছাই সম্ভবত সেইসব লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৩৬৩ সালের বৈশাখ মাসে এই ধরনের প্রথম গল্প 'শোক', লেখেন তিনি। তারপর ১৩৬৭ সাল থেকে শুরু করে ১৩৮২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রতিবছরই একটি, কখনও বা দুটি গল্প লিখেছেন। এইসব গল্পের বেশির ভাগই দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার শারদসংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সমকালীন অন্যান্য জনপ্রিয় কিশোর পত্রপত্রিকায়। বাংলা সাহিত্যে ছা‌েটদের জন্য এর আগেও বিভিন্ন লেখক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তাদের লেখার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই পর্যায়ের লেখার বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখেছি তিনি মূলত একজন অভিজ্ঞতানিষ্ঠ লেখক, এই শিশু কিশোর কাহিনিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানেও তিনি অলীক অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণ না করে তার চেনামহলকেই গল্পে নিয়ে এসেছেন। অন্তরঙ্গ সেইমহলে যেমন রয়েছেন বালক নরেন্দ্রনাথ ওরফে পন্টু, ছোট ভাই ধীরেন্দ্র মিত্র ওরফে কান্দু এবং হেমেন্দ্রনাথ মিত্র ওরফে বাঞ্চু, তেমনি রয়েছেন তাদের বাবা, মা, বাবার পিসিমা ভাইদিদি, চা‌াদার ঠাকুরদা ও আরও অনেকে। ছেলেবেলার সেই সুখে দুঃখে ভরা দিনগুলির মধ্যে যে চিরকালীন গল্পের উপাদান রয়েছে, তাকেই নরেন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের লেখা ছোটদের গল্পকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্বের নায়ক তিনি নিজেই। সেইসব গল্পে পুববাংলায় কাটানো তার কৈশোরকাল জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে। নদীমাতৃক গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ, গ্রামের পাঁচমিশেলি সাধারণ মানুষজনের দৈনন্দিন জীবন এবং এই সঙ্গে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতির নানাদিকও এইসব গল্পে বাস্তবনিষ্ঠ ভাবে ফুটে উঠেছে। ছেলেবেলার দুষ্টুমি আর অ্যাডভেঞ্চার, বন্ধুত্ব আর ঝগড়া বিবাদ, কিশোর বয়সের সাধ

আহ্লাদ, স্বপ্ন কল্পনা সমস্ত কিছুকেই এইসব গল্পের মুকুরে যেন প্রতিবিম্বের মতই স্বচ্ছভাবে দেখা যায়। আর দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে সেই ধরনের কিছু গল্প যেখানে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে মুখ্যভূমিকায় নন। তখন তিনি নাগরিক, নগর জীবনের পটভূমিকায় চোখের সামনে দেখেছেন পরবর্তী দুই প্রজন্মকে, তাদের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠাকে। আর সেই অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে ধরে রেখেছেন ছোট ছোট গল্পে।

১৩৬৭ সালের শারদীয়া 'অপরূপা' সাহিত্যপত্রে নরেন্দ্রনাথের 'অনাথের কীর্ত্তিকলাপ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই অনাথ নামের ছেলেটি নরেন্দ্রনাথের ছোটবেলায় তাদের বাড়ি কাজ করত। অনাথ ছিল নরেন্দ্রনাথের বাবার খুব প্রিয়পাত্র। তাই বাড়ির ছোটদের ওপর তার বেশ কর্তৃত্ব ছিল। বাড়ির ছোটদের মধ্যে যে সবার বড়, সেই পন্টুর (নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান খুব একটা বেশি ছিল না। তাই অনাথের কর্তৃত্ব বাড়ির বড় ছেলে পন্টু মেনে নিতে পারত না। এ নিয়ে প্রায়ই নানা রকম গোলযোগের সৃষ্টি হত। যা পরে বাড়ির বড়দের হস্তক্ষেপে মিটেও যেত। বেশির ভাগ সময় নরেন্দ্রনাথের বাবার পিসিমা, ছোটরা যাকে ভাইদিদি ডাকত, তিনিই এসবের মিটমাট করতেন। কখনও বা বাবা মহেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াত। এ হেন অনাথের নানারকম কীর্তিকাহিনির কথাই এই গল্পে সরসভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। ছোটবেলায় পন্টু প্রায়ই ভাবতেন অনাথের মতো সুখী কে? হাটে মাঠে ঘাটে উত্তর দক্ষিণে পুব থেকে পশ্চিমে কোথাও ওর যাওয়ার বারণ নেই। আর পন্টুর অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মকথায়' লিখেছেন, 'গাঁয়ের ছেলে হয়েও আমি না পারি গাছে উঠতে, না পারি নৌকো বাইতে। আরও এমন হাজার কাজ পারি না যা আমার ছোট ভাই পারে, যা আমার সমবয়সিরা এমনকি কমবয়সিরাও পারে।তাই অনাথের প্রতি বালক পন্টুর ঈর্ষা সঙ্গত কারণেই স্বাভাবিক ছিল।

ঈর্ষার আরও অনেক কারণই আছে। আঁকার নীচে ঢাকা পান্তাভাত আমি খেতে চাইলে মা বকুনি লাগান, কিন্তু অনাথের বেলায় কোনো নিষেধ নেই। সে আমাদের দেখিয়ে প্রায় রোজ পান্তাভাত খায়। পোড়া লঙ্কা কি কাঁচালঙ্কা পাতে ঘষে ডাল পোড়া দিয়ে মেখে দিব্যি হুস হুস করে অনাথ ভাতের থালা শেষ করে। খাওয়া হয়ে গেলে থালার

জলটুকু যাতে এখন অপূর্ব ঝোলের স্বাদ চুমুকে শুষে নেয়। সেই একঘেয়ে গরমঘাত খেতে গিয়ে হিংসায় আমাদের বুক জ্বলে, চোখ টাটায়, জিভ দিয়ে জল পড়ে। গরমের দিনে পান্তা, শীতের দিনে পরশুতি, অনাথের মতো সুখী কে। স্মৃতিচিন্তায় (রচনাবলী ২ খণ্ড) চাকলাদার ঠাকুরদার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরদার বাক্সে পাওয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ, গয়াসুরের • কাহিনি, আখ্যানমঞ্জরী আর মাইকেল নবীন বঙ্কিম গ্রন্থাবলি দিয়েই বালক পন্টুর সাহিত্যপাঠে হাতেখড়ি হয়েছিল। সেই চাকলাদার ঠাকুরদা (তার বাবার মামা) এবং ঠাকুরমার কথা নিয়েই লেখা হয়েছে 'গুপ্তচর' (শারদীয়া, দেবসাহিত্য কুটীর শারদীয় সংকলন ১৩৬৮) গল্পটি। ঠাকুরদার বাক্সের তালা ভেঙে দেখতে হবে ভেতরে কি আছে, নইলে নিজেদের নানারকম অনুমান করা আর শেষ হচ্ছে না। তাই একদিন কান্দু আর বাঞ্ছু মাথায় গামছা বেঁধে, হারিকেনের কালি মুখে মেখে ভয়ংকর বেশ ধরে দুজনে দুখানা লাঠি নিয়ে পুবের ঘরের দুটি দোর আগলে রইল। আর দলের সর্দার আমি দিদিভাইয়ের পান ছেঁচার লোহার গুঁতোটা নিয়ে এসে তালা ভাঙতে শুরু করলাম।এই অসমসাহসিক ডাকাতির শেষ হল ঠাকুমা কর্তৃক ডাকাত সর্দারের কর্ণমর্দনে। আর এর প্রতিশোধ নিতে পন্টু ঠাকুমার লুকিয়ে লুকিয়ে দাঁতে মিশি দেবার খবর গুপ্তচরের মতোই ঠাকুরদার কানে তুলে দিল।এ নিয়ে দাদু ঠাকুমার ঝগড়া আর ঝগড়া শেষে বিনাশর্তে ভাব করার কথা দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে।

একই গ্রামের একই পাড়ার ছেলে কুশল, বয়সে পন্টুর চাইতে দু'তিন বছরের বড় হলেও খেলার সঙ্গী হতে বাধা ছিল না। সেই কুশলকে কোনো এক অনির্দেশ্য কারণে সবাই বলে বোকা কুশা, কি কুশা বোকা। তাকে নিয়েই লেখা হয়েছে 'কুশল' (উত্তরায়ণ, শারদীয় সংকলন ১৩৭১) গল্পটি। গ্রামের নাপিত প্রাণনাথ শীলের চালাক বলে খ্যাতি আছে। তাই সে একদিন কুশলকে খুব গোপনে চালাক হবার ওষুধ বলে দিয়েছিল, পাকা তেঁতুল দেখেছিস? সেই তেঁতুলের কালো কালো বীচি দেখেছিস? সেই বীচি একশ একটা গুণে নিবি। খবরদার কেউ যেন দেখতে না পায়। দেখতে পেলে আর ফল হবে না। তারপর সেই বীচিগুলি নিয়ে হামানদিস্তায় ভালো করে গুড়ো করবি। খবরদার সেই শব্দ যেন কারো কানে না যায়। তাহলে ফল হবে না। তারপর

করবি কি সকাল সন্ধ্যায় সেই গুড়ো একটু একটু করে খাবি। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার মতো চালাক না হয়ে উঠিস, আমি কী বলেছি।

চালাক হতে গিয়ে কুশল স্ট্রং ডায়েরিয়া হয়ে প্রায় যায় যায় অবস্থা। কোনোমতে ডাক্তারের ওষুধে সে যাত্রা প্রাণে বাঁচল সে। এই হাসি ঠাট্টার গল্পে শেষদিকে হঠাৎ কিছুটা গভীরতার ছোঁয়া লেগেছে। গল্পকথক বছর তিনেক পরে জেলাশহরে কলেজে এসে হঠাৎ একদিন কুশলকে দেখতে পান একটি যাত্রা দলের অভিনেতারূপে। সে নিয়েছিল আকাট মূর্খ এক হাবাগোবার পার্ট। তবে তার পার্টই সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। অঙ্কের বিরতিতে রঙমাখা চেহারায় কুশল নিজেই এসে পরিচয় দিল। আর তার অভিনয় ভালো হচ্ছে, এই প্রশংসার উত্তরে জোর করে একটু হেসে বলল, পেটের দায়ে এই চালাকিটুকু শিখেছি। আমি যতখানি বোকা তার চেয়েও বেশি বোকার পার্টি করতে পারি, আমি যতখানি ভালোমানুষ তার চেয়েও বেশি ভালো মানুষ সাজতে পারি আজকাল। জলের দেশ পুৰবাংলা, চলাচল বেশির ভাগ নৌকোতেই হত। কিন্তু নৌকাচড়ে পটুদের আনন্দ হত না। তারা কলার ভেলায় আর তালগাছের ডোঙায় চড়তে চাইত। সে জিনিস তারা পাবে কোথায়। শেষপর্যন্ত বাচ্চাদের একান্ত অনুরোধে পাশের বাড়ির গোপাল ঘরামির মেয়ে বুচিকলার ভেলা বানিয়ে আনল। পন্টু, কান্দু ও বাঞ্ছুর খুশি আর ধরে না, এই কলার ভেলার ময়ূরপঙ্খী তাদের সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে নিয়ে যাবে, এই কল্পনায় মন তাদের রঙিন হয়ে উঠল। তারপর একদিন বাঞ্ছু একা একা সেই ভেলায় চড়ে যেতে গিয়ে কিভাবে উলটে জলে পড়ে গেল, কিভাবে আবার তাকে উদ্ধার করা হল এবং সেই অপয়া কলার ভেলাকে জলে। ভাসিয়ে দিলেন দিদিভাই, সেই ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘ময়ূরপঙ্খী’ (অলকানন্দা, শারদীয় সংকলন ১৩৬৯) গল্পটি।

‘কানা বাসরের ঘোড়া' (বেনুবীণা, শারদীয় সংকলন ১৩৭৫) গল্পে পৌষ সংক্রান্তির দিন গ্রামের মাঠে ঘোড়দৌড়ের কথা রয়েছে। ঘোড়ার সওয়ার ইসমাইলকে তার ভিটে বাড়ির মালিক হুকুম দিয়েছিলেন সে যেন তার ঘোড়াকে ইচ্ছে করে পেছনে টেনে রেখে হারিয়ে দেয়, এজন্য দশটা টাকাও দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল দৌড়ে

ইসমাইলের ঘোড়াই সবার আগে শেষসীমায় পৌছাল। মনিবের ভয়ে ভীত ইসমাইল আশ্বাসের জন্য রাতের অন্ধকারে পন্টুর বাবার কাছে এলে তার কাছে জানা গেল কিভাবে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানোয়ারটা নিজের জোরেই নিজে বেরিয়ে গেল।আর শেষদিকে ইসমাইলও আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল 'আমি যে কারাে ভিটে বাড়ির প্রজা সে কথা ভুলে গেলাম, আমি যে মনিবের ধমক খেয়েছি টাকা খেয়েছি সে কথা আর মনে রইল না। আমি আর আমার ঘোড়া ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু রইল না মেজোকর্তা।

এভাবে প্রতিটি গল্পেই নরেন্দ্রনাথ তার শৈশবের সেই বৈচিত্র্যে ভরা দিনগুলোকে আমাদের সামনে ছবির মতো তুলে এনেছেন।

যে গল্পটি নিয়ে নরেন্দ্রনাথের শিশু কিশোর গল্পমালার সূচনা হয়েছিল, সেই 'শোক' (মৌচাক, বৈশাখ ১৩৬৩) গল্পটি আগাগোড়াই একটি চিঠি। বাড়ির ছোট ছেলেটির আদরের পোষা বেড়াল রঙন, তারও যখন বাচ্চা হল একটা, আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু ক-দিন যেতে না যেতেই এক কালো হুলো বেড়াল এসে মায়ের একটু অসাবধানতার সুযোগে সেই তুলতুলে নরম বাচ্চাটার ঘাড় মটকে মেরে ফেলল। আদরের রঙনের ততোধিক আদরের ছানার এই নিষ্ঠুর মৃত্যুতে বাড়িতে নেমে এল শোকের ছায়া। আর তাই ছোট ছেলে ডন তার ইতুমাসির জন্মদিনে যেতে পারল সেই না যাবার কারণটা জানিয়ে প্রিয় মাসির কাছে চিঠি লিখে সে মনের দুঃখটা হালকা করতে চায়। গল্প তথা চিঠির শেষে রয়েছে ইতি—তোমার 'ডন'ও 'শোক' দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প, যেখানে নরেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা নয়, তার পরবর্তী প্রজন্মের, তার সন্তানের ছেলেবেলা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত মনে করা যায়, লেখকের কনিষ্ঠ পুত্রের ডাক নাম 'ডন'। এইটুকু তথ্যের সূত্রে গল্পটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 'অনুকারিণী'গল্পের 'তোড়া' বাড়ির সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা। তার ঠাকুমা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করেন। তোড়াও সঙ্গে সঙ্গে তানপুরা বাজাতে বসে। গলা ছেড়ে গান গায় আ আ আ। তেমনি অধ্যাপক বাবার দেখাদেখি সেও বই খুলে বসে দুর্বোধ্য ভাষায় পড়া শুরু করে। চালাদার ঠাকুরদা ঠাকুমা যেমন নাতি পন্টুকে নিয়ে মাঝেমধ্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন, আজ সেই দুরন্ত পন্টু ঠাকুরদার ভূমিকায় বসে নাতি নাতনিদের দুষ্টুমি থেকে গল্প লেখার উপকরণ খুঁজে

পান। উষ্ণ জীবনের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত এইসব গল্প চলতি কিশোরগল্প থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম এক স্বাদ নিয়ে আসে আমাদের কাছে।

১২.৯ অনুশীলনী

১। শহুরে জীবনে কিভাবে নরেন মিত্রের গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। নরেন মিত্রের গল্পের বিশেষ চরিত্র হলো শিল্পী চরিত্র এবং জটিল প্রেম আলোচনা করো।

৪। জীবন মৃত্যু কিভাবে নরেন মিত্রের গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আলোচনা কর।

৫। ছোটদের নরেন মিত্র – টীকা লেখো।

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ সাহিত্য বিহার

২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা।

৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—'আত্মকথা', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২

৪। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী

৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—‘গল্প লেখার গল্প’ (১-১৫ জুলাই ১৯৭৫) বেতার জগৎ পত্রিকায় প্রকাশিত

৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র-‘জন্মভূমি’ ভাঙ্গা হাইস্কুল শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, শান্তিনগর ঢাকা, বাংলাদেশ,

৮। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—

৯। অরুণকুমার মুখপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২

১০। বীরেন্দ্র দত্ত—বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, এস পি পাবলিশিং, কলিকাতা,

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খণ্ড—গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা,

১২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশ কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা,

১৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—অসমতল গল্পগ্রন্থ ২য় সংস্করণ

১৪। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, চতুর্থ প্রকাশ,

১৫। নারায়ণ চৌধুরী-নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প’

একক ১৩ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – চোর, রস, চড়াই-উৎরাই, অবতরণিকা

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ চোর

১৩.২ রস

১৩.৩ চড়াই-উৎরাই

১৩.৪ অবতরণিকা

১৩.৫ অনুশীলন

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ চোর

তেরোশো একান্ন সালের মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ ঘটে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোর' গল্পটির। ইংরেজি সাল হিসেবে জানুয়ারি, উনিশশো চুয়াল্লিশে। লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ বেরোয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশে মোট বারোটি গল্প নিয়ে 'অসমতল' নামে। এই সংকলনেরই অন্যতম দ্বিতীয় গল্প 'চোর'। প্রকাশকাল ধরলে, এবং নিশ্চয়ই রচনাকালের দিক থেকে সঠিক মাস ও বছর না জানা থাকলেও, গল্পটির রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ, অন্তরাল স্থিত অবক্ষয়ের, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবনমনের দিক এ গল্পের সমকালকে নিশ্চিত প্রামাণ্য করে। গল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবির্ভাবকাল নিশ্চয়ই বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রথম দিক, কিন্তু তার প্রথম মুদ্রিত রচনা

স্মরণে থাকলে প্রমাণ হয়ে যায় তার প্রথম আবির্ভাব কবির কলম নিয়েই। তিরিশের দশকের শেষে উনিশশো ছত্রিশ সালে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মূক' নামে একটি কবিতা।

তখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, কবিতাই তাঁর প্রিয়তম প্রকাশ মাধ্যম, কবিতাও প্রিয় বিষয়। কবির অনুভূতি নিয়ে তার যাত্রা শুরু, কথাসাহিত্যের অঙ্গনে ভীরু পোশাক ছেড়ে রাজবেশ পরে প্রবেশ। ছাত্রজীবন থেকে গ্রাম, মফঃস্বল শহর আর নগর কলকাতা এসবের বাস্তব জীবন-পরিক্রমায় যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অজস্র নুড়ির সঞ্চয়, তা-ই তাকে নিয়ে আসে গল্পের ও উপন্যাসের জগতে। প্রথম জীবনের কবিতার সূক্ষ্ম অনুভূতি, পরবর্তী জীবনের নানান প্রতিকূল অবস্থায় জীবন সংগ্রামের রক্তিম রূপসূত্রে অভিজ্ঞতার বাস্তবতা-দুই মিলে নরেন্দ্রনাথকে কথাকারের মধ্যে বসায় সেই সময়। সময়টা তিরিশের দশকের শেষার্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাই কথাকার হিসেবে যা কিছু লিখেছেন গল্পের ধারায়--সবই তার অনুভবের গল্প। ছোটগল্পের বাস্তব আর কবি-মনের কোমল কোণের একান্ত অনুভবের জগৎ-দুই মিলে-মিশে তার গল্পের এক লক্ষণীয় ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে ধরিয়ে দেয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের যা কিছু সীমা, তা-ই তাঁকে অসীমের দিকে নিয়ে যায়। সীমা পায় গল্পের বাস্তবতায়, অসীম পায় পরিচ্ছন্ন অনুভবে, কবি-মনের নিঃসঙ্গতার প্রয়োগে ও অভিজ্ঞতায়। 'চোর', 'ঘুষ', 'এক পো দুধ' ইত্যাদি গল্পে এর প্রমাণ মেলে। নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এক স্বীকৃতি ও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। তাই তার গল্পের সীমা তার ত্রুটি নয়, তার নিশ্চিত অবলম্বন। আঁকা চরিত্রদের ভাবনা-চিন্তার শেষতম ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপ, যাকে তার গল্পের সিদ্ধান্তের 'মোচড়ে' পাই, তা তাঁর অনুভব, তার সংগুপ্ত কবিমনের অলৌকিক এক শীতলপাটি বিছিয়ে তার ওপর স্বভাবী পাঠকদের আসন করে দেওয়া।

'চোর' গল্পের মধ্যে এসবের যথোচিত ভাষ্য মেলে। গল্পটি পড়া শেষ হলে সমালোচক-পাঠকের মনে পড়ে এর ছোটগল্প-ধারায় বিশেষ শ্রেণীচিহ্নিত করার বিষয়। গল্পটির

কাহিনী-অংশ সামান্য—মাত্র দুটি চরিত্রের বাইরের ও মনোলোকের রুদ্ধশ্বাস টানাপোড়েনেই যার নিটোল রূপ সামনে আসে। অমূল্য আর তার স্ত্রী রেণু—সেই দুই চরিত্র। অমূল্যর স্বভাব ছিঁচকে চোরের মতো। চাকরি করে ‘পাল ব্রাদার্স’ নামের এক দোকানে। সদ্য বিয়ে করেছে অমূল্য। তার পুরনো অভ্যাসেই দোকান থেকে কিছু-না-কিছু হাত-সাফাই করে আনে বউ রেণুর জন্য। রেণু বুঝতে পারে তার স্বামীর এমন চৌর্যবৃত্তির বিষয়। স্বামীকে বারণ করে, রাগারাগি করে, অভিমানে, চাপা অপমানবোধে নিশ্চুপ হয়ে চোখের জল ঢাকে কখনো-কখনো, কিন্তু অমূল্য তার কোনো কথা শোনে না। অমূল্যর এমন অন্ধকার স্বভাবের জীবন, ঘৃণ্য জীবন রেণুকে ভিতরে ভিতরে অসহায় করে তোলে দাম্পত্য ও সাংসারিক নৈতিকতার দিক থেকে। রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত রোমান্টিক সম্পর্কও বিস্বাদ হয়ে ওঠে রেণুর কাছে।

রেণুর সমস্ত রকম নিষেধ, প্রতিবাদ, ক্ষোভ সত্ত্বেও অমূল্য এক সময় দোতলার ভাড়াটে বিনোদবাবুর ঘর থেকে কাঁসার বাটি চুরি করে আনার পরামর্শ দেয় রেণুকে। কারণ রেণুকে বিনোদবাবুর স্ত্রী খুব ভালোবাসেন। তার ছোট ছেলেও রেণুর খুব অনুগত। রেণু তখনো অমূল্যর কথামতো নীচে নামতে পারে না, পারবেও না কোনোদিন—এরকম এক নীতি শাধিত ভাবনা মনে পুষে রাখে। হঠাৎ একদিন সহকর্মীর সঙ্গে মতবিরোধে অমূল্যর ‘পাল ব্রাদার্স’ থেকে চাকরি যায়। সংসার দারিদ্রে ভাঙতে থাকে, প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর কঠিন অভাবের জীবনধারণ দুঃসহ ও দুরূহ হতে থাকে। অমূল্য আপ্রাণ চাকরি খোঁজে, পায় না। হাত সাফাইয়ে পেন চুরি করে এনে পরে তা বিক্রি করে একদিন বাঁচার উপযোগী চাল-ডাল-তেল-কয়লার সঙ্গে এক শিশি সুগন্ধ নারকেল তেলও কিনে আনে রেণুর জন্য। সেদিন রাতের বিছানায় আবার অমূল্য রেণুর সাহসহীনতার অভিযোগ তোলে।

অবশ্যই যেনবা অমূল্যর প্রচ্ছন্ন প্রেরণায় গল্পের শেষে রেণু তার সাহস দেখায়। বিনোদবাবুর ঘর থেকে এক ফাঁকে তার হাতঘড়ি চুরি করে এনে রাতের বিছানায় স্বামীর হাতে বিজয়িনীর গর্বে তা পরিয়ে দিয়ে খুশি করতে যায়। ঘড়ি পরিয়ে দুহাতে

জড়িয়ে ধরে স্বামীকে। এই ঘটনায় অমূল্যর মনের গভীরে লাগে ভয়ঙ্কর আঘাত। অমূল্যর কাছে সেই মুহুর্তে তার স্ত্রীর অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।

লক্ষণীয়, গল্পটির দুটি মাত্র চরিত্রের মানস বিবর্তনের মাধ্যমে যে বিষয় নিতি ভাবের নিষ্পত্তি তা সমকালীন বাস্তব সাংসারিক তথা সামাজিক মৌল সত্য ধরে উঠে আসে। সেখানে নিশ্চয়ই বৃত্তের অর্থে মনস্তত্ত্ব-সম্মত সমাজসমস্যা মূলক গল্পের শ্রেণীতেই চিহ্নিত হয়ে যায় 'চোর' গল্প। গল্পের প্লট-বৃত্তের দিক থেকে এর কাহিনী অংশ তুচ্ছ। তা আদৌ ঘটনাশ্রয়ী নয়, কোনো বিশেষ ভাবের পরিবাহকও নয়। গল্পটির প্লট দুটি চরিত্রের মনের মধ্যে যেন এক সংযোগ সেতু—তার ওপর দিয়ে প্লটের সূক্ষ্ম সুতোর জট তৈরি হতে হতে একসময় হঠাৎ ভেঙে যাওয়া শেষ প্রান্তের গল্পের অংশে সেই জট পাঠকদের স্তম্ভিত করে। দুটি মনের মধ্যে যে বন্ধন তৈরির পুল, তার জটিল গঠনে কার দায়িত্ব অমূল্য, না রেণুর—সেই প্রশ্নেই এক অন্ধকার বিবর সামনে আসে। বস্তুত গল্পের প্লট জটিল হয় চরিত্রদের মনোলোকেই-বাইরের জীবনে ও স্বভাবে নয়।

'চোর' গল্পের গঠনে টানা কাহিনী নেই, নেই কোনো বড় ঘটনার তাৎপর্যময় উপস্থিতি একথা আগেই বলেছি। কিন্তু অমূল্য নিজে তার সক্রিয়তা দিয়ে যেসব ছোট ছোট ঘটনা ঘটিয়েছে জিনিস চুরির প্রসঙ্গ ধরে, সেগুলি গল্পের বাইরের অবয়ব রচনা করেছে ঠিক, অবশ্যই গল্পের প্লটকে সুতোয় বেঁধে নিয়ে গেছে দম্পতির যৌথ সম্পর্কের দায়িত্বে। অমূল্যর এক একটি চুরির ঘটনা আর প্রথম দিকে রেণুর মনের গভীরে তার প্রত্যক্ষ ও গোপন বিষ প্রতিক্রিয়া—এসবেই প্লটের বন্ধন ও জটিলতা রূপ পেয়েছে। অমূল্যর এক একটি চুরির ঘটনা দিয়ে মাঝখানে গল্পকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-বাক্য প্রয়োগে তাদের সংযোগ সূত্র রচনা করেছেন। লেখকের এমন উপস্থিতি গল্পের প্রয়োজনীয় ভাষ্যকারেরই বুঝিবা! গল্পের প্লট গতিপ্রাণ হয়েছে মনের জগতের আলো-আঁধারি খেলায়।

সাধারণভাবে, প্রতি গল্পেই প্লটের অবয়বে একটি করে মহামুহুর্ত থাকে। এ গল্পে তা আছে অমূল্যর চরিত্র ধরে নয়, আছে রেণুর এক অবিশ্বাস্য সক্রিয়তায়। অমূল্যর চাকরি যাওয়ার পর অমূল্য যখন দৈনানুদৈনিক জীবনধারণে সম্যক বিপর্যস্ত, তখনি রেণুর দিক

থেকে দোতলার বিনোদবাবুর ঘড়ি চুরির যে ঘটনা, তার মধ্যেই আছে সেই ‘চরমক্ষণ’টি। এই ‘চরমক্ষণ’ প্লটের কাহিনী-আভাস ধরে নয়, চরিত্রের মনোলোকের তীব্রতম প্রতিক্রিয়ায় :

‘নিস্তব্ধ ঘর, ঘড়ির শব্দ এখান থেকেই যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, অতটুকু হাতঘড়িতে কি এত শব্দ হয়? এ তার নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ! একবার রেণু চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখান থেকে তার নড়বার শক্তি নেই, পা আটকে গেছে মাটিতে। আর ওই হাতঘড়িটার ছোট ছোট কাঁটা দুটো তার দুচোখের তারাকে বিদ্ধ করে রেখেছে’।

এইভাবে রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ ও মন দিয়ে ‘চরমক্ষণ’ রচনা, আর এর শেষঃ

‘এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব। আর একবার ছোট্ট ঘড়িটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখল রেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শও কি এত তীব্র, এমন রোমাঞ্চকর’।

এই ‘মহামুহূর্তে’র শেষতম চিত্রটি রেণু চরিত্র বিবর্তনে তার নীচে নামার আগে আত্মতৃপ্তি দিয়ে মৃত্যুর আগের মুহূর্তের মতো একবার জ্বলে ওঠার, জীবন সুস্থ হওয়ার মতো এক নিষ্ফল অবস্থা!

‘চোর’ গল্প যেহেতু চরিত্রে মনস্তত্ত্বনির্ভর সমাজসমস্যাসুলভ বাস্তবতার গল্প, তাই এর দুটি চরিত্রই আমাদের আলোচনায় সমান প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে লেখা এই গল্পে যুদ্ধের কালো ছায়া নিশ্চয়ই আছে, আছে সন্তর্পিত স্বভাবে। অমূল্য সেই যুদ্ধের আগুনে পোড়া ছড়ানো ভস্ম থেকে উঠে-আসা সারা গায়ে ভস্ম-মাখানো ব্যক্তিত্ব! যুদ্ধে বিধ্বস্ত সমাজ ও মধ্যবিত্ত জীবনের নৈতিকতার বিপর্যস্ত রূপ, অবক্ষয়িত মনোভূমির পাংশু বর্ণ স্বভাব অমূল্য সহজ ললাটলিখনের মতো বহন করেছে। সে নববিবাহিত। সামান্য মাইনের চাকুরে সে। লক্ষণীয়, তার যে ছিচকে চোরের স্বভাব, তা চরিত্রের অন্তর্নিহিত নয়, সমসময়বর্তী সমাজই তাতে আরোপের ধর্মকে প্রকট করে।

নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে একজন নববিবাহিত পুরুষের পক্ষে সমকালীন বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বণ্টনবৈষম্যের শিকার এই অমূল্য। সে অন্তত তার স্ত্রীর কাছে

আদৌ অসৎ নয়। নিজের চুরি করার কথা যেমন অকপটে বলে, তেমনি হাত সাফাইয়ের জিনিস দিয়ে স্ত্রীকে খুশিও করতে চায়! তার হাত সাফাইয়ের কাজে আছে অটুট আত্ম প্রত্যয়, সেই সঙ্গে সংসার ফিরে স্ত্রী রেণুর প্রতি আছে সমান ভালোবাসার আকর্ষণ:

'অমূল্য এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওকে, কেবল এই গোঁড়ামিটুকু যদি না থাকত, এই অতিরিক্ত শুচিবায়ু।'

অমূল্য হাত সাফাইয়েই তাই চাকরির দোকান থেকে আনা দামী চিরুনি উপহার দেয় রেণুকে। ট্রামে টিকিট না কাটার যুক্তি:

'বিয়ে করার বড্ড খরচ। দু'চার পয়সাও যদি এ ভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তা হ'লে কি করে চলে বল।'

এসবের পরেই অমূল্যর চাকরি যায় দোকান থেকে। তার পর তার নতুন করে বাঁচার সংগ্রাম শুরু। চাকরি খোঁজে, পায় না। বাড়ির জমানো স্নো-সাবান বিক্রি করে সংসার চালায়। যখন আর চলে না, হাত সাফাইয়ের পেন বিক্রি করে প্রতিদিনের সংসারে বেঁচে থাকার খাদ্য-সামগ্রী জোটায়, সেই সঙ্গে 'ওটিন স্নো' এনে এই অভাবের মধ্যেও স্ত্রীকে উপহার দিতে ভোলেনা। অমূল্যর সংসার জীবনে আছে ত্রিস্তর বিবর্তন—প্রথম স্তরে সে একেবারে নিজের মতো করে নীতিহীনতায় ও পাপের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করেছে, নববিবাহিত জীবনের সমস্তরকম অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্যে। দ্বিতীয় স্তরে, তার চাকরি যাওয়ার পরেও নতুন করে চাকরি খোঁজার উৎসাহের মধ্যে, হাত সাফাইয়ে জিনিস বিক্রি করে বাঁচার মধ্যে, স্ত্রীকে 'ওটিন স্নো' উপহার দিয়ে ভালোবাসায় কাছে টানার মধ্যে সে যেভাবে হোক বাঁচতে চেয়েছে,অবশ্যই তার বাঁচার প্রয়াসে লেগে আছে ধূয়ার মতো সেই নীতিহীন চৌর্যবৃত্তি! তৃতীয় স্তরে তার ভালোবাসার স্ত্রী সম্পন্ন সমস্ত রকম মোহের যে করুণ বিনষ্টি, দারিদ্র্যের মধ্যেও অবশিষ্ট সেই ভালোবাসার মহত্তম দিকটির যে কলঙ্কিত, হতাশাখিন্ন স্বভাব, তা-ই একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে।

অমূল্য তার সময়ের শিকার। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন অবক্ষয়িত পরিবার ও সমাজের, বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থায় পঙ্গু পরিবেশে চিহ্নিত। অমূল্যর শেষতম সিদ্ধান্ত ভাবনা কেবল ব্যক্তির অনুভব মাত্র নয়, তা পরিবার তথা সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক উদ্দেশ্যচিহ্নিত অন্তিম ভাষণ। বাস্তবতা যেমন ছোটগল্পের অবয়ব, তেমনি তা গল্পের চরিত্রেরও প্রাণ এবং সম্পদও। অমূল্য চরিত্রের বাস্তবতা তার মনেই নির্মিত। সে সমস্ত রকম সচেতন নীতিহীনতা, পাপবুদ্ধি নিয়ে আদর্শপ্রাণিত এক সাংসারিক জীব হিসেবে স্খলিত পুরুষ। তার স্খলন ও পতন সমাজনীতির নির্দেশেই ধরা পড়ে। কিন্তু এই মানুষটি অভাবে একেবারে যন্ত্র হয়ে যায়নি, মনের মধ্যেকার স্বাভাবিক সুস্থ বোধকে এতটুকুও হারায়নি। আর, হারায়নি বলেই স্ত্রীর দামী ঘড়ি চুরি করে আনার ঘটনায় সে মনের গভীরে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ায়, বুঝি বা কোনো প্রবল শত্রুর দিক থেকে আক্রান্ত হয়। এমন প্রতিক্রিয়ায় তার মনোলোকের অন্ধকার আর একদিকে আলোকময়—যে আলোয় স্ত্রী ও তার পতনে-পচনে সংসার জীবনকে দেখে।

‘আজ তার উল্লসিত হওয়ার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দুখানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোনো সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-কনিত মৃণালভুজ নয়—তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।’

এতদিন তার সমস্ত নীতিহীনতার মধ্যে রেণুর সান্নিধ্য ছিল পাপস্খলনের একজাতীয় মুক্তির জায়গার মতো। তা ছিল তার সমস্ত রকম বিচ্যুতির পরে বাঁচার একমাত্র আশ্রয়, পরোক্ষে প্রেরণাও। সেই আশ্রয়টুকুও হারাবার মুহূর্তে তার নতুন অনিকেত জীনের সূচনা রেণুর চৌর্যবৃত্তি গ্রহণে। এখানেই অমূল্যর জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধন ছিন্ন হওয়ার, শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার অভিশাপ চেপে বসে। তার স্ত্রীকে কঠিন অমর্যাদায় হারানোর শোক তার সংসারভিত্তির শিথিলতাকেই নিশ্চিত করে। এ রেণু গল্পের এমন এক চরিত্র, যার বিবর্তনের মধ্যে প্রধান দুটি অংশের ভাগ ধরা পড়ে। স্পষ্টত রেণু যুদ্ধ-সমকালের ক্রমিক অবক্ষয়ে আক্রান্ত হওয়ার উপযোগী এক সাংসারিক বধূ শ্রেণীর চরিত্র। তার নীতিবোধ থেকে নীতিহীনতায় নিমজ্জিত হওয়ার মধ্যে নিম্নশ্রেণীর

অসহায়তা—সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুইই প্রকট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে যেমন কালোবাজার, চোরাকারবারি ও মজুতদারদের প্রথম সমাজে দেখা দেয়, তেমনি প্রথম ভদ্র সমাজে গণিকা-বৃত্তি গ্রহণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভদ্র সমাজের গৃহস্থ বাড়িতে গণিকাবৃত্তির প্রচলন ও উদ্ভূত যুদ্ধ-সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিষাক্ত, পচনশীল জীবন-ব্যবস্থার ছিল স্বাভাবিক দিক। ঘরের বধু, সংসারী নারী হচ্ছে গাণক, ঘরের বন্ধু হয়ে উঠছে চোর—গভীর তাৎপর্যে দুটি অবস্থাই এক বিষয়ের, এক সমাজ দষ্টির, এক জীবন ভাবনার দুই আধার। সুন্দরী নববধূ রেণু হল চোর-চাকুরিহীন খামার অসহায়তার কারণে— এর মধ্যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অবস্থার যে অভিশাপ আছে, তাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কালের শিকার, যারা অবশ্যই সময়ের নির্মম অভিঘাতে সুস্থ জীবনাদর্শের স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত থাকতে অপারগ।

তখন অমূল্যর দোকান থেকে চাকরি যায়নি, একদিন অমূল্য ভোরে রেণুকে বিনোদবাবুর বাড়ি থেকে দামী স্টিলের বাটি চুরি করে আনার যুক্তি দেয়। তীব্র প্রতিবাদে রেণু গুম হয়ে থাকলেও অমূল্যর কথার প্রতিক্রিয়া তাকে রীতিমতো ভৌতিক স্বভাবে ঘিরে রাখে:

'দুপুরবেলায় মাসিমার কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে অকারণে রেণুর হাত কাঁপতে লাগল। কী সাংঘাতিক মানুষ অমূল্য, কি বিশ্রী ঠাট্টাই সে করতে পারে।'

এইভাবে অমূল্য অর্থাৎ স্বামীর কথায় রেণু নিজের মধ্যেই নিজের জটিল দ্বন্দ্বের শিকার হয়। অমূল্যর চাকরি যাবার পর এক রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীর শয্যাদৃশ্যের সংলাপ বিনিময় চিত্র এই রকম:

'স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রেণু আস্তে আস্তে বলল, যাই বলো, আমার কিন্তু গা কাপছে এখনো। এত সাহস কি ভালো? ...অমূল্য বললো, 'সাহস ভালো নয় ? সাহস না থাকলে এতদিন উপোস করে মরতে হত।...' অভিমানে কথা ফুটলো না রেণুর, ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল বার বার। এর জবাব রেণু স্বামীকে একদিন না

একদিন না দিয়ে ছাড়বে না।' রেণু চরিত্রের যে কুৎসিত অবতরণ, তার বীজ স্বামীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো গভীর গোপন মনোবিকলনে।

অর্থাৎ রেণুর মধ্যে যে পতনের নিয়তি-স্বভাব, তা দুটি সূত্রে এসেছে:

১. স্বামীর তাকে দুর্বল বলার কারণে সাহস দেখাবার মতো প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিকতার জাগরণে;

২. চাকরীহীন অসহায় স্বামীর পাশে থেকে তার সহধর্মিনী হিসেবে তাকে কিছুটা অর্থনৈতিক চাপ থেকে 'রিলিফ' দেওয়ার মানসিকতায়।

রেণুও বস্তুত পরিবেশের শিকার। সে নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূ হওয়ায় হয়েছে তা সেই সঙ্গে নীতিহীন স্বামীর প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি তার পাপ ও নীতি, বৃত্তিগুলিকে উপযুক্ত সহধর্মিণী হিসেবে গ্রহণ করার নিষ্ঠার মধ্যেই তার ভাগটি অসহায়তা স্থির হয়ে যায়। অথচ এই রেণুই গোড়া থেকে ছিল আদর্শ স্ত্রী, বধূ। ট্রামে টিকিট না কাটায় স্বামীর প্রতি ক্ষোভ, দোকান থেকে সাবানের বাক্স, প্লেট হাত সাফাই করার কারণে মনের মালিন্যে অসহায়তা, দামী চিরুনি হাত সাফাইয়ে আনায় রেণুর চাপা ক্ষো রাগ—এসবই রেণুকে ভদ্র, রুচিসম্পন্না রমণী করে তুলেছিল। রেণু তাদের ভবিষ্যৎ ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবেছে, ভেবেছে তাদের সামাজিক সুস্থ জীবনের কথা। স্বামীর পাশে শুয়ে রেণুর চিন্তা:

'কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ-সব সে সহ্য করতেই পারে । কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বৌ।

অন্ধকারে স্বামীর বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে এলো। এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট, পরের দোকান থেকে জিনিস চুরি করে আনতে যার কোন লজ্জা-ঘৃণার বালাই নেই।

অমূল্যর চুম্বনের প্রত্যুত্তরে রেণু কিছুক্ষণ স্তব্ধ...'।

রেণুর মধ্যে ছিল প্রবল সামাজিক ও ব্যক্তিক মূল্যবোধ। সে স্বামীর চুম্বনের প্রতিক্রিয়ায় থাকে শীতল, বৈষয়িক অমূল্যর কাছে স্বামী-স্ত্রীর গোপনতম সম্পর্কের আদান-প্রদানে রেণু আবেগের থেকে যুক্তির আশ্রয় নেয়। রোমান্টিক সম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে এ এক নির্মম নিষ্ফলত্ব!

এমন যে রেণু, তাকে গল্পের শেষে লেখক এঁকেছেন নীতিহীন, পতিত এক নারী হিসাবে। তার স্বামীপ্রেম অটুট, বরং শেষ দিকে অনেক বেশি আবেগাত্মক, কিন্তু তার স্বভাবে আছে বিষাক্ত কালি-কলুষ—যা পান করে মানুষ আত্মহনন করতে যায়। রেণুর পরিবর্তন প্রকারান্তরে তার আত্মহননেরই সামিল। তার স্বামীকে কাছে পাওয়াও যেন আর এক পৃথিবী জয়ের সামিল। যে স্ত্রী স্বামীর আপদে-বিপদে, মতে-মতান্তরে এতদিন সহযাত্রিনী হতে পারেনি, সে আজ সেই স্বামীকে চিরকালের আপন করতে পারছে:

'....লাইটটা অফ করে এসে রেণু স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। আজ তার কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই। আজ সে পৃথিবী জয় করে ফিরেছে।'

কিন্তু অমূল্যর মতো আমরাও জানি, রেণুর মতো নববিবাহিতা বধূটি সমস্ত রকম কুণ্ঠাশূন্য, লজ্জাহীন, দীন, সমস্ত দিকের সৌন্দর্যহীন, স্বামী নামক পৃথিবীর কাছে চির পরাজিত এক মলিন বিষাদময় ব্যক্তিত্ব। হাত সাফাইয়ে পাপ ও নীতিহীনতায় অমূল্যর নিজেরই একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, স্থান, স্তর ও মাপ ছিল, রেণুর সে সব কিছুই থাকেনি।

সে বিনোদবাবুর ঘড়ি চুরিতে হয়ে যায় নৈতিক বোধ থেকে সর্বস্বান্ত। যার জন্য সে এত বড় ঘটনা ঘটায়, এত নীচে নেমে যায়, তার কাছে সে হয় শ্রীহীন, কলঙ্কিত পরিত্যাজ্য মনের গভীর অধিতলে।

আসলে সমস্তরকম অপকর্মের মধ্যেও অমূল্যর মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন বোধ ছিল স্ত্রী। রেণু সম্পর্কে। তার প্রেম নামক সুকুমার বৃত্তিটি রেণুকে ঘিরেই অমূল্যর প্রেমের ঘেরাটোপে মূল্যবান এক মণি। রেণুর পতন হল সেই ঘেরাটোপের বাইরে, প্রেমের স্থান থেকে অপ্রেমের নিয়তিতে। তার পতন অমূল্যর চিন্তায় নিয়তিরই এক নির্দেশ -

‘...স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর এ সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।’

সময়ের পরোক্ষ শিকার ‘চোর’ গল্পের দুই চরিত্র—অমূল্য ও রেণু। এমন সময় ধরেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই গল্পে তার জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিটি ধরা পড়ে যায়। বিশ শতকের চল্লিশের দশক ধরে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যতগুলি গল্প লিখেছেন, দেশ-কালের দাবিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তার গল্পকার-ব্যক্তিত্ব এমন সময়ের কালো ছায়া নিয়েই ছোটগল্পগুলিতে ধরা পড়ে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের প্রধান শর্ত সমাজ-বাস্তবতা, দ্বিতীয়, মানবিক বোধ সেই বাস্তবতার রূপ-রূপায়ণ ও প্রতিষ্ঠা প্রয়াস। মধ্যবিত্ত জীবনের সুপরিচয়ের রসের আস্বাদ আমাদের মনোলোকে মেলে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তার অনুগামী গল্পকার-ভাষ্যকার। লেখকের কথাই ঠিক, অপরিচিতদের পরিচিত করাতে চাননি তিনি, কিন্তু পরিচিতরা একদিকে যেমন সুপরিচিত হয়েছে, তেমনি তারা যে – এত অপরিচিত ছিল, তার বিস্ময় আমাদের স্থির করে রাখে। মধ্যবিত্ত সমাজে খুব পরিচিত কাছের মানুষও কিন্তু অদ্ভুত অপরিচিত! অর্থনীতি-সমাজনীতি—সব অতি-প্রচ্ছন্ন মিলে-মিশে একটা মানুষ, আমার প্রতিবেশী মানুষ কেন, আমার নিজের ঘরের মানুষও অপরিচিত। এক একটা বিশেষ অনুভূতি দিয়ে তাদের পরিচিত করেছেন গল্পকার একের পর এক গল্প লিখে। তাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প সাধারণ অর্থে অনুভবের গল্প।

কিন্তু এই অনুভব যেমন বেশ কিছু গল্পে অনুভবেই শিল্পের চমৎকারিত্ব পেয়ে ধন্য হয়, তেমনি একাধিক গল্পে তা এক গভীর উপলব্ধির জগতে চলে যায়। ‘চোর’ গল্পটি গল্পকারের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, এর অন্তিম চিত্রে অমূল্যর যে অনুভব, স্ত্রী রেণুর যে পরিবর্তিত মনোভঙ্গির চকিত আলোক-বিচ্ছুরণ, তা আর অনুভবে থাকে না, এক উপলব্ধির জগতে পাঠকদের নিয়ে যায়। সে জগৎ শিল্পীর ছোট কলমে রূপ পায় না, তা ছাড়িয়ে শিল্পীর বড় লেখনীতে অনন্তের ব্যঞ্জনায় মানব-মানবীর সর্বাবয়ব জীবন-ব্যাখ্যার সামিল হয়ে যায়।

'চোর' গল্পের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজ-অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রিত জীবন-উপলব্ধির এক সত্য দিক। আমরা একাধিক প্রসঙ্গে বলেছি, মানুষের মনই সবচেয়ে বাস্তব। সেই রাত অমূল্য-রেণু ঠিক একেবারে মাপা, কিন্তু তাদের মাপের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যখন তা সমস্যা দেশকালের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড় জীবন সমস্যার মূল ধরে টান দেয়।এখানেই নরেন্দ্রনাথের attitude to life-এর দিক ধরা পড়ে। অমূল্যর স্ত্রীকে নিয়ে ভালোবাসা, নীতিবোধে রেণু দিয়েছে আঘাত। বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থায় দারিদ্র্য আছে, থাকবে, কারণ বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সমাজই তার জন্মদাতা। কিন্তু মানুষের মন প্রচণ্ড গতিশীল, সে এমন সততে ধরতে চায়, যা জীবন-প্রাণের চালিকা শক্তি। ভালাোবাসা এক আত্মিক শক্তি মানুষের। বাইরের দেশ-কাল ছাড়ানাে তার দাবি মানুষের কাছে। অমূল্য সেই দাবির কাছে শূন্যকে দেখে—রেণুর পতন যতই সময়ের দাবি তাকে, মনের-প্রাণের-আত্মার দাবির কাছে তা তুচ্ছ। রেণুর পতন তাকে বাঁচাতে পারল না। এই যে অমূল্যর এক অর্থে স্ত্রীর কাছে পরাজয়, এটাই তার সংসার জীবন নিয়তির থেকে প্রেম-মানবতার বিনষ্টিকেই বড় করে। নরেন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির জগৎ ব্যঞ্জনায় কেঁপে উঠেছে অমূল্যর সিদ্ধান্ত ভাবনায়। স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্যর যে কাঠ হয়ে থাকার মধ্যেই আছে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত মাধুর্যের' বিলোপ সাধন। এখানেই গল্পের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের সেই অনুভবের সীমাটুকু নেই, তাকে ছাড়িয়ে 'শ্রীহীন কলঙ্কিত জীবন-উপলব্ধিতেই মেলে অসীম প্রেম জীবন নিহিত বিষাদগ্রস্ত রূপ।

এইভাবেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবনকে দেখার দৃষ্টির মধ্যে বাস্তবতাকে নন্দিত করেছেন। বলা যায় বাস্তবতা স্বাগত হয়েছে জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে। ১. বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম চিরন্তন সর্বকালের সর্বদেশের মানবিক সুস্থবোধ—এই দুই মিলে 'চোর' গল্পের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত। দেশ-কালের সমাজের যে সর্বনাশা রূপের অভিঘাত, তা থেকেই জন্ম নিয়েছে অমূল্য, রেণু। এই যে চরিত্রের সঙ্গে সম-সময়ের নিবিড় যোগ—এখানেই গল্পের সমাজ বাস্তবতার রূপ। ২. রেণু তার সমস্ত আদর্শবোধ, রুচি নিয়ে ও স্বামীর আত্মবিকারকে সরিয়ে, কিছুটা স্বামীর জিদে, কিছুটা বা স্বামীর অসহায়তার কথা ভেবে চৌর্যবৃত্তিতে নীচে নামে। এখানেও অবক্ষয়িত সমাজের চুম্বকের মতো আকর্ষণ কাজ

করে রেণুর মধ্যে। এখানেও সেই রূঢ় সমাজ বাস্তবতার প্রতিবিম্বন। ৩. বিনোদবাবুর ঘড়ি স্বামীর হাতে পরিয়ে দিয়ে রাতের বিছানায় রেণুর স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস আর অমূল্যর ভিতরে ভিতরে কাঠ হয়ে যাওয়া—দুই মনোভাব উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি করে, তা-ও পরিবর্তিত স্বভাবের বৈপরীত্যে দুই সামাজিক-পারিবারিক যুবক-যুবতীর মনোলোকের বাস্তবতাকে ধরিয়ে দেয়। দুজনের মধ্যে তৈরি হওয়া শেষের যে ফাটল, তা মানসিক বাস্তবতা ও জীবনবাস্তবতার প্রামাণ্য দিক। নিম্নবিত্ত জীবনের পটে নববিবাহিত দুই পুরুষরমণী অমূল্য ও রেণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণ দেশ কাল-এর বাস্তবতা ও চরিত্রের মানবিক গুণের অবলোপে পাঠকদের কাছে লেখক-ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দেয়। 'চোর' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কঠিন সমাজ-বাস্তবতার এক সার্থক রূপকার।

'চোর' গল্পটির এমন নাম প্রয়োগে অবশ্যই, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যঞ্জনার আশ্রয় ছন। গল্পের প্রথমেই আছে চুরির চিত্রনায়ক অমল্যর সাবানের বাক্স ও এক কৌটা স্নো চুরি করে এনে স্ত্রীকে দেওয়ার মতো তুচ্ছ একটা ঘটনা। গল্পের শেষেও সেই রেণুর বিনরবাবুর হাতঘড়ি চুরি করে আনার মতো অতি তাৎপর্যপর্ণ ঘটনা। গল্পের চরমক্ষণে'র চিত্রে সেই চুরি। অন্তিম ব্যঞ্জনায় আছে সেই চরিরই অভিঘাতে এক ভিন্ন ইবন-উপলব্ধির কথা অমূল্যর দিক থেকে। সুতরাং 'চোর' নাম প্রয়োগে গল্পের যেনবা আর একটি শিকড় হয়েছে এমন নাম। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু একমাত্র চুরির চক্রেই গতিময়। নাম চুরির শিল্প-ন্যায়ে সার্থক।গল্পটির চরিত্র ধরলে 'চোর' নামের তাৎপর্য আরও গভীরতা পায়। অমূল্য ছিচকে চোর, কিন্তু সে বড় চোর বা ছোট চোর যাই হোক না কেন, চোরই! তার হাত সাফাই র চৌর্যবৃত্তি রেণুর মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গল্পের প্রথম থেকে অনেকটা অংশ তারই ভাষারূপ। রেণুর চুরি করার আগে পর্যন্ত অমূল্যর চৌর্যবৃত্তি গল্পের মূল ভাবের প্রথম অংশ। এখানে অমূল্যর চুরি বাইরের ঘটনা, রেণুর প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। গল্পের শেষভাগে আছে রেণুর চুরির ঘটনা, তা পরিণামী অংশ। সেখানে যে প্রতিক্রিয়া অমূল্যর মনে, তা তার আপাত অর্থে স্বভাবের বিপরীত। তার মানে, চৌর্যবৃত্তিতে দু'রকম প্রতিক্রিয়া গল্পের বাস্তবতার ব্যঞ্জনা পায়। অমূল্যর

চুরিতে রেণুর প্রতিক্রিয়া এবং রেণুর চরিতে অমূল্যর প্রতিক্রিয়া—দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। অমূল্য চুরি করে সংসার সামলাতে ও নববধূকে খুশি রাখতে এবং নিজেকেও সচ্ছল করতে। রেণুর চুরি সেখানে কিছুটা প্রয়োজনে, বেশির ভাগই অহেতুক। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, জিদে স্বামীর সামনে নিজের সাহসকে বোঝাতে বেপরোয়া চুরির মধ্যে চলে যায়। পরোক্ষে থাকতে পারে স্বামীর অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে, অসহায় দায়বদ্ধতাকে সামলানোর বাসনা। কিন্তু দুজনের চোর হওয়ার মধ্যে দুই স্বভাবের চোরের পরিচয়। ‘চোর’ নামের গভীরে চরিত্র ধরে এই ব্যাখ্যা অন্য শিল্প মাত্রা পায়।

আর একটি ব্যাখ্যা, মানুষ চোর কেন হয় তার কারণ খুঁজলে যে একটি সাধারণ ভাষ্য মেলে, তা হল—সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা বিষয়ক। শুধু স্ত্রীকে খুশি করার জন্য অমূল্য চুরি করে না। সে বিনোদবাবুদের স্টিলের বাসন বিক্রি করে বসে সিনেমা দেখার বিলাসের কথা বলে ঠিকই, কিন্তু গল্পে এটাও প্রমাণ হয়, সে সংসার চালায় তা দিয়ে। অর্থাৎ নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ নীতিহীন সুবিধাভোগী, অন্যের শ্রমজাত উপায়ের টাকার তঞ্চকতায় কলঙ্কিত জীবন গ্রহণ করে সামাজিক অবক্ষয়ে, অভিশাপে—অর্থের বণ্টনবৈষম্যেই। স্ত্রী হিসেবে রেণুরও কিছুটা পরোক্ষে সেই আদর্শচ্যুতি। সাধারণভাবে চোর শ্রেণীর জীবনের অসহায়তা গল্পে চিত্রিত আছে। ‘চোর’ নামে তার প্রতিচ্ছায়া।

‘চোর’ থেকে অমূল্য ‘সাধু' হয়নি গল্পের শেষে ঠিকই, কিন্তু তার ঘরে তার স্ত্রী নীতিহীন চৌর্যবৃত্তির শিকার হওয়ায় তার ভাগ্যে তার স্ত্রীর ভালোবাসার গেছে চুরি হয়ে। রেণুর স্বভাবের স্থলন সেই চুরি-হওয়া, স্বভাব চুরি হয়ে-যাওয়া। প্র যেখানে রেণুর মধ্য দিয়ে অমূল্যর মনোভাবনায় পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য সেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেখানে তার সংসার ‘শ্রীহীন কলঙ্কিত’। সুন্দরী তরুণীর হাতে চুরির কলঙ্ক তার স্বভাব সৌন্দর্যেরই অপহারক। আর সেই সঙ্গে অমূল্যরও সংসার নির্ভর সুস্থ জীবন-প্রীতির দিক মুছে দেয় তা। নিজের চুরির ওপর ছিল রেণুর যাবতীয় ভসন সত্ত্বেও ভালাোবাসার, আদর্শের শিল্প-প্রলেপ। কিন্তু যে তাকে তার পাপের ওপর ভালোবাসার আবরণ দেবে হাতের নরম কোমল আকর্ষণে, প্রত্যয়ে, শপথে, হৃদয়ের লাবণ্যে, সেই

রেণুর হাত হল কলঙ্কিত। রেণুর ঘড়ি চুরি তার মূল্যবান মনকে চিরকালের জন্য চুরি করে নিয়েছে। তার অমূল্যর সাংসারিক জীবনের সেই সুন্দর শান্তির ঘরে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। তাই রাতে রেণুর সর্বশেষ বাহুবেষ্টনে সে যেন কাঠ। অর্থাৎ ব্যক্তি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপলব্ধিতে অমূল্যর মনোলোকে, সেই রেণুরও যে চুরির স্বভাবে বিকারগ্রস্ত অবাঞ্ছনীয় বদল, তা-ই প্রতিপাদ্য হওয়ায় গল্পের ‘চোর’ নাম অবশ্যই শিল্পসার্থক।

১৩.২ রস

‘রস’ গল্পটিতে মুসলমান সমাজ-জীবন পটভূমি হিসেবে গৃহীত হলেও তা প্রধান নয়, যে কোনো সম্প্রদায়ের পেশাগত সম্পর্ক ও প্রেম-ভাবনার দ্বন্দ্বও এর পটভূমিতে গহীত হতে পারে। এই গল্পের কাহিনী-অংশটি বড় নয়, কিন্তু যেটুকু আছে, তা-ও আদৌ অবহেলার নয়। অর্থাৎ ‘রস’ গল্পের কাহিনী এর প্লটের ঘন রূপটি গঠনে সহায়ক। কাহিনীর মধ্যে ঘটনা আছে, কিন্তু ঘটনাগুলি কোথাও অতিরিক্ত মনে হয়নি। উপস্থাপনার স্বাভাবিকত্বে কাহিনী ও ঘটনা গল্পের আকারকে ঈষৎ দীর্ঘ করলেও ছোটগল্পের বাঁধুনির উপযোগী সংযত স্বভাবযুক্ত থেকেছে।

এ গল্পের নায়ক মোতালেফ। মোতালেফ খেজুর গাছ থেকে রস বের করার কাজে একজন দক্ষ গেছে। তার বয়স বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। এই বয়সেই বিয়ে করলেও আগের বউ মারা যায়। কার্তিকের খেজুররস ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দরকার পড়ে এমন একজনকে যে সুদক্ষ হাতে সেই রস থেকে গুড় এবং গুড় দিয়ে পাটালি করে দেবে। বর্তমানে বিপত্নীক মোতালেফ, তাই তার খেজুর গাছ থেকে দক্ষ হাতে রস বের করার শিক্ষা যে দিয়েছিল, সেই মৃত রাজেক মৃধার বিধবা বউ, মোতালেফের থেকে দু-তিন বছরের বড় মাজুখাতুনকে বিয়ে করে এনে ঘরে তোলে। মাজুখাতুনের এক মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। একাই থাকে আগের স্বামীর রেখে যাওয়া ভিটেয়। সবচেয়ে বড় কথা, মাজুখাতুনের রস থেকে গুড় বানানো ও পাটালি করার হাত অসাধারণ। কাজের জন্য নিয়ে-আসা মাজুখাতুনকে, কিন্তু মোতালেফের ওই বয়সের প্রেম ও রূপসজ্জার প্রবল আকর্ষণ চরকান্দার এলেম শেখের আঠার-উনিশ বছরের স্বামী

পরিত্যক্তা মেয়ে ফুলবাণুর প্রতিই সর্বাধিক। কথাও দিয়ে আসে এলেম শেখকে পরোক্ষে এবং ফুলবাণুকে প্রত্যক্ষে টাকা জোগাড় করে এনে বিয়ে করার। আর শীতের রস থেকে গুড় ও পাটালি করে টাকা আনার একমাত্র সাহায্যকারী মাজুখাতুন ছাড়া কে হবে তার? মাজুখাতুন যখন স্ত্রী হয়ে থেকে মোতালেফের গুড়ের ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা এনে দিল, তখনি তাকে একটা বানানো অপবাদ দিয়ে তালাক দেয় মোতালেফ। মোটা উপায় থেকে কিছু টাকা দিয়ে ফুলবাণুকে ঘরে আনে। ফুলবাণুর সঙ্গে মোতালেফের যৌবন-স্বপ্নের জীবন এক চরম জৈব উন্মত্ততায় কেটে যায়। এমন বসন্তের জীবনের সুখ তার ধরে না যেন। ফুলবাণুকে এতটুকু কষ্ট দেয় না। আদরে-আবদারে রানির মতো রাখে। ইতিমধ্যে মাজুখাতুন প্রতিবাদহীন গোপন চাপা ঈর্ষায় জ্বলে। শেষে প্রথম স্বামীর বড় ভাই ওয়াহেদ মৃধার যুক্তিতে তালকান্দার নাদির শেখ—যার বয়স এখন পঞ্চাশ কি একান্ন এবং যে গেছো নয়, যার আগের বউ কিছু বাচ্চা-কাচ্চা রেখে কলেরায় মারা যাওয়ায় দেখাশাোনার এলাকাভাব, তাকে বিয়ে করে নদীর পারে তার সঙ্গে চলে যায়।

আগের বউ মাজুখাতুনের এইভাবে চলে যাওয়ায় যেনবা আপদ বিদায়ে ফল হয় ভীষণ। কিন্তু তার সুখ বেশিদিন থাকে না। একবছর ঘুরে আবার যখন শীতে আসে, মোতালেফ গাছে রস আনার কাজে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আরো বেশি দায়িত্ব তার ওপর আসে। তার হাত যে খুব ভাল। কিন্তু রস থেকে গুড় বানাতে পিস হল বিপদ। ফুলবাণু কিছু জানে না, শেখালেও পারে না। ফুলবাণুর চেষ্টার ত্রুটি নেই,কিন্তু মোতালেফকে তার গুড়ের ব্যবসায় গত বছরের খ্যাতি এনে দিতে ব্যর্থ হয়। এতেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখা দেয় চরমতম অশান্তি। যে সুন্দরী ফুলবাণু মোতালেফকে দেহের সুখ থেকে সমস্ত রকম সুখে সুখী করেছিল, গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিনে সেই ফুলবাণু একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। রাগে, দুঃখে, হতাশায় মোতালেফ ফুলবাণুর গায়ে হাত তোলে পর্যন্ত। ফুলবাণুর বাবা এলেম শেখ এসে মিটমাট করিয়ে দুজনকে শান্ত করে রেখে যায় যদিও, তবু তাদের পরস্পরের সম্পর্কে সেই উদ্যম, তেজ, আসক্তি, উন্মাদনা আর থাকে না।

এই অবস্থায় একদিন বাজারে মোতালেফের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় নাদির শেখের। তাকে মোতালেফ কিছু গুড় দেয় ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার জন্য। বিনা পয়সায় কিছুতেই নেবে না দেখে মোতালেফ এক সেরের দাম নিয়ে বাকিটা দিয়ে দেয় বিনা পয়সায়। বাড়িতে সেই গুড় আনায় মাজুখাতুনের রাগ ওঠে তুঙ্গে। সে সেই গুড় ছুঁতেই চাইল না। স্বামীকে সে শাসিয়ে দেয়, যেন কোনোদিন আর মোতালেফের গুড় না আসে তার বাড়িতে, এমনকি মোতালেফ তার সঙ্গে দেখাও যেন না করে। বেশ কিছুদিন দেখা না হওয়ায় মোতালেফ একদিন নিজেই আসে নাদির শেখের বাড়ি। সঙ্গে রসের দুটি হাঁড়ি। এই অবস্থায় নাদির শেখ ভীতসন্ত্রস্ত। যদি স্ত্রী কিছু খারাপ ব্যবহার করে ফেলে মোতালেফের সঙ্গে। শেষে হুঁকো খাইয়ে মোতালেফকে ঘরে বসার আমন্ত্রণ জানালেও ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন কথা শোনাতে কসুর করে না। মোতালেফ নাদির শেখকে দিয়ে মাজুকে জানায়, সে মাজুখাতুনকে রস খাওয়াতে আসেনি। এ বছরে একটিবারও ভালোভাবে গুড় করে বিক্রি করতে পারেনি। একটু যদি গুড় বানিয়ে দেয় মাজুখাতুন। নিজের হাতে, সে বিক্রি করে সুখ পায়, তার এত গাছ বাওয়া সার্থক হয় কিছুটা। মোতালেফের গলার স্বর চাপা অভিমানে গাঢ়। এই কথায় মাজুখাতুনের চোখে নীরব গোপন অশ্রু। একমাত্র মোতালেই তা দেখতে পায়। নির্নিমেষ বেহুঁশ মোতালেফকে দেখে নাদির শেখ যখন হাতের হুঁকোয় আগুন নিভে যাওয়ার কথা মনে করায়, তখন মোতালেফের শেষ প্রতীকী বাক্য ‘না, মে বাই নেবে নাই। এ গল্পের কাহিনীর এখানেই শেষ। কাহিনী-অংশটি ছোট নয়। অতীতের কিছু। ফ্ল্যাশব্যাকের চিত্রসহ এই গল্পের কাহিনী-অংশ দুবছরের কম-বেশি সময়কে ধরে রাখে। কাহিনীর আরম্ভ কার্তিকে, মোতালেফের সঙ্গে মাজুখাতুনের বিবাহ এবং মাজুখাতুনকে খেজুররসের সময়ে নিজের ঘরে আনার ঘটনা নিয়ে। এর পরে একে একে ফুলবাণুর সঙ্গে মোতালেফের প্রাক-বিবাহ পর্বের প্রেমের চিত্র, মাজখাতনের সঙ্গে তার এই দ্বিতীয় বিবাহের আগে মোতালেফের সঙ্গে বিবাহ বিষয় অবতারণার মনস্তাত্ত্বিক সুক্ষ ভাব ভাবনার সংক্ষিপ্ত ছবি, লেখকের নিজস্ব বর্ণনায় মোতালেফ-মাজুখাতুনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মোতালেফের ব্যবসায়িক উন্নতির বর্ণনা, ফুলবাণুকে বিবাহ করা, ঘরে আনা ও তাদের দুরন্ত যৌবনভোগের, প্রেমের, রূপাসক্তির চিত্রাঙ্কন, মাজুখাতুনের

আবার নাদির শেখের বাড়ির গৃহিণী হয়ে আসার কাহিনী, ফুলবাণু-মমাতালেফের সম্পর্কে চিড় ধরার পরিস্থিতি-চিত্র, শেষে রসের হাঁড়ি নিয়ে নাদির শেখের বাড়ি এসে মোতালেফের মাজখাতুনের কাছে এক গভীর অন্য স্বাদের প্রেমানুভবে গোপনতম আত্মসমর্পণ—এসব দিয়েই কাহিনীকে একটি সুতোয় ধরা হয়েছে।

কাহিনীটির নানান ঢেউ, কিন্তু লক্ষ্য মোতালেফকে কেন্দ্র করে প্রেমের দুই রূপ চিত্রণ- এক, নিছক রূপাসক্তিজনিত প্রেম, দুই, বাস্তব প্রয়োজনের জীবনের সঙ্গে জড়ানো প্রেম। এই প্রেমের কাহিনীকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেভাবে গল্পে রেখেছেন, তাতে কাহিনী আখ্যানধর্মী হয়েছে তুলনায় বেশি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কল্লোলের কালের লেখকরা যেভাবে কাহিনী বয়নে অভ্যস্ত ছিলেন আখ্যানধর্মী গল্পে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তা থেকে সরে আসতে পারেননি। প্রয়োজনে গল্পের মধ্যে ফুলবাণুর অতীত বর্তমান, মাজুখাতুনের অতীত বর্তমান এবং মোতালেফেরও সেই অতীত-বর্তমান জীবনকে রাখতে হয়েছে। এই কারণেই কাহিনী দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক। এ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করা যেত, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখনী সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়নি। না হওয়ার ফলে কাহিনী-অংশ যে সুখপাঠ্য হয়নি তা নয়, গল্পের মূল রসকে ব্যাহত করেছে, একথাও বলা যায় না। তবে গল্পটি আকারে দীর্ঘ হয়েছে এবং লেখক স্বয়ং গল্পের মধ্যে কোথাও কোথাও বিবরণকে নিজের মতো গ্রহণ করায় বর্ণনার তির্যকতার নিশ্চয়ই কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। মোতালেফের জীবন ও মানসিকতা বোঝাতে এই বিবরণ বিস্তৃতি পেয়ে গেছে। গল্পের প্লটে কোনো শ্লথতা নেই, কাহিনীবৃত্ত আরম্ভ ও শেষ চিত্রের ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ, কিন্তু কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ লেখকের কোনো শিল্পপ্রয়োগের দীনতার প্রমাণ না দিলেও কাহিনীকে বড় আকার দানে সহায়তা করেছে। মোতালেফের দিক থেকে মাজুখাতুনকে বিবাহ করা এবং তালাক দান, ফুলবাণুকে বিবাহ করা ও তাকে শেষ পর্যন্ত কাছে রেখেই মাজুখাতুনের কাছে আবার যাওয়া, মাজুখাতুনের তৃতীয় বিবাহ—এসব গল্পের প্রয়োজনে ঠিকই আছে, কিন্তু মুসলমান সমাজের উপযোগী এদের প্রত্যেকের আরও বিবাহ ঘটনা ঘটিয়ে লেখক কাহিনী মধ্যে একাধিক জট পাকিয়েছেন, বা হয়তো মুসলমান সমাজের রীতিকে পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করার সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু গল্পের পক্ষে কাহিনীর এই সমস্ত সংবাদ ও জট অতি প্রয়োজনীয়

কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। তবু 'রস' গল্পের কাহিনী তার বক্তব্যকে অসাধারণ ব্যঞ্জনার প্রকাশে সক্ষম হয়েছে, এখানেই এই গল্পের কাহিনীবৃত্তের শিল্পমর্যাদা যথেষ্ট বর্ধিত ও স্বীকৃতি পাবার উপযোগী।

'রস' গল্পের চরিত্রই মূলত গল্পের প্রাণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে বক্তব্য অনয়াজ চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা অসামান্য মর্যাদা পাবেই। সে মর্যাদা শিল্পের। যে কোনো মত বা নিম্নবিত্ত চরিত্রকে গল্পের মধ্যে টান টান রূপ দিতে তিনি সক্ষম। চরিত্রে কোনো বাড়তি রক্ত-মাংস-মজ্জা থাকে না। তাদের শিল্পের প্রয়োজনে যতটুকু দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রয়োজন ততটুকুই পাই গল্পপাঠে। চরিত্র পর্যবেক্ষণে নরেন্দ্রনাথ এক অসাধারণ ক্ষমতাবান শিল্পী— এই চরিত্র মধ্যবিত্তই হোক, নিম্নবিত্তই হোক, বা গরিবই হোক। তার অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে এ-ব্যাপারে তিনি কখনোই সরে আসেননি। 'রস' গল্পের নায়ক মোতালেফ। তার দু'পাশে দুই নায়িকা মাজুখাতুন ও ফুলবাণ। এই তিন চরিত্র ছাড়া আর কোনো ছোট চরিত্রই এই গল্পে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। খুব। ছোট ছোট চিত্রে ফুলবাণুর বাবা এলেম শেখ ও মাজুখাতুনের তৃতীয় স্বামী নাদির শেখ চরিত্রদুটিকে আমরা কিছুটা কাছের করে পেলেও এলেম শেখ গল্পের প্রয়োজনেই সামান্য তৎপরতা দেখিয়ে বিদায় নেয়। মুসলমান সমাজে টাকা না দিলে মেয়েকে ঘরে আনা যাবে , এই রীতি বোঝাতেই এলেম শেখ এসেছে। আর সেই টাকা দিতে গিয়ে মোতালেফের মাজুখাতুনকে ঘরে আনা ও বিদায় করে ফুলবাণুকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এলেম শেখ তার ওই কাজটুকুর সূত্র ধরিয়ে দিয়েই বিদায় নেয়। মোতালেফ-ফুলবাণুর মধ্যে চরম ঝগড়ার দিনে তার একবার ওদের বাড়ি এসে মিটমাট করে দেওয়ার খবর শুনি। তার খুব একটা গুরুত্ব এই চরিত্রের দিক থেকে আছে কিনা সংশয় জাগে। ফুলবাণুর দিক থেকে মিটমাট গল্পে যা 'টোন'– তাতে স্বাধীনভাবেও হতে পারত।

নাদির শেখ গল্পের শেষে কিছুটা সক্রিয়, তবে তার মতো ঘোর সংসারী প্রৌঢ় মানুষের পক্ষে যে মানসিকতায় থাকা সম্ভব, তাতেই সে স্থিত থেকেছে। সে কাহিনীর মধ্যে মাজুখাতুনের সঙ্গে মোতালেফের সম্পর্কসূত্র রচনার পক্ষে যোজক চরিত্র। কিন্তু সে মোতালেফ-মাজুখাতুনের মধ্যেকার মৌল সম্পর্ক বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। সে ভদ্র,

সাংসারিক সৌজন্য রক্ষায় অভিজ্ঞ পুরুষ। বিনা পয়সায় সে কিছুতেই গুড় নিতে স্বীকৃত হয়নি মোতালেফের কাছ থেকে। এই বয়সে নতুন স্ত্রী এনে ঘরে তুলে সে স্ত্রীর অনুগত ঠিকই, কিন্তু মোতালেফের প্রসঙ্গে মাজুখাতুনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মৌল কেন্দ্রটি সম্পর্কে যে একেবারেই অজ্ঞ, অজ্ঞ মোতালেফের তার বাড়ি আসার সক্রিয়তা সম্পর্কেও। বস্তুত নাদির শেখ চরিত্রটিও কাহিনীসূত্র যেমন ধরে রাখে, তেমনি এলেম শেখের থেকে কিছুটা বরং বেশি মোতালেফ-মাজুখাতুনের শেষতম প্রেম-সম্পর্কের ব্যঞ্জনাটির পরোক্ষ সহায়ক হয়ে থাকে।

প্রধান চরিত্র মোতালেফ। সে সত্যিকারের এক যুবক এবং বিপত্নীক হলেও সে একাধিক তরুণী যুবতী নারীর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষ। তার কর্মক্ষমতায় অসাধারণ পৌরুষের ব্যঞ্জনা। এই চরিত্রের একই সঙ্গে দুটি দিক। একদিকে নিখুঁত দক্ষ, গেছো, একজন গাছ-শিল্পী- অর্থাৎ যে কোনো ধরনের খেজুর গাছ থেকে এক কর্মী, নিষ্ঠাবান, সক্ষম শিল্পীর মতো রস বের করে আনতে পারে। সে একজন গেছো শিল্পীর মতোই জানে 'কাটতেও হবে আবার হাত বুলতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোনো ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক-ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের।' আর একদিকে সে সসের স্বাস্থ্যের সচ্ছলতায় একজন রূপাসক্ত প্রেমিকও, সে সুন্দরকে চায় বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ।

মোতালেফের পৌরুষের প্রথম বৈশিষ্ট্যে আসে তার জীবনে মাজুখাতুন। সেখানে সে যথার্থ গেছে। গাছ শিল্পীর মানসিকতায় তার সংগ্রহ-করা বিপুল পরিমাণ রস থেকে খুব ভাল, বাজারের সেরা গুড় তৈরি করার জন্যই মাজুখাতুনকে আনে। মাজুখাতুন বিধবা, বয়স বেশি, দেখতেও সুন্দর নয়। কিন্তু মাজুর গুড় তৈরির হাত খুব ভাল, অসামান্য। মাজুখাতুন সেক্ষেত্রে একজন শিল্পীও যেন। সুতরাং মাজুখাতুনকে পছন্দ করার কারণ তার বৈষয়িক টাকাপয়সার উন্নতির পথ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে থাকলেও পরিণামে মোতালেফের শিল্পী-মনই মাজুখাতুনের দিকে আকৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে মোতালেফের ঘরে আসে ফুলবাণু। যুবক মোতালেফ যুবতী ফুলবাণুর মধ্যে জীবনের আর এক তাৎপর্য পায়। তার প্রয়োজন সে গভীরভাবেই বোঝে। মাজুখাতুনকে মোতালেফ যেভাবে তালাক দেয়, তা তার নীতিবোধের দিক থেকে হীনতারই পরিচায়ক। কিন্তু মোতালেফের রূপাসক্তি, দেহ-সম্ভোগ বাসনা ফুলবাণুকে ঘিরে যেভাবে গড়ে ওঠে, তা তো সংসার-বিবিক্ত নয়! সে ফুলবাণুর মধ্যে প্রেম ও প্রয়োজনকে একসঙ্গে মিলিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তার শিল্পীর চোখ— একদিকে প্রেমে, আর একদিকে প্রয়োজনে দীপ্ত হলেও সে কিন্তু প্রেম দিয়ে ফুলবাণুকে গুড়শিল্পী করে তোলার চেষ্টাও করেছে। ফুলবাণু তার যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হোক, যেমন কর্মসহচরী, তেমনি নর্মসহচরী— দুইই! কিন্তু কর্মসহচরী হতে গিয়ে অল্পবয়সী ফুলবাণুর যে ব্যর্থতার চিত্র, তা-ই শিল্পী মোতালেফকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফুলবাণুও মোতালেফের কাছে অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব হয়ে পড়ে।

কোনো কোনো সমালোচক মোতালেফ সম্পর্কে বলেছেন, ‘সে প্রয়োজনের জন্য চাহে মাজুখাতুনকে’ এবং এইটুকু বলেই মোতালেফ চরিত্রের মূল্যায়ন শেষ করেছেন। তাঁর কাছে মোতালেফকে মনে হয়েছে স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং আরও বলেছেন, তার জীবনে প্রেম ক্ষণিক স্বপ্ন, জীবিকার্জনই মুখ্য দাবী। কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্য কত বড় ভ্রান্তি আনে চরিত্রটি সম্পর্কে, তা সচেতন ও গভীরভাবে গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। মাতালেফের অর্থের প্রয়োজন ছিল ঠিকই, এমন প্রয়োজনেই সে প্রথমে মাজুখাতুনকে আনে এবং পরে অর্থ এলে তাকে তালাক দেয়। সেই টাকায় ফুলবাণুকে আনে ঘন হিসেবে। কিন্তু এর পর থেকেই মোতালেফের চরিত্রে যে সূক্ষ্ম বিবর্তন, তা তাকে সি ‘স্থলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি’ প্রমাণ করে না! মোতালেফ একজন সূক্ষ্ম মনের ও দক্ষতার শিল্পী, এটা কম ব্যাখ্যা নয়! সেই সঙ্গে রস থেকে যে ভাল গুড় তৈরি করতে পারে, তা সে জহুরির মতো চেনে, চেনে তার নতুন শিল্পসৃষ্টির মতো নবস্বাদের তৈরি করে সেই গুড় ও গুড়ের পাটালি তার ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতি যেমন ঘটায়, এটা ব্যবসা যেমন স্থূল লক্ষ্যের দিক, তেমনি তার শিল্পকে এবং সেই শিল্পীকে যে প্রেমে মর্যাদা দান সে উৎসুক, ফুলবাণুর সূত্রে ঠকে শিখে তার পরিচয় রেখেছে গল্পের

পরিণামে। নাদির শেখের বাড়ি রস দু'হাঁড়ি নিয়ে যাওয়ায় তার আগের ব্যবসায়িক বুদ্ধি একমাত্র সত্য নয় কিছুতেই, তার সঙ্গে একজন নিখুঁত স্বাদের গুড়-শিল্পী ও পাটালি প্রস্তুতকারিকাকে স্বীকৃতিদানের বাসনাও সক্রিয়। এই সূত্রেই জাগে নব প্রেম মোতালেফের! সুতরাং তার 'জীবিকার্জনই মুখ্য দাবী', 'প্রেম ক্ষণিক স্বপ্ন'মাত্র, এমন চরিত্র-বিচারণায় চরিত্রটির ক্রমপরিণতির শিল্প-দাবী ও অন্তিম পরিণতির শিল্প-মূল্যকে অস্বীকারই করা হয়। প্রেম ও প্রয়োজনের কথা থাকলেও গল্পের বক্তব্যে মোতালেফের যে চরিত্রে উত্তরণ, তা তার সূক্ষ্ম শিল্পী-মনের প্রেম-মনস্কতাকেই ধরায়, স্থূলতাকে নয়।

মাজুখাতুন চরিত্রটি আর এক সার্থক চরিত্র! সে জীবনে ত্রি-স্তরে প্রায় পোড়-খাওয়া এক নারী। প্রথম বিবাহ তার জীবনে সুখ দেয়নি। আগের স্বামীর মেয়ের বিবাহ দিয়ে সে তার স্বাভাবিক জীবন কাটায়। মোতালেফ তার জীবনে নতুন করে ঝড় তোলে। তার সঙ্গে মোতালেফকে বিয়ে করার আগে, যেসব কথাবার্তা হয় তার সংক্ষিপ্ততা ও তাৎপর্য মাজুখাতুনকে বড় জায়গায় নিয়ে যায়। যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে মোতালেফকে ভোলাবার ক্ষমতা সামান্য থাকলেও বাসনা নেই। মোতালেফ তার শিল্পের পূজারি। তার একবারে নতুন স্বাদের গুড় তৈরির ক্ষমতা, পাটালি বানানোর হাত মোতালেফ তারিফ করে। কিন্তু মোতালেফের স্ত্রী-করার গোপন বাসনায় সে হতচকিত, বিস্মিত। তার মোতালেফকে বলা কথাগুলি তার প্রেমিকা মন ও প্রয়োজনের জীবন দুদিক থেকেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

'প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন ... একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ তামাসার আর মানুষ পাইলা তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে'

মোতালেফ বলল, ''অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কমবয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি!'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে। গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

লক্ষ করার বিষয়, মাজুখাতুন এর পরেই মোতালেফকে বিদায় দিয়ে যেভাবে নিঃসঙ্গ মনে মোতালেফের ও নিজের জীবনের কথা ভাবে, তাতে তার চরিত্রের মাত্রা বেড়ে যায়। তার পদক্ষেপ সন্তর্পিত, যুক্তিনিষ্ঠ, ফুলবাণর মতো আবেগে ভেসে যাওয়া নয়। সে নিজে বিধবা, একটি কন্যার— যার বিবাহ দিয়েছে, মা। সুতরাং তার চরিত্রের dimension অনেক বড়! তার থেকেও বড় সে একজন নিষ্ঠাবতী গুড়শিল্পী। সেই মাজুখাতুনকে শেষে মোতালেফ তালাক দিলে 'বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সে হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।' চরিত্রের ক্রমবিবর্তনে এবং গভীরতম নারী-চরিত্র-ন্যায়ে এটাই স্বাভাবিক। ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে মাজুখাতুনের প্রেমজীবনে ট্র্যাজেডি 'রস' গল্পে অনবদ্য। মোতালেফের থেকেও মাজুখাতুনের বিশাল এক শালবৃক্ষের মতো বড় মাপের প্রসারিত, চাপা প্রেম-অভিমান গল্পের ও চরিত্রের মর্যাদা অনেক বাড়ায়।

নাদির শেখকে বিবাহ করার আগে প্রথম স্বামীর বড় ভাই ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে কথোপকথনে এবং নতুন বিবাহের চুক্তিতে মাজুখাতুনের যে সংলাপ-বিনিময় তার গুরুত্বও চরিত্রটিকে অন্য মূল্য দেয়। সে পোড়-খাওয়া এক রমণী। মোতালেফের কাছ থেকে চলে আসার পর যে নবলব্ধ জীবন-আস্বাদের তীব্রতা থেকে, স্থায়িত্ব-ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনাকে বিষের মতো মনের জ্বালায় ধরে, তা থেকে মুক্তি পেতেই আবার নাদির শেখের ঘরে আসে। তার বড় কাজ রস থেকে অসামান্য স্বাদের গুড় করা। সেখানে সে আর এক শিল্পী। তার শিল্পত্বকে সে অভিমানে বিসর্জন দিতে চায় বলেই ওয়াহেদকে তৃতীয় বিয়ের আগে বলে, 'কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে। মোতালেফের কথা ভেবেই জিজ্ঞেস করে, "গাছি না তো সে? খেজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?" তার অভিমান কত তীব্র, তার মানসিক পছন্দ-অপছন্দতেই প্রমাণ মেলে: 'রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর

গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের এ ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।”

এইসব ভাবনার ও তৃতীয় বিবাহ করার পরেও মাজুখাতুনের সঙ্গে মোতালেফের যোগাযোগে কিন্তু অন্য মানসিকতা উঠে আসে। মোতালেফের প্রতি ঘৃণায়, রাগে, অভিমানে, বিচ্ছিন্নতাবোধে সে, নাদির শেখ তার দেওয়া গুড় আনলে, ছোঁয় না। মোতালেফের মধ্যে সে পেয়েছিল তার জীবনে স্থায়ী দায়িত্বভার বহনের মানুষ এবং তার শিল্প-স্বীকৃতির তারিফ করার এক মানুষ-শিল্পীকে। তাই এই যৌথ মানসিকতায় সে একদিন প্রাণ দিয়ে মোতালেফের কাছে থেকেছে। তাই তার তালাক মাজুখাতুনকে চরম শূন্যতার দিকে তো ঠেলবেই! তার ত্রিমাত্রিক জীবন—১. সাধারণ সাংসারিক জীবন যেখানে রাজেক মৃধা, তার কন্যা ও সে সত্য। ২. মোতালেফের সঙ্গে যৌথ জীবন যেখানে মোতালেফের কর্মদক্ষতা, তার স্বামী হিসেবে মাজুখাতুনের মনের গর্ব ও তার গুড় করার শিল্পিত প্রয়াসের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুর্তি সত্য। ৩. তার নাদির বাঁধা জীবন যেখানে সে এক গভীর শূন্যতায় যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত দিন প্রচ্ছন্ন অভিমান ও বেদনা চাপা। গল্পের শেষে মোতালেফ সেই শেষের জীবনে তার মধ্যে তুষের চাপা আগুন জালিয়ে দেয়। এ আগুনের দুই রূপ। এক রূপে সে মোতালেফকে ঘৃণা করে, অস্বীকার করে, প্রচণ্ড অভিমানে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, আর একদিকে গভীরতম পেয়ে এমন এক গভীরতম স্বভাবের নারী, যার একসময়ে দেখা যায়, এত তপ্ত রাগ আর অভিমানের মধ্যেও কালো বড় বড় তার দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে। এইখানেই এই চরিত্রটির অনবদ্যতা এবং ট্র্যাজেডির বিষাদ। রস’ গল্পে মাজুখাতুন সবচেয়ে বড় মাপের ও বড়মানের শৈল্পিক চরিত্র। ফুলবাণু চরিত্রটিকে লেখক যে উদ্দেশ্যে এনেছেন, সে তার পুরো কর্তব্যই করেছে ঠিক ঠিক। তার কাজ মোতালেফের রূপাসক্তি মেটানো। সে নিঃসন্তান অবস্থায় বেশি বয়সের এবং অসুন্দর স্বামী গফুরকে ছেড়ে চলে এসেছে। তার মধ্যে রোমান্টিকতা বয়সের কারণেই বেশি। মোতালেই সুন্দরী ফুলবাণুর পক্ষে উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু বিয়ের পর অসাধারণ দেহভোগের, রূপাসক্তির সুখী জীবন কাটানোর পর যখনি তার প্রয়োজনের জগতে ফেরার সময় আসে, তখনি তার সীমা বোঝা যায়। সে তো রস থেকে গুড় করার শিল্পী হতে পারে না, সে বড়জোর সাদামাটা

কিছু গুড় তৈরি করতে পারে। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা। স্বামীর প্রয়োজনে সে অপ্রয়োজন, স্বামীর অপ্রয়োজনের দিনে সে সামান্য প্রয়োজন টুকুতেই শেষ হয়ে যায়। মোতালেফের গেছে শিল্পীর মানসিকতায় সে গুড় তৈরির সূত্রে 'পুতুলই থেকে যায়, প্রতিমা' হয় না। তাই তার সঙ্গে মোতালেফের তীব্র বিরোধ ঘটে। মোতালেফ চেয়েছিল ফুলবাণু তার যেমন প্রেমিকা হোক, বধূ হোক, সংসারের আপনজন হোক, তেমনি তার প্রয়োজনের জীবনেও শিল্পের জীবনের উপযুক্ত সঙ্গী হোক। হতে পারেনি, এখানেই তার ব্যর্থতা। মাজুখাতুনের কাছে এখানেই তার পরাজয়। বয়সে, রূপে, দেহসম্ভোগে সে মাজুখাতুনকে হারিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রেম যখন গভীর জীবনাগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তখন তার মূল্যহীনতা স্পষ্ট হতে পারে। তাই বাড়িতে মোতালেফের স্ত্রী হয়ে থাকলেও কোথায় একটা সীমাহীন দূরত্ব রেখে দিন কাটাতে হয়। মোতালেফকে ছুটতে হয় মাজুখাতুনের জন্য। প্রেম তো জীবন বাদ দিয়ে মূল্যহীন। নিছক প্রয়োজনের জীবন হলে প্রেম সেখানে ক্ষণিক, কিন্তু যেখানে প্রেম প্রয়োজনকে বড় শিল্পের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে স্থায়ী হতে চায়, সেখানে শুধুই প্রেম অকেজো, অপদার্থ হয়ে যায়। ফুলবাণুর অস্তিত্ব তাই চিরকালের প্রেমিক শিল্পী-মানুষের কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটিতে কোনো কোনো সমালোচক 'সমাজ চিত্র'– এরকম এক শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে তার লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু এই চিহ্নিতকরণ সমালোচকের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 'রস' গল্পে কোনো সামাজিক সমস্যা নেই। সমাজের কোনো পরিবর্তনের জন্য লেখকের উদ্দেশ্যই দেখা দেয়নি গল্পে। মূলত প্রেমই এই গল্পটির প্রধান লক্ষ্য ও ব্যঞ্জনা, সমাজচিত্র তার বাইরের আবরণ বা খোলস মাত্র। তাই এই গল্প প্রেমরসাত্মক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে। সেই সমালোচক আরও জানিয়েছেন, মুসলমান-সমাজের কিছুটা বৈশিষ্ট্যকে উপভোগ্যভাবে চিহ্নিত করিয়াছে,... এই গল্পের মধ্যে মুসলমান সমাজের বিবাহের রীতিনীতি, প্রতিবেশীদের মধ্যে মেলা-মেশা ও প্রেম নিবেদনের বিশিষ্ট ভঙ্গিটি একটু নূতন কিঞ্চিত আস্বাদনবৈচিত্র্য আনিয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এসব কথা গল্পের মূল লক্ষ্য থেকে পাঠকদের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরায়। আগেই বলেছি, এটা পটভূমির সাধারণ মামুলি বিষয়, অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের প্রেমের

কথাতেও বলা যায় সহজে। পটভূমি বরং গল্পের মৌল চরিত্র ও ব্যঞ্জনার অভিঘাতকে যেভাবে দীর্ঘস্থায়ী আবেশে, জীবনাগ্রহে ধরে রাখে, এই পটভূমি সেখানে গল্পের গোড়া থেকেই তুচ্ছ হয়ে যায়।

গল্পটির ক্লাইম্যাক্স একেবারে গল্পের শেষ চিত্রে লক্ষণীয়। গল্পের ক্লাইম্যাক্স আসার আগে ফুলবাণুর একটি কথা স্মরণীয়। ওদের তীব্র অশালীন ঝগড়া মিটে যাবার পর মাোতালেফ যখন তার কষ্ট মাস দুয়েকের পর চলে যাবে বলে জানায়, তখন :

'ফুলবাণু বলল, কষ্ট আবার কি?

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা, তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। সে কথা ওরা বলেও জানে, শুনেও জানে।'

এখান থেকেই কিন্তু ক্লাইম্যাক্স অংশের বীজাভাস মেলে। যেখানে নাদির শেখের বাড়ি গিয়ে মোতালেফ নিয়ে-আসা দু'হাঁড়ি রসের প্রসঙ্গে নাদির শেখের মাধ্যমে মাজুখাতুনকে শোনায়— ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে। সেখানেই গল্পের ক্লাইম্যাক্স, তার পরে আস্তে আস্তে গল্পের শেষ পরিণতির দিক নেমে আসে। মোতালেফের পরবর্তী কথায় মাজুখাতুনের চোখ ছল ছল হওয়া এবং 'হুঁকোর আগুন এখনো নেবেনি' মোতালেফের দিক থেকে নাদির শেখকে এমন শেষতম কৈফিয়ত দানে গল্পের ব্যঞ্জনা বেজে ওঠে।

গল্পের মধ্যে প্রেমভাবের একমুখিনতা অসাধারণ রক্ষিত। মোতালেফ-মাজুখাতুনের সম্পর্কের চিত্র আঁকতে লেখক কিছু আখ্যায়িকার বিস্তার ঘটিয়েছেন ঠিকই, বৃত্তান্তের কিছু প্রবণতাও আছে গল্পে। এই অনাবশ্যক বিস্তার গল্পের মূল লক্ষ্যকে আঘাত হানতে পায় কিন্তু পারেনি। মনে হয়, বিষয়ের যে গভীরতা, জীবন-রস-নিষিক্ত যে তাৎপর্য এমনভাবে পাঠকমন ধরে রাখে, যার জন্য কাহিনীর বিস্তার উপেক্ষার বিষয় হয়ে যায়। এইখানেই এই গল্পের বড় ধরনের শৈল্পিক কৃতিত্ব।

প্রকাশভঙ্গিতে লেখকের রচনারীতি-অনুগ কিছু বিবৃতিধর্ম আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ ইঙ্গিত-বৈশিষ্ট্য অসামান্য হয়ে বাজে। এর কারণ লেখক বিষয়বস্তু অনুসারী ভাষা ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। ফুলবাণুর প্রেমমনস্কতার উপযোগী সংলাপের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়:

১. 'পছন্দসই জিনিস নেবা, বাজানের গুণা, তার দাম দেবা না?

২. 'বাজানের মাইয়া টাকা চায়না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষেরে। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?"

মোতালেফের সংলাপ মাজুখাতুনের প্রতি:

১. কম বয়সী মাইয়া পোলা... কাঁচা রসের হাঁড়ি।

২. 'তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি, আর নাস্তার কালে গুড়। ফুলবাণুর প্রতি মোতালেফের সংলাপ:

১. 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙা হয় না, আর এক জনের পান খাওয়া-ঠোটের রস লাগে।

এই সমস্ত সংলাপের ব্যঞ্জনা একটি সার্থক প্রেমের গল্প হিসেবে 'রস'-এর উপযোগী সর্বাংশে। আবার গল্পের শেষতম দৃশ্যের ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষা ওই গল্পের রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্যের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ:

'গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের! নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।'

এই অংশের ব্যঞ্জনায় শুধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই ঐতিহাসিক দু'টি পঙক্তিই কেবল উদ্ধারযোগ্য: 'একটি কথার দ্বিধা থর থর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।' মাজুখাতুনের চোখে নীরব গোপন অলক্ষিত অশ্রুর উচ্ছ্বাস আর মোতালেফের নির্বাক

হয়ে নিথর সেদিকে তাকিয়ে থাকা এর মধ্যে যে বিশ্বজনীন মানবমনের বিশুদ্ধ প্রেমের বিশাল ব্যঞ্জনা রক্তিম হয়ে ওঠে, তার প্রতিতুলনা কোথায়ও মিলবে না। শেষতম চিত্রটি আরও গভীরতম, ভাষার গাঢ়তায় ও প্রতীকী-স্বভাবে মোতালেফের দিক থেকে :

'হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের ডাকে, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল মন ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুন যে নিবা গেল কইলকার।'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না, মেঞা ভাই, নেবে নাই।' এই যে আগুন প্রসঙ্গে সংলাপ বিনিময়— এর তাৎপর্য জীবনের গভীরতার সঙ্গে প্রেমের গভীরে প্রোথিত। নাদির শেখের কাছে এই আগুন নিছক কোরই, কিন্তু মোতালেফের কাছে সে আগুন ভালোবাসার, যার স্বাদ হুঁকোর জলের মধ্য দিয়ে এসে তামাকের স্বাদে মানুষের ভয়ঙ্কর এক কর্মক্ষমতার মেজাজকে তুঙ্গে তোলে, আবার, এখানে, মাজুখাতুনের প্রেম-সম্পর্কের সূত্রে, মোতালেফের বড় কর্মক্ষমতার সূত্রে এক দীপ্ত জীবন-পরিচয়কেও প্রতিষ্ঠিত করবে। এমন আগুন নিয়ে এসেছে মোতালেফ সঙ্গে করে, যা তার দেওয়া দু'হাঁড়ির রস জ্বাল দেবে, আর সেই আগুনের স্পর্শ পেয়ে সেই দু'হাঁড়ির রসের মাজুখাতুন নতুন গুড় তৈরি করবে! মাজুখাতুনের পক্ষেই সেই রস থেকে গুড় হল তার নতুন শিল্পের জীবন, মোতালেফের পক্ষে সেই রসে আগুন ধরানো জীবন হল নতুন করে প্রেমের ও গেছো শিল্পীর আরও বড় কর্মের জীবন। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এমন অসাধারণ প্রতীকপ্রতিম ভাষা প্রয়োগ গল্পের ভাষাবৈশিষ্ট্য, গদ্যরীতি ও রচনারীতিতে বড় শিল্পের মায়া আনে। এই বড় শিল্প বড় জীবনার্তির যথার্থ অনুগ।

নামকরণের দিক থেকে 'রস' নামটি ছাড়া বুঝি এ গল্পের অন্য কোনো নামই হতে পারে না। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে রস— খেজুররস। এই রসের থেকে গুড় বানানো নিয়েই মাজুখাতুনের সঙ্গে প্রথমে, পরে ফুলবাণুর সঙ্গে মোতালেফের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাজুখাতুনকে তালাক ও ফুলবাণুর সঙ্গে সম্পর্কের গভীর তিক্ততা— এই রসের কারণেই। আর এই রসই গল্পের শেষে মাজুখাতুন ও মোতালেফের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে গোপনে, ব্যঞ্জনায়। তাই মোটা অর্থে কাহিনীর সুতোয় নামটি ঠিকই মানিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, ফুলবাণুর প্রতি মোতালেফের যে আসক্তি, তা হল রূপাসক্তি। সেই রূপ কিন্তু দেহ-ভোগে ও দেহসৌন্দর্যে রসের মূর্তি পায়। মাজুখাতুনের প্রতি মোতালেফের যে আসক্তি, তা রসের সূত্রে এক নতুন স্বাদের গুড় তৈরি করার অসাধারণ ক্ষমতাবতী নারীর প্রতি আসক্তি, যাকে শিল্পীর প্রতি আসক্তি বোঝায়। রস এখানে দু'অর্থে ব্যঞ্জনা পায়— পার্থিব ভোগের অর্থে, বড় শিল্প ও শিল্পীর অর্থে। তাই এ ক্ষেত্রে 'রস' নাম সার্থক।

তৃতীয় ব্যাখ্যা হল, যতই রূপ থাক, বিষয় থাক, রসই তো সব। রসই আনন্দ। মোতালেফের যে শ্রম তা রসের জন্যই। এই গল্পের রসের আর এক নাম যদি জীবন বলি, তবে নীচের তলার দুই শ্রমজীদ মানবী মোতালেফ ও মাজুখাতুনের যে রস নিয়ে শ্রম ও শিল্পচর্চা, যে , সম্পর্ক রচনা- তা প্রকারান্তরে জীবনচর্চারই নামান্তর মাত্র। এই জীবন বড় জয় হয়ে বাঁচতে থাকার জীবন। এই জীবন সব কিছু বৈষয়িক জিনিসকে তুচ্ছ করে, এ অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবন। এই আধ্যাত্মিকতা প্রেমে আসতে পারে, শ্রমে আসর পারে, আবার ব্যবহারিক জীবনকে প্রেমে ও শ্রমে এক গভীর-নিবিড় বন্ধনেও বাঁধতে পারে। এই শ্রম ও প্রেমে বাঁধা যে যৌথ জীবনবোধের আর্তি— তাতেই গল্পে জড়িয়ে যায় মোতালেফ ও মাজুখাতুন। গল্পের শেষেও তাদের দুজনের যে গোপনতম হৃদয়ার্তি, তার মূলেও এই প্রেমজীবন, শিল্পীজীবন ও শ্রম-জীবনের অত্যদ্ভুত মিলন। এই মিলন-ভূমির যে আলো তা রসের, আনন্দের, প্রেমের। সুতরাং রস' গল্পের নামে নিশ্চিতভাবে মেলে এই বৃহত্তম প্রেমজীবনের আস্বাদ, স্বস্তি, শান্তি। তাই 'রস' নামের ব্যঞ্জনা অনেক বড় তাৎপর্যে দীপিত হয়ে ওঠে।

১৩.৩ চড়াই উৎরাই

'চড়াই উৎরাই' নামের এই গল্পটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই গ্রন্থনামের সংকলনভুক্ত অন্যতম গল্প। গ্রন্থটির প্রকাশকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তিরও পরে। গল্পটির রচনাকালও এই সময়ের। এই গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র একই সঙ্গে দুই শ্রেণীর মানুষের, তার পরিবারের জীবনচিত্রের মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের অন্তর্নিহিত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের স্বচ্ছ রূপ এঁকেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আমরা জানি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

একজন সার্থক রূপকার। তার ছোটগল্পে আছে এই শ্রেণীর মানুষের নীচে নামার কখনো বা ওপরে ওঠার, কখনো আবার তারই স্তরে থেকে স্তরগত চিন্তা-ভাবনা-নির্ভর মানস বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পরিবার-ভিত্তিক জীবনের নিষ্ফলত্ব, অসহায়তাকে হার্দ্য মানবিক বোধে উপস্থিত করার একজন সার্থক লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 'চড়াই উৎরাই' গল্পে তার নিপুণ পরিচয় মেলে। এ গল্পের কাহিনী বলেছে একজন যুবক-- যে জীবনধারণে বাস্তবিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, কিন্তু অত্যন্ত সচেতন, স্পর্শকাতর একজন কবি-সাহিত্যিক। আগাগোড়া উত্তমপুরুষে বর্ণিত এই গল্পে উত্তমপুরুষ কথক প্রথম দুটি নিমন্ত্রণ পত্র পায় একটি তার নিজের নামে লন্ডন-ফেরত, কলকাতার কলেজে পড়ার সময়ে সহপাঠী, এখন ব্যারিস্টার, বন্ধু অসিতের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র, আর একটি তার স্ত্রীকে লেখা মল্লিকা নামে তাদেরই পরিচিত এক বিবাহিতা মহিলার সাধারণ পোস্টকার্ডের চিঠি। বন্ধু অসিতের নিমন্ত্রণপত্র আসবে তা কথক আগেই জানত। বিরাট ধনীর পুত্র। আগেই বলে রেখেছিল বিয়ে হলে কথক যেন নিজের লেখা বই উপহার দেয় লেখক-বন্ধুর স্মৃতি হিসেবে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অসিত ওকে নিজের বিবাহের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠিটি স্ত্রী ইন্দিরার নামে হলেও মল্লিকার চিঠি পেয়ে ইন্দিরা স্বামীকে বলে সন্ধে বিয়েবাড়ি সেরে যেন মল্লিকার বাড়ি একবার ঘুরে আসে। মল্লিকা যেমন গল্পের কথকের পিসতুতো ভায়ের শ্যালিকা, তেমনি আবার স্ত্রীর দিক থেকে একটা সম্পর্ক বেরিয়ে যায় সে স্ত্রীর খুড়তুতো ভাইয়ের শ্যালক যতীন্দ্রের ঘরণী হয়েছে। এই সঙ্গে গল্পের কথকের পুরনো স্মৃতিতেও জড়িয়ে থাকে মল্লিকা। ছাত্রজীবনে পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে থেকে বি. এ. পড়ার সময় বৌদির ছোট ছোট তিন ভাইবোনকে পড়াত। এসবের মধ্যেই কিছুদিন ধরে অতি সংগোপনে দুজনের অল্প-স্বল্প সংলাপ বিনিময়ে নীরব প্রেমও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা আরও বেশিদূর গড়াবার আগেই মল্লিকাদের বাড়ির সঙ্গে গল্পের কথকের সম্পর্কও চলে যায়। মল্লিকার স্মৃতি একেবারে মুছে যায় মন থেকে। সেই মল্লিকা এবারের পোস্টকার্ডে কথকের স্ত্রীকে কলকাতায় থেকেও ওদের মনোহরপুকুরের বাসায় না-দেখা করার অভিযোগ জানিয়ে লিখেছে চোখ খারাপ হওয়ার কথা। ইন্দিরার পরিচিত মেডিকেল কলেজে এক চোখের ডাক্তারের

সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার বিষয়ে অনুরোধও আছে চিঠিতে। গল্পের কথক কল্যাণের খবর গতানুগতিকভাবেই জানতে চেয়ে চিঠি শেষ করেছে মল্লিকা। গল্পের কথক বন্ধু অসিতের বিয়ের নির্দিষ্ট দিন সন্ধেয় যথারীতি নিজের কিছু বই ও ফুল উপহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে বিয়েবাড়ি এসে উপস্থিত। বিয়েবাড়ির সামনে আসতেই অসিত ওকে দেখতে পেয়ে ওর সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দেয়, কিন্তু পরিচয় প্রসঙ্গে অসিতের বাবার উত্তর এবং অসিতের প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট হয়, অসিতের ধনী পিতা কেবলমাত্র প্রয়োজনেই মানুষের সঙ্গে পরিচয় গভীর করে রাখতে অভ্যস্ত, এমনকি পূর্ব-পরিচিতকেও চিনে রাখায় অনিচ্ছা প্রধান হয়। বিয়েবাড়ির মধ্যে ঢুকে গল্পের কথক একে একে যে সব সূক্ষ্ম অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে অসিতের বাবার আচরণ সুত্রে, তার নিয় বেয়ারাদের ভোজ্য পানীয় পরিবেশনের সূত্রে— তাতে কথকের আত্মসম্মান ক্রমশ আহত হতে থাকে ভিতরে ভিতরে। বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে আহারাদির ব্যবস্থাও ভোজ্য পানীয় আইসক্রিম আর সিগারেট ছাড়া কিছু ছিল না। আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল সাহেবি পার্টির। নিজের মধ্যে বিরক্তি তৈরি হওয়ায় গল্পের কথক যখন বাইরে চলে আসে বাড়ি ফেরার জন্যে, তখনি অসিতের সঙ্গে দেখা। অসিত এমন পার্টির বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য রেখে আমন্ত্রিতদের পেট ভরে না খেতে পাওয়ার জন্য দুঃখ জানায়। গল্পের কথক চলে যাওয়ার কথা বললে তখন অসিত নিজে থেকেই একসময় তার ফেরার জন্য । ব্যবস্থার কথা বলে, আর তখনি অসিত, ওরই একদা প্রেমার্থিনী আগের দুই পরিচিত মহিলা— ফেরার জন্য ট্রামের কথা ভাবছে খবর পেয়ে, ব্যস্ত হয়। এ ব্যাপারে গাড়ি নিজেরই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাই অসিতের কাছে খুব জরুরি। তাই অসিত তার বন্ধ গল্পের কথককে ভিড়ের বাসে বা ট্রামে যেতে বার বার নিষেধ করে। নিজেই পকেট থেকে প্রথমে একটি টাকা পরে বদলে দু'টাকার নোট বের করে গল্পের কথকের পকেটে জোর করে দিয়ে দেয় রিকশায় যাওয়ার জন্য। এক মুহূর্ত সে আর দাঁড়ায় না! মহিলা দুটিকে তার পক্ষে লিফ্ট দেওয়া তখন সম্মানীয়া অতিথিদের প্রতি একান্ত কর্তব্য।

বন্ধুর বিবাহের এই দিনটির রঙিন কল্পনা গল্পের কথকের কাছে এক আকস্মিক স্বপ্নভঙ্গের গভীর বিস্বাদ ও বিষাদের বিষয় হয়ে ওঠে। এমন মন নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে তার অতীতের সূক্ষ্ম মধুর হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার রােমান্টিক সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে পৌঁছে যায় মল্লিকাদের বাড়ি। মল্লিকার সাত-আট বছরের ছেলে ননী, বছর পাঁচেক বয়সের মেয়ে ময়নার প্রাথমিক হৃদ্য আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে গল্পের কথক ওদের ঘরে ঢােকে। কথাবার্তায় মল্লিকা বােঝে, গল্পের কথক বিয়েবাড়ি থেকে আসছে, খাওয়া হয়নি। নিজেই ছেলেকে দিয়ে মিষ্টি আনায়, বাড়ির সঞ্চিত ময়দা দিয়ে লুচি করে খাওয়ায়। কিন্তু কল্যাণ খাবার সবই দিয়ে দেয় ছেলে-মেয়ের হাতে। এমন নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূর ব্যবহারের আতিথেয়তায় গল্পের কথক গভীর অভিভূত, মুগ্ধ হয়ে, আবার আসার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে, যখন বাড়ির বাইরে আসে, তখন দৌড়ে আসে ননী আর ময়না। ওরা পয়সা চায়। ননী প্রায় ছোঁ মেরে গল্পের কথকের পকেট থেকে অসিতের রাখা দু'টাকার নোট নিয়ে দৌড়ে পালায়, কারণ তার ভয় যদি টাকার নোটটা কেড়ে নেয় গল্পের কথক। আর এক পকেটে খুচরো আনা দুয়েক পয়সা ময়না তুলে নেয় নিজে থেকেই। একটু পরে। ননী ফিরে এসে অভিমান করে, মা তার টাকাটা নিয়ে নিয়েছে। টাকাটা যে কথক ননীকেই দিয়েছে মাকে নয়, এটা প্রমাণ করার জন্যে ডেকে নিয়ে যায় ভিতরে। বিদায় নিতে আসার সময় মল্লিকা যে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই সে একভাবে দাঁড়িয়ে তখনো। ননী তার টাকাটা মা কেড়ে নিয়েছে এমন অভিযোগ করলে মল্লিকা স্মিত হাসির মধ্যে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে জানায়, টাকাটা তো তাদেরই খাদ্য পরদিন মুড়ি-মুড়কিতেই যাবে। মল্লিকার গল্পের কথকের এমন টাকা দেওয়ায়, ধারণা হয় তার লেখায় অনেক আয় নিশ্চয়ই। তাহলে তার সকৌতুক প্রচ্ছন্ন প্রস্তাব, টাকা পয়সা এভাবে না দিয়ে বরং কতকাল আগেকার মতো একসঙ্গে সেই সিনেমা দেখতে যাওয়ার মতো দু-এক নাইট সিনেমা দেখারই ব্যবস্থা হোক। নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে মল্লিকার প্রস্তাবে যেন সম্মতি জানিয়েই গল্পের কথক দ্রুত তার সামনের থেকে গলির বাইরে চলে যায়। গল্পটি এখানেই শেষ হয়েছে।

'চড়াই উৎরাই' গল্পের প্লটবৃত্ত উত্তমপুরুষ কথকের বর্তমান সমাজের দুই বিপরীত বিত্তের মানুষের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপ আঁকাতেই অবয়ব পেয়েছে। কিন্তু সেই দুই শ্রেণীর রানষের পারিবারিক অবস্থা স্বভাবী পাঠকদের যে বোধ ও বোধির জগতে নিয়ে যায় । সাথক হয়েছে প্লটের নিটোল গঠনে। কাহিনীর মধ্যে বাইরের ঘটনা তেমন নেই, যেটুকু ঘটনা আছে তা কেন্দ্রীয় চরিত্রের পক্ষে 'mental'। ছোট ছোট ঘটনাগুলি বাইরের স্বভাবে উজ্জ্বল নয়, উত্তমপুরুষ কথকের মানসিক অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পটির প্রথম দিকে লেখক একই সঙ্গে চিঠি আসার সূত্রে ছোট ছোট ফ্ল্যাশব্যাকে আগের কাহিনীর ছবি এঁকেছেন। সেখানে বিত্তবান বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার বন্ধু অসিতের সঙ্গে বন্ধুত্বের গভীর সম্পর্কের আত্মীয়তার ছবিটি গল্পের উত্তমপুরুষ মধ্যবিত্ত কথকের পক্ষে আনন্দদায়ক হওয়ায় শুরুটি শিল্পের স্বভাবে যথার্থ ব্যঞ্জনা পায়। এর পরেই আরম্ভ হয়েছে মূল কাহিনী। দুটি চিত্র পাশাপাশি। প্রথমাংশে বন্ধু অসিত-প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়াংশে মল্লিকা-প্রসঙ্গ। দুই প্রসঙ্গের অভিজ্ঞতা গল্পের কথককে দু'ভাবে ঘা মারে মনের গভীরে, কিন্তু কাহিনীটির বৃত্ত গঠন ও সম্পূর্ণতা এমনভাবে রচিত যে সমগ্রভাবেই দুই চিত্রের বৈপরীত্যে একালের সামাজিক বিত্তের মাপে স্তর-নির্দিষ্ট করা মানুষের সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। গল্পটি মল্লিকার প্রসঙ্গেই শেষ, কিন্তু এই প্রসঙ্গটির তাৎপর্য যেনবা পূর্ববর্তী অসিত-প্রসঙ্গের তাৎপর্যেরই একটি ধারাবাহিক অংশ। অর্থাৎ গল্পের উত্তমপুরুষ কথকের অভিজ্ঞতা-প্রাপ্তির পক্ষে একটি টানা সূক্ষ্ম সুতা প্লটের নিবিড় স্বভাবে অন্তর্নিহিত থেকে গেছে। যেহেতু গল্পের সমগ্র কাহিনী ও ঘটনা সম্পূর্ণত উত্তমপুরুষ কথকের চরিত্র-ভাবনায় 'mental' মানসিক সূক্ষ্ম বাধে ও অনুভূতির ব্যঞ্জনায় নির্দিষ্ট, তাই প্লটের স্বভাব হয়েছে Introvert। সাধারণ কাহিনী ও ঘটনা-বয়নেই তার শিল্পরূপ সমগ্রতা পায়নি বলেই 'চড়াই উত্রাই' গল্পের প্লটবৈশিষ্ট্য গভীর শিল্পকর্মে লক্ষণীয়।

আগেও বলেছি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত পরিবার জীবন ও মানুষের চরিত্র-চিত্র আঁকায় একজন অত্যন্ত দক্ষ কথাকার। ছোটগল্পে সেই দক্ষতা অসাধারণত্ব পেয়েছে। 'চড়াই

উৎরাই' গল্পের উচ্চবিত্তের বন্ধু অসিত তার একদা কলেজের সহপাঠী গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-চরিত্র কল্যাণের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে প্রথম দিকে, অর্থাৎ তার বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে আসার আগে, তার মধ্যে বিত্তবানের চাপা কোনো অহমিকার প্রকাশ নেই। স্বভাবে সহজ সরল তার রূপ। পোশাক-আশাকে অসিত কোর্টের মধ্যেকার বড় বড় ব্যারিস্টারদের মধ্যে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্রে যথেষ্ট চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব, তার বন্ধু কল্যাণের দিক থেকে নিশ্চয়ই, কিন্তু কথাবার্তায়, আচার-আচরণে সে এত বন্ধুত্বের গর্বে স্বতঃস্ফূর্ত যে, তার শেষতম চিত্রে সূক্ষ্ম বিপরীত স্বভাবের পরিচয়ের কোনো ছিটে-ফোটা এখানে নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত এক কেরানি বন্ধু কল্যাণ আর বিত্তবান পিতার বিলেতফেরত ব্যারিস্টার পুত্র অসিতের মধ্যে যে প্রত্যক্ষত একটা ফাঁক থেকেই যায়, অসিত তা বুঝতেই দেয়নি! বরং কল্যাণের লেখক সত্তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলার মধ্যে তার কিছটাস মনের পরিচয়ই মেলে। কল্যাণকে দিয়ে উপহারের জন্য কিছু লিখে দেওয়ার অনুরোধ জ্ঞাপন বন্ধুত্বের উত্তাপে স্বাভাবিক। এমনকি যখন কল্যাণ তাদের সমাজেও উপহারের প্রচলন থাকা বিষয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করে সকৌতুকে, তখনো অসিতের কথায় আছে তার মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই পড়ে থাকার নিজস্ব যুক্তি-নির্ভর টীকা-ভাষ্য: 'আসল বুর্জোয়া ক্রোড়পতি ক্যাপিট্যালিস্টরা আমরা কি, হাতির কাছে পিঁপড়ে, তোমরা আমরা বলো না। সব আমরা। সব সমান, সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত মধ্যবিত্ত পিত্ত পড়া পেট সই। অসিতের এমন কথার শেষ অংশে কল্যাণেরই কলেজের প্রথম বার্ষিক ক্লাসে পড়ার সময়কার কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কবিতার ভাবার্থের মিল থেকে যায়।

অসিতের এমন অন্তরঙ্গতার অতি সূক্ষ্ম বিপরীত চিত্র সেই অন্তরঙ্গতারই আবরণে অন্য তাৎপর্যে গল্পের মধ্যে পাঠকের অভিজ্ঞতার গভীর গূঢ় অভিঘাতে ধরা পড়ে। সেখানেই অসিত চরিত্র ও গল্পকারের লক্ষ্য এক শিল্পমূল্য পায়। একজন বিত্তবান মানুষের পক্ষে অর্থের অহমিকা প্রকাশের অন্যতম উপায় হল বিবাহাদি অনুষ্ঠানের মতো ঘটনা। অসিতের বাবার পক্ষে পুত্রের পুরনো বন্ধুকে, যে একবার ওদের বাড়িতেও গিয়েছিল, না চিনতে পারার যে যুক্তি, তা একজন বড়লোকের স্বাভাবিক অনাত্মীয়তাকেই স্পষ্ট করে। তার পুরনো ক্লায়েন্টদের গভীরভাবে সঠিক মনে রাখার মধ্যে তার চরিত্র-পরিচয়

একটুতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তার মতো পিতার পুত্র অসিত ক্রমশ যে বাবারই অনুসারী অতি গভীর স্বভাবে, লেখক সে দিকটি সুনিপুণভাবে এঁকেছেন বিবাহের ঘটনার সন্ধেয়। বন্ধুকে একা একটি ফঁকা ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে যাওয়ার অসৌজন্যকর মানসিকতা, খেতে বসার সময় অসিতের বাবার চাপা উন্নাসিক অথচ কৃত্রিম ভদ্রতার ব্যবহারজনিত বিরক্তি এবং অসম্মাননা নিয়ে বেরিয়ে আসার পর অসিতের বন্ধুর প্রতি আচরণ অসিত চরিত্রটিকে যেমন স্পষ্ট করে, তেমনি প্রত্যক্ষ করায় শিক্ষিত ধনীদের বিভেদমূলক আচরণকেও। অসিতের আগের দুই বান্ধবী এবং প্রেমিকা ও দুই বান্ধবীই পরস্পর দুই বোন এবং যারা বিত্তে অসিতদের শ্রেণীর, তাদের লিফট দেওয়ার জন্য নিজেরই বন্ধুকে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, যাওয়ার আগে ভিড় বাসে-ট্রামে নয়, রিকশায় যাওয়ার জন্য কল্যাণকে বলে নিজের পকেট থেকেই ভাড়া হিসেবে দু'টাকা দেওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কল্যাণের মতো কেরানি শ্রেণীর মধ্যবিত্তের প্রতি নির্মম করুণারই প্রকাশ ঘটে। এ ঘটনা একজন বন্ধুর কাছে যেমন বন্ধুত্ব-বিদারকের বিষয়, তেমনি সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে অশালীন, অসৌজন্যকর, চরম অনাত্মীয়তারই পরিচায়ক। সমস্ত মিলিয়ে একটা অপমান— যা শ্রেণীভেদের, এবং যে শ্রেণীভেদ বিত্তের বৈষম্যের কারণেই সম্ভব হয়েছে। অসিতের বন্ধু কল্যাণের প্রতি আচরণে তা-ই স্পষ্ট হয়। বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় কারোর ফেরার ভাড়া দেওয়াটাও যেমন রুচিহীনতার প্রমাণ দেয়, তেমনি গভীরতম অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে সেই দেনা-পাওনার সম্পর্ক থাকলেও তার প্রকাশের এমন কৃত্রিমতার, উপেক্ষার, অনাত্মীয়তার প্রয়োগ বস্তুত ধনী ও মধ্যবিত্তের অর্থের বণ্টন-বৈষম্য ও তন্নিহিত মানসিকতাজাত গভীর ভেদের ব্যবধানকেই বড় করে। অসিত চরিত্র গল্পের এই দিকটিকেই সত্য করে তোলে!

অন্যদিকে মল্লিকা বিত্তের ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত কোটির মানুষ। তার মধ্যে মধ্যবিত্তের আন্তরিকতা আছে, সহজ, সরলতা আছে, কিন্তু সাংসারিক জীবনধারণের উপযোগী অর্থব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙেপড়ার কারণেই স্বভাবে সেই নিম্নবিত্তের সংকীর্ণতা, অশিক্ষা, ছোট ছোট স্বার্থভাবনা মুছে যায়নি। কল্যাণকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে

প্রথমে। তার বিয়েবাড়ি থেকে অভুক্ত হয়ে ফিরে আসায় সে উৎকণ্ঠা বোধ করে, ভদ্রতার কাছে অস্বস্তি পায়, তাই সামান্য ত্বরিত আয়োজনের ত্রুটি করে না। এই মানসিকতাটুকু অসিত ও তার পরিবারের নেই। মল্লিকার ব্যবহার লেখক কল্যাণকে বরং খুব অন্তরঙ্গ করে ওদের পরিবারের প্রতি মানসিকতার দিকে থেকে। কিন্তু সবশেষে যখন মল্লিকার বিদায়কালীন সকৌতুক মধুর ভাষণে পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে, এক গভীর আনন্দ দিয়ে কল্যাণ বাড়ির বাইরে আসতে থাকে, তখনকার যে অভিজ্ঞতা তা তাকে মুহূর্তে স্তম্ভিত, বিমূঢ় করে। সামান্য আয়োজনের মধ্যেও সমস্ত অন্তরঙ্গতার মায়া-সুখ-তৃপ্তি মুহূর্তে মুছে গিয়ে এক গভীর প্রচ্ছন্ন হতাশা, বিষাদ আনে। ননীর নিজে থেকে কল্যাণের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু'টাকার নোট নেওয়া, ময়নার খুচরো পয়সাগুলি তুলে নেওয়া পর্যন্ত কল্যাণের পক্ষে বালখিল্যের অবুঝ ব্যবহার হিসেবে স্বীকৃতি পেত, কিন্তু সেই টাকা তাদের সংসারের পক্ষে পরের দিনের খরচেরই উপায়— মল্লিকার এই ছোট মনের যুক্তিতে টাকাটা ফেরত দেওয়ার কথা অন্তত একবারও না বলে নিজের আঁচলেই বাঁধা, শেষে নাইট শো-তে সিনেমা দেখানোর প্রস্তাব দেওয়ার মধ্যে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূর অশালীন অসৌজন্যকর, লোভী মানসিকতা যেভাবে ধরা পড়ে, তা অনবদ্য, তা ব্যঞ্জনাগর্ভ।

‘চড়াই উৎরাই’ গল্পের কল্যাণ চরিত্রটি দুই চিত্রে যোজক কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে যেমন দ্রষ্টা, তেমনি সে-ও একজন স্পর্শকাতর, আত্মসচেতন, শিক্ষিত, সাধারণ অভিমানী মধ্যবিত্ত কেরানি। সে নিজেও লেখক। অসিতের সে বন্ধু, মল্লিকার সে পূর্বপ্রণয়ী। দুজনের সঙ্গেই একটা অন্তরঙ্গতা, মনের সূক্ষ্ম-গভীর আকর্ষণ অবধারিত আত্মীয়তাসূত্রে আছে। আর সেই সুত্র ছিড়ে গেছে দু'ভাবে, দুই পরিবেশে। কল্যাণের অভিজ্ঞতার চরম তাৎপর্যেই গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য। গল্পের মধ্যে অসিতের বাবার চরিত্রটি যথার্থ অর্থে ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই শ্রেণীর মানুষেরা হয় স্বার্থসর্ব, দাম্ভিক, নিজ শ্রেণী-সচেতনতায় এবং আচার-আচরণে কৃত্রিম। মল্লিকার ছেলে ননী ও মেয়ে ময়না মায়ের গোপন নির্দেশেই কল্যাণের কাছে পয়সা চায়। গল্পে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও সূক্ষ্ম তাৎপর্যে ধরা পড়ে। বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত বাড়ির এমন এক আচার-আচরণ প্রায় অলিখিত অধিকারের মতো কাজ করে অনেক ক্ষেত্রেই! বস্তুত ‘চড়াই

উৎরাই' গল্পের চরিত্রগুলি কোথাও নিছক চিত্র হয়নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উঠতি ধনী সমাজের, স্বাধীনতা-উত্তর কালের ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ-অভিজ্ঞতার স্পষ্ট দলিল হয়েছে।

শ্রেণী হিসেবে 'চড়াই উৎরাই' গল্পটি সমাজসমস্যা মূলক গল্পের পর্যায়ে পড়ে, চরিত্রগুলি স্পষ্ট ও গতিপ্রাণ হলেও লেখকের লক্ষ্য মানুষ যেমন, তেমনি সেই মানষে, সমস্তরকম সক্রিয়তার যে ভিত্তি— সেই সমাজও। এবং সমাজের শ্রেণীবিনা) শ্রেণীসম্পর্কের মধ্যেকার অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার ও শিক্ষার নিষ্ফলত্বই লেখকের লক্ষ্য হওয়ায় গল্পটি নিঃসন্দেহে সমাজসমস্যার গল্পই।

গল্পের ক্লাইম্যাক্স দু'টি স্বতন্ত্র কাহিনীসূত্রে দু'ভাবে দু-জায়গায় গল্পে আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে গল্পের তাৎপর্যের সূত্র ধরলে লেখক উত্তমপুরুষ কথকের ভাবনার মধ্যেই তা রেখেছেন। অর্থাৎ 'তারপর প্রায় ননীর মতো ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।'— এই বাক্যে গল্পের উত্তমপুরুষ কথকের পলায়নের ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয়ে যায়। কল্যাণের রুদ্ধশ্বাস পলায়ন বস্তুত শুধু মল্লিকার কাছ থেকে, তার বাড়ি থেকে নয়, অসিতের বিবাহবাড়ির অভিজ্ঞতা ও মল্লিকাদের বাড়ির অভিজ্ঞতা— দুই থেকেই সচেতনভাবে পলায়ন। আজকের সমাজ এভাবেই সচেতন, শিক্ষিত, স্পর্শকাতর মানুষকে অবধারিতভাবে পলায়নী মনের ভিতর দিকেই ঠেলে দেয়। 'চরমক্ষণ' ঘটনাশ্রয়ী ও চরিত্রমূলক কতকাংশে হলেও তা হয়ে উঠেছে বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক ভাবের উদ্বোধক ও বাহক। অসিত প্রসঙ্গের মধ্যে গল্পের 'চরমক্ষণ' এসেছে পকেট থেকে টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ থেকে দু'টাকার নোটটা বন্ধুর পকেটে অসিতের ফেলে দেওয়ার ঘটনার মধ্যে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ মল্লিকার কাহিনী-অংশের 'মহামুহূর্তটি দেখা দিয়েছে সেই দু'টাকার নোটই মল্লিকার নিজের থেকে নিজেরই আঁচলে বাঁধার ঘটনায়। এই দুই ঘটনা একসঙ্গে যে ভাবের সামগ্রিক তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা আনে গল্পের শেষতম বাক্যে, সেখানেই উত্তমপুরুষ কথকের চরিত্র নয়, সমগ্র গল্পেরই ক্লাইম্যাক্স ও স্থায়ী সিদ্ধান্ত।

'চড়াই উৎরাই' গল্পে মূল ভাবটি কেন্দ্রস্থ ও একমুখিন হয়েছে উত্তমপুরুষ কথক কল্যাণের অনুভূতি, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অবশ্যই লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথম দিকে অসিতের অন্তরঙ্গতা, মল্লিকার প্রসঙ্গ বোঝাতে কিছুটা কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। এই অতিরিক্ততা এড়ানো যেত। লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে তা শিল্পের স্বাদ ও স্বাদুতা পেলেও মূল ভাবের পক্ষে কিছুটা অনাবশ্যক মনে হয়। গল্পটি অকারণ কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে এই অর্থে। তবে এই বর্ণনা ও উপস্থাপনা গল্পের ভাবপ্রকাশের কেন্দ্রবস্তুটিকে আচ্ছন্ন করেনি, তার বিস্তারে বাধা দেয়নি।

এ গল্পটির রচনারীতি পরিকল্পনামাফিক হলেও অসঙ্গত হয়নি। 'অসিত প্রসঙ্গ' থেকে 'মল্লিকা প্রসঙ্গে' আসায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। সবটাই স্বাভাবিক। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সবসময়েই গল্প বলেন নিজেরই কথা বলার মতো ভাষায়। সচ্ছল তার গতি, অতি অন্তরঙ্গ তার প্রকাশভঙ্গি, এবং মধ্যবিত্ত জীবনেরই অন্তর্নিহিত স্বভাবের মতো অকৃত্রিম খোলামেলা তার গঠন। ভাষায় ব্যঞ্জনা অসিত ও মল্লিকা— দুয়েরই আচার-আচরণ ও সংলাপনিহিত এবং কৃত্রিমতা-দোষ বর্জিত।

'চড়াই উৎরাই' এমন নাম গল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যার অনুসারী, অর্থাৎ নামটি নিঃসন্দেহে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। গল্পের উত্তমপুরুষ কথক কল্যাণের অভিজ্ঞতার সূত্রেই এমন নাম দিয়েছেন লেখক। গল্পের কাহিনীতে 'চড়াই' অর্থাৎ ওপরে ওঠার অংশটি যদি ধনী বন্ধু অসিতের বিবাহবাড়ির শেষ ঘটনা পর্যন্ত হয়, তবে 'উৎরাই' অর্থাৎ নীচে নামার অংশটি মল্লিকার কাহিনী-অংশেই চকিত— এমন ব্যাখ্যা সহজেই আসে। লেখকের দুই অভিজ্ঞতা দু'ভাবের কাহিনীতে ব্যক্ত হওয়ায় নামের সার্থকতা আছে।

আবার অসিত প্রসঙ্গের সমগ্র কাহিনীটুকুতেও আছে চড়াই-উৎড়াই। অসিতের সঙ্গে কোর্টের পরিবেশে কথোপকথনের সময় কল্যাণ যে আন্তরিকতার পরিচয় পায় মধ্যবিত্ত কেরানি-বন্ধু হিসেবে এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে, তা বিয়েবাড়ির মধ্যে একাধিক সম্পর্কে ভাঙতে ভাঙতে অসিতের রিকশার ভাড়া-দেওয়া প্রসঙ্গে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধুত্বের আন্তরিকতা ও সম্পর্কের মাধুর্য এমন তিক্ত-বিরক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম দেওয়ার কারণেই এখানে আছে চড়াই-উৎরাই-এর তাৎপর্য। মল্লিকার কাহিনীতেও তার

পরিচয় মেলে। মল্লিকার সহজ আন্তরিক ব্যবহার, আতিথেয়তা, অন্তরঙ্গ স্বভাব-মাধুর্য তার শেষতম চিত্রে দু'টাকার নোট আঁচলে বাঁধার ঘটনায় ও এক নাইট একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার প্রস্তাবে একেবারে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। কল্যাণের কাছের সম্পর্ক-ভাবনার ওপরে ওঠা থেকে এমন নীচে নামার অভিজ্ঞতায় নামের পরিষ্কার ব্যাখ্যা মেলে। 'চড়াই উৎরাই' নামের বড় তাৎপর্য গল্পের মধ্যেকার মূল লক্ষ্যবস্তুর সূত্রে নিশ্চয়ই মহৎ শিল্প-মর্যাদা পায়। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে দুষ্ট, ভঙ্গুর বাংলাদেশের নাগরিক মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজ যেভাবে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, তাতে ওঠা নামার একধরনের কার্ডিওগ্রাফিক চিত্র ভেসে ওঠে। স্বাধীনতা-উত্তর কালের গল্প 'চড়াই উৎরাই'। এই গল্পের কথক কল্যাণের অভিজ্ঞতার চিত্র দুই ঘটনা চড়াই উৎরাই-এর তাৎপর্য আনে ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, বিশেষ করে ধনী ও মধ্যবিত্তে বিভক্ত সমাজে এই ওঠা-নামার তরঙ্গ থাকবেই। তার বাইরের আকারে ভিন্নতা, আধারে স্বাতন্ত্র, কিন্তু অন্তঃস্বভাবে অদ্ভুত মিল। এটাই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অভিজ্ঞ বাংলাদেশের মানবিক জীবনের সর্বস্তরের পক্ষেই একান্তভাবে স্বাভাবিক। অর্থের দাসত্ব সবাই করে। এই অর্থ বুর্জোয়া সমাজ-শাসনের বৈষম্যজাত অর্থ। এর সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের স্বার্থ হীনভাবে জড়িত। এই হীন স্বার্থ তাদের শিক্ষা ও 'কালচার'কেও যেমন পালিশ করে, তেমনই অন্তঃস্বভাবে পবিত্র, সুস্থ, মার্জিত করে না। অসিত, অসিতের বাবা ও পরিচিতরা যে চকচকে দীপ্তি দেয় ধনতন্ত্রের ধ্বজা করে সমাজের বুকে, মল্লিকারা সেই দীপ্তির বদলে দেয় ম্লানিমা, প্রদীপের আলোর শান্ততা ঠিকই, কিন্তু একই বুর্জোয়া অর্থনীতির কাঠামোয় দুই-এর মধ্যে আছে অত্যদ্ভুত মিল। অসিতদের কালচার' উঁচুতে তোলা চকচকে আবরণে ঢাকা, কিন্তু নিষ্ফল, ফাপা, ফাপা। আর মল্লিকাদের কালচার' নীচে নামানো, আপাতদৃষ্টিতে সৎ, সুস্থ, অন্তরঙ্গ, এই অর্থে চড়াই-উৎরাই-এর সঙ্গে তাৎপর্যে সমন্বিত কিন্তু ভিতরে সেই একই নিষ্ফলতা, ফঁকা স্বভাব। বুর্জোয়া অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজনীতি এবং এসব থেকে জাত কালচারের চেহারাটাই' এই। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই বক্তব্যের সুগভীর তাৎপর্যটুকু আলোচ্য গল্পে অসাধারণভাবে এঁকেছেন। এই মুগ্ধ হবার মতো শিল্পদক্ষতার কারণে গল্পের নাম 'চড়াই উৎরাই'

যেমন সার্থক, তেমনি গল্পের সময়োপযোগী বিষয়-ভাবনার গুরুত্ব অসামান্য মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য!

১৩.৪ অবতরণিকা

তেরোশো ছাপান্ন সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র পুজোসংখ্যায় প্রথম পত্রস্থ হয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্পটি। ইংরেজি চল্লিশের দশকের শেষদিকে রচিত এই গল্পে সে সময়ের দেশীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা ও সময়ের চিত্র পাঠকরা অবশ্যই আশা করতে পারেন। গল্পটির প্রেক্ষাপট শহর কলকাতা এবং এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক গৃহবধূর সংসারজীবন ও চাকরিজীবনের বাহ্যিক-মানসিক টানাপোড়েন ও তজ্জনিত অসহায়তা, সর্বশেষ চাকুরে রমণীর ব্যক্তিত্বের অভাবনীয় উত্তরণ। একেই গল্পকার স্থির-নিপুণ পর্যবেক্ষণে এঁকেছেন 'অবতরণিকা' গল্পে। এ গল্পে গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেশ-কালের পটে বাঁধা।

'অবতরণিকা' গল্পের প্লটে জড়ানো কাহিনীটি দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে এর সময়সীমা নির্দিষ্ট। গল্পের শুরু এইভাবে—চাকুরে গৃহবধূ-নায়িকা আরতি সন্ধেয় বেশ দেরি করেই উৎকণ্ঠিত স্বামী-শাশুড়ি-শ্বশুরের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বাড়ি ফেরে। আরতির এমনভাবে দেরি করে ঘরে ফেরার ঘোরতর বিরোধী স্বামী সুব্রত, শাশুড়ি সরোজিনী, শ্বশুর প্রিয়গোপাল। মেয়ে মন্দিরার অসুখের কারণে সুব্রত বারণ করেছিল আরতিকে আজ অফিস যেতে, আরতি শোনেনি। সুব্রতর অভিযোগ সেখানেই। রাতে বিছানায় শুয়ে আরতি স্বামীকে জানায় অফিসের দেওয়া একটা মেশিন বিক্রির জন্যে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল বলেই এত দেরি। সান্ত্বনার মতো মনে করায় স্বামীকে-রোজই তো এমন দেরি হয় না। তা ছাড়া সংসার চালাতে টাকা তো দরকার। আজকের একটা মেসিন বিক্রিতে এর কমিশন বারো টাকা রোজগার হয়ে গেল। সুব্রতর মতে, টাকার চেয়ে বড় প্রেস্টিজ, বড় পারিবারিক শান্তি। তাই একদিন হয়তো চাকরির দরকার ছিল, এখন তার প্রয়োজন নেই, কারণ সুব্রত ওর চাকরির পরেও একটা পার্ট-টাইমের কাজ পেয়েছে। এবার আরতিকে তার চাকরি ছাড়তেই হবে। একথার পরে আরতি কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

আসলে ঘরের বধূ আরতি বাইরে বেরিয়ে অফিসে চাকরি করুক, শ্বশুর-শাশুড়ির ঘোরতর আপত্তি ছিল গোড়া থেকেই। পুরনো রক্ষণশীল ভাবনায় তারা তখন কোনো ক্রমেই ঘরের লক্ষ্মীর চাকরি পছন্দ করেননি। অবশ্য স্বামী সুব্রত প্রথম দিকে মৃদু আপত্তি জানালেও পরে আরতিকে বাবা-মায়ের বাধা সত্ত্বেও চাকরিতে পাঠায়। ‘মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী’-তে চাকরি করে আরতি। ওদের নতুন একটা সেলাই মেশিনকে বাজারে চালু করতে কোম্পানি বেশ কিছু মেয়েকে নিয়োগ করেছে। ওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেশিন দেখায়, চালানো শেখায়, অর্ডার নিয়ে বিক্রি করে, মাস-মাহিনা ছাড়া কমিশন পায় আলাদা প্রত্যেকের বিক্রি করা মেশিন পিছু। আরতি রাতে এসে স্বামীকে সে সব অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত গল্প করত। সাহেব পাড়ায় অবাঙালি মহলে মেশিন বিক্রির সুবিধের জন্য এডিথ সিম নামে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাকেও নিয়েছে কোম্পানি। এই কলিগের সঙ্গে আরতির যে বিশেষ বন্ধুত্ব, তা-ও জানায় স্বামীকে। সুব্রত এরকম এ্যাংলো মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশতে বারণ করে দেয়।

আরতি চাকরি করলেও সংসার ও তার সমস্ত সদস্যদের প্রতি সমান দরদ। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে প্রত্যেকের পছন্দমতো নানা ধরনের জিনিস উপহার দিয়ে খুশি করে। প্রতি মাসে মাইনের সঙ্গে কমিশনের বাড়তি টাকা আনে। অবশ্যই অফিসের কাজেআরতির সক্রিয়তা ও আন্তরিকতা বিশেষ খ্যাতি আনে বলে আরতি বেশি জড়িয়ে পড়ে অফিসের কাজে। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় দেয়। আরতি সংসার ও শরীরের কথা ভেবেই সুব্রতর এতটা ভালো লাগে না। একদিন কোম্পানির মালিক হিমাংশুবাবুর সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করে ও। এ বিষয়ে কিছু কথা অভিযোগের মতো বলতে গিয়েও বলতে পারে না, ফিরে আসে। শেষে যখন আরতিকে জোর করে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার কথা বলে, আর তা আরতিও জিদে ও টাকার প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে শোনে না, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্য মনোমালিন্য এবং তীব্র সংঘর্ষ বাধে। সুব্রত তার মেয়েকে সামলানো ও শাসন করার জন্য শ্বশুর নিবারণবাবুকে জানায়, বাড়িতে ডেকে পাঠায় এক সন্ধেয়। নিবারণবাবু মেয়ের কাছ থেকে আপত্তি ও বাধা পেয়ে ফিরে আসেন। পরে ওদের স্বামী-স্ত্রীর যখন বিরোধ চরমে, তখন সম্পর্কের

অসহায়তা কাটাতে সুব্রত শ্বশুরকে অন্তত কিছুদিনের জন্য তার নিজের বাড়িতে আরতিকে রাখার কথা বলে। কিন্তু দিন দুয়েক পরে যেদিন বিকেলে শ্বশুর আসেন, সেদিনই—যে জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চাকরির স্থায়ী অ্যাকাউন্টান্ট সুব্রত, সেই ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল করে, সুব্রতর চাকরি চলে যায়। ওই ব্যাঙ্কে জমানো সুব্রতর নিজেরই দুশো টাকা আর সেই সঙ্গে নিবারণবাবুরও হাজার টাকার ওপর চলে যায়।

এবার আরতির চাকরিই সংসারে একমাত্র ভরসা। আরতি অফিসে অনেক সকালে বেরিয়ে অনেক রাতে ফিরে বাড়তি টাকা উপায় করে চলে। কেউ আর কোনো কথা বলে না। সুব্রত এবার নিজের একটা চাকরির চেষ্টায় বেরোয়, কিন্তু পায় না। মাঝে মাঝে সুব্রত দেখে আরতিকে অফিসের সেই এ্যাংলো মেয়েটির সঙ্গে। সুব্রতর এটা পছন্দ নয়। তবু সুব্রত ভেবে রাখে একটা চাকরি পেলে এ বিষয়ে সে তখন আরতিকে কথা শোনাবে। বেকার সুব্রতকে সহজ করার জন্য আরতি বাড়ি ফিরে অফিসের নানারকম গল্প । তার অফিসেও ধনী ক্রেতারা আজকাল ভালো ব্যবহার করে না। কোম্পানির কাছে তাদের অভিযোগ যায় নানা কারণে তাদের বাড়ি আরতিদের যাওয়ার দেরি হলে। আর এসব অপ্রীতিকর গল্প শোনায় না সুব্রতকে। কখনো বা কিছু বলে ফেললেও সুব্রত সাবধান করে বাইরে থেকে কোম্পানির কাছে ওদের সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়ার ব্যাপারে। আরতি যেন এসময়ে মেজাজ না দেখায়। আরতি মেনে নেয়।

কিন্তু সুব্রত ক্রমশ দেখে, আরতি অফিস থেকে ফেরার পর কেমন যেন শুকনো মুখ ওর। ক্রমশ সুব্রতর চাপে আরতি স্বীকার করে, অফিসে হিমাংশুবাবু কথা রাখছেন না বলে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে কথান্তর হয়। মালিকের কথামতো মাসে তিনটি মেশিন বিক্রি করলে কমিশন ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় পাবে টেন পার্সেন্ট! কিন্তু এডিথ চারটি ও আরতি তিনটি মেশিন বিক্রি করার পর হিমাংশুবাবু সেই কথা উইথড্র করে নিয়ে বলেছেন অত্যন্ত ডাল মার্কেট হওয়ার জন্য যেন ওরা তাতে চাপ দেয়। তাতেই এডিথের সঙ্গে হিমাংশুবাবুর কথা কাটাকাটি হয়—অশান্তি এখানেই। শেষে সুব্রত একদিন। একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বর্ধমান গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে দেখে আরতি অফিস যায়নি, সংসারের কাজে ব্যস্ত। শোনে, আরতি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সুব্রত

অবাক, স্তব্ধ, স্তম্ভিত, কঠিন। আরতি একে একে সমস্ত ঘটনা বলে জানায়, এডিথ অসুস্থতার জন্যে সাামেবার আসতে পারছে না অফিসে, দারোয়ানের হাতে পাঠানো চিঠির মারফত তা জানানো সত্ত্বেও হিমাংশুবাবু রবিবার এডিথ উপরি রোজগারের লোভে গেস্টদের এন্টারটেন করে বিছানা নিয়েছে—এমন অত্যন্ত অশালীন অসম্মানকর কথা বলায় এবং কথা উইথড্র না করলে কোনো মেয়েছেলে তার অফিসে কাজ করতে পারবে না

আরতি একথা বললেও উইথড্র না করায়—আরতি নিজেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

একথা শোনার পর একসময়ে সুব্রত মায়ের সামনেই এক অদ্ভুত হাসি মুখে ধরে নিজের সিদ্ধান্ত জানায়। আসলে যাকে অপমান করেছেন হিমাংশুবাবু, সেই এডিথই কিন্তু নির্বিবাদে সিগারেট মুখে দিয়ে সে অফিসেই কাজে লেগে গেছে। কারণ তার স্ত্রী আরতির মতো সে তো আর বাঙালি সেন্টিমেন্টাল মেয়ে নয়! এতে আরতি জল ভরা দুই আয়ত চোখের সঙ্গে হতাশ। প্রশ্নও—তার স্বামীর কাছ থেকেও শেষে এমন কথা তাকে শুনতে হল! এ ‘অবতরণিকা' নামের এমন বড় গল্পটির কাহিনী-শেষ এমন নায়িকার বিষাদ-বেদনা ও চরম হতাশা দিয়েই। শ্রেণীবিচারে গল্পটি অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীধর্ম সমন্বিত সার্থক রচনা। আকারে বেশ বড় এই গল্পটির প্লটের বিন্যাস ও জটিলতাও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকটি ছোট, সংযত ব্যঙ্গাত্মক গল্প থেকে পৃথক-স্বভাবী। আরতির সমস্যা অবশ্যই পারিবারিক ও সামাজিক, সেই সঙ্গে গভীরতর স্বভাবে ব্যক্তিক। এমন এক নায়িকা চরিত্রের চিত্ত-স্বাতন্ত্র, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের মৌলিক দিক—যা স্বামীর সঙ্গে, শ্বশুর শাশুড়িসহ পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে, সেই সঙ্গে অফিসের সহযোগী মহিলা কর্মীদের দাবি-দাওয়ার আদায়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে, তারই ক্রমিক অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন গল্পকার। চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের উপযোগী বিস্ময়কর চরিত্র ব্যক্তিত্বের পূর্ণ উদ্ভাসনে আরতি নামের চাকুরে বধূটি এই শ্রেণী-স্বাতন্ত্রকে বড় জায়গায় নিয়ে যায়।

‘অবতরণিকা’ গল্পের প্লট নির্মাণে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তেমন কোনো অভিনবত্ব আনেননি। নির্দিষ্ট ছকে এর কাহিনী ও ঘটনার সুবিন্যস্ত রূপ আছে। গল্পের প্রথমে আছে বেশ

কয়েকমাস আরতির চাকুরি জীবন কাটানোর পর একাধিক দিনের মধ্যেকার একটি দিনের দেরি করে বাড়ি ফেরার পারিবারিক সংকট চিত্র। এই চিত্রের সময়সীমা নায়িকার সন্ধেয় বাড়ি ফেরা ও রাতের বিছানায় স্বামী সুব্রতর সঙ্গে তার মতবিরোধের অন্তর সংঘাত ও আরতির নিদ্রার ক্লান্তিতে চিহ্নিত। এর পরেই গল্পকার প্রসঙ্গ এনেছেন অতীতের আরতি প্রথম চাকরি নেওয়ার প্রতিক্রিয়া ও ক্রমশ তারই সূত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক মানসিক অনন্বয়ের। এই সংঘাত প্রসারিত হয়েছে স্বামীর সূত্রে আরতির অফিস পর্যন্ত। আরতি চাকরি না ছাড়ায় সুব্রত বিরক্ত হয়ে শ্বশুরের শরণাপন্ন হয়, ঠিক করে ফেলে পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে সাময়িক ব্যবধানের জন্য স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি কিছুদিন রাখার। চাকরি আরতি ছাড়তে চায় না কিছুতেই। আর এই অবস্থায় আসে ব্যাঙ্ক ফেলের আকস্মিক ঘটনা ও সুব্রতর চাকরি চলে যাওয়া। গল্পের কাহিনী ও ঘটনায় এরপর নতুন মোড় ফেরে। আবার কাহিনী আসে বর্তমান কালে। এখানে প্রধান ঘটনা আরতির নিজে থেকে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া।

দুটি প্রধান ঘটনা—সুব্রতর চাকরি যাওয়া একেবারে বাইরের ঘটনা, আরতির চাকরি যাওয়া আরতিরই নিজের মধ্যে তৈরি করা ঘটনা। গল্পের মধ্যে এমন দুটি দু'ধরনের চাকরি ত্যাগের ঘটনা প্লট-বৃত্তকে গভীর-জটিল করেছে শেষে। দুই ঘটনার এমন বিপরীত স্বভাব গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুগ করেছে। গল্পের প্লটবৃত্তের কেন্দ্রে সুব্রতও নয়, আরতিই নির্দিষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু আরতির ব্যক্তিত্বের ক্রমিক উদ্ভাসনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, আরতির শ্বশুর-শাশুড়ির দৃষ্টিভঙ্গি, অফিসের মালিকের লাভ-লোকসানের মধ্যে অস্থিত চিত্ততা, সুব্রতর ব্যাঙ্ক ফেল ঘটনা, এডিথের সঙ্গে আরতির বিশেষ বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা, ধনী মেশিন-ক্রেতাদের উন্নাসিক ব্যবহার—এমন সব একাধিক টুকরো টুকরো চরিত্র ও ঘটনা উঠে এসেছে গল্পের স্বভাবেই। তাই গল্পের প্লটে খুব একটা জটিলতা নেই, কিন্তু চরিত্রের ব্যক্তিত্বের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্রের কারণে এমন সব ছোটখাটো সিচুয়েশন প্লটকে পূর্ণ-অবয়ব দানে সহায়ক হয়েছে।

'অবতরণিকা' গল্পের প্লট মন্থরগতি কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে নির্মিত, কিন্তু সে গতি মন্থর হলেও অমোঘ, স্থির-লক্ষ্য। আরতি ঝোঁকের মাথায় কাজে ইস্তফা দেয়নি, আবেগে

ভেসে যায়নি, কোনো সেন্টিমেন্টালিজম তার মধ্যে নেই, তার ইস্তফা ভাবনাচিন্তারই সুস্থ সিদ্ধান্ত। এই যে আরতির শেষ পরিণতি, চরিত্রাত্মক গল্পের পরিকাঠামোয় একেবারে স্বাভাবিক এবং নিয়তির মতো অপরিবর্তনীয়। তাই গল্পের কাঠামোয় বিশেষ প্রেক্ষিত ও সময়ের ঐক্য একটি নারীর অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যেমন ব্যক্তিত্বের যোজক হয়েছে, তেমনি সময়ের ব্যবধানের স্থির-স্বভাব ক্লান্তিকে কত সহনীয়। এ গমের পাঠক নিছক ঘটনা-আশ্রিত কাহিনী শুনতে চায়নি, প্লটে ডালে কাহিনী ও ঘটনা পাঠককে বাধ্য করেছে সব কিছু পাশে সরিয়ে রেখে নিশ্চিত গল্পের নায়িকাকে দেখার। প্লটের যে প্রথম থেকে সুতো এক এক করে জড়িয়ে যাওয়ার স্বভাব, তা আরতিকে কেন্দ্রে রেখেই সম্ভব হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পের মুল লক্ষ্য থেকে একবারও সরে যাননি। কিছুটা প্রথাবদ্ধ বিবৃতিধমী এই কাঠামোর মধ্যে নায়িকা চরিত্রের চমৎকারিত্বই প্লটকে করেছে শিল্প-লাবণ্যে সহনশীল।

এ জাতীয় গল্পে 'মহামুহুর্ত থাকেই—যেখান থেকে গল্প হঠাৎ মোড় বদলায়, গল্পের মুখ এক অন্তিম ভাবব্যঞ্জনার জন্য তৈরি দেওয়ালে নিমজ্জিত থেকে যায়। সুব্রতর হঠাৎ চাকরি যাওয়া সেই 'মহামুহূর্ত' দিক। সেই অংশের ঘটনায় সুব্রতর কোনো হাত নেই ঠিকই, কিন্তু সুব্রতর হঠাৎ বেকারত্ব গ্রহণ, আরতির কাজের চাপ বেড়ে যাওয়া, কমিশনে টাকা বেশি উপায়ের জন্য এবং বেশি মেশিন বিক্রির জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম, আর তাতেই হিমাংশুবাবুর কথা না রাখায় মানসিক হতাশা ও প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরি হওয়া, শেষে এডিথের অপমানের কারণে নিজের সুস্থ মনের ব্যক্তিত্বকে জিদে ও প্রবল প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই মহামুহূর্তের পরবর্তী শিল্প-ন্যায় তৈরি হয়ে ওঠে। আরতির সর্বশেষ চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার মধ্যে আরতি, তথা সমগ্র গল্পেরও পরিণামী ব্যঞ্জনা চমৎকারিত্ব পেয়ে যায়।

'অবতরণিকা' গল্পে একাধিক ছোট বড় চরিত্র আছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়িকা আরতিই। সুব্রত, সুব্রতর বাবা-মা, সুব্রতর শ্বশুর, হিমাংশুবাবু, এডিথ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার থেকে শুরু করে বাকি সকলেই গৌণ হয়ে যায় আরতির কাছে। তারা আরতিকেই দেয় শিল্পের লাবণ্যমণ্ডিত ভূমি এবং আরতিকেই আশ্রয় করে। অবশ্যই আরতি একটি সার্থক

চরিত্রাত্মক গল্পের লক্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আরতি গল্পের মধ্যে ক্রমশ তার পারিবারিক সত্তা থেকে ব্যক্তিসত্তায় এসেছে এবং সেই ব্যক্তিসত্তা থেকে নিগূঢ় সামাজিক-মানসিক সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছে।

পারিবারিক সত্তায় আরতি সন্তানের মা, শ্বশুর-শাশুড়ির বৌমা, কুলবধূ। চাকরি করার মধ্যেও তার এইসব সম্পর্কে ফাটল তৈরি করেনি। গভীর মানবিক বোধে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মহনীয়তায় আরতি পারিবারিক ও সামাজিক-মানবিক সত্তা—যা চাকরির সঙ্গে যুক্ত—দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। শ্বশুর-শাশুড়ি তার প্রথম মাইনের টাকায় কেনা উপহারের জিনিস না নিয়ে অপমান করেছে, অনেক বাঁকা কথা বলেছে, শ্লেষের কাটার আঘাত দিয়েছে তার মনের গভীরে। কিন্তু আরতি তাকে সহজভাবে নিয়ে মানিয়ে চলেছে। গাোড়া থেকেই সে ঠাণ্ডা মন ও মাথার মানুষ।

তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে স্বামী সুব্রতও জড়িত। আরতি একা নয়, তার স্বামীকে নিয়েই ৰ ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা। এই পূর্ণ ব্যক্তিসত্তায় কিন্তু ফাটল ধরে সুব্রতর কারণেই। সখানেও আরতি কথায়, ব্যবহারে, চিন্তায় ভারসাম্য হারায়নি। কিন্তু সুব্রত ক্রমশ তাকে বাধ্য করেছে তার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পরোক্ষে অফিসের কাজের কঠিন সমের মধ্যে ঠেলে দিতে। সুব্রত তাকে কাজ ছেড়ে দিতে বলে, নিরন্তর চাপ দেয়, তার বাবা নিবারণবাবুর কাছে অভিযোগ জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছুকাল ব্যবধান তৈরির জন্য প্রত্যক্ষভাবে সচেষ্ট হয়। এখানেও আরতি তার স্বামীসহ পূর্ণ ব্যক্তিত্বে ফাটল ধরাবার সুযোগ করে দেয়নি। সুব্রতকে জড়িয়ে বধূ হিসেবে তার যে ব্যক্তিসত্তা সেখানেও সে ঠাণ্ডা মাথার, যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনার মানুষ।

এমন যে আরতি, তার শেষ চাকরিতে ইস্তফা দান কোনোক্রমেই লঘু আবেগের ঘটনা নয়, নয় বাঙালি মেয়েসুলভ সহজ ভাবপ্রবণতার। হলে তার শিল্পের চরিত্র হত বিঘ্নিত, বিনষ্ট। সুব্রত যখন তার মাকে, মূলত আরতিকে শোনানোর জন্যই, বলে:

‘সবচেয়ে মজার কথা মা, সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে সে হয়ত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও শুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙালী মেয়ে নয়।’

তখন স্পষ্ট হয়ে যায়, সুব্রত তার স্ত্রী আরতিকে বোঝেনি, বুঝতে পারেনি তার সংকীর্ণ সীমার জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রসারিত মানসিকতার আরতিকে।

আরতির যে বড় সামাজিক-মানবিক সত্তা, তার প্রতিষ্ঠাতেই স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে যায়। আরতির পারিবারিক জীবনের স্বার্থ-চিন্তা তার মন থেকে ক্রমশ গেছে মুছে। স্বামীর সহযোগে যে ব্যক্তিসত্তা, সেখানেও বড় অনন্বয়ের অন্ধকার খাদ তৈরি হয়ে গেছে। তার সামাজিক-মানবিক সত্তা তৈরি হয়েছে এডিথের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বেই। এ ক্ষেত্রে কমিশনের টাকা বড় কথা নয়, বড় কথা নয় চাকরি চলে যাবার ভয়, বড় কথা হল ব্যক্তিত্বের অবনমনে আরতির প্রতিবাদী, মানবিক বোধে দীপ্ত দৃঢ়চিত্ততা। এডিথ সত্যই সে জাতীয় মেয়ে নয়—যা ভাবেন হিমাংশুবাবু, এমনকি পরোক্ষে তার নিজের স্বামী সুব্রতও। তর্কের খাতিরে যদি তা হয়ও বা, তবু অফিসের ‘ডেকরামে’, ভব্যতা-সভ্যতা ও শিষ্টাচারের সীমায় হিমাংশুবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই যে কোনো স্পর্শকাতর নারীব্যক্তিত্বের পক্ষে অবমাননাকর। এমন যে ব্যক্তিত্বের, চেতনার সবল জাগরণ আরতির মধ্যে, এখানেই তার নতুন সামাজিক-মানবিক সত্তার সু-স্বাগত হওয়ার দিক। আরতির যে পরিবারের, স্বামীর সমস্ত বাধা উপেক্ষা করেও চাকরি করার কঠিন জিদ, তারই এক পরিবর্তিত, প্রসারিত, ব্যক্তিত্ব-পরিশীলিত রূপে ধন্য জিদ হল প্রবল প্রতিবাদেই চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া!

বস্তুত আরতি আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এক সুস্থ গণদাবির কথা জানিয়ে বড় অন্যায়ের বা নেতৃত্ব দিয়েছে। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিমাংশুবাবুর সঙ্গে আরতির সংলাপ বিনিময়ের দুটি চিত্র উল্লেখ্য:

১. “হিমাংশুবাবু কিছুক্ষণ জ্বলন্ত চোখে আরতির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, ...আমি আবার বলছি, সে অত্যন্ত খারাপ টাইপের লুজ মর্যার্লসের মেয়ে।’

আরতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল: আপনি যা বলেছেন উইথড্র করলে কোন ভদ্রলোকের মেয়েছেলে আপনার এখানে কাজ করতে পারে না।”

২. "হিমাংশুবাবুই ফের উঠে এসেছিলেন, 'আপনি কি পাগল হলেন নাকি মিসেস মজুমদার ? কোথাকার একটা যা তা টাইপের মেয়ে, জাতে মেলে। না, ধর্মে মেলে না, তার জন্য আপনি চাকরি ছাড়তে যাবেন কেন? আপনাকে তো কিছু আর বলা হয়নি?

আরতি বলল: আমাদেরই বলা হয়েছে।"

এই দুটি চিত্রে আরতি একবার প্রসঙ্গ এনেছে 'কোন ভদ্রলোকের মেয়েছেলের' চাকরি না করতে পারার কথা, আবার বলেছে 'আমাদেরই' বলতে অফিসের সব মেয়েদেরই কথা! আরতির অফিসে কোনো ইউনিয়নই নেই, কিন্তু তার বাইরে যে মানবতাবোধে সহকর্মীদের মধ্যে মর্মের যোগ-অনুভব, সেখানে এক নতুন সুস্থ প্রগতিমূলক ভবিষ্যতের ইউনিয়ন তৈরির আবেগ ও কাঠামো প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। তার নেত্রী বুঝিবা আরতিই! আর এই প্রচ্ছন্ন নিরাবয়ব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে আরতি তার কঠিন সামাজিক-মানবিক সত্তার আকাশমুখী পতাকা নিয়ে! নিজেকে দিয়ে সে সকলের জন্য প্রতিবাদের পতাকা উর্ধ্বে তুলতে পেরেছে। এখানে পরিবারও তার সমস্যা বড় হয়নি, বড় হয়নি বেকার স্বামীর। অসহায় জীবনস্বভাব-চেতনা, প্রধান হয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতিচেতনা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দিয়ে সমষ্টির প্রগতির যেনবা যথার্থ উদ্বোধন!

গল্পের একেবারে শেষে আরতির ব্যক্তিক জীবনের অসহায়তাই তাকে বেদনা-বিদ্ধ এক বিষাদময়তার মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে সে একেবারেই একা, অনিকেত, নিঃসঙ্গ। তার শেষ চিত্র এই রকম:

"সুব্রতর শ্লেষাত্মক বাক্যের উত্তরে আরতির কথা 'তুমি, তুমিও তাই বলছ? আরতি চোখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে। সুব্রত দেখল এতক্ষণে, এতদিন বাদে আরতির আয়তসুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।"

গল্পের কাঠামোয় আরতি এক এক করে পারিবারিক সত্তা, ব্যক্তিক সত্তা থেকে সরে এসেছে। সামাজিক-মানবিক সত্তায় সে হয়েছে স্থির। কিন্তু সেখানে তাকে সমর্থন জানানোর মতো তার স্বামী পাশে নেই। তার কাজে স্বামীর সঙ্গে যে অনন্বয়, অন্তত মনের দিক থেকে এখানেই তার দুটি সত্তার গভীর অন্তর্গঢ় বিরাোধের ফলিত দিক

সেই একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা অশ্রুসজল অভিমানে তাকে এক জীবন্ত নারী-ব্যক্তিত্ব করেছে। এমন ব্যক্তিত্বের অন্তিম বিস্ময়কর উদ্ভাসনেই (epiphany) আরতি চরিত্রের। চমৎকারিত্ব ও শিল্পিত অনন্যতা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনকে দেখার দৃষ্টি প্রথমত তিনটি দিক থেকে বিশিষ্টতা পায় প্রত্যেক গল্পেই। ১. গল্পকারের কঠিন বাস্তবতাবোধ, ২. দেশ ও কাল মাপে পারিবারিক সামাজিক জীবন স্বভাবের প্রতি শিল্পী-মনের অনড়-আনুগত্য, ৩. পরিচ্ছন্ন মানবতাবোধ। 'অবতরণিকা' গল্পের জীবনকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার সূত্রে গল্পকারের ব্যক্তিত্ব এই তিন পর্যবেক্ষণে সমর্থন পায়। গল্পে সুব্রতর বাবা-মা-ভাইদের নিয়ে যে মধ্যবিত্তের সংসার, তার মধ্যে আরতির যে বধূ হিসেবে সক্রিয়তা, আত্মীয়তা ও সহমর্মিতা—সেখানে বাস্তবরসে সৃষ্টির এতটুকু বিচ্যুতি নেই। যে সময়ে এই গল্প রচিত, যে সময়ের পট ও মানুষ এই গল্পের পক্ষে ছায়ার মতো পোশাক, তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নানা বদলের প্রতিশ্রুতি মেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থনৈতিক ও নৈতিক সম্পর্কগুলির মধ্যে 'ভাঙন' আনে। 'অবতরণিকা' গল্পে সাংসারিক অসচ্ছলতার কারণেই আরতিকে বাইরে বেরুতে হয়েছে চাকরির জন্যে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর নীতিবোধ, সংসারের অন্যান্যদের সম্পর্কের মূল্যবোধে রক্ষণশীল ও উদার ভাবনার সংঘর্ষ-সংকট প্রকট হয়েছে। এই যে চিত্র এর বাস্তবতা অবশ্যই যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা।

এ নিশ্চয়ই গল্পের নায়িকা অবক্ষয়ের শিকার হয়নি, সে মাথা ঠিক রেখে সংসার ও অফিস সামলে চলেছে। কিন্তু অফিসের মধ্যে এসে আরতির বড় জীবনের শিক্ষালাভ ঘটেছে। সে পারিবারিক, স্বামীসূত্রের ব্যক্তিক মানবতার সম্পর্ক থেকে বহুর সম্পর্কের মানবতায় চলে আসতে পেরেছে সেই শিক্ষাতেই। এসবে যে বাস্তবতা, তার নিখুঁত চিত্রকর হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গল্পে যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা আছে, যে ঘটনায় সুব্রতর চাকরি যায়। এর পরে আরতির যে কঠিন শ্রমের মধ্যে ডুবে যাওয়া, যেভাবে অর্থ উপার্জনের প্রয়াস, তাতে গল্পের বাস্তবতা যতটা বিশ্বাস্য, তেমনি বিশ্বাস্য তার এডিথের জন্য মানবিকবোধের জাগরণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র আরতির সঙ্গে

হিমাংশুবাবুর সংঘর্ষের যে চিত্র এঁকেছেন গল্পের শেষে, সেখানে আরতি তার অতি-স্বাভাবিক চরিত্র-ন্যায়েই সহকর্মী এডিথের সমর্থনে তার পক্ষ থেকে সমস্ত অপমানিত মহিলা অফিস কর্মীদের পক্ষে চলে এসেছে। পারিবারিক জীবনে সে হারেনি, সুব্রতর সঙ্গে মানসিক সংঘর্ষে ও সংকটে সে নিজের স্থান বদল করেনি, তেমনি সে নিজের চাকরি ও সংসার বাঁচাতে গিয়ে এডিথের অপমান ও অসম্মানকে ভুলতে চায়নি। আরতি চরিত্রের বাস্তবতা তার স্বাভাবিক চরিত্র ন্যায়েই উজ্জ্বল।

অবশ্যই 'অবতরণিকা' নিছক অনুভবের গল্প নয়, এ গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙনও পরিণতিতে সত্য হয়ে আসেনি, মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে, নাগরিক পরিবার জীবনের প্রেক্ষাপটে এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংকটকেই তীব্র করে দেখিয়েছেন গল্পকার। যুদ্ধোত্তরকালে নাগরিক জীবনপটে ধরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ছোট করে দেখতে অভ্যস্ত ছিল কিছু মানুষ। যুদ্ধের সময় এই সমাজ নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়, সমাজের মধ্যে যুদ্ধজনিত অবক্ষয়ের রূপ বীভৎস হতে থাকে। সুব্রতর মধ্যবিত্ত মানসিকতায় হিমাংশুবাবুর অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্যগুলির মধ্যে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের এভাবে সাধারণীকরণের মনোভাব গ্রহণ ঠিক নয়। আরতি এসবের ঊর্ধ্বে। যুদ্ধ ভদ্রঘরের মেয়েদের গণিকাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়। শহর কলকাতায় মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন, তেমনি গ্রাম থেকে শহরে আসা বহু মেয়েদের মধ্যে এমন বৃত্তি গ্রহণের ঘটনা আছে। আবার শহরেরই এক উপজাত (by-product) সম্প্রদায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধজনিত মানবতার ক্ষয়রোগ বিস্তৃত হয়েছিল। গল্পে আরতির কথায় অবশ্যই এডিথকে সেই মানের মহিলা বলে মনে হয় না। আরতির যে প্রতিবাদ, তা কোনো সম্প্রদায় ভেবে নয়, মুক্ত মনেই নারীজাতির সম্মান বাঁচানোর এক শপথ বিশেষ।

হিমাংশুবাবু আরতির হঠাৎ চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনাকে আদৌ সমর্থন না করে যা যুক্তি দেয়, তা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক এবং মানুষে-মানুষে বড় সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক attitude :

“হিমাংশুবাবু ফের উঠে এসেছিলেন: আপনি কি পাগল হলেন নাকি মিসেস মজুমদার ? কোথাকার একটা যা তা টাইপের মেয়ে, জাতে মেলে না, ধর্মে মেলে না, তার জন্যে আপনি চাকরি ছাড়তে যাবেন কেন? আপনাকে তো কিছু আর বলা হয়নি?”

হিমাংশুবাবুর এমন দৃষ্টিভঙ্গি সর্বকালের মানবতাবিরোধী। আরতি নিজে একা এই পক্ষের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে, সেইভাবেই বেরিয়ে এসেছে নিয়োগকর্তার সামনে থেকে। এখানেই গল্পকারের জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় চরিত্রের বকলমে প্রতিষ্ঠিত। নরেন্দ্রনাথের মানবতা বিষয়ে যে চিত্ত-স্বাতন্ত্র, যে প্রসারিত করে জীবন ও মানুষকে দেখা, তার মধ্যেই আছে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব ও গল্পকারের মৌল ভাবনা।

‘অবতরণিকা’ গল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে প্রথম চোখে পড়ে নায়িকা আরতির মধ্য দিয়ে গল্পের ভাবের একমুখী স্বভাবের দিক। গল্পটির মূল ভিত্তি চরিত্রের প্রকাশমূলকতা, সেখানে ভাবের রূপ ও বিকাশ আরতিকে আশ্রয় করেই শিল্প-সম্ভাব্যতা পেয়েছে। গল্পে ঘটনা আছে ছোট ও বড় আকারের একাধিক, কিন্তু আরতির শিল্পরূপের পূর্ণস্বভাব ধরার পক্ষে সেগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র কোথাও এতটুকু সুযোগ দেননি ভাবের অনাবশ্যক অতিবিস্তারের। ব্যাঙ্কফেলজনিত সুব্রতর চাকরি যাওয়া আর এডিথের জন্য স্বেচ্ছায় আরতির চাকরি ছাড়া—দুই বড় ঘটনার প্রকৃতিগত তাৎপর্যের দিক গল্পের ভাবকে একমুখিন স্বভাব দিয়েছে।

লক্ষণীয়, গল্পটির মধ্যে বিবৃতিধর্ম আছে, এবং তার মধ্যে গল্পকারের নিজস্ব নির্দেশ প্রকট। সুব্রত বা আরতির ভিতর থেকে কোনো মনস্তত্ত্বের জটিল স্বভাব উঠে আসেনি, তাদের সংকটচিত্র, উত্তেজনাপূর্ণ বাকবিতণ্ডায় গল্পকার নিজেই তাদের মনের খবর দিয়েছেন বিবৃতির ভাষায়। টানা গল্পের স্বভাবে যেমন সুব্রত-আরতির মনের খবর গল্পকার নিজের কথাতেই দিয়েছেন, তেমনি গল্পের শেষতম সংঘর্ষের চিত্র—যা হিমাংশুবাবু-আরতির মধ্যে ধরা—সেখানেও তাদের মনের খবর গল্পকারের শোনানো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এমন সব মনের খবরে গল্পের গতি ক্লান্তিকর হয়নি।

গল্পের বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের একান্ত অনুগ হয়েছে গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ। গল্পের ভাষায় কোনো প্রতীক-প্রয়োগ-প্রয়াস নেই। সারল্য এর অলংকার, শিল্পের সংযম এই গদ্যভাষার দ্যুতি, এর অনায়াস ভঙ্গি হল ভাষায় গল্পের গতির উপযোগী যুগপৎ বন্ধন ও মুক্তির যৌগিক রূপ! প্রত্যেকটি সংলাপ অবলীলায় মনের গভীরে যাওয়ার মূল্যবান উপকরণ। সংলাপই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ধরায়, স্বতন্ত্র চরিত্রব্যক্তিত্ব বোঝাতে নিঃসঙ্গ মনের একক বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।

"...সুব্রত স্ত্রীকে বলল: 'কালই একটা রেজিগনেশান লেটার ছেড়ে দিয়ে। আরতি একবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল: "আমার চাকরি ছাড়া নিয়ে তোমার অত মাথা ব্যথা হয়েছে কেন বল তো?'

স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল সুব্রত; তারপর শান্তভাবে বলল: "আজকাল কথাবার্তার চমৎকার ধরন হয়েছে তোমার!'

আরতি লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ করে থেকে একটু হাসল।"

স্বামী-স্ত্রীর শয্যাদৃশ্যে এই যে মনোরম সংলাপ-বিনিময়, এর মধ্যে একে একে স্বামীর কঠিন নির্দেশ, স্ত্রীর অসহিষ্ণু মন্তব্য, স্বামীর শান্তভঙ্গিতে ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীকে অভিযুক্ত করা, শেষে স্ত্রীর একই সঙ্গে সলজ্জ হাসি—এসবের স্তরে স্তরে আছে একেবারে অন্তরঙ্গ সম্পর্কভাবনার চমৎকৃতির দিক। সারাদিনের শেষে আলস্যে সুব্রতর বই পড়া, রাতের বিশ্রামের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর নির্বিকার বাক্য বিনিময় বাঙালি পরিবারের শিক্ষিত দম্পতির জীবন্ত মানসচিত্র প্রতিষ্ঠিত করে। গল্পের যেখানে বর্ণনা, যেখানে সংলাপ, আবার যেখানে ঘটনার আকস্মিকতা, এসব ছাড়াও যেখানে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অদম্য প্রয়াস,—সব জায়গাতেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র গদ্যের মধ্যে নিরাসক্তি বজায় রেখে সব কিছুর অমোঘে প্রতিক্রিয়া-চিত্রকে সামনে এনেছেন।

প্রসঙ্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের প্রকরণ বৈশিষ্ট্যর আর একটি দিক সম্পর্কে ভাবনা আসে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে নারীর চোখের জল সম্পর্কে এক প্রতীকপ্রতিম প্রতিক্রিয়ার দিক লাখ— যা প্রায় তার প্রকরণের অন্তিম চিত্রের পক্ষে যেন স্বাভাবিক দিক! নারীর

দুচোখের অশ্রু মানবতার সহযোগেই রূপ পায়। ‘ঘুষ’ গল্পের শেষে কুন্তলার চোখে জল, ‘রস’ গল্পের শেষে নাদির শেখের স্ত্রী মাজখাতুনের চোখের ছল ছল, ‘অভিনেত্রী’ গল্পের শেষে লাবণ্যর তাচের হাসির সঙ্গে পাশাপাশি ছল ছল স্বভাব দুটি চোখের অবস্থান—এসব বোঝায় নরেন্দ্রনাথ গল্পের প্রকরণে নায়িকাদের স্বভাবের মধ্যে মানবতার প্রতীক, অভিমানের পর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তেমনি ‘অবতরণিকা’ গল্পের শেষেও সেই চিত্রঃ

“তুমি, তুমিও তাই বলছ?

আরতি চোখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে।

সুব্রত দেখল এতক্ষণে, এতদিন বাদে আয়ত সুন্দর চোখদুটি জলে ভরে উঠেছে।”

এমন নায়িকাদের অশ্রুকে গল্পের ব্যঞ্জনায় ব্যবহার নিশ্চয়ই গল্পকারের রীতির mannerism নয়, চরিত্রের ন্যায়েই আঁকা এক গভীর অনুভবের বাত্ময় রূপ।

‘অবতরণিকা' শব্দটির দুটি প্রধান অর্থ—১. কোন গ্রন্থের ভূমিকা; ২. সিঁড়ি বা ‘সোপান’। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের নাম যেখানে ‘অবতরণিকা, সেখানে এমন দুই

অর্থেই গল্প-নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য নয়।

প্রথমত, ‘অবতরণিকা’ গল্পের নায়িকা আরতি গল্পের শেষে যেভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে, তাতে তার এমন কাজ এক নতুন দিকের ভূমিকা করে। তা হল, অফিসে বা কর্মস্থলে সমবেত মানুষের কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে প্রতিবাদ জানানো। আরতি যেখানে চাকরি করে সেখানে গোষ্ঠীগত বা সমবেতভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর মতো কোনো সংগঠন ছিল না, থাকার কথাও নয়। আরতি এক রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূ হলেও সে প্রতিবাদ জানিয়েছে অফিসের সমস্ত মহিলাকর্মীদের স্বার্থেই। নিজের স্বার্থ সে বিসর্জন দিয়েছে। একটা ইউনিয়ন তৈরি করে সমবেতভাবে প্রতিবাদ জানানোর ব্যবস্থা না থাকলেও আরতি তার একটি ভূমিকা করে দিয়েছে আভাসে-ব্যঞ্জনায় তার প্রতিবাদী চরিত্র-ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তাই আরতি চরিত্র ধরে গল্পের যে ব্যঞ্জনা, তা যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ,

মানবতার সপক্ষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানানোর মতো গোষ্ঠীগঠনের ভূমিকা। গল্পনাম তাই সার্থক।

দ্বিতীয়ত, 'সিঁড়ি' বা 'সোপান' অর্থ ধরলে আলোচ্য গল্পে আরতি সেই ব্যক্তিত্বের সোপান—যাকে অবলম্বন করে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার ক্রমশ নীচের দিকে নেমেছে ধীরে ধীরে। মধ্যবিত্ত সংসারে থেকে তার সন্তানদের বাড়িতে রেখেই স্বামীর দুর্বল অর্থ ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য সংসারের বাইরে এসেছে আরতি। সংসারের বন্ধন ক্রমশ হয়েছে ছিন্ন আপাতদৃষ্টিতে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কেও ঘটেছে অবনতি যত আরতি অফিসে তার কাজের জগতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে। আবার চাকরি যাওয়ার পর যেখানে সুব্রতর উপায়ের টাকার সমূহ ঘাটতি, সংসার চলে চাপাচাপির মধ্যে, যেখানে সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচেরও ঘটে ছাঁটাই, সেখানে আরতিও চাকরিতে দেয় ইস্তফা। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থার এমন ক্রম-অবনতি ঘটেছে যে সোপান ধরে, সেই সোপান হল আরতির জীবনধারাই। আরতি সেই অবতরণিকা যে একটি পরিবারের অর্থনৈতিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের অবতরণ ঘটায়। বিষয়ের এমন ব্যাখ্যার মধ্যে আছে 'অবতরণিকা' নামের সার্থকতা।

তৃতীয়ত, 'অবতরণিকা' যদি সিঁড়ি হয়, আরতির সক্রিয়তা যে শুধু একটি সংসারের অর্থনৈতক অবস্থার পতনকেই দেখিয়েছে তা নয়, ব্যঞ্জনায় বোঝায় এক ব্যক্তিত্বের সিঁড়ি ধরে ওপরের দিকে নিশ্চিত উত্থানকেও। আরতি পারিবারিক স্বার্থ থেকে ব্যাক্তখায়ের স্বামী-সম্পর্কও ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠেছে, এসেছে অফিসের শ্রমে বিশিষ্ট, ক্লান্ত বহু মানুষের মধ্যে। আরতি শৌখীন বধুমাত্র নয়, সেই শ্রমজীবী রমণী। আর তার শ্রম সহকর্মীদের পরিবেশে পারস্পরিক শখে জীবনমুখিন। এমন জীবনপ্রেমেই সহকর্মীরা তার একান্ত আপন। তাই হিমাংশুবাবুর প্রতিবাদে সে মুখর হতে পেরেছে। তার এমন প্রয়াস তার সিঁড়ি ধরে উত্তরণকে দেখায়। আরতি সেই সিঁড়ি যা জীবন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় ও ঘঘাষণায় ঊর্ধ্বমুখী। আরতি নতুন গণসংগঠনের প্রবক্তা একটি অফিসের মধ্যে। এই স্বভাবে ও ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসনের আরতি নিজেই নিজেকে করেছে অবতরণিকা। গল্পের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নামের গভীর ব্যঞ্জনার ঘোষক।

১৩.৫ অনুশীলনী

১। 'চোর' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা নির্ণয় করো

২। 'চোর' গল্পটি একটি মনস্তত্ত্ব নির্ভর সমাজ সমস্যামূলক গল্প ব্যাখ্যা করো।

৩। সময়ের পরোক্ষ শিকার 'চোর' গল্পের দুই চরিত্র- আলোচনা করো।

৪। 'রস' গল্পটিতে মুসলমান সমাজ জীবন পটভূমি হিসেবে গৃহীত হলেও তা মুখ্য নয়,আলোচনা করো।

৫। মোতালেফ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৬। 'রস' গল্পটির সমাজ চিত্র সম্পর্কে লেখ।

৭। 'চড়াই উৎরাই' গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে কতদূর সার্থক।

৮। মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবন ও মানুষের চরিত্র কিভাবে চিত্রিত হয়েছে 'চড়াই-উৎরাই' গল্পের আলোচনা করো

৯। 'চড়াই-উৎরাই' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো এবং এটি কতটা ব্যঞ্জনা ধর্মী তা বিচার করো।

১০। 'অবতরণিকা' গল্পটির ক্ষেত্রের নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাস্তব চেতনা কতদূর ফুটে উঠেছে আলোচনা করো।

১১। 'অবতরণিকা' গল্পের আরতী চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

১২। 'অবতরণিকা' গল্পের নামকরণ কতটা ব্যঞ্জনা ধর্মী তা যুক্তি সহকারে আলোচনা করো।

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ সাহিত্য বিহার

২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা।

৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—'আত্মকথা', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২

৪। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী

৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—'গল্প লেখার গল্প' (১-১৫ জুলাই ১৯৭৫) বেতার জগৎ পত্রিকায় প্রকাশিত

৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র-'জন্মভূমি' ভাঙ্গা হাইস্কুল শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, শান্তিনগর ঢাকা, বাংলাদেশ,

৮। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—

৯। অরুণকুমার মুখপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২

১০। বীরেন্দ্র দত্ত—বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, এস পি পাবলিশিং, কলিকাতা,

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খণ্ড—গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা,

১২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশ কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা,

১৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—অসমতল গল্পগ্রন্থ ২য় সংস্করণ

১৪। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, চতুর্থ প্রকাশ,

একক ১৪ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত গল্প – অভিনেত্রী, রানু যদি না হতো, হেডমাস্টার, হেডমাস্টার, পালঙ্ক

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ অভিনেত্রী

১৪.২ রানু যদি না হতো

১৪.৩ হেডমাস্টার

১৪.৪ পালঙ্ক

১৪.৫ অনুশীলনী

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ অভিনেত্রী

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অভিনেত্রী' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে 'যুগান্তর' পত্রিকার তেরোশো সাতান্ন সালের পুজোসংখ্যায়। ইংরেজি চল্লিশের দশকের শেষ বছর অর্থাৎ উনিশশো পঞ্চাশ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরই এর সম্ভাব্য রচনাকাল। এই গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত বা প্রায় এক নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন্ত ছবি উপহার দিয়েছেন গল্পকার। সেই নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সুগভীর মানবতাবোধ গল্পের মূল লক্ষ্যে ওতপ্রোত। মধ্যবিত্ত সাংসারিক জীবনচিত্রের বাস্তবতাকে জীবন্ত করতে গল্পকার বিশেষ করে একটি চরিত্রকে স্থির-লক্ষ্য করেছেন। সে আদৌ অভিনেত্রী নয়, কিন্তু অভিনেত্রী হতে গিয়ে তার যে স্বভাবের কারুণ্য, বিষাদময়তা,

চলচ্চিত্রের অভিনয় থেকে সংসার জীবনের অসহায় অভিনয়ে তার যে বিপরীত স্বভাব ও সার্থকতা, গল্পের প্রধান চমক সেখানেই।

'অভিনেত্রী' এক অনুভবের গল্প! বিশেষ একটি চরিত্র ধরে সমকালের মধ্যবিত্ত জীবনদর্শন গল্পে বড় হয়ে ওঠে গল্পকারের উদ্দেশ্যের পক্ষে। তার সঙ্গে যুক্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব জীবন সমস্যা ও তারই আবার চলচ্চিত্রে ধরা অভিনয় তথা শিল্পের। সমস্যা—দুয়ের মধ্যে তফাত কতটুকু, নাট্যশাস্ত্রের এমন এক প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব এ গল্পের। পরিকল্পনায় জড়ানো আছে। 'অভিনেত্রী'-র মধ্যে অবশ্যই একটি টানা গল্প আছে, যার কথক অনিমেষ চৌধুরী নামের এক নতুন চলচ্চিত্র পরিচালক। অনেকদিন ধরে সহকারী থাকার পর অনিমেষ চৌধুরী প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের কাছ থেকে কম টাকার নতুন ভালো ছবি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। চিৎপুর অঞ্চলের অভিনেত্রী মালতী মল্লিক, মানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে না এবং বেশ কম টাকা নেবে—এই ভেবে তার খোঁজে এসে দেখা না পেয়ে, তার ঝি ক্ষান্তমণিকে স্টুডিওয় দেখা করার জন্য স্টুডিওর নাম ও সময় জানিয়ে চলে আসে জয় মিত্র স্ট্রিটে তার এক পুরনো বন্ধু বিনয় চক্রবর্তীর বাড়িতে।

বিনয় চক্রবর্তীর বন্ধুত্ব ও তার পারিবারিক অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা ও আতিথেয়তা অনিমেষের কাছে আকর্ষণীয়। অল্প খরচের মধ্যে গভীর আদর-যত্নে এমন আপ্যায়ন পায়। অনিমেষ বন্ধু বিনয় ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে, তাতে নিজেকেই মনে হয় কোনো মহামান্য অতিথি। বিনয় সত্তর টাকা মাইনের চাকুরে, এক রুগ্ণ সন্তানের পিতা। অভাবের সংসার। স্ত্রী সংসার সামলাতে পারে না। তা নিয়ে প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। অনিমেষ যখন ওদের বাড়ি আসে তার আগেই তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। ঝগড়ার কারণ তাদের রুগ্ণ পুত্র বিস্তু। বিস্তুকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো একান্তই দরকার, তার টাইফয়েডে একটা পা দুর্বল, টেনে টেনে চলে সে। ডাক্তারের মতে, ভালো খাবার খাওয়ালেই তা সেরে যাবে। সেই খাবার, টনিক ইত্যাদি কেনার ক্ষমতা বিনয়ের নেই, সেই সঙ্গে প্রতিদিন বেঁচে থাকার মতো সাংসারিক জিনিসপত্র কেনারও অর্থাভাব চরমে। ঝগড়ার মধ্যে বিনয় স্ত্রীর প্রতি মুখখারাপও করে।

এমন হীন পারিবারিক দীনতার চিত্রে অনিমেষ দেখে বিনয়ের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্ত্রী লাবণ্যের মিষ্টি হাসি, রুগণ ছেলের তুলনায় সুশ্রী মুখ, ফর্সা রঙ, টানা নাক-চোখ, অভাব অনাদরের মধ্যেও দীর্ঘ দোহারা চেহারা ও অটুট স্বাস্থ্যকে। লাবণ্যর কোলে রোগা ছেলে যেন মানায় না, কিন্তু লাবণ্যর মাতৃত্ব তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে মধুরতর করেছে। বিনয়ের সামনেই ওর কথার উত্তরে অনিমেষ ওর পার্টটাইম চাকরি করে দেওয়ার অক্ষমতা জানায় ওদের সিনেমা লাইনের অসুবিধের কথা বলে। অনিমেষ জানায়, লাজুক বিনয়ের পক্ষে ছোট পার্ট করাও সম্ভব নয়, তবে লাবণ্যকে দিয়ে ছোট একটা চরিত্রে অভিনয় করানো যায়। তাতে লাবণ্য বেশ মানানসই। একে দিয়ে কম টাকার বাজেটে কাজটা করাতে পারবে—অনিমেষের এই চিন্তাটাই বড়। নির্বাচিত ভূমিকাটিও নুতন বই-এ অপ্রধান। বেকার স্বামীর স্ত্রী হবে লাবণ্য, সঙ্গে রুণ সন্তান, পরিবারের ছোট বউয়ের একটা অংশ। সব নিয়ে দু-তিন দিনের শুটিং। লাবণ্যর ছেলেই সেই সন্তান হবে। এত টাকা একসঙ্গে পাবে ভেবে লাবণ্য মনের গোপনে দারিদ্র্যের জীবনে কিছু উজ্জ্বল মুক্তির আনন্দ হিসেব করে বসে।

অনেক ভাবনা-চিন্তা, ভালো-মন্দ দিক চিন্তা করার পর বিনয় স্ত্রীর অভিনয়-করা মেনে নেয়। লাবণ্যও অনিমেষের কথামতো একদিন স্টুডিওর ব্যবস্থা দেখে পরে শুটিং এ আসে স্বামী-পুত্রসহ। আসে ক্রুদ্ধ মালতী। কারণ মালতীর সঙ্গে চুক্তি না করায় সে দেখতে চায় অনিমেষ যাকে ঠিক করেছে, সে কিরকম অভিনয় করে। বাস্তবিকই অনিমেষ লাবণ্যকে বহুবার অভিনয় শিখিয়েও, রিহার্সালে বসিয়েও ছবি তোলার সময় লাবণ্যকে দিয়ে দৃশ্য তোলায় ব্যর্থ হল। সে জায়গায় অভিনয় করল মালতী মল্লিক। দৃশ্য জমে গিয়ে সহজেই চোখে জল এনে দেয়। বিনয় লাবণ্য দুজনেই লজ্জিত। প্রথমে লাবণ্যর ছেলেকে নিয়ে অভিনয় করানো হল। তার জন্যে টাকা নিল না লাবণ্য। ওরা ফিরে আসে হতাশ হয়ে স্টুডিও থেকে।

আনমেষের ছবি মুক্তি পাওয়ার পর আনমেষ দুটি পাস নিয়ে বিনয়ের বাড়ি আসে ওদের ছবি দেখানোর জন্য। এবার অনিমেষের সামনেই লাবণ্য যে বাড়িওয়ালার বাড়িভাড়া আদায়ের তাগাদার সামনে গারিবারিক অসহয়তা ও আড়ষ্টতা কাটাতে

অভিনয় করে, তাতে অনিমেষ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়। বাওয়ালার সামনে নিজেকে লুকোতে বিনয়ের নিজের যুক্তিতেই কথার আড়ালে যায় বিনয়। বিনয়ের যেন ভয়ঙ্কর পেটের অসুখ করেছে হঠাৎ, বিছানায় শয্যাশায়ী, মানুষজন টাকা-পয়সা নেই, শেষে নিজের ডাক্তার মামাকে দিয়ে দেখানো, কোনোরকমে সামলানোর মতো এমন একাধিক বিশ্বাস্য কথা বলে লাবণ্য স্বাভাবিক ভদ্রতায় বাড়িওয়ালা গোবিন্দবাবুর ভাড়াভিক্ষার চাগকে সামলায়। সুস্থ হলেই ভাড়া নিজে দিয়ে আসবে বিনয়, এবং আনুষঙ্গিক নিল আতিথেয়তার তদ্রতার অভিনয় করে অনিমেষের সামনেই লাবণ্য সাংসারিক অর্থনৈতিক অসহায়তা, আড়ষ্টতা ও অপমানকর দিক সহজ করে নেয়। এতই যদি নিখুঁত অভিনয় করতে পারে লাবণ্য, তা হলে স্টুডিওতে কেন পারেনি--তা এক বিস্ময় অনিমেষের কাছে। লাবণ্য ধরা গলায়, ছলছল চোখে হাসিমুখে জানায়, এ অভিনয়ে। মালতী মল্লিকও ব্যর্থ হত।

লাবণ্যর এমন অসহায়তাবোধ ও মিথ্যে অভিনয়ের আন্তর স্বীকৃতি দিয়েই গল্পের শেষ। অভিনেত্রী অবশ্যই চরিত্রাত্মক শ্রেণীর গল্পের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এর সঙ্গে জড়িত আছে নিবিড়ভাবে সমসময়বতী ভেঙেপড়া পরিবার ও বুর্জোয়া অর্থনীতির অভিশপ্ত সমাজ। চরিত্রাত্মক গল্পে অবধারিতভাবে থাকে মনস্তত্ত্ব, সমাজ ও নর-নারীর সমস্যা। লাবণ্যর মতো গৃহস্থ নিম্নবিত্ত পরিবারের এক অসহায় কেরানির বন্ধু তার সংসারী মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় দুর্বল, আড়ষ্ট, ব্যর্থ। সেই মনের ক্রম অভিব্যক্তির নির্মম চিত্র এ গল্পে আছে নিপুণ বাস্তবতায়। অনিমেষ চৌধুরীর দৃষ্টিতে ধরা বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা চিহ্নে এবং লাবণ্যের চোখের গোপন চাপা অশ্রুতে ভেজা কণ্ঠ ও মুখের অনাবিল স্মিত হাসির মধ্যে এক চরিত্র-নিহিত অপূর্বত্বের অনুভূতি গল্পটিকে সার্থক চরিত্রাত্মক গল্পের মর্যাদা দেয়।

'অভিনেত্রী' গল্পের প্লটে আছে চরিত্র-নির্ভর কাহিনী-আভাস। কাহিনীটি রূপ পেয়েছে অনিমেষ চৌধুরীর সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে। গল্পকার অনিমেষ চৌধুরীর তৎপরতার মধ্যে তার দৃষ্টি দিয়েই কাহিনী-অবয়ব গঠন করেছেন। অনিমেষের দেখার দৃষ্টিতে মূল লাবণ্যর ও তার পারিবারিক কাহিনীর দুটি ভাগ— প্রথম ভাগে, লাবণ্যর সপুত্র সিনেমায়

নামার প্রস্তুতিচিত্র ও তার সর্বশেষ অসহায় ব্যর্থতার করুণ রূপ, দ্বিতীয় ভাগে, বাড়িওয়ালা গোবিন্দবাবুর বাকি ভাড়ার জন্য তাগিদকে সামলানোর সার্থক প্রয়াসের অভিনয়-উদ্যোগ। দুটি ভাগের যোজক ব্যক্তিত্ব লাবণ্যই। প্লটের জট কাহিনীর দ্বিধা-বিভক্তি মেনে নিয়ে। চরিত্রের অন্তলোকের উদ্ভাসনে অপূর্ব পায়। কাহিনী হয় গৌণ, চরিত্রের অন্তলোকের। অপূর্বত্ব এক নতুন আলোকপাত ঘটায় পাঠকদের বিস্মিত-অনুভবে।

মালতী প্রসঙ্গ, স্বামী বিনয় চক্রবতরি অসহায়তা, গোবিন্দবাবুর ভাড়ার তাগাদা এমনকি অনিমেষ চৌধুরীর কম টাকায় অভিনেত্রী-অনুসন্ধান ও নির্বাচন—এসব প্রস প্রধানত লাবণ্যকে শিল্পের যথাযথ আসনে স্থিত করার জন্যই চিত্রিত। গল্পটি বর্ণনার আশ্রয়ে এইসব প্রসঙ্গকে প্লটের জটিলতায় যুক্ত করে চরিত্রের একমুখিনতাকে প্রধান করেছে। প্লটের কেন্দ্রে লাবণ্য ও তার বিশেষ অভিজ্ঞতাই গল্পের বিন্দুতে সিন্ধর স্বাদ চকিত করে প্লটের বিন্যাসকে জটিল জালের স্বভাব দিয়েছে। গল্পের প্রথমেই মালতী মল্লিক প্রসঙ্গ, তারপর এসেছে লাবণ্যর সংসার ও লাবণ্য। পরে আবার মালতীর অভিনয়, শেষে মালতীর শিল্পের জীবন্ত অভিনয়ের সঙ্গে লাবণ্যর পারিবারিক জীবন্ত অভিনয়ের প্রতিবিম্ব-স্বভাবে কঠিন বৈপরীত্য ও বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। কিন্তু গল্পের প্লটের প্রয়োজনীয়তা কেবল অভিনয় শিল্পকলার তত্ত্বের রূপ-চিত্রণে যথার্থতা পায়নি, পেয়েছে লাবণ্যর অতি জীবন্ত বাস্তব স্বভাবের অন্তস্থিত বিষাদ-করুণ অস্তিত্বের বিস্ময় চকিত টীকা-ভাষ্যে।

প্রত্যেক ছোটগল্পেরই যেমন থাকে একটি 'মহামুহূর্ত', যেখান থেকে গল্পের গতি ও চরিত্রের ভাগ্যের দোলাচল স্বভাব নিয়ন্ত্রণে ও পরে অগ্রগমনে নিশ্চিত একটা পথ ধরে পরিণামী ব্যঞ্জনার লক্ষ্যে ধাবিত হওয়ার প্রয়াস, তেমনি সেই মুহূর্তের শিল্পনৈপুণ্য গল্পের একটি বড় উপকরণ হয়। 'অভিনেত্রী' গল্পের 'মহামুহুর্ত'টি কাহিনীর সূত্রে প্রধান হয় না, মূল্য পায় লাবণ্যর চরিত্র-ন্যায় ধরে। তার অভিনয় প্রয়াস ও বাস্তব সত্য-জীবনের অনুভব—দু'য়ের মিশ্রণ সার্থক অভিনয়ে যেখানে এক হতে পারল না, সেখানেই গল্পের মূল চরিত্র ধরে চরমক্ষণে'র উজ্জ্বল কম্পমান আলো :

'...সেটের মধ্যে লাবণ্যর হাত কাঁপে, পা কাঁপে, ঠোঁট কাপে থর থর করে। অদ্ভুত একটা ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। সে ভয় ছেলের মৃত্যুভয় নয়, অনেক কষ্টে যদি বা ছেলের কাছে তাকে বসানো গেল, তার আড়ষ্টভঙ্গি কিছুতেই যেতে চায় না। ছেলের মাথার কাছে বসে হাতে পাখা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য তা রেখে দিল। অনিমেষ ধমক দিয়ে উঠল, 'অমন করে বাতাস করে নাকি? আপনার নিজের ছেলে মরে যাচ্ছে।'

লাবণ্য মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, না।'

পুরো ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে শেষে সেট থেকে লাবণ্যকে নামিয়ে আনল অনিমেষ, তারপর অসহায়ের মতো বলল, 'হল না।'

লজ্জায় অনুশোচনায় লাবণ্য মুখ নীচু করল।'

এই চিত্রের রুদ্ধশ্বাস উপস্থাপনায় আছে লাবণ্যর নতুন অভিনয় ও বাস্তব জীবনের সংঘাত থেকে জাত এক কঠিন অক্ষমতার অনুভব। লাবণ্য চরিত্রের বিবর্তনের শেষে অন্তিম যে অপূর্বত্বের ওপর আলোকপাতের দিক আছে, এখানে তারই এক করুণ দ্বান্দ্বিক ভূমি। এই ভূমি থেকে সরে আসার পরেই লাবণ্য অনিমেষের চোখে বিস্ময় হয় শেষ সংসার-জীবন সামলানোর চিত্রে। লাবণ্যর ব্যক্তিত্বের স্বাধীন তৎপরতায় না, চরমণ রচিত হয়েছে অনিমেষ চৌধুরীর প্লটের মধ্যে যাবতীয় তৎপরতার সূত্র ধরে। আসলে গল্পে অনিমেষ চৌধুরীই লাবণ্য চরিত্রের পর্যবেক্ষক। অনিমেষ চৌধুরী যেন বা লেখক স্বয়ং—পর্যবেক্ষক ও চরিত্রচিত্রের বিবরণদাতা।

'অভিনেত্রী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাবণ্য। তাকে কেন্দ্র করেই গল্পকারের মূল লক্ষ্য শিল্পরূপ পেয়েছে। গল্পের প্রথমে লাবণ্য নেই, প্রসঙ্গ আছে অভিনেত্রী মালতী মল্লিকের। সই প্রসঙ্গ ধরে বিনয়-লাবণ্যের বাড়িতে অনিমেষ চৌধুরীকে এনেছেন গল্পকার। অনিমেষের বন্ধু বিনয়ের বাড়ির প্রায়-নিম্নবিত্ত পরিবেশ ও জীবনযাপন চিত্র, সংসার পরিচালনায় বিনয়ের সত্তর টাকা মাইনের চাকরির আয়ের অসহায়তা এবং লাবণ্যর সংসার সামলানো ও স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক সংঘর্ষের তীব্রতা দিয়ে লাবণ্যর অভিনয় প্রসঙ্গ অবতারণা ও সেই বিষয়ে বাসনা জাগ্রত করার একটি প্রাক-ভূমিকা-চিত্র

এঁকেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিনয়ের পার্টটাইম চাকরির জন্য অনিমেষকে অনুরোধ, অনিমেষের মতে বিনয়ের মতো ভীরু, তেমন কথা বলতে না পারার স্বভাবের জন্য অভিনয়ের অযোগ্য হওয়া ও সব শেষে লাবণ্যকেই একটি বিশেষ অথচ ছোটখাটো অভিনয়ের জন্য নির্বাচন প্রসঙ্গটি আসে।

মালতী মল্লিক ভালো হোক, খারাপ হোক, মূলত একজন পেশাদার অভিনেত্রী, লাবণ্য আদৌ তা নয়, তবু অভিনয় করার জন্য সে অবশেষে নির্বাচিত হয়। গল্পের মূল লক্ষ্যে এভাবেই লাবণ্যর যোগ ঘটে। কিন্তু গল্পকার লাবণ্য চরিত্র আঁকতে বসে তার দুটি সত্তাকে স্পষ্টভাবে ভাগ করে দেখিয়েছেন। একটি তার অর্থনৈতিক দুর্যোগে ভেঙেপড়া মধ্যবিত্ত সংসারের একসন্তানের জননী ও একমাত্র বধূরূপ; আর একটি তার অভিনেত্রী রূপ। আবার অভিনেত্রী রূপেও লাবণ্যর ব্যক্তিত্বে দুটি দিক ধরা পড়ে। ১. তার কৃত্রিম অভিনয়ে অংশগ্রহণ। ২. তার বাস্তব সংসারে জীবন্ত স্বভাবে অভিনয় প্রদর্শন।

অনিমেষ চৌধুরী লাবণ্যকে চলচ্চিত্রের জন্য যে চরিত্রে অভিনয় করতে দিয়েছে, তা তার বাস্তব জীবনেরই প্রতিরূপ ব্যক্তিত্ব। মূলত সাংসারিক সচ্ছলতা আনতে অর্থের জন্যই তার এমন অংশগ্রহণ, তা তার আজীবনের পেশা নয়। স্টুডিওয় লাবণ্যর অভিনয়ের প্রেরণা ও সাহস এবং সহজ স্বাভাবিক মন তৈরির জন্য 'সেট সাজানো হল। আড়ম্বর আয়োজনের কিছু নেই। দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর। ঠিক যেমন ঘর লাবণ্য দেখে এসেছে, অনিমেষ সেটে প্রায় তারই অনুকরণ করল।' অনেকক্ষণ ধরে অনিমেষ লাবণ্যকে তার কথা, ভাব ইত্যাদির রিহার্সাল দিলেও লাবণ্য কিছুতেই তার অভিনয়ের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। স্টুডিওর অনেকগুলি পুরুষের দৃষ্টির সামনে তার লজ্জা, সংকোচ তার অভিনয়ে বড় বাধা হয়। নিরুদ্বেগ মুখ লাবণ্যর, দুঃখ নৈরাশ্য, ক্ষোভ—যেগুলি অভিনয়ে একান্ত প্রয়োজন এবং চরিত্র-বাস্তবতার শিল্পভিত্তি, তার না ভাব ফুটছে না। সে মুখ একান্ত অ-ভাবব্যঞ্জক। সমস্ত সিচুয়েশনে অভিনয়ের মধ্যে শাবণ্যর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর জন্য উৎকণ্ঠা ভয় থাকবে, কিন্তু অভিনয়ে ছেলের জন্য মৃত্যু ভয় নয়, নিজের আড়ষ্টতায়, ভিতরে বাস্তব এক ভয়ে লাবণ্যর অভিনয় আর হয়না। আবার এই আড়ষ্ট লাবণ্যই বাড়িতে অনিমেষের সামনে, বাড়িওয়ালা

গোবিন্দ বাকি দু'মাসের ভাড়া চাইতে এলে, কি অসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করে স্বামীকে মাস রোগী সাজিয়ে! সে অভিনয়ের এক বিস্ময়কর আবেদন! লাবণ্যর কৃত্রিম অভিনয়ের আড়ষ্টতা, ভয়, আবার অকৃত্রিম অভিনয়ের সপ্রতিভ স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব চরিত্রটিকে দুটি সত্তায় ভাগ করে। চলচ্চিত্রের অভিনয়ে লাবণ্যর মুখে ছিল কৃত্রিম সংলাপ—যা লাবণ্যর নয় আদৌ, যদিও বিন্তুর ওরকম অসুখ হলে সে এমন সংলাপের বাস্তবতায় ছেলের সঙ্গে বা ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে অভ্যস্ত। অভিনয় একটা কঠিন শিল্প—তা বাস্তব সংসারের যে রূপ—তা থেকে আলাদা। সংসারে যে কোনো দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বিষাদ থাক না কেন, তার সঙ্গে স্বভাবের আবেগ রক্তের সম্বন্ধে জড়িত। অন্যের তৈরি করা সংলাপে যে কোনো একজন অভিনেত্রীকে কৃত্রিমভাবে সেই আবেগ তৈরি করতে হয় এবং তার পরিবেশনে অভিনেত্রীর থাকে সেই কৃত্রিম আবেগের সঙ্গে জড়ানো অকৃত্রিম শিল্প-মায়া। তার থেকে যে জীবনের প্রকাশ, হল শিল্পের জীবন, তা কৃত্রিম হয়েও অকৃত্রিম। লাবণ্য এখানেই ব্যর্থ।

অন্যদিকে বাড়িওয়ালার সামনে লাবণ্য যে অভিনয় করে, তা নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনেরই! তা আগে জীবন, পরে অন্যের কাছে হয়ে ওঠে শিল্প। তার যে আবেগ, কৌশল, উত্তেজনা, সত্যতা, তা ব্যক্তিত্ব থেকে জাত, বাঁচার বাসনার মধ্যে গভীর প্রোথিত। বাড়িওয়ালার সামনে বিনয়-লাবণ্যর যে আচরণ, তা সত্যিকারের সম্মান নিয়ে বাঁচার সমস্যাকে সামাল দেওয়ার প্রয়াস। এখানে দ্বিতীয় কোনো শিল্প-মায়া নেই। বাস্তব জীবনের গভীরেই তা জীবনেরই শিল্পমায়া! জলের গভীরে মাছের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতো। চলচ্চিত্রের অভিনয়ে সেই বিষয়ই থাকে, কিন্তু তা কৃত্রিমতার মূলে অকৃত্রিমতার ভ্রম বা মায়া জাগায়। লাবণ্যর দুই রূপের মধ্যে যে বৈপরীত্য ও একীকরণের বদলে নিষ্ফলত্ব, তা-ই তাকে জীবন-উপলব্ধির গভীর স্বভাবে একজন অভিনেত্রী করেছে। বস্তুত লাবণ্যর সংসার জীবনের যে বাঁচার খাঁটি তৎপরতা, তা অভিনয় নয়, জীবনেরই অন্যতম উপকরণ, অঙ্গসৌষ্ঠব তা। জীবন ধারণ ও যাপনে বিভিন্ন সংসারী মানুষদের কিছু নর্ম মেনে চলতে হয়, যা সামাজিক নিয়মের সত্য মিথ্যা দুই-ই হতে পারে। কিন্তু তা অভিনয়ের কৃত্রিম বা জীবন্ত স্বভাবের প্রতিরূপকে বাোঝায় না, তা জীবন-বাস্তবতার যথোচিত শিক্ষা, নীতি। লাবণ্যর গল্পের শেষের অভিনয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটি

সংসারের সমস্ত রকম অর্থের বণ্টন বৈষম্যের মাঝখানে বেঁচে থাকার, জিতে যাওয়ার বা কখনো কখনো হেরে যাওয়ারও, এক নিশ্চিত সামাজিক উপায়ই। লাবণ্যর পক্ষে তা একান্ত স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত। চলচ্চিত্রের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে স্টুডিওর সেটে যা ছিল ভয়ের, আড়ষ্টতার, এখানে তা হয়েছে দৈনন্দিন জীবন-স্বভাবের এক মনোরম সক্রিয়তা, শ্রম, বিকাশ। অনিমেষের চোখ দিয়ে গল্পকার নায়িকার দুই ব্যক্তিত্বের অসাধারণ দুই মেরু-দূরত্বের স্বভাবকে চিত্রময় করেছেন।

গল্পের শেষের চিত্র আবার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবন-বাস্তবতার অসহায় দিককে pointing finger করে। লাবণ্যর শেষ চিত্রের সক্রিয়তায় অনিমেষ বিস্ময়ে দক। তার সঙ্গে লাবণ্যর উক্তি-প্রত্যুক্তির চিত্রখণ্ডটি এইরকম :

(বিনয়ের মন্তব্য শুনে) "অনিমেষও সহজ হবার চেষ্টা করে হেসে বলল... তবে তোমার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব কিন্তু বউদির। এমন পাকা অভিনেত্রীর ডিরেক্টরের দরকার হয় না। লাবণ্যর দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ : 'আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?' লাবণ্য স্থির দৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল; মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।"

মালতী মল্লিক পেশায় অভিনেত্রী। তার জীবন্ত অভিনয় অন্যের সংলাপ ব্যবহারের কৃত্রিমতা থেকে অকৃত্রিম শিল্পের সম্মান পায়। কিন্তু যে নিম্নবিত্ত এক গৃহজীবনের সমস্যা সামলানোর চিত্রে লাবণ্য তার স্থিতবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নির্বিকার কৌশল, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি দিয়ে উপস্থিত অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পায়, তা অনেক বধূর পক্ষে সম্ভবও হয়। তা পরিবার ন্যায়েই তৈরি হয়। তা একটি সংসারযাত্রায় একাধিক পোড়-খাওয়া গৃহবধূর ঠাণ্ডা মাথার রচনা। তার রূপ বাস্তব জীবনের যোগে জীবনেরই আর এক দিক। তা অভিনয়ের মতো কৃত্রিম নয়। মালতীর অভিনয়ের কৌশল এখানে খাটে না। সর্বশেষ লাবণ্যর ধরা গলায়, অশ্রু ছলছল চোখের নীচে ঠোঁটের হাসি অদ্ভুত এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার বিস্ময়কর দিক। বাড়িওয়ালাকে সরাতে পেরেছে সহজেই—এর কৃতিত্বে তার মনের চাপের যে relief, তাতে তার মুখে বিজয়িনীর হাসি থাকা

স্বাভাবিক। আর চোখে জল আনার মধ্যে তার অভিনয় করে অর্থ উপায়ের সংসার সাশ্রয়ের ব্যর্থতাজনিত বেদনার অভিব্যক্তিও থাকতে পারে। থাকতে পারে স্বামীর বন্ধুর উপস্থিতিতে এমন বাড়িওয়ালার কাছে নোংরা মিথ্যাচার-জনিত হীনম্মন্যতাবোধের গোপনতম প্রতিক্রিয়া! দুই বন্ধুর চোখে লাবণ্যর শেষ মুখাবয়বের ভাষা যে প্রশ্ন রাখে, তা রহস্যে এক অভিনেত্রীরই সফলতাকে ইঙ্গিতময় করে।

'অভিনেত্রী' গল্পের প্রকরণগত অবয়বে আরও কয়েকটি মানুষকে বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে সক্রিয় হতে দেখি। এরা হল মালতী মল্লিক, বিনয়, গোবিন্দবাবু, প্রযোজক বৈকুণ্ঠবাবু এমনকি অনিমেষও। সকলেই তাদের গৌণ কাজগুলি করে গেছে যথাযথ। মালতী মল্লিক সিনেমার অভিনেত্রীর টাইপ। তার পরিচালকের সঙ্গে ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময়, লাবণ্যকে ঈর্ষা, অভিনয়ের জন্য তাৎক্ষণিক অর্থলিপ্সা তার পেশা-জীবনের সম্যক অনুপন্থী। সে লাবণ্যর অভিনয়ের একটি contrast-এর কাজ করেছে গল্পে। বিনয় নিম্নবিত্ত পরিবারের এক সফল অসহায়, নির্বিরোধী পুরুষ চরিত্র। গোবিন্দবাবু সহানুভূতিশীল এবং লাবণ্যর কাছে বোকা-বনে-যাওয়া ভালো মানুষ বাড়িওয়ালা। অনিমেষ চরিত্র মূল গল্পের বাইরে থেকে লাবণ্যকে দেখিয়ে দিয়েছে। তার দেখা ও পাঠকদের দেখা একই। গল্পকার নিজে না উপস্থিত থেকে অনিমেষকে দিয়ে গল্পের ও পরিণামকে, চরিত্রের ভিতরের সত্তাকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তার আর কোনো কাজ বস্তুত অপ্রধান চরিত্রগুলি লাবণ্যর দুই সত্তার মধ্যে সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য সতি উল্লেখযোগ্য অবলম্বন।

'অভিনেত্রী' গল্পেও গল্পকারের দেশ ও কাল-চকিত জীবনকে দেখার গভীর দৃষ্টি সক্রিয়। লেখক-ব্যক্তিত্ব এসবের সমবায়েই পূর্ণ রূপ পেয়েছে। আগেও বলেছি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের ও তন্নিহিত বাস্তবতার একজন সফল রূপকার। পরিচিতের মধ্যে অপরিচয়ের রসে পরিচিতকে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকে, থাকে মানব্য-ভাবনার উজ্জ্বল স্বীকৃতি। 'অভিনেত্রী' গল্পে বিনয়-লাবণ্যর দাম্পত্যজীবন ও লাবণ্যর অভিনেত্রী হওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস লেখকের জীবনকে দেখার এক বিশেষ দৃষ্টি সামনে আনে।

গল্পের যেখানে বিনয়-লাবণ্যর নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসার পরিবেশে অসহায়তার ছবি, সেখানকার সমকালীন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভেঙেপড়া অর্থনীতির বাস্তবতার গেরুয়া রঙ চোখ থেকে সরে না। 'চোর', 'ঘুষ', 'চড়াই উৎরাই', 'এক পো দুধ ইত্যাদি গল্পের ভিন্ন স্বভাবে আঁকা বাস্তবতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য থেকেই যায়। অর্থাৎ পরিচিত সংসার, মানুষজন, তাদের জীবন ধারণ, যাপন ও সমস্যা, তাদের মেরুদণ্ড ভাঙা অবক্ষয়ের অর্থব্যবস্থা সবই নরেন্দ্রনাথের গল্পের শৈল্পিক বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে। 'অভিনেত্রী' গল্পে প্রথমেই গল্পকার এই বাস্তবতার নিপুণ চিত্র উপহার দিয়ে তা থেকে অভিনয় শিল্পের প্রসঙ্গে এসেছেন। লাবণ্যর সিনেমার অভিনয়ে আসার বাসনার জন্ম এই পারিবারিক অসহায় জীবন-বাস্তবতার কঠিন ভূমিতেই। সমগ্র গল্পে লাবণ্যর চরিত্রের দুই ভাগে আছে দু'পাশে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন স্বভাবের উপযোগী এক সমান্তরাল ভূমি। মাঝখানে যোজক হয়েছে তার অভিনয় প্রয়াস ও তার প্রয়াসের ব্যর্থতা ও নিষ্ফলত্ব। অভিনয় বাসনাও আর্থিক অবস্থার কিছু সুরাহার উপায় মাত্র। অর্থাৎ 'অভিনেত্রী' গল্পে আছে গল্পকারের জীবনকে দেখার সেই চিরন্তন বাস্তবতার ভূমি রচনা। ১. বাস্তবতা, ২. অভিনয় শিল্প—দুই দিয়ে জীবনকে যাচাই করতে চেয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ। এ-ও যেন এক পরীক্ষা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসার ও তার সদস্য লাবণ্যর জীবন নিয়ে। অভিনয় হল লাবণ্যর জীবনের মর্মমূল তুলে ধরার আর এক উপায়।

পেশার অভিনয়ে লাবণ্যর ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। অনিমেষের দৃষ্টি দিয়ে তার দুই অভিনয়কে দেখার যে অভিজ্ঞতা, তা-ই লাবণ্যকে আর এক মাত্রা দেয়। তার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের দিক দক্ষ পরিচালক অনিমেষ চৌধুরীর experiment, নিজের বাড়িতে বাড়িওয়ালাকে সামলানোর জন্য স্বামী ও অনিমেষের সামনে যে অভিনয়, তা কোনো বিশেষ পরিচালকের শেখানো নয়, তা লাবণ্যরই নিজের দৈনানুদৈনিক জীবনের গভীর তল থেকে উঠে-আসা এক উপস্থিত বুদ্ধির সফল পরিণাম। এই প্রয়াস বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় মানবজীবনের সঙ্গে যোগে জীবনের নিশ্চিত উপায়। এমন অভিনয় শিক্ষার গুরু এবং পরিচালকও পরোক্ষে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ ও তার বন্টন-বৈষম্যের অর্থনীতি। আমাদের বক্তব্য, "অভিনেত্রী' গল্পে চরিত্র ও পরিবেশগত

বাস্তবতা যেমন আছে, তেমনি আছে অভিনয় শিল্পের তত্ত্ব নিয়ে গল্পকারের কিছু সংযত প্রয়োগনির্ভর টীকা-ভাষ্য, কিছু ভাবনা। এ এরিস্টটল বলেছেন : Art is imitation। শিল্প যদি অনুকরণ হয় তা হলে জীবন সেই শিল্পের অনগত হয়ে অনকরণকেই সত্য করবে কিনা। অভিনয়ের মধ্যে অকৃত্রিম হয়ে-ওঠা, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের মধ্যে সেই অকৃত্রিম বিস্ময়কর অভিনয় কতটা কৃত্রিম অভিনয়ের উপায়কে বর্জন করে তার নিষ্ফলত্বকে, সীমাকে ধরিয়ে দেয়, লাবণ্যর দুই অভিনয়ে তারই পরিচয় মেলে। জীবননিষ্ঠ সংলাপ—যা অভিনেত্রীর মুখস্থ করা কৃত্রিম বিষয়, আবার ঘরোয়া এক বধূর বাস্তব জীবন থেকে সমস্যা-সংকটে তৈরি হওয়া সংলাপ—দুয়ের ব্যবহারে, প্রথমটিতে মালতী সফল, দ্বিতীয়টিতে লাবণ্য। গল্পে লাবণ্যর শেষ অভিনয় জীবনের সহজ স্বতোৎসারিত উপলব্ধি জড়ানো, মালতীর বাইরে থেকে চাপানো। লাবণ্য নিজে থেকে যেটা অভিনয় করে, তা তার জীবনেরই স্বাভাবিক উপকরণ। এই স্বাভাবিকত্বই আবার বাস্তবতা, তা পেশার অভিনয়ের মতো কৃত্রিমতায় অকৃত্রিম নয়।

পেশার অভিনয় জীবনের খোলস মাত্র, মুখের রঙ মুছলেই তার বিকৃত রূপ। জীবন সংসারের অভিনয় জীবনের এক ছায়া, তা জীবনের সঙ্গে চলে, জীবনের স্বভাবকে দেখায়, জীবনকে সচল করে। তা কখনো জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কখনো পিছনে ঠেলে দেয়। লাবণ্যর দ্বিতীয় অভিনয় তার বধূ জীবনের বহু-আচরিত দিক, তার অস্তিত্বের কোনো বিশেষ সংকট মোচনের সফল আয়ুধ। এখানে মালতীর অভিনয়ের কৃত্রিমতা তুচ্ছ, সম্পূর্ণ সংসারী মালতীর পক্ষে সেই প্রাণবন্ত স্বভাব দেখানো সব সময়ে সফল না-ও হতে পারে। এমন সব ভাবনায় 'অভিনেত্রী' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র শিল্পের বাস্তবতার মধ্যে অনুকরণগত অভিনয়ের বাস্তবতার লক্ষণীয় ভেদটিকে সচিত্র করেছেন। 'অভিনেত্রী' গল্পে লেখক-ব্যক্তিত্ব তাই এক বিস্ময়কর রহস্যময় শিল্প-চমৎকারিত্ব-সৃষ্টিকারী জিজ্ঞাসায় স্থির।

'অভিনেত্রী' গল্পে ভাবের একমুখিতা রক্ষায় গল্পকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, তাতে কিছু শিল্পগত শৈথিল্য থেকে গেছে। চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে লাবণ্যর পুত্র-স্বামীসহ ফিরে আসার আগে পর্যন্ত গল্পের অংশে অনাবশ্যক বিস্তার আছে। কাহিনীর এমন অতি

বিস্তার গল্পের সনেটের মতো বন্ধনের অনুপযুক্ত ভাবকেন্দ্রিক শিথিল-শরীর দেয়। মালতী মল্লিকের প্রসঙ্গটির প্রাথমিক সূচনা ঠিক, কিন্তু তা বিবৃতিমূলকতায় অতিকথনদুষ্ট। বিনয়দের বাড়ি পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত অংশটিরও একই ত্রুটি। প্রথম দিকে বিনয় লাবণ্যর নিম্নবিত্ত পরিবারের বিবর্ণ রূপাঙ্কন প্রয়াসে লেখকের সংযম থাকা উচিত ছিল।

আসলে মূল ভাবের দুটি দিক-পরিবারজীবন কেন্দ্রিক কঠিন বাস্তবতা ও অভিনয়ের দুই রূপের লক্ষণীয় প্রভেদ-চিত্র রচনা। অবশ্যই অভিনয়-জীবনভাবনা অনিমেষের মধ্যবিত্ত পরিবারের কঠোর বাস্তবতার সূত্রেই উঠে আসে। কিন্তু গল্পকার লাভ অভিনয় জীবনে আনতে গিয়ে এমন টানা বিবরণধর্মের মধ্যে গেছেন, যা গল্পের গতি করেছে কিছুটা মন্থর। বৃত্তান্তের প্রবণতা থাকায় গল্পটির মেদবাহুল্য ঘটেছে।

গল্পের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কিছুটা বিবৃতিমূলকতা থাকায় ইঙ্গিতধর্ম অস্বীকত। একেবারে পরিণামী বাক্যগুলিতে লাবণ্য চরিত্র নির্দেশক ইঙ্গিতধর্ম থাকায় শেষের অভিজ্ঞতা শিল্পসার্থক। আগের বিনোদ-লাবণ্যর বিন্তুকে নিয়ে রচিত সংসারচিত্র—যার দ্রষ্টা অনিমেষ স্বয়ং—তার তুলনায় বাড়িওয়ালা গোবিন্দবাবুকে নিয়ে বিনোদ ও প্রধানত লাবণ্যর অভিনয় চিত্র অনেক প্রাণবন্ত। এই চিত্রের সংযম, সংক্ষিপ্তি, তীব্র গতিময়তা, মানবতাবোধ সমগ্র গল্পের শেষার্ধের অন্যতম শিল্পসম্পদ।

'অভিনেত্রী' গল্পের ভাষা একাধিক ক্ষেত্রে 'ন্যারেটিভ'। এই ন্যারেটিভ স্টাইল গল্পকারকে অতিকথনে অভ্যস্ত করে, বলা যায় বাধ্য করে। গদ্যভাষার বিবরণধর্ম নয়, ভাবের একমুখিতা রক্ষিত হয়েছে লাবণ্য চরিত্র ধরেই। বিবরণের মূলে অনিমেষের সক্রিয়তা স্পষ্ট, কিন্তু 'অভিনেত্রী'র দুই তাৎপর্য লাবণ্য চরিত্রে ধরতে গিয়ে অনিমেষ নয়, লাবণ্যই স্বয়ং গল্পের প্রধান চরিত্র হয়েছে। তার সক্রিয়তাই গল্পের মূল গতিনির্দেশক। লাবণ্যর অভিনেত্রী সত্তাটি নিম্ন-মধ্যবিত্তের কঠিন বাস্তবতার যোগেই হয়েছে বিস্ময়কর। গল্পের প্রকরণ বৈচিত্র্যে যে সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে একা লাবণ্যর দায়িত্বই সর্বাধিক। নিজে পেশায় অভিনেত্রী না হয়েও লাবণ্য মালতীর মতো এক সফল অভিনেত্রী সম্পর্কে এমন কথা বলার সাহস পায় :

'লাবণ্য স্থির দৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল; মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না। এ যেন প্রখ্যাত এক জাত অভিনেত্রীকে অপেশাদার, সংসার রঙ্গমঞ্চের সফল অভিনেত্রীর চ্যালেঞ্জ জানান। এই 'চ্যালেঞ্জ' তার শক্তি, সাহস, তার জীবনযুদ্ধের স্বপক্ষের সত্যভাষণ। তা অভিনয় নয়, অভিজ্ঞতার অভিনবত্বে অভিনয়ের থেকেও বড় জীবন উপলব্ধি। শেষতম বাক্যে লাবণ্যর চোখে জল ও ঠোঁটে হাসি—একই ভাবের ভূমিতে দু'য়ের এমন ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রয়োগ ও চিত্রধর্ম গল্পের প্রকরণগত সৌকর্যকে শিল্প-সম্মান দেয়। এখানে গল্পকার তার শিল্পস্বভাব-অনুগ অনুভবের গল্পের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন।

গল্পের নাম যখন 'অভিনেত্রী' তখন স্পষ্টই বোঝা যায় এমন নাম ব্যবহার গল্পের চরিত্র ধরেই ব্যঞ্জনার অনুবর্তী। কিন্তু 'অভিনেত্রী' নাম চরিত্রের পেশা ধরে তাৎপর্য পায়, ব্যক্তিনামে নয়। আবার 'অভিনেত্রী' গল্পে একজন আছে আপাতত শখের অভিনেত্রী অনিমেষ চৌধুরীর বন্ধু বিনয়ের স্ত্রী লাবণ্য। অভিনেত্রীর দুই স্বভাবে এবং স্বভাবের সার্থক বৈপরীত্যে দুই রমণী গল্পের নামের মধ্যে ভিন্ন মাত্রা এনেছে। পেশার অভিনয়ে কৃতী হওয়া, আর অপেশাদার হয়ে অভিনয়ের প্রয়াসে ব্যর্থতার বোঝা ও যন্ত্রণা বহন করা দুই অর্থের চরিত্রনির্ভর চমৎকারিত্বে গল্পের দই চরিত্র যথাক্রমে মালতী এবং লাবণ্য যে গুরুত্ব পায়, তাতে নামের শিল্প-মহিমা প্রাথমিকভাবে মেনে নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, গল্পের পরিণামী লক্ষ্য ধরলে মালতী মল্লিক গল্পনামে আদৌ গুরুত্ব পায় না। লেখকের লক্ষ্য লাবণ্যই—গল্পের মূল ভাববস্তুর দিক থেকে সেখানে লাবণ্যর দুই ধারার অভিনয় করার প্রয়াস ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। লাবণ্য কোনোদিনই অভিনয় করানো নিম্নবিত্ত পরিবারের সংসার-জীবনযাত্রা ও তার ক্লেদাক্ত দিকের জ্বালা-যন্ত্রণাকে মেনে নিয়ে জীবন যাপন—সেখানে অভিনয় নেই। পরিচালক অনিমেষ চৌধুরীর লাবণ্যকে ও তার সাংসারিক অসহায় অবস্থাকে দেখে তার সদ্য পরিচালিত চিত্রের কোনো সিচুয়েশনে লাবণ্যকে হুবহু খাপ খাওয়ানো যাবে ভেবেই লাবণ্যকেই অভিনেত্রী বানানোর স্বপ্ন দেখেছে। অর্থ কম লাগবে আর লাবণ্যও তার জীবনের সঙ্গে অভিনীত

বিষয়ের গুঢ় সাদৃশ্যে চলচ্চিত্রের মর্যাদা বাড়াবে—তা-ই ভেবেছে। কিন্তু স্টুডিওয় লাবণ্য কৃত্রিম সংলাপের অভিনয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ বাড়িওয়ালা গোবিন্দবাবুর সামনে অসাধারণ অভিনয় করে যায় রূঢ় বাস্তব সত্যকে মিথ্যা দিয়ে বানানোর প্রয়াসে। এখানে সে স্বতঃস্ফূর্ত। তাই অভিনয় কলার দুই বৈশিষ্ট্য প্রয়াোগে লাবণ্যর প্রয়াসে আছে অভিনয় শিল্পের মৌল সত্য—যা লেখকেরই নিরীক্ষার বিষয়। এই ব্যাখ্যায় গল্পের এমন নাম ব্যাপক ব্যঞ্জনার উপযোগী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, গল্পের নামে গল্পকার স্টুডিওয় অন্যের লিখে দেওয়া সংলাপে ও বানানো সিচুয়েশনে এক অভিনয়-ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করেছেন। তার কৃত্রিমতার পাশে লাবণ্যরা দরিদ্র, জীবনেরই অকৃত্রিম চলন ধর্ম থেকে জাত মিথ্যাকে সত্য করার আপ্রাণ নিখুঁত অভিনয়ে লিপ্ত হওয়ায় লাবণ্যর জীবন-স্বভাবকে এক বিস্ময়কর শিল্প মর্যাদা দিয়েছেন গল্পকার। বস্তুত জীবন সংসারে সকলেই ব্যাপক অর্থেনট ও নটী। জীবন-মঞ্চেও আমরা সকলেই বাঁচার জন্য অভিনয় করে যাই। সে অভিনয় বড় দর্শনকে দেখায়। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনব্যবস্থা যখন প্রত্যক্ষত সমাজনির্ভর, অর্থনীতির বণ্টন-বৈষম্যে পর্যদস্ত, তখন সেই ছোট জীবনকে সামলাতে গিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ছাোটখাটো অভিনয় দিয়ে সামলাতে হয়। লাবণ্য তা-ই করেছে। সে গোবিন্দবাবুর সামনে তার উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল ও সপ্রতিভ স্বভাব দিয়ে পারিবারিক অসৌজন্যকর অসহায় অবস্থাকে সামাল দিয়েছে। এখানে সে যথার্থ অভিনেত্রী। সে অভিনয় জীবনেরই ভিতর থেকে উঠে আসা একাধিক বিচিত্র সমাজ ও পারিবারিক অভিজ্ঞতারই এক শিক্ষা। বস্তুত এটা অভিনয় নয়, লাবণ্যর নিম্নবিত্ত সংসার জীবনেরই অঙ্গ। অনিমেষ চৌধুরীর কাছে তা অভিনয় মনে হতে পারে, কিন্তু তা অকৃত্রিম, সহজ, সরল জীবনপ্রকাশই! অভিনয় শব্দের প্রয়োগে জীবন-মঞ্চ ও সংসারী-নটীর তাৎপর্যে গঙ্গনাম বড় ব্যঞ্জনা পায়। স্টুডিও ক্যামেরার সামনে বসে লাবণ্য চোখে জল এতটুকুও আনতে পারেনি, অথচ গোবিন্দবাবু চলে গেলে তার মিথ্যা অভিনয়ের শেষে গলা ধরে যায় ছল ছল দু'চোখের প্রভাবে। সেই সঙ্গে দু'ঠোটে হাসি লেগে থাকে। এভাবে সেই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়—যা একই সঙ্গে সহ অভাব মেটানোর সুযোগ হারানোর কষ্ট ও গোবিন্দবাবুকে

সামলাতে পারার বিজয়ী এক হয়ে যায়। এই অভিনেত্রী লাবণ্য একেবারে নতুন, জীবনের নিখুঁত যোগে মালতীতে হারিয়ে দিতে একান্ত সক্ষম। গল্পের নামে এমন বিচিত্র স্বভাবেরই দ্যোতনা।

চতুর্থত, যে কথা আমরা আগেও বলেছি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পের মধ্যে অভিনয় কলার দিক নিয়ে এক টীকা-ভাষ্য রচনায় আগ্রহী তত্ত্বের দিক থেকে। অভিনয় যদি বাস্তব জীবনের অনুকরণ হয়, তা হলে ব্যবহারিক সত্য জীবনে যে অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা তার সঙ্গে অন্যের শেখানো বুলি দিয়ে কৃত্রিম অভিনয়ে বিষয়কে অকৃত্রিম করার প্রয়াসের মধ্যে তফাত কোথায় ? এই মৌল প্রশ্ন দুই চরিত্র মালতী ও লাবণ্য প্রসঙ্গে উঠে আসে। মালতীর অভিনয়ে তার কণ্ঠে ও চোখে কৃত্রিম অশ্রু, তাতেই বৈকুণ্ঠ পোদ্দার ও অন্য দর্শকদের চোখে করুণ সজল ভাব। অন্যদিকে লাবণ্যর নিজেরই বাড়িতে অভিনয়ে অন্যদের চোখে জল নেই, নিজেরই চোখে জল, কণ্ঠ ভারী। এই দুয়ের মধ্যে অভিনয়-তত্ত্বের মূলগত প্রভেদ। 'অভিনেত্রী' এমন নামে দুই তত্ত্বই প্রধান হয়। লাবণ্য শেষে বলেছে :

'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।' আবার মালতী ডিরেক্টর অনিমেষ চৌধুরীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে : 'আপনি শত হলেও ওর পালক বাপ, আমি ওর সাক্ষাৎ মা। কি করতে হবে না হবে, আমার চেয়ে বেশি জানেন নাকি আপনি। এই উক্তিতেও অভিনয়ের বড় দিক ধরা পড়ে। আসলে অভিনয় জীবন্ত হয়ে ওঠার মধ্যে বাস্তব জীবন-স্বভাবের প্রয়োগ যে স্বাদ দেয়, যতই জীবন্ত হোক অভিনেত্রীর কৃত্রিমতা থেকে অকৃত্রিম অভিনয় স্বভাবে—একটা সূক্ষ্ম সীমা থেকেই যায়। দুটিই অবশ্য গুরুত্বে সমান—একটি শিল্পের জীবন—যা মালতীর, আর একটি জীবনের শিল্প—যা লাবণ্যর। দুই অভিনেত্রীর দুই তত্ত্ব গল্পনামে অসাধারণ সার্থকতা পেয়েছে তত্ত্বের সুক্ষ্ম টীকা-ভাষ্যে। গল্পনামের চমৎকারিত্ব অসামান্য নিশ্চয়ই।

১৪.২ রাণু যদি না হতো

তেরোশো ষাট সাল, অর্থাৎ ইংরেজি উনিশশো তিপ্পান্ন সালের দোল সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পত্রস্থ হয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রাণ যদি না হতো’ গল্পটি। গল্পটিতে সমকালীন একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের করুণ চিত্র আছে। তেমন একটি পরিবারে বয়সে ছোট-বড় হিসেবে সদস্য সংখ্যা মোট ছ'জন—বাবা হেমাদ বোস, মা কমলা, বড় মেয়ে গল্পের নায়িকা রাণ, ছোট মেয়ে বল, আর দুই পুত্র-বন্ধু, বন্ধু। এই অযনো অসাচ্ছল্যে প্রায় পঙ্গু সংসারে আছে অভাবের মধ্যেও পারিবারিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য পরস্পরের মধ্যে, যদিও প্রায়ই খাওয়া-দাওয়া, অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র্য, অভাব নিয়ে ছাোটখাটো অশান্তি, অসুবিধে, অস্বস্তি লেগেই থাকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই পরিবার-চিত্রের বাস্তবতার মধ্যে গল্পের নায়িকা করেছেন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সংসারের সতেরো বছরের বড় মেয়ে রাণুকে। তার নিঃসঙ্গ অনুভূতি, জিজ্ঞাসা দিয়ে গল্পকার মূলত এই পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের জন্ম ও সেই সূত্রে জীবনের অস্তিত্বের মূল্যায়নে নিবিষ্ট থেকেছেন। গল্পের মূল ভাববস্তুকে অনেকটা ব্যাখ্যার মতো উপস্থাপিত করেছেন চরিত্র ও ঘটনার ন্যায়ে, কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে। 'রাণু যদি না হ’তো’ গল্পটি আকারে বেশ ছোট এবং এর কাহিনী অংশও ছোট মাপে গল্পে গৃহীত। গল্পের শুরু বুড়ো ডাক্তার শ্রীপতি দত্তের অনেক দিনের পুরনো ডিসপেনসারির একটি চেয়ারে অপেক্ষমাণ রাণুর বিরক্তিকর মানসিকতা দিয়ে। রাণুর বাবা-মার, ওর ঠাকুর্দার আমল থেকে খুবই পরিচিত এই ডাক্তার। তারা অসুখ-বিসুখে এই ডাক্তার ছাড়া অন্য কাউকে দেখায় না। রাণু কলেজ থেকে ফেরার পথে বিকেলের দিকে এসেছে অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ নিতে। কলেজ যাওয়ার পথে রাণু পুরনো কম্পাউন্ডার ফটিকবাবুকে বলে গিয়েছিল মায়ের জন্য ওষুধ তৈরি করে রাখতে, ফেরার পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন ফটিকবাবু কাজে বাইরে চলে যাওয়ায় এবং মায়ের ওষুধ কথামতো তৈরি করে না রাখায় বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতে, এমন ফাল্গুনের বিকেল তার কাছে নষ্ট হবার উপক্রম। ফেরার পথে রাণু বান্ধবী হেনার বাড়ি যায় হেনার মাসতুতো ভাই, এম.এ পাস, চাকরিরত তেইশ বছরের

যুবক সুনীলের সঙ্গে একবার অন্তত দেখা করার জন্য। সুনীল তার বছর দেড়েক সময়ের গোপন প্রেমিক।

সাড়ে পাঁচটাতেও ফটিকবাবু না আসায় বিরক্ত রাণু কেবিনের আড়ালে অন্তঃস্বত্ত্বা এক রোগিণীকে দেখতে ব্যস্ত ডাক্তারবাবুর বুড়ি দাই মা সারদার কাছে তার খোঁজ নেয়। তাতেই দাই মা সারদা রাণুকে কেবিনের মধ্যে বসিয়ে সস্নেহে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। অন্তঃস্বত্ত্বা মেয়েটি চলে গেলে সারদা দাই সবিস্তারে রাণুর সতেরো বছর আগে তার হাতেই জন্ম হওয়ার কাহিনী বেশ রসিয়ে গল্প করে রাণুর দিক থেকেই জানার জন্যে অদম্য কৌতুহলের সূত্র ধরে। তাতেই রাণু আভাসে-ইঙ্গিতে জানতে পারে তার বাবা মা তাকে পথিবীতে সে সময়ে কিছুতেই আসতে দিতে চায়নি। অন্য এক ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে তাকে জন্মাবার আগেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল ভূণ অবস্থায়। শ্রীপতি ডাক্তার ও সারদার দাইমার তৎপরতায় তা বন্ধ হয়। রাণুর জন্ম হয় খুব কষ্টের মধ্যে। রাণুর জন্ম তারা চায়নি, কারণ সংসারের একটি সন্তান মানুষ করার মতো অর্থের অভাব। বাবা তো তখন বেকার, সেই অল্পবয়সে তারা সন্তানের দায়িত্ব নিতেও অক্ষম। তাছাড়া হেমাঙ্গর ইচ্ছে ছিল রাণুর মাকে বি.এ. পাস করানোর। সন্তান থাকলে তাতেও অসুবিধে এসবের কারণেই তারা রাণুর জন্ম বন্ধ করতে চেয়েছিল অন্য উপায়ে।

এই কথা জানার পর রাণু, ডাক্তারখানা থেকে সেদিন—শেষে মায়ের মিক্সচার। ফটিকবাবুর কাছ থেকে নিয়ে, আর কোথাও না গিয়ে সোজা বাড়ি চলে আসে। দুঃখে অভিমানে নিজের ঘরে বিছানা নেয়—যা এর আগের কোনোদিন সে করেনি। তার নিজেকে বার বার বীতস্পৃহ, বিদ্বেষপ্রসূত প্রশ্ন, তার এমন জন্মের মূল্য কী? এখন তার মনে হয় বাবা তার খুনি, তার মায়ের দিকেও যেন তাকাবার প্রবৃত্তি নেই। আজকের প্রেমিক সুনীলের সঙ্গে ভালোবাসাও হত না, যদি সে না জন্মাত। তার চারপাশের বাবা মা থেকে সকলেরই সম্পর্ক, স্নেহ দয়া মায়া সবই যেন ভান, মিথ্যে! কিন্তু ক্রমশ এই ধারণা যে ভুল সেই অভিজ্ঞতা আসে, যখন সে দেখে, তার অসুস্থ মা বন্ধু- রঙ্কুদের রাগের মাথায় গালাগাল দিয়েও, বাবার এমনভাবে এত সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য

বিরক্তি প্রকাশ করেও, চরম দুঃখে-কষ্টে নিজের বন্ধ্যা থাকাটাই শ্রেয় বলে ঘোষণা করেও, এমনকি রাণুর প্রশ্নের উত্তরে তার জন্ম না হলে মা খুশি হত বলেও, শেষে হেসে ওঠে। শীর্ণ মুখের শুকনো ঠোঁটের সেই সুধাস্নিগ্ধ হাসি, রাণুর রাতের খাবার খেয়ে নেওয়ার জন্য মায়ের সস্নেহ নির্দেশ, শেষে ওদের বাড়ি সুনীলের আসা, মায়ের সঙ্গে গল্প-করা, মায়ের সুনীলকে পছন্দ হয়ে যাওয়ার কথা তার মন সমস্ত শূন্যতা কাটিয়ে জীবনের দিকে ফেরে। অস্তিত্বের, পৃথিবীতে জন্ম-নেওয়ার গুরুত্ব সে অবলীলায় অনুভব করে। পৃথিবীর ওপর তারায় ভরা বিরাট আকাশ দেখে রাণু পৃথিবীকে ভালোবাসায় স্থিত-প্রতিজ্ঞ হয়ে যায়। এক প্রতীকী অনুভব দিয়ে গল্পের শেষ এখানেই।

আলোচ্য গল্পটির শ্রেণীনির্ণয়ে কিছু সমস্যা থেকে যায়। একে নিশ্চয়ই সমাজ-সমস্যার, বা মনস্তাত্ত্বিক অথবা রোমান্টিক গল্পের শ্রেণীতে রাখা যায়। দার্শনিক গল্পের বৈশিষ্ট্য আছে গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে। আবার কেবল রাণুর চরিত্র ধরে গল্পটির বিচারে বসলে চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতেও রাখা যেতে পারে বলে সন্দেহ হয়। চরিত্রাত্মক গল্পে থাকে মনস্তত্ত্ব, সামাজিক ও নরনারীর সমস্যা। একটি বিশেষ চরিত্রের গোপনতম চিত্ত ভাবনার স্বাতন্ত্র, তার ক্রমিক আবরণ উন্মোচন ও প্রসারণ এবং শেষে এক অজানা বোধের অনালোকিত জগৎকে সেই চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করার প্রয়াসেই এই শ্রেণীর গল্পের শেষ হতে দেখা যায়। 'রাণু যদি না হ'তো' গল্পে এই চরিত্রাত্মক গল্পের দিকের টান বা ভারই বেশি, কিন্তু একটি লেখক চিন্তিত দার্শনিক বক্তব্যও চরিত্রের শেষ অনুভূতি থেকে উঠে আসে। শ্রেণীনির্ণয়ের সমস্যা এই চরিত্র ও বিষয়ের দ্বিধাবিভক্ত উপস্থাপনাতেই সামনে আসে। আমাদের মতে উপরি-উক্ত দুই রীতির মিশ্রণেই এই গল্পের বিশেষ শ্রেণীচরিত্র মান্য। গল্পটি অবশ্যই চরিত্রাত্মক, কিন্তু সতম ব্যঞ্জনায় আছে এক জটিল দার্শনিক জিজ্ঞাসার প্রশ্রয়।

গল্পের প্লটের যে সামান্য কাহিনী-অংশ, তার দুটি ভাগ—প্রথমদিকে সতেরো বছরের কলেজে পড়া দ্বিতীয় বর্ষের তরুণী ছাত্রী রাণুর পরিচয়, কৌতুহল, জিজ্ঞাসা, প্রেমিক সম্পর্কে আকর্ষণ ও বাবা-মায়ের সতেরো বছরের একটি জটিল অবস্থার কাহিনীবিন্যাস—যার সঙ্গে রাণুর জন্মের যোগ নিবিড়; দ্বিতীয়াংশে রাণুর জীবন ও

পৃথিবীর বুকে নিজের জন্ম হওয়ার অধিকার নিয়ে জিজ্ঞাসার সমাধান। পরিষ্কার দুই অংশে কাহিনীর বিন্যাসে কোনো ফাঁক নেই। অবশ্যই প্লটের বৈশিষ্ট্যে রাণুর একান্তভাবে নিজের জীবন-কথা ও পরে নিজের জন্ম বিষয়ে বিরক্তি থেকে বড় আকাঙ্ক্ষায় জীবনমুখী হওয়ার গল্প জট পাকায়। লক্ষণীয়, এর সঙ্গে আছে রাণুর মা-বাবার প্রথম বিবাহিত জীবনের সন্তান রাণুর জন্ম হওয়া-না-হওয়া নিয়ে আর এক কাহিনী-আভাস।

অর্থাৎ রাণুর সুনীলকে ভালবাসার সামান্য কাহিনী-আভাসের মধ্যে নিবিড় হয়ে আছে সারদা দাইয়ের বলা আর এক কাহিনী—রাণুর বাবা-মায়ের। শেষে পারিবারিক অর্থনৈতিক অসহায়তার চিত্রে, তার দুঃখকর প্রতিক্রিয়ার চিত্রে রাণুর নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বেরিয়ে আসা! ছোট ছোট কাহিনী-আভাসকে জোড়া লাগিয়ে অবশ্যই একমাত্র রাণুরই চরিত্রসূত্র ধরে, গল্পকার কাহিনীর সময়সীমা চিহ্নিত করেছেন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত পর্যন্ত। আসলে রাণুর মানসভূমির তীব্র আলোড়ন ও সেই আলোড়ন অপসারিত হয়ে রাণুর চিত্তচাঞ্চল্যের স্থিরতা—দুই দিক ধরেই গল্পের প্লট-বৃত্তের অবয়ব এক-চরিত্র-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। গল্পে প্লটের জটিলতা থেকে বড় হয়েছে চরিত্রের মনোভূমির লক্ষণীয় আলোড়ন। রাণুই তার একমাত্র কেন্দ্রীয় ভিত।

'রাণু যদি না হ'তো' গল্পে ছোট পরিসরে আছে 'মহামুহূর্ত' রচনার উপযোগী সিচুয়েশন। এই গল্পটি ঘটনাশ্রয়ী নয়, নয় কোনো চরিত্রের প্রকাশমূলক, আসলে চরিত্রের মনোলোকে ধরা একটি বিশেষ ভাব বার বার প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে, সরে গিয়ে, আবার এসে মহামুহুর্ত-চিত্রটিকে দিয়েছে গতির তীব্রতা, ক্রান্তিরেখার 'হাঁ'-'না'-এর হস্য। গল্পের মহামুহুর্তে'র চিত্রটি রাণু ও তার মায়ের সঙ্গে সংলাপ-বিনিময়ে ধরা পড়ে:

'রাণুর মা বলল, ... এখন মরলেই আমার হাড় জুড়োয়। যতদিন থাকব, সবগুলি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যন্ত্রণা আর সয় না। এর চেয়ে সাতজন্ম বাঁজা হয়ে থাকাও ভালো বাপু।'

রাণু ডাকল, 'মা'।

"কি রে,"

‘আচ্ছা তুমি যে ও কথাগুলো বললে তা কি সত্যি? ’

হতুম, আমরা যদি না হতুম তাহলে তোমাদের কি সত্যিই ভালো লাগত? ‘ও সেকথা বুঝি তোমার কানে গেছে। লাগতই তো, খুব ভালো লাগত।

বলে রাণুর মা ফিক করে হেসে ফেলল। এই যে ছেলেমেয়েদের জন্মের ওপর রাণুর মায়ের রাগ, অভিশাপের মতো কথা প্রয়োগ শেষে নিজের বন্ধ্যা জীবনকেই শ্রেয় বলে ঘোষণার পাশাপাশি রাণুর জিজ্ঞাসার কাছে শীর্ণ মুখের শুকনো ঠোঁটের কোণে সুখস্নিগ্ধ মধুর স্বতঃস্ফূর্ত হাসি ফুটে ওঠা—এর মধ্যেই ‘চরমক্ষণের’ রুদ্ধশ্বাস এক আবহাওয়া স্থির হয়ে থাকে। এর পরেই ঘটেছে রাণুর জীবনের দিকে ফিরে আসার, তার ভাবনার গভীরে জন্ম হওয়া চরিতার্থতার দিক। রাণুর কৌতূহলে, জিজ্ঞাসায় মায়ের যে স্বীকারোক্তি ও তাকে লঘুতায় জীবন্ত করার মতো মনোভঙ্গিতেই গল্পের বহিরঙ্গের মোড় ফেরানোর চিত্র। কিন্তু গল্পের শেষেই আছে পরম মুহূর্ত-বিন্দুর মধ্যেকার ‘সিন্ধুর স্বাদ’!

‘রাণু যদি না হতো’ গল্পে বিশেষ ভাবাশ্রয়িতা গুরত্ব পেয়েছে বেশি, কিন্তু রাণুর চরিত্র, তার বাবা হেমাঙ্গ ও মা কমলার খণ্ডচিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চরিত্র আঁকার দক্ষতা প্রমাণ করে। রাণুর কৌতূহল-দীপ্ত মনোলোকের একাধিক জিজ্ঞাসাই গল্পের গতি আনে। বয়সে সতেরো বছরের তরুণী রাণুর মধ্যে আছে সহজ রোমান্টিকতা। সে মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ অভিজ্ঞতার মেয়ে। জটিল কোনো জিজ্ঞাসা তার মধ্যে দেখা দিলেও তার সমাধানে সে সহজে আগ্রহী হতে পারে না। তার বয়সের অভিজ্ঞতা তাকে চূড়ান্ত রোমান্টিক করতে পারে, বড় জীবন উপলব্ধির গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। অথচ তাকে দিয়েই গল্পকার জন্ম, জীবন নিয়ে গূঢ় প্রশ্ন ও পার্থিব জগতে মানুষের অস্তিত্বের বিচারণার দিক দেখাতে চেয়েছেন। চরিত্র ন্যায়ে কিছুটা ‘রসাভাস-দোষ’ ঘটেছে বলে মনে হতে পারে।।

রাণুর মনের যেটুকু maturity, তা ধরা পড়ে সারদা দাই-য়ের বলা তার বাবা-মার কাহিনীর প্রতিক্রিয়ায় বাড়ি ফিরে মায়ের মধ্যে দেখা একই সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার করুণ চিত্রের মধ্যে! রাণু বাবা-মায়ের সংসারের দারিদ্র্যের মধ্যে এতগুলি ভাইবোন দেখে, বাবা-মায়ের অসহায়তা উপলব্ধি করে মায়ের সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে তার সতেরো

বছর আগেকার কোনো অপরাধের স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পায়নি। বাবা-মা যে অসহায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই সেদিন রাণুর মতো সন্তানকে চায়নি, ক্রমে ছেলেমেয়েদের কাছের করতে হিমসিম খাচ্ছে তা বুঝে নিজেকে চিন্তার ভার থেকে মুক্ত করে নেয়। স্বস্তির মধ্যে চলে আসে। বাবা-মার প্রতি সমস্ত বিরূপতা সরে যায়।

গল্পে রাণুর সর্বশেষ আন্তর অনুভূতির দিক বাবা-মার প্রতি, সংসারের প্রতি আকর্ষণে জীবনকে গভীর প্রীতিতে দেখার দৃষ্টি তৈরি করে তার প্রতিদিনের সংসার। আবার পাশাপাশি সুনীলের প্রসঙ্গ মায়ের কাছে শুনে আর এক রোমান্টিক মনের বিস্তারে নিজেকে যেনবা সে হারিয়ে ফেলে। পরিবারের প্রতি মমতা ও মানবিকতায় ভালোবাসা এবং সুনীলের প্রতি প্রেম—দুই দিয়ে পৃথিবীর প্রেমাকর্ষণকে ছোট পরিসরে বড় ব্যঞ্জনায় দেখাতে সচেষ্ট গল্পকার। তার শুধু জন্ম নয়, জন্ম হওয়ার পর পার্থিব অস্তিত্বের মূল্যায়নে রাণ সে জীবনে প্রেমের মাধুর্যকে অনেক বড় করে অনুভব করে। রাণুর এই অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্নভাবে জীবনপ্রেমের দর্শনকে ঘোষণা করে। “রাণু যদি না হ’তো’ গল্প জীবনের গল্প, জীবনপ্রেমের গল্প এবং তা অনুভবের গল্পও—সে অনুভব সত্য, শাশ্বত এবং পৃথিবী ও জীবন মেলানো এক প্রান্তরের মধ্যেকার দিগন্ত প্রসারী বিষয়।

ছোট পরিসরে রাণুর বাবা হেমাঙ্গ হয়ে ওঠে তার দরিদ্র পরিবারের, বেকার জীবনের victim, তা তার স্ত্রী কমলারও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিক। অল্প বয়সে তারা সন্তান চায়নি। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে। কিন্তু সন্তান জন্মের পর তারা সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহে, অসহায় ভাবনায়, তাদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে থেকে বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ। সন্তানের নিরাপত্তা ও পরিবার-নির্ভর জীবন-ব্যবস্থায় তারা অন্যদিকে মুখ ফেরায়নি। তাদের মানসিকতা বোধ তাদের সংগ্রামমুখর জীবনপ্রেমেরই অভিজ্ঞান। রাণুর জন্য হেমাঙ্গর অফিস থেকে ফেরার পর দুশ্চিন্তা, মায়ের দিক থেকে রাণুকে খাওয়ানোর জন্য সস্নেহ উৎকণ্ঠা ও অনুরোধ এবং সুনীলের কথা বলে রাণুকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা সবই বাবা-মায়ের যেমন জীবনপ্রেমেরই প্রমাণ, তেমনি সংসারের মানবিক প্রয়োজনের দিকগুলিরও স্বাভাবিক স্বীকৃতিদান। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত

পরিবারের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সীমা চিহ্নিত করে তার মধ্যে একে একে তারই অনুগ যেমন চরিত্র এনেছেন, তেমনি তাদের মানবিক গুণগুলির সচিত্র স্বভাব-পরিচয় দিয়ে মানবতাকেই বড় করেছেন। রাণুর বাবা-মা চরিত্র দুটি গল্পে গৌণ হলেও চিত্রের ধর্ম থেকে প্লটের অন্তর্নিহিত স্বভাব-বেগে বরং তারা চরিত্রই হয়ে উঠেছে।

ইংরেজি পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে এই গল্প লিখতে বসে গল্পকার যুদ্ধোত্তর সেই সমাজ-ভাঙনকে পরিবার-জীবন চিত্রে প্রত্যক্ষভাবে আঁকেননি ঠিকই, কিন্তু ভেঙে পড়া, বুর্জোয়া অর্থনীতির স্বভাবে অবক্ষয়িত সমাজ ও তথা মধ্যবিত্ত পরিবার-জীবনকে পাশে সরিয়েও রাখেননি। তারই পটে এক তরুণীর রোমান্টিক মনের অভীপ্সার মানবজন্মের মূল সত্যকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। সারদা দাইয়ের কাছে নিস্পাপ মনে যে কথা সে জেনেছে বাবা-মার সম্পর্কে এবং যে কথার মধ্যে রাণুই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, সেই কথার তাৎপর্যেই রাণুর যন্ত্রণাদিগ্ধ মানস পরিবর্তনের সূচনা গল্পের মধ্যে আছে। এবং সেখান থেকেই গল্পকারের মনোলোক জাত একধরনের আত্মঅন্বেষণের পরিচয় মেলে।।

শ্রীপতি দত্তের ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে আসার পরেই গল্পকার রাণুর চিন্তার মধ্যে এক গভীর অভিমানে যে বিষয়টি pointing finger-এর মতো যোগ করেছেন তা রাণুরই ভাবনার ভাষায়:

‘তার মনে হল, এই পৃথিবীতে সে জোর করে এসেছে। তার আসবার কোন কথা ছিল না। তাকে কেউ চায়নি। সে যাতে না আসে তার জন্যেই সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কি হত যদি সে না হত, যদি সে না আসত।’ বস্তুত এই চিন্তা শুধু এক তরুণীর অনভিজ্ঞ রোমান্টিক মনের ভাবনার বিলাস নয়, এর জিজ্ঞাসার ভিতে আছে গূঢ় জীবনদর্শনের ব্যঞ্জনা। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ে এখানেই ধরা পড়ে সর্বকালের মানুষের আত্ম-অনুসন্ধিৎসার জটিল জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতই সমাধানহীন এক গভীর শূন্যতা তৈরি করে দেয় রাণুর মনে।

‘...আজকের রাণু আর অন্য দিনের রাণু সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের রাণু আর পুরোপুরি এ পৃথিবীর মেয়ে নয়, এমন এক জগতের যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই।’

অবশ্যই এক তরুণীর রোমান্টিক জিজ্ঞাসায় যে শূন্যতার জগতের দিকে গল্পকার অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, সেই শূন্যতার দিক থেকেই আঙুল সরিয়ে তিনি নায়িকাকে জীবন পূর্ণতার দিকেই শেষ জিজ্ঞাসার আঙুলটিকে স্থির রেখে গল্প শেষ করেছেন। জীবন-পূর্ণতার চিত্রে প্রথমে গল্পকার রাণুর দৃষ্টিতে তার মাকে করেছেন মাতৃত্ববাসনা-হীন মা, বাবাকে করেছেন একজন হিংস্র খুনি। রাণুর দ্বেষ ও জিঘাংসায় বাবার সঙ্গে এক অনন্বয়বোধে করুণ হয়ে ওঠে মন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনকে দেখার দৃষ্টি যেহেতু positive, মৃত্তিকা প্রেমের সত্যে পরিশীলিত, তাই রাণুর দৃষ্টি পরিবার-জীবনপটেই বদলাতে থাকে। বাবা-মার বর্তমান স্নেহ মায়া-মমতাকে মনে হয়েছে ভান, মিথ্যা তার আকস্মিক বেঁচে থাকার অস্তিত্বের পক্ষে, বাবা মার সতেরো বছর আগেকার তার এমন সুন্দর জন্মের প্রতি প্রথম অনিচ্ছার স্বভাবের নিষ্ফলত্বে, রাণু ও তার ভাইবোনদের জন্মের প্রতি মায়ের শেয়াল-কুকুরের জন্মের মতো ঘৃণাবোধ, সন্তানদের জন্য যন্ত্রণাবোধ ও বন্ধ্যাজীবন বাসনার তীব্রতা তাকে শূন্য জীবনবোধের যন্ত্রণায় আড়ষ্ট, ভীত, বিরক্ত, নিঃসঙ্গ করে রাখে।

কিন্তু লেখকের attitude to life কখনোই এমন একপক্ষীয় নৈরাশ্যের ভূমিকে সত্য করে না। এত যন্ত্রণার মধ্যেও মায়ের শীর্ণ শুকনো ঠোঁটের মিষ্টি হাসিতে মায়ের দিক থেকে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়ার জন্য অপত্য আন্তরিক স্নেহভাষণে তার শূন্যতা আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে। এমন অপসৃয়মাণ মানস-বৈশিষ্ট্যের প্রথম ধাপ রচিত হয় মুহূর্তের অনুভূতিতে:

‘এতক্ষণে সব তার পরিষ্কার হয়ে গেছে, কেন বাবা-মা তখন তাকে চাননি, বা কেন তারা এখনও রাণুদের সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছেন না।’

মধ্যবিত্ত পরিবারের বেহুলার ভেলায় বসে ভেসে যাওয়ার স্বভাবটিকে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতা বোধ করতে থাকে। এটা হল পরিবারের বাস্তব পটভূমির রূঢ় প্রভাব, বলা যায় অভিজ্ঞতার সম্যক স্বীকৃতি রাণুর মনে। রাণু এবার রোমান্টিক জিজ্ঞাসা থেকে ক্রমশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। এই অভিজ্ঞ হওয়া বস্তুত জীবনকে গ্রহণ করাতেই সত্য, জীবনকে ঘৃণা দিয়ে খায় নয়। অসুস্থ মায়ের আধময়লা রোগশয্যার

পাশে রাণু এসে বসে পড়ল, মা অনুর শরীর খারাপের অজুহাতে দূরে সরে যেতে বলে। রাণুর কথা এখন আর তত খারাপ লাগছে না না'আবার মায়ের একটি কথার উত্তরেই বলে: 'বাবা আসুক মা, এলে একসঙ্গে খাব।' এই চরণ, কথা, সক্রিয়তা বাবা-মার থেকে তার সাময়িক বিচ্ছিন্নতাকে, অনন্বয় ভাবনাকে ভরে দেয়। পারিবারিক মমত্ব সহমর্মিতা এই চিত্রের প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে লেখক-ব্যক্তিত্ব এক তরুণীর রোমান্টিক মনের বিশাল মুক্তির দিককে শূন্যতা সরানোর আর একটি উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুনীলের ওদের বাড়ি আসার খবর, অনেকক্ষণ গল্প করার খবর ও মায়ের সুনীলকে অকপট অন্তরঙ্গ প্রশংসা—সব মিলিয়ে রাণুর ভাবনার গভীরে আর এক মানসমুক্তির উপযোগী প্রান্তর তৈরি করে যে প্রান্তরের মাথায় তারাভরা অসীম আকাশ। ছোট্ট এক উঠোনের মাথার ওপরকার সেই আকাশ তাকে জীবনের দৃঢ় উপযোগিতার দিক অনুভব করায়। বিশাল পৃথিবীর পক্ষে রাণু এক তুচ্ছ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু রাণুর কাছে, তার ছোট জন্মের সীমায় এই পৃথিবীর, সমাজের, পরিবারের চারপাশের মানুষগুলির অনেক বড় তাৎপর্য। যা আছে তাকে আবেগে-অন্তরঙ্গতায়, মানবিক বোধে, দোষে-গুণে গ্রহণ করাতেই ছোট জীবনের বড় সার্থকতা।

পারিবারিক জীবন-অসহায়তার মধ্যেও জীবন বরণের attitude থেকে ব্যক্তিক জীবনের মনোরম পরিপূর্ণতার অনুভব দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রাণু যদি না হ'তো' গল্পের প্রধান লক্ষ্যকে দীপিত করেছেন। শূন্যতা নয়, জীবনপ্রেম ও প্রাণতাই পৃথিবীতে জীবন অস্তিত্বের যাচাইয়ের প্রধান কষ্টিপাথর। এই ধারণায় লেখকের শিল্পভাবনার চিত্ত-স্বাতন্ত্র তথা দৃষ্টিভঙ্গি স্বাগত হওয়ার যোগ্য।

'রাণু যদি না হতো' গল্পের কাহিনী অংশ খুবই সামান্য, একটি চরিত্রের মনোলোকের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও তার মুশকিল আসানই গল্পকারের প্রতিপাদ্য। এখানে প্রধান চরিত্রের মনোভাবই প্রধান লক্ষ্য গল্পকারের দিক থেকে। প্রকরণের দিক থেকে যে ভাব রাণুর মনের মূল ভিত্তি, তার একমুখিতা এতটুকু নষ্ট হয়নি। রাণুর বাবা-মা নানা কারণে প্রথম বিবাহিত জীবনের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিক জটিল মানসিকতায় তাড়াতাড়ি সন্তান চায়নি। প্রথম সন্তান রাণুর অমের ভ্রূণ নষ্ট করতেই তারা ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাণুর এখন

সে ঘটনা জানার পর নিজের মধ্যে একটা অভিমান তৈরি হয়েছে বাবা-মার প্রতি। সেই সূত্রে পৃথিবীর কাছে, সংসারের কাছে তার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। সেই জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধানই গল্পের মূল থিম।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই 'থিম'কে ছোটগল্পের নিখুঁত বন্ধনে রূপ দিতে গিয়ে অনাবশ্যক বিস্তার ঘটাননি কাহিনীর। বাবা-মার কাহিনী—যা সারদা দাইয়ের বর্ণনায় আছে, তা একেবারে সংক্ষিপ্ত এবং রাণুর মর্মমূলে ঘা দেবার মতো তির্যক, দ্রুতগতিসম্পন্ন। রাণুর লোকের উন্মোচনই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে রাণুর বাবা-মার প্রসঙ্গ আর একটু বিস্তারিত হলেই গল্পের কেন্দ্রানুগ স্বভাবের গতি প্রাণতা শ্লথ ও মন্থর স্বভাবে গল্প প্রকরণের দিক থেকে ক্ষুন্ন করত। তা হয়নি বলেই গল্পের শেষ দিকের চিত্র অসাঙ্গাস সংযত, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যঞ্জনাগর্ভ।

কিন্তু এখানে আমাদের একটি প্রশ্ন থেকে যায় গল্পের বিষয়ভাবনার প্রয়োগের দিক থেকে। রাণুর এই পৃথিবীতে জন্ম হওয়ার উপযযাগিতা, তার অস্তিত্বের বিষয়ে গত নিজের মতো করে ভাবনাটি একটি জীবনের মর্মমূল ধরে বড় সমস্যার দিকে পাঠকের চিন্তাকে নিতেই পারে। বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়স ও মনে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে সেই আত্মিক সংকটের প্রশ্ন তুলেছেন, এ জীবন লইয়া কি করিতে হয়, কি করিব? এখানেও সেই অস্তিত্বের নিগূঢ় প্রশ্ন। 'রাণু যদি না হ'তো' গল্পে রাণু এক অনভিজ্ঞ সতেরো বছর বয়সের কলেজ ছাত্রী, রোমান্টিক। সে বাবা-মার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জীবন কাটায়। সে যখন প্রশ্ন তোলে, তার এ পৃথিবীতে জন্মের কি দরকার ছিল মায়ের বাবার অনিচ্ছায়, তখন এই বয়সের চরিত্র-ন্যায়ে তা স্বাভাবিক হয় কি না গভীর সংশয় জাগেই। গল্পটির সমাধান করেছে রাণু সহজভাবে, তার একদিনের জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাকি জীবনে তো এই দেখার অনেক উত্থান-পতন ঘটবেই! তাতে রাণুর জীবন-প্রশ্নের যাচাই কি একই থাকবে? আমাদের মনে হয়, রাণুর নিজস্ব সমাধান—যা গল্পকারেরও—তা অতি দ্রুত ঘটেছে গল্পে, যে কারণে চরিত্র ও বিষয় গভীরতা হারায়।

অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের attitude সত্য, কিন্তু যাকে আশ্রয় করে এই লক্ষ্যের যাচাই-করা, তার কি সে যোগ্যতা আছে শিল্পের বিচারে, দুটি জীবনের স্বভাবে? নরেন্দ্রনাথ মিত্র রাণুর দিক থেকে রূঢ় বাস্তব সাংসারিক অভিজ্ঞার আশু প্রয়োগ দেখে মনের বদল ঘটিয়েছেন, তার সুনীলের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেমের আদর্শে সংকটের সমাধান ভেবেছেন, তা যদিও গল্পকারেরই লক্ষ্য এবং গল্পকার এখানে সফল হয়েছেন গল্পের শেষতম অনুভবের ব্যঞ্জনা চিত্র-আঙ্কনে। কিন্তু যে সমস্যা চিরকাল দার্শনিকদের ভাবায়, সংকটের মধ্যে নিয়ে আসে নিঃসঙ্গ জীবন, সমাজ, সংসারের বিপুল টানাপোড়েনে যে অস্তিত্বের সংকটের সমাধান আজও সঠিক হয়নি, তা এত সহজে রাণুর মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে ছোটগল্পের অসাধারণ প্রকরণসৌন্দর্য মান্য হয়, কিন্তু চরিত্র-ন্যায়ে বক্তব্যের দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস অসম্ভব হয়ে ওঠে।

অবশ্যই এই বিষয় গল্পের ত্রুটি বা অসঙ্গতি নয়, কারণ, মনে হয়, গল্পকার কোনো বড় জীবনদর্শনের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট, জন্মগ্রহণের বিস্ময়কর ও অসঙ্গতিকে দেখাতে চাননি। তার গল্পের ভঙ্গি রোমান্টিক অনুভবে দীপিত। একটি তরুণীর ক্ষণিকের বিভ্রমই গল্পের বিস্তারের উপায়, গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা তারই অনুগ। রাণুর যে গল্পের শেষতম অনুভূতি, তা একান্তভাবে তারই, তা মূলত তারই রোমান্টিক জীবনমুখিন অনুভবের পক্ষে এক গভীর সান্ত্বনা। তার বাবা-মা, সংসার, পরিজন, সুনীল—সব সম্পর্কে অনন্বয়ী ভাবনা ধুয়ে-মুছে যায়। ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনের অনাবিল উদ্ভাসেই (epiphany) রাণু গল্পের শেষে এমন এক কথা ভাবতে পেরেছে:

‘আশ্চর্য আকাশ, আর আরো সুন্দর এই পৃথিবী। রাণু মনে মনে ভাবল, সে যদি না হত তা হলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়ত কিছুই এসে যেত না। কিন্তু কোন-না কোন ভাবে রাণু যখন একবার এসে পড়েছে তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।’

গল্পের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে গল্পকারের বিবরণধর্ম নেই। আরম্ভে এবং শেষে আছে ইঙ্গিতধর্ম। গল্পের প্রথমেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র বুড়ো ডাক্তার শ্রীপতি দত্ত ও তার কম্পাউন্ডার, বুড়ি থুড়থুড়ি দাই, ডিসপেনসারির অতি প্রাচীন পরিবেশ, তার

আসবাবপত্তরের দীনতা, জীর্ণতা প্রাচীনত্ব—এসব এঁকে রাণুর বাবা-মায়ের সতেরো বছর আগের যোগাযোগের শিল্পনায় (logic) ব্যঞ্জনায় বোঝাতে চেয়েছেন। রাণুর কাছে সারদা দাই তার বাবা-মার যে প্রথম সন্তান জন্মের কাহিনী শুনিয়েছে, এই শোনানো কাহিনীটি বিশ্বাস্য হয় এমন প্রাচীন পরিবেশ ও মানুষগুলির জন্যই। তাই গল্পের প্রথমেই আছে শিল্পিত পরিবেশের নিখুঁত প্রতিচিত্রণ। এই চিত্রের দ্রষ্টা অবশ্যই রাণু স্বয়ং।

মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র অতিক্রম করে গল্পকার গল্পের শেষে রাণুর স্নেহময়ী জননীর উপযুক্ত সংলাপে পরিবারের রূঢ় বাস্তবতার দিক দেখিয়েছেন। এই চিত্রের বাস্তব রস গল্পের স্বাদকে মৃত্তিকামুখিন বৈশিষ্ট্য দেয়। গল্পের শেষে আছে রোমান্টিক মনোভঙ্গি রাণুর। এই মনের উপকরণ জোগান দিয়েছে সন্ধ্যা-রাত্রির প্রাকৃতিক পরিবেশ-শোয়ার ঘর ও রান্নাঘরের মাঝখানের ছোট্ট একটু উঠোন থেকে দেখা একটুকরো তারা-ভর্তি আকাশ। এই আকাশ বস্তুত রাণুর মনের আকাশের প্রতীকী রূপ। সুতরাং গল্পের যে আদি ও অন্ত রূপের মধ্যে নিটোল বন্ধন—তা শিল্পের সংযমে কাহিনীকে ত্যাগ করে নায়িকার মনের বন্ধনে বড় ব্যঞ্জনাকে ধরিয়ে দেয়। গল্পের মধ্যেকার গদ্যেও নেই অপ্রয়োজনীয় মেদ । গল্পের প্রতিটি সংলাপ সংক্ষিপ্ত, যথাযথ, রাণুর মনের পক্ষে নিখুঁত। গল্পের মধ্যে যে সামান্য বিবরণ অংশ, তা রাণুর চিন্তাতেই ধরা। সারদা দাইয়ের রাণুকে ভেবে শেষ কথা বলা—‘বেঁচে থাক, সুখে থাক। আহাহা সন্তান যে কি জিনিষ—'। গল্পের গতির শেষ পর্যায়ে রাণু নিজে তার বাবা-মার সন্তান হয়ে, তার ভাইবোনদের মধ্যে অভাবে থেকে অনুভব করেছে—সন্তানের প্রতি স্নেহ-সম্পর্কের বিস্ময়করতাতেই আছে জীবনকে ভালোবাসা। সারদা দাইয়ের যে সন্তানের কথায় তাকে পৃথিবীতে, সংসারে বড় মূল্যদান, তাই গল্পের শেষে মূল্যবান হয় রাণুর বিদ্রোহী মনের ক্রমশ শান্ত হওয়ার উপযোগী অনুভবে। সুতরাং গল্পের বিষয় ও চরিত্রের মনোভঙ্গির এবং কেন্দ্রীয় ভাবানুগত ভাষা ও গদ্যভঙ্গি এই গল্পকে সর্বাবয়বের সমন্বয়ে শিল্পের চমৎকারিত্ব দিয়েছে।

'রাণু যদি না হ'তো' গল্পটির নাম অবশ্যই ব্যাখ্যাশ্রয়ী। নামে আছে একটি বাক্যের আংশিক প্রয়োগ, ছেদচিহ্নে দু'ভাগ করার প্রথম অংশ। এমন ব্যাখ্যাশ্রয়ী নামে তেমন এ ব্যঞ্জনা নেই, কিন্তু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধরে তার মনোভাবের দিকনির্দেশ আছে। 'রানু যদি না হ'তো' নামের অর্থ, অন্তত গল্পের প্লট, কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রলক্ষ্য যা প্রমাণ করে, তা হল রাণুর যদি এই পৃথিবীতে আদৌ জন্ম না হত, তা হলে কি এমন হত! রাণ মনে করে, তাতে সুনীলের প্রয়োজন হত না; এমন শোওয়া-বসা স সংসারে বেঁচে থাকা, খাওয়ার-পরার জন্য অর্থ-উপায় কোনো কিছুরই দরকার হত না। বাবা-মার তাকে প্রয়োজন হত না, সে-ও বাবা-মাকে সাংসারিক ব্যস্ততায় ব্যতিত দেখত না। তার ওপর বিশেষ করে তার এই জন্ম জোর করেই সম্ভব হয়েছে। বাবা-মার প্রবল অনিচ্ছায় সে এসেছে। এই মানসিকতা দিয়ে গল্পের শুরু, আংশিক বিস্তার, শেষে এই ভাবের বদল ও জন্মের এক গভীর প্রয়োজনকে সে মেনে নেয়। সুতরাং এমন ব্যাখ্যাশ্রয়ী নামের মধ্যে মূল গল্পকে ধরিয়ে দেওয়া এবং অসমাপ্ত বাক্যের বাকি অংশের সমাপ্তির ব্যঞ্জনা থেকে গেছে। এমন গল্পনামের অসমাপ্ত অংশটিকে সমাপ্ত করেছে গল্পটি।

দ্বিতীয়ত, একটি negation দিয়ে গল্পের নাম শুরু, গল্পের শেষ কিন্তু আর এক positive ভাবনা দিয়ে। অর্থাৎ রাণুর যদি জন্ম না হত, এই 'না' সূচক বক্তব্যই গল্পের লক্ষ্য নয়, বিপরীতে 'না' নয়, হা' দিয়েই রাণুর জন্মের মূল্যায়ন দেখিয়েছেন গল্পকার। রাণুর জন্মটাই ঠিক, সেখানে 'যদি'-র প্রসঙ্গই অবান্তর। গল্পের সব শেষের রাণুর নিজের মনে মনে ভাবা বাক্য দুটি গল্প নামের অর্থের বৈপরীত্যে আর এক ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাব ব্যাখ্যার অনুগ করে তোলে স্বভাবী পাঠকদের।

'রাণু মনে মনে ভাবল, সে যদি না হত তাহলে এই বিরাট আকাশ আর এই বিপুলা পৃথিবীর হয়ত কিছুই এসে যেত না। কিন্তু কোন না কোন ভাবে রাণু যখন একবার এসে পড়েছে তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।' রাণুর জন্মের স্বপক্ষে গল্পের বিশেষ নামের উত্তর থাকার, এমন বাক্যে অন্তর্নিহিত থাকায় নাম ব্যঞ্জনাধর্মী।

তৃতীয়ত, গল্পকার গল্পে রাণুর ভাবনায়, দুটি বড় প্রশ্ন তুলেছেন— এক. পৃথিবীতে কারো জন্ম হওয়া উচিত কিনা, দুই. আদৌ তার প্রয়োজন আছে কিনা। এই দ্বিমুখী প্রশ্নের দিকই গল্পের নামে সমস্যা তৈরি করে দেয়। একজন মানুষ না জন্মালে বিশাল পৃথিবীর কোনো যায় আসে না। মানুষের স্থান তো ছোট পরিবারেই বড় হয়ে ওঠে। বিশাল পৃথিবীর কাছে মানুষ তুচ্ছ, কিন্তু মানুষ আদৌ তুচ্ছ নয় ছোট পরিসরে, ছোট পরিসরে থেকে এই পৃথিবীকেই ভোগ করার দিক থেকে। নিঃসীম তারাভরা আকাশ আর সুন্দর এই পৃথিবীর ভাগীদার সেই মানুষ যে ছোট জীবনের সীমায় তাকে ভোগ করতে জানে, উপভোগের আর্তি বিছিয়ে দিতে পারে! রাণু শেষে বাবা-মাকে ভালোবেসেছে, সুনীলের প্রেমকে গভীরতম হৃদয়-সত্যে গ্রহণ করেছে। এই আস্তিক্য চিন্তা বুঝিয়ে দেয় গল্পনামের রাণুর জন্ম না হওয়ার এমন অসহায় সিদ্ধান্ত-চিহ্নিত ইঙ্গিত। পৃথিবী এবং আকাশের দিক থেকে নয়, মানুষের দিক থেকেই জন্ম স্বাভাবিক, একান্ত কাঙ্ক্ষিত। সব সময় negation দিয়ে নয়, affirmation-ই সব সত্য ধরিয়ে দেয়। গল্পের নামে যে জীবন ও জন্ম অস্বীকৃতির negation আছে, গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা তাকে অস্বীকার করতে শেখায়। এই বিপরীত তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায় গল্পের নাম অবশ্যই সার্থক।

১৪.৩ হেডমাস্টার

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘হেডমাস্টার’ গল্পের প্রথম প্রকাশ ঘটে সে সময়ের সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার তেরোশো ছাপ্পান্ন সালের (উনিশশো উনপঞ্চাশ-এর) পূজাসংখ্যায়। লিটির রচনাকাল অবশ্যই আনুমানিক ইংরেজি উনপঞ্চাশ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মান্য আগে। সময় স্বাধীনতা-উত্তর, দেশ বিভাজনের নানান ঘটনায় উত্তপ্ত ও বিপর্যস্ত! ময়ের ছাপ নিশ্চয়ই গল্পকারের শিল্পী-সত্তায় এবং গল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে স্পষ্ট। এমন চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পের নায়ক তাই প্রায় নবাগত প্রৌঢ় হেডমাস্টার—যিনি বাস্তুহারা স্বভাবে তখনকার পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় আস্তানা নিতে ব্যস্ত এবং স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ সপরিবারেই! আপাত রাজনৈতিক জ্বালা ও উত্তাপ এ গল্পের প্রসঙ্গে অনুপস্থিত। কিন্তু গভীরভাবে আছে এক বাস্তুহারা পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের করুণ দিক। কিন্তু অর্থনৈতিক ভাঙনের দিক ধরে এক প্রৌঢ় শিক্ষক-নায়কের, অতীতে যাঁর পদমর্যাদা

ছিল প্রধানশিক্ষকের—পুরনো শিক্ষাজীবন থেকে সরে এসে নতুন করণিক জীবনের আশ্রয়ের বৈশিষ্ট্যে মহৎ আদর্শবাদের নানান ভাঙচুর ও উত্তরণ পরম রমণীয় সচিত্র রূপ নিয়েছে। 'হেডমাস্টার' গল্পে চরিত্র প্রাধান্য পেলেও আছে একক দুর্ভাগ্যপীড়িত ব্যক্তিকেন্দ্রিক আখ্যানের আড়ম্বরপূর্ণ বিবর্তন।

তখন অখণ্ড বাংলাদেশ ভেঙে পূর্ববঙ্গ হয়েছে পাকিস্তান। দলবদ্ধ ও এককভাবে পাকিস্তান চিহ্নিত দেশ থেকে বহু পরিবার, মানুষজন বাস্তুহারা হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। সেই বাস্তুহারাদের একজন হলেন সাগরপুর এম.ই. স্কুলের একান্ন বছরের হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। তার সঙ্গে এসেছে পুরো পরিবার—যথার্থ সুন্দরী শ্রী লাবণ্য, অবিবাহিতা তৃতীয়া কন্যা অষ্টাদশী গীতা, তার তিন পুত্র। প্রথম পুত্রের বয়স সাত। প্রথম দুই মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু স্ত্রীর দুই কলকাতাবাসী দাদার সঙ্গে যোগাযোগে তাদের কাছেই ওঠেন। পরে ঘরের স্থান সংকুলানের অসুবিধের কারণে চলে আসেন কালীঘাটের টিনের বস্তিতে মাত্র একখানা আলো-বাতাসহীন ঘরের ভাড়ায়। হেডমাস্টার সব দিকে রীতিমতো দৃঢ়চিত্ত, শক্তসমর্থ, সপ্রাণ। দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের স্কুলের ছাত্র কমে যাওয়ায় ও প্রাইভেট টিউশানির সংকটজনক অসুবিধের কারণেও স্কুল ছাড়েন তীব্র অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে। আর মাস্টারি করবেন না কিছুতেই, চাকরি খুঁজে ফেরেন কলকাতায়। স্ত্রীর জিদেই কলকাতায় আসা!

এই অবস্থায় ছোট মেয়ে নীতা অফিসের ঠিকানা জোগাড় করে দেওয়ায় কৃষ্ণকমলবাব নিজের ছাত্র ব্যাঙ্কের বড় পদে আসীন নিরুপম নন্দীর সঙ্গে দেখা করেন হঠাই। নতুন করে যোগাযোগের পর ব্যাঙ্ক থেকে নিরুপমকে নিয়ে সোজা নিজের বাসায় আনেন। নান নস্ট্যালজিক স্মৃতির স্তূপ খোঁড়াখুঁড়ির পর নিরুপম নন্দী মাস্টারমশাইয়ের জন্য অন্তত শেষমেশ তার ব্যাঙ্কের একটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয় মাস্টারমশাই এবং তার স্ত্রী লাবণ্য অর্থাৎ মাসিমাকে। এসবের মধ্যে নিরুপম শোনে মাস্টারমশাইয়ের যুবক বয়সের রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী। তখন তিনি সিটি কলেজের ছাত্র, দিদির শ্বশুর যোগাযোগে লাবণ্য হন প্রাইভেট ছাত্রী। লাবণ্যর অসুস্থতার কারণে মাস্টারমশাই আর

বি,এ, পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তখনও স্ত্রী হননি লাবণ্যদেবী। পরে স্ত্রী হলেও কি গ্রামেই শিক্ষক হয়ে যান স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও।

মাস্টারমশাইয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি যেমন আছে নিরুপমের, তেমনি তার ব্যক্তিত্ব ও দাপটের কাছে কম ভয়ও পায় না নিরুপম। শেষে অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থা না হওয়ায়, নিজের ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গুপ্তকে বলে। কারণ নতন নিয়োগের ভার একমাত্র তারই হাতে। যিনি দীর্ঘকাল স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন, তিনি ছাত্রদের জগৎ ছেড়ে করণিকের কাজ করতে পারবেন কিনা—এমন প্রবল সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও নিরুপমের সনির্বন্ধ অনুরোধে আশ্বাসে মিঃ গুপ্ত প্রথম ইন্টারভিউ না নিয়ে চাকরিতে বহাল করে তাকে। নিরুপমের মুখের খবরেই মাস্টারমশাই কাজে যোগ দেন। মাইনেরও বয়স অনুযায়ী সাধারণ স্কেল ষাট টাকা থেকে স্পেশাল পঁচাশি টাকায় ব্যবস্থা করে এবং পরে কাজ দেখে আরও ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও দেয়।

মাস্টারমশাইকে নিরুপম নন্দী প্রথম পরিমলবাবুর ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ওঁর কাজ দেয়। পরিমলবাবু একজন পককেশ বৃদ্ধকে কাছে পেয়ে খুশি হলেন না। পরিমলবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম নয়। বাড়িতে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, মাঝে মাঝে ছেলের খোঁজে নিরুপমের কাছে আসেন। প্রথম চাকরি পেয়ে মাস্টারমশাই-এর পোশাক-পরিচ্ছদ আমূল বদলে যায়। এর মূলে যে স্ত্রী লাবণ্যলেখা—তা একদিন ছুটির পর ডালহৌসিতে দেখা হলে নিরুপমের বিস্ময়সূচক প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু তা স্বীকার করেন।

কিন্তু প্রথমেই মুশকিল হল, মাস্টারমশাই সম্পর্কে যা কিছু রোমান্টিক আচ্ছন্নতা ছিল চাকরি পাওয়ার প্রথম দিকে, তা বিপর্যস্ত হল। পরিমলবাবু নালিশ করেন নিরুপমের কাছে—তার মাস্টারমশাই উঠতে বসতে তার কর্মচারীদের কাছে তার কথায় ইংরেজির ভুল ধরেন, খুঁত ধরেন। কাজে নানাভাবে ব্যাঘাত আসে। অভিযোগ ওকে সরিয়ে নিতে হবে নিরুপমকে কারণ দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভাল। নিরুপম মাস্টারমশাইকে ডেকে পরিমলবাবুর সঙ্গে তার ঝগড়া করার কথা তুললে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর উত্তেজক কথা: ‘ওকে বেতিয়ে যে লাল করে দিইনি আমি ...’ এমন আরও ভুল ইংরিজি বলা ও

লেখার অভিযোগ শোনান। সেই সঙ্গে অভিযোগ—পরিমলবাবু অফিসে অল্পবয়সী কেরানিদের কাছে ইয়ার্কি করে ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা নিয়ে, সিনেমাস্টারদের নিয়ে, এমনকি ব্রথেল নিয়েও অন্য সব কথা বলে। আদিরসে পরিমলবাবুর যে বিশেষ আসক্তি তাতে মহিলাকর্মহীন ব্যাঙ্কে নানা মেয়ে ও তাদের যৌনজীবন নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে মাতেন নিরুপম নন্দী জানে। তবু পরিমলবাবু ব্যাঙ্কের কাজে ক্লিয়ারিং মেলাতে রীতিমতো দক্ষ লোক। শেষে মাস্টারমশাইয়ের ক্রোধ সামলাতে পারে না নিরুপম। তার কাজের ডিপার্টমেন্ট এবার করেন বিল সেকশান। সেখানেও ননীবার তীব্র অভিযোগ জানান নিরুপমের কাছে। মাস্টারমশাই কোনো কাজ না করে কেবল ননীবাবুর ভুল ধরেন, এডমিনিস্ট্রেশান-এ অকারণ মাথা গলান ইত্যাদি। এদিকে নিরুপম মাস্টারমশাইকে সব কথা জানালে তিন নবাবুর যাবতীয় ক্লিক করার দিককে সাপোর্ট করার তীব্র সমালোচনা করেন। ননীবাবু যে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের ভাগ্নে—একথা জানালে মাস্টারমশাই শষে ভুল বুঝে ক্ষমা চেয়ে নেন নিরুপমের কাছে। নিরুপমকে অনুরোধ করেন যেন এসব ব্যাপার তার স্ত্রীকে না বলে নিরুপম।

এইভাবে মাস দুয়েকের মধ্যে নিরুপমের সহযোগিতায় ব্যাঙ্কের প্রায় সব বিভাগে রপ্রসন্নবাবু ঘুরে ঘুরে কাজ করলেও—লেজার, লোন, ফিক্সড-ডিপোজিট, এ্যাকাউন্টস, ডেসপ্যাচ—এমন সব বিভাগ থেকে নানা অভিযোগ আসতে থাকে শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছেও ! এবার মাস্টারমশাই-এর চাকরি রাখা আর সম্ভব নয়—এই হতাশা যখন নিরুপমের তখন, নিরুপম ডেসপ্যাচ থেকে বেয়ারাদের দেখাশোনার কাজে মাস্টারমশাইকে বসান। প্রফুল্লবাবু কেয়ারটেকার-এর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তাই সেখানে তিনি বদলি হলেন। তাতে রাগে অভিমানে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু আঘাত পেলেও কিছু করার নেই। এবার তার কাজ নিরুপম বুঝিয়ে দেয়—তাকে দেখতে হবে বেয়ারারা কখন আসে যায়, বিভাগে কজন বেয়ারা আছে, দরকার কজন, বেয়ারা ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, তারা চুপচাপ বসে থাকে কিনা কাজ না করে....। মাস্টারমশাই এতে অপমান বা েধ করলেও নিরুপম কিছুটা বিরক্ত ও অসহায় হয়েই তাকে সামলে থাকার ইঙ্গিত দেয়।

পরে প্রথম কদিন বেয়ারাদের কাছ থেকেও মাস্টারমশাই ভীষণ রূঢ়ভাষী হাজিরা সম্বন্ধে কড়া মনোভাব তার। চালচলন, আচার-ব্যবহার বিষয়ে খুঁতখুঁতে, বিশেষ করে কি একটা কথা শুনে বেফাঁস কথা বলার শাস্তি হিসেবে শীতল বেয়ারাকে চড় মারেন এমন সব অভিযোগ আসে। পরে সপ্তাহ দুই বাদে অন্য ধরনের অভিযোগও আসে। মাস্টারমশাই বেয়ারাদের হয়ে প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে ঝগড়া করেন, কোনো বেয়ারাকে কেউ কড়া কথা বললে তিনি প্রতিবাদ করেন। কোন ব্যক্তিগত কাজে বেয়ারাদের ব্যবহার। করায় প্রবল আপত্তি তোলেন। তার যুক্তি অফিসের বাবুদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত রাখলে অফিসের কাজ ব্যাহত হয়... এমন সব। ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু নিরুপমের কাছে অভিযোগ করেন মাস্টারমশাই-এর বেয়ারাদের আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলার ব্যাপারে! নিরুপম নন্দী তা দেখার প্রতিশ্রুতি দেয়।

একদিন ইয়ার ক্লোজিং-এর কাজ সারতে দেরি হওয়ায় ব্যাঙ্ক ছাড়তে আরও কিছু সময় লাগে নিরুপমের। অফিসে রাত আটটায় আর কেউ নেই। দুই সহকর্মীর সঙ্গে বাইরে "ময়ে মনে পড়ে যায় কিছু জরুরি চিঠির কথা আবার অফিসে ঢোকে নিরুপম সহকর্মীদের ছেড়ে দিয়ে। এবার বেরুবার সময় দেখে আলো-জ্বলা ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের হে বেয়ারাদের দল ছোট ছোট টুল পেতে বসে আছে মাস্টারমশাইকে ঘিরে। তাদের রা হাতে খাতাপেন্সিল, কারোর বা ব্যাঙ্কেরই বাতিল কাগজপত্তর, কারোর হাতে বা খড়ি ও শ্লেট। ডেসপ্যাচের চেয়ারটায় বসা মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই-এর কণ্ঠ ওর কানে এলো : ‘আচ্ছা, স্বাধীনতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানো তোমরা?’ নিরুপমের গলা শুনে অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মতো মাস্টারমশাই নিজের কাল কথা বলেন: ‘অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো করে আয়ত্ত করানোই অবশ্য আমার উদে কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কি বল ? .... এদের মধ্যে এক ছেলে কিন্তু অদ্ভুত মেরিটোরিয়াস। আমাদের এই কানাই, চেন ওকে?...... জানো খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্ট-এর মধ্যে ফার্স্ট করে তোলা যায়।...’

নিরুপমের সঙ্গেই সেদিন মাস্টারমশাই বেরিয়ে এসে অন্তরঙ্গ অনুরোধ করেন নিরুপমকেই—সে যেন গীতার মা আর জেনারেল ম্যানেজার কারোর কানে এসব কথা না তোলে। এখানেই 'হেডমাস্টার' গল্পের আখ্যান শেষ।

বোঝাই যায় 'হেডমাস্টার' গল্পের আখ্যান ব্যক্তিচরিত্রনির্ভর, কোনো বিশেষ ভাব বা স্বতন্ত্র কোনো কাহিনী ও ঘটনানির্ভর নয়। গল্পের সামগ্রিক প্লট জটিল রূপ পেয়েছে একটিমাত্র চরিত্র ধরেই। গল্পকার গোড়া থেকেই বিশেষ চরিত্র ধরে তার জীবন ধারণ ও যাপনের মধ্যবর্তী একাধিক ছোট ছোট কাহিনী পরম্পরায় প্লটের জটিল সত্যের মূলে নিবিষ্ট থেকেছেন। গল্পে কোনো 'Sub-plot'নেই। আপাতদৃষ্টিতে হেডমাস্টারের স্ত্রী লাবণ্যলেখার সঙ্গে প্রধান চরিত্রের রোমান্টিক প্রণয় স্বভাবের চিত্র—যা বিয়ের আগে ছিল—তা উপকাহিনীর স্বভাব দেখাতে পারে, কিন্তু তা-ও উপ-প্লট হতেই পারে না, কারণ প্রধান চরিত্রের সঙ্গে তা এমনভাবে উভয় চরিত্রের স্বধর্মে লেগে আছে যেখানে বিপরীত কোনো তাৎপর্য না সৃষ্টি করায় প্রধান চরিত্রের শুধুমাত্র নিগূঢ় অঙ্গ-স্বভাব পেয়েছে।

গল্পে হেডমাস্টার যে দেশ বিভাজনের বলি, বাস্তুহারা হয়ে কলকাতায় চলে আসেন সপরিবারে, অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণেই এমন দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে, তা নায়ক চরিত্রের ছাত্র নিরুপম নন্দীকে বিস্তারিত বলার মধ্যেই সচিত্র হয়। সেখানে বিশেষ ব্যক্তি তথা কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবন-চরিতের আদলে কিছুটা বিবরণধর্ম আখ্যান গঠনে সহায়ক হয়েছে। গল্পের শুরু হেডমাস্টারের হঠাৎ ছাত্র নিরুপমের ব্যাঙ্কে এসে দেখা করা, কথা বলতে বলতে নিজের কালীঘাটের বস্তি বাড়িতে নিয়ে আসা, নস্ট্যালজিক বিস্তারিত স্বভাবে নিরুপমের সঙ্গে পাকিস্তানের ফেলে-আসা দৈনন্দিন জীবনযাপনের খবর দেওয়া মধ্য দিয়ে ব্যক্তির জীবন স্বভাবচিত্র হয়ে ওঠে। আখ্যান অনেকটা জীবনী রচনার বৈশিষ্ট্যে প্লটের শরীর পায়।

ছাত্র নিরুপম নন্দীর ব্যাঙ্কে হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকারের করণিকের চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ অংশটি আখ্যান তথা প্লটের বিবরণ ধর্মকেই দেখায়। আখ্যান-সম্ভব ব্যক্তির জীবন আঁকার মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিরূপ

মেলে ঠিক, কিন্তু তা আরও সংক্ষিপ্ত ও সংযত হওয়ার সুযোগ ছিল, 'হেডমাস্টার' গল্পের প্লটনিহিত কাহিনী স্বভাব সেই সুযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। ব্যাঙ্কে মাস্টারমশাই-এর চাকরি পাওয়া থেকেই গল্পের গতি ও বিষয়ের তীব্রতা বেশি চমকৃতির বৈশিষ্ট্য পায়। পড়তে পড়তে মনে হয় গল্পে হেডমাস্টারের সাগরপুর এম.ই. স্কুলের শিক্ষকতা জীবন প্রসঙ্গের বিস্তারে গল্পকারের বর্ণনা ও যুবক হেডমাস্টারের সঙ্গে প্রাইভেট ছাত্রী পরে স্ত্রী লাবণ্যলেখার রোমান্টিক সম্পর্কের জীবনরূপের। উপস্থাপনা অতিকথনে ও প্রয়োজনহীনতায় সুক্ষ্ম অর্থে মন্থর।

তবে গল্পের করণিক মাস্টারমশাইয়ের কয়েকটি চিত্রের সমবায়ে কাহিনী-অংশ। অসম্ভব শিল্প-কুশলতায় রচিত। তার জটিল প্লটের উপযাোগী অবয়ব এবং কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অভিমুখী তীব্র গতিময়তা বিস্ময়কর শিল্পের চমৎকারিত্ব আনে। এই অংশেই মেলে গল্পে 'চরমক্ষণ' অর্থাৎ 'ক্লাইম্যাক্স'। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, গল্পের climax এসেছে হেডমাস্টার চরিত্র ধরেই। চরিত্রের যেখানে ক্লাইম্যাক্স, গল্পেরও সেখানেই! কারণ মূল চরিত্র এবং মূল গল্প—'হেডমাস্টার' গল্পে একই—অঙ্গাঙ্গী শিল্পস্বভাবেও একই। গল্পের ও চরিত্রের মূল 'মহামুহূর্ত' (climax) কোনো মনস্তত্ত্বে জটিল হয়নি, কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিশুদ্ধ আদর্শবাদিতায় বিশিষ্টতা পেয়েছে। বেয়ারাদের দেখাশোনা বিভাগে শেষ বদলি হবার পর থেকে সপ্তাহ দুয়ের মধ্যে মাস্টারমশাই সম্পর্কে ক্রমশ অন্য ধরনের অভিযোগ আসতে থাকলে একসময়ে ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবুর নিরুপম নন্দীর কাছে অভিযোগ ':.... বেয়ারাদের সর্দারী থেকে এখনো মাস্টারমশাইকে সরিয়ে আনুন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের উনি মাথায় তুলে ছাড়বেন।'

এখান থেকে চরিত্রের ও গল্পের ক্লাইম্যাক্স শুরু। ক্রমশ তা বিস্তারিত হতে থাকে। মাস্টারমশাইয়ের শেষ কর্মকাণ্ড ধরেই:

'মুহূর্তকাল আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, এ সব কি হচ্ছে মাস্টারমশাই। ক্লাস নিচ্ছেন নাকি?"

মাস্টারমশাই অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়ালেন, "না না ক্লাস টলাস কিছু নয়। অমনিই ওদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো করে আয়ত্ত

করানোই অবশ্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কি বল ?”

এই হল চরিত্র ও গল্পের চমৎকার climax অংশ। এর মধ্যেই আবার গল্পের তথা হেডমাস্টার চরিত্রের শিল্পসম্মত পরিণতি চিত্রের ব্যঞ্জনার আকস্মিকতা পাঠকদের মুগ্ধতার অনড় স্বভাব আনে। আবার গল্পের একেবারে শেষে সমগ্র গল্পের দ্রষ্টা, উত্তমপুরুষ বক্তা নিরুপম নন্দী যখন এভাবে শেষ করেন, ‘প্রথম মাস্টারীও মাস্টারমশাই এমনি লুকোচুরির ভিতরেই শুরু করেছিলেন। তখন এই অংশও পরিণত শিল্পব্যঞ্জনার আগের অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রধান চরিত্রের আরও এক কৌতুক রসাভাসের মাত্রা (dimension) যোগ করে।

সবশেষে গল্পের আখ্যান, ঘটনা ও প্লটের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় নিরুপম নন্দীর প্রসঙ্গ আসে কাহিনীসূত্র ধরিয়ে দেওয়ার কারণে। নিরুপম নন্দীই সমগ্র গল্পের প্রধান অঙ্গুলির নির্দেশনা স্পষ্ট করে। সে গল্পের হয়তো কোনো চরিত্র হতে পারেনি সে অর্থে, কিন্তু লেখকের হয়ে এই চরিত্র যেভাবে গল্পের বয়নকে বিশ্বাস্য করেছে, কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নানান বৈশিষ্ট্যে সচল বিচিত্রবর্ণ ও বিশাল প্যানোরামায় মর্যাদাসম্পন্ন করেছে, তা গল্পের আখ্যান-আঙ্গিকের আর এক শিল্প চমকৃতির দিক। হেডমাস্টার তার সমস্ত কথা অকপটে বলার সুযোগ পেয়েছেন উত্তমপুরুষ কথক ছাত্র নিরুপম নন্দী তথা বকলম কৌশলের কারুকার্যের কারণেই। হেডমাস্টারকে পাঠকদের কাছে সর্বাবয়োবে চিনিয়ে দেওয়ার কাজে গল্পকারের হয়ে নিরুপম নন্দীর যাবতীয় ভাবনা, কৌতুক রস পরিবেশ, শ্রেষ, অসহায়তা, সত্যভাষণ, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও চরিত্রকে বড় জায়গায় উত্তরণের অসীমে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস—গল্পটির শ্রেষ্ঠ গল্পের মর্যাদার আসন স্থায়ী ক আখ্যানের এখানেই অপরূপত্ব।

‘হেডমাস্টার’ গল্পের নাম অবশ্যই চরিত্রকেন্দ্রিক, কিন্তু চরিত্রকেন্দ্রিকতা নামকে নিয়ে গেছে চরিত্র ব্যঞ্জনার নির্গলিত অর্থের মধ্যে। প্রথমত, গল্পের নায়কের আলাদা নাম আছে কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। কিন্তু সে নাম গল্পনামে ব্যবহৃত হয়নি। তার কারণ গল্পকার গল্পনামে একটা চাপা নিরপেক্ষতা মানাতে চেয়েছেন। তাই কৃষ্ণপ্রসন্ন নাম

থাকলে সেই কজন ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ এর আলাদা সত্তা—যা গল্পে আগাগোড়া ধরার চেষ্টা হয়েছে, তা ব্যাহত হবেই শিল্পের মাপে। তাই মূল নাম বাদে শিল্পমান বরং বর্ধিতই।

দ্বিতীয়ত, গল্পকার আগাগোড়া গল্পে ‘হেডমাস্টার’ও ব্যবহার করেননি, করেছেন মাস্টারমশাই’! কিন্তু ওই নামেও গল্পের নাম শিল্পমানে কিছুটা খণ্ডিত হয়। মাস্টারমশাই’ শব্দে লঘুতা আছে, কিছুটা বা অ-শ্রদ্ধাও, যদিও তার যুক্তি অনেকে মানতে না-ও পারেন। আর মাস্টারমশাই এমন নাম শিক্ষক-চিত্রকর, শিক্ষক-গায়ক, শিক্ষক-খেলাধূলা এসবেও তো ব্যবহৃত হতে পারে! সুতরাং ‘মাস্টারমশাই’ গল্পে বার বার ব্যবহৃত হলেও নামে তা হত সূক্ষ্ম তাৎপর্যে বেমানান কিছুটা বা!

তৃতীয়ত, ‘হেডমাস্টার’ এমন নামে কেন্দ্রীয় চরিত্রের নিজস্ব মানমর্যাদা, আদর্শ রক্ষিত হয় সহজেই! গল্পের শেষে সেই মাস্টারের স্বীকৃতিই তো গল্পের ব্যঞ্জনাকে অর্থের সীমা ছাড়িয়ে প্রসারতা দিয়েছে। গল্পের শেষই তো তার লক্ষ্য। হেডমাস্টার ছিলেন বলেই তো ছাত্র নিরুপম নন্দীর কাছে এসেছেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার, হেডমাস্টার বলেই তো ছাত্রদের স্কলারশিপ পাওয়া ইত্যাদিতে ভঁর গর্ব! গর্ব যেমন নিরুপম নন্দী, তেমনি অফিসের বেয়ারাদের সেই অশিক্ষিত কানাইও তো হতে পারে! গল্পের প্রথম ও শেষদুয়ের মধ্যে সংযোজক সূত্র হল মাস্টারমশাই এর ‘হেডমাস্টারি’। ছাত্রদের শাসন ও সুশিক্ষা দানে সহশিক্ষকদের যতটা না, হেডমাস্টারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আদর্শ অনেক বেশি, স্থায়ী। সুতরাং একজন হেডমাস্টারকে যিনি গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ—গল্পনামে ব্যবহার করা শিল্পসম্মত।

চতুর্থত, ‘হেডমাস্টার’ গল্পে চোরাঢেউ-এর মতো একটি শ্লেষ কাজ করেছে। সাধারণ এক লঘু প্রবচন—ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বা স্বভাব যায় না ম'লে....ইত্যাদি। এই গল্পে এসব প্রবচন ব্যবহারে চরিত্রটিকে একেবারেই ছোট করা হয় নিচুমানের প্রাবচনিক হিউমার দিয়ে। আসলে হেডমাস্টারের ব্যবহারে আছে বড় মাপের শ্লেষ। তিনি যদি কোনোদিন ভাগ্যের ফেরে চাকরি ছেড়ে করণিক হন, তিনি যদি পুরনো আমলের একজন শিক্ষিত, আদর্শবাদী, রুচিবান ব্যক্তি হন, তবে তিনি তো যুদ্ধ-পরবর্তী

অবক্ষয়িত সময়ে তথাকথিত আধুনিকতার কাছে শ্লেষের উদ্বোধক হবেনই! হেডমাস্টার ব্যাঙ্কের করণিকদের মুখের সামনে ধরা সেই আয়না—যার মধ্যে প্রত্যেকে নিজেদের বিকৃত মুখবিম্ব দেখতে পায়—সভ্য হওয়ার নামে অসভ্য অশিক্ষিত, স্বার্থপর স্বভাবের সেই মানুষদেরই হেডমাস্টার সামনে এনেছেন। যার স্বভাব শাশ্বত সত্যকে ধরিয়ে দেয়, সুস্থ আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেয়, আধুনিক পরিশীলিত মানুষজনদের, সমাজের যথোচিত ছবি সামনে আনেকেই 'হেডমাস্টার' নাম দিয়ে গল্পনামে গল্পকার সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সুতরাং গল্পের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এমন গল্পনাম সার্থক ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত নিঃসন্দেহে।

১৪.৪ পালঙ্ক

'হেডমাস্টার' ও 'পালঙ্ক' দু'টি গল্পের বিষয়ে একজায়গায় মিল আছে—তা হল দুটি গল্পের নায়কই দেশ-বিভাজনের শিকার এবং আদিতে তখনকার পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের বাসিন্দা। হেডমাস্টার গল্পের কেন্দ্রীয় মানুষ কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন সপরিবারে, এসেছেন কলকাতায়, স্থায়ীভাবে, 'পালঙ্ক' গল্পের কেন্দ্রীয় পর রাজমোহনবাবু পাকিস্তান নিজে ছাড়েননি, তবে তাঁর পুত্র ও বৌমা সপুত্রক পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীগত দুটি সাদৃশ্য বাদ দিলে দুই গল্পের প্রধান ব্যক্তির একজন হেডমাস্টার-আদর্শ নিয়ে কলকাতার এক ব্যাঙ্কে করণিকের পদে জীবিকাগ্রহণে বাঁচতে গিয়ে আদর্শভ্রষ্ট হননি! পরোক্ষে শিক্ষকতার আর একজন রাজমোহনবাবু তাঁর পাকিস্তানেই আভিজাত্য, মান-মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তাতে জীবনপাত হলেও ভ্রূক্ষেপহীন।

'পালঙ্ক' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৫৯ (ইঃ ১৯৫২) সালের পূজাসংখ্যায়, পত্রিকায় প্রকাশের আগে বেতারে পঠিত হয় শ্রাবণ ১৩৫৯-এ। এই গল্পটিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পরবর্তী বছর সাতেক সময়সীমায়। দেশবিভাজনের অভিশাপ, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জাত্যভিমান এসব মিলেমিশেই 'পালঙ্ক' গল্পের কাহিনীভাগ নির্মিত। এ গল্পে টানা কোনো আখ্যান নেই, আছে দামী

পুরনো একটি পালঙ্ককে ঘিরে পালঙ্কের মূল মালিক রাজমোহনবাবু ও সেই পালঙ্কের ক্রেতা প্রতিবেশী মকবুল—দুজনের ব্যক্তিত্বের অন্তর্মুখী সংঘাতের চিত্র।

রাজমোহনবাবুর ছেলে সুরেন ও তার বউ অসীমা, কানু, টেনু, রীণা, সীমা—এই চার ছেলেমেয়ে নিয়ে পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতা চলে গেছে। পাকিস্তানের যা কিছু সম্পত্তি তা বিক্রি করতে চাননি রাজমোহনবাবু। তিনি দেশ ছেড়ে কলকাতায় যেতেও রাজি নন কোনোমতেই। তিনি সম্পত্তি আগলান। পাকিস্তান হলেও জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা অগাধ। এই অবস্থায় ছেলের বউ অসীমার একটি চিঠি আসে কলকাতা থেকে। কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি পুরনো বাড়িতে তারা থাকে। সেখানে স্যাতসেঁতে মেঝেয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করা কঠিন। অসুখবিসুখ জ্বর-জারি লেগেই আছে। স্বামীর খাট কেনার পয়সা নেই। এই পরিস্থিতিতে বৌমার প্রস্তাব: ‘আমার বিয়ের সময় আমার দাদুর দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানা বিক্রি করে দিন, দিয়ে সেই টাকা এখানে পাঠান।....এ তো আপনাদের বাড়ির জিনিস নয়। এক হিসেবে পরের জিনিস, পরের কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া। তা বিক্রি করলে আপনার সম্মানের কোনো হানি হবে না।....পত্রপাঠ আপনি পালঙ্কখানা বিক্রির ব্যবস্থা করবেন।’ এই চিঠিতেই লেখা পুত্র সুরেনের কথা সুপারিশের মত: ‘...অসীমার প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।’

চিঠির এই প্রস্তাবে রাজমোহনবাবু যেমন অপমানিত বোধ করেন, তেমনি রাগে জ্বলতে থাকেন। তিনি তো নিজেই পালঙ্কটিকে অতি যত্নে সাবধানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খেন। এবার নানা কথায় ঠিক করলেন পালঙ্কটি বিক্রিই করবেন, প্রতিবেশী নকে বিক্রিও করে দেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়। মকবুল বিস্ময়ে, তার অবিশ্বাস্যতার এ পরিস্থিতি বুঝে কোননারকমে পাওয়া টাকা এদিক-ওদিক থেকে জোগাড় করে তা নেয়। পালঙ্ক তার ঘরে চলে যায়। রাজমোহনবাবু বিনা পয়সাতেই দিতে চায়, বল তাতে মনে করিয়ে দেয় যে সে বিনা পয়সাতেই নিত, কিন্তু পালঙ্কটা তো তার। উমার, তার নিজস্ব তো নয়, তাকে তো টাকা পাঠাতে হবে, তাই টাকা দিয়েই নিচ্ছে। এই কথায় রাজমোহনবাবুর যেন কোনো বিষাক্ত তীব্র তিরবিদ্ধ হওয়ার জ্বালা এলো। রাগে, ক্ষোভে,

অপমানে 'ও তো পালং না, খাট না, ও আমার চিতের কাঠ'-এই কথা বলে সত্যিই হস্তান্তর করেন মকবুলকে।

কিন্তু রাগ কমলে রাজমোহনবাবুকে পালঙ্ক বিক্রির বিষয়টা গভীরভাবে ভাবায়। নিজের পালঙ্কহীন ঘরটা যত দেখেন ততই যেন তার বুকের ভিতরটা ফাকা, খালি, শূন্য বোধ করেন। এক গভীর মায়া তাকে তার পালঙ্কের মায়ায় জড়িয়ে ধরে। বুকের মধ্যে অসীম শূন্যতা, দশ বছর আগে মৃত স্ত্রী সরলার মুখ, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর নাতি-নাতনির বিচ্ছেদ দুঃখ তাকে গভীর যে উপলব্ধি দেয়, তা হল—তিনি একা, এই শূন্যপুরীতে, এই শন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ। পরের দিন রাজমোহনবাবু নিজে আসেন মকবুলের। বাড়ি। সন্তর্পণে পালঙ্কটা দেখেন তাকিয়ে। পালঙ্কে গদি নেই, একটা মাদুর আর ছেড়া কথা বিছানো। ওয়াড়হীন তেল চিটচিটে গোটা দুই—যেনবা চিতা থেকে তুলে আনা বালিশ রাখা! ঘরের পরিবেশ নোংরা। একসময় মকবুলকে বলেন টাকা ফেরত দিয়ে নিজের পালঙ্কটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা।

এই প্রস্তাবেই আসে প্রবল বিরোধ। মকবুল কিছুতেই আর ফেরত দেবে না। ওটা তার কেনা, পছন্দের। খেতে না পেলেও পালঙ্ক আর সে বিক্রি করবেই না। যত দামই তিনি বা কেউ তাকে দিক না কেন। কথা শুনে অপমানে রাজমোহনের মুখ আরক্ত। মকবুল-স্ত্রী ফতেমার কথা—পালঙ্ক ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে—শোনেই না, বরং রেগে যায়। ওই পালঙ্কে ও এক ছেলেমেয়ে নিয়ে শোবে। পাড়ার পরিচিত মানুষজন মিটমাট করতে চাইলেও মকবুল কথা শোনে নি। শেষে রাজমোহনবাবু মকবুলকে জব্দ করার উপায় ভেবে তাকে সবরকমের কাজের জায়গা থেকে সরাতে নানা ফন্দি আঁটেন। মকবুলও কোনো কাজ না পাওয়ায় ছেলেমেয়ে নিয়ে ওর প্রায় পথে বসার অবস্থা হয়। তবু সে বিক্রি করে না। স্ত্রী ফতেমার কাছে মকবুলের যুক্তি—পালঙ্ক আমার তেজ। আমি তেমন হলে ধলাকর্তাকে খুনও করতে পারি।

অবশ্য খুন আর হয় না। ইতিমধ্যে রাজমোহনবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। আগে প্রায়দিনই রাজমোহনবাবু মকবুলের অনুপস্থিতিতে ফতেমার কাছে আসত লুকিয়ে খাটটা দেখে যেতে। অসুখের জন্য কিছু বাকস্ পাতা নেওয়ার ছলে। তাকে ফতেমাও জানায় খাট

বিক্র হবে না। প্রচার হয়ে যায় অভাবে মকবুল খাট বিক্রি করছে বেশি টাকায়। তালাকান্দার আতাজদ্দি শিকদারের কাছে। তখন রাজমোহনবাবু জ্বর আর আমাশায় অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। সেদিন রাতে রাজমোহনবাবুর কাছে ভৃত্য কালু নেই, ছটি নিয়ে শখের থিয়েটার দেখতে গেছে, বুবী ঝি-ও পথ্যের বাটি রেখে চলে দুর্বল পায়ে লাঠি ভর দিয়ে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে দরজায় তালা দিয়ে কোমরে চাবিগাছা বেঁধে মকবুলের সঙ্গে একা দেখা করতে আসেন। দুর্বলতায় পা কাপ জামা নেই, জুরে পুড়ে যাচ্ছে গা। পায়ে জুতো নেই। পরনে নেংটির মতো একখানা বস্ত্রখণ্ড। চশমা না পরলে হাঁটতে পারেন না, সেই চশমাও আনতে ভুলে গেছেন। অসুস্থ অবস্থায় ওকে আসতে দেখে মকবুল অবাক। রাজমোহন রাগে জিজ্ঞেস করেন মকবুলকে সে সত্যি পালঙ্ক বিক্রি করেছে কি না। মকবুল তাঁকে ঘরে পাতা পালঙ্কের কাছে আনে। পালঙ্কে প্রায় মূর্ছিতার মতো ফতেমা শুয়েছিল, উঠে পড়ে। কেরোসিনের ডিবে জ্বালে। খাটে এক ধারে দুটি শিশু মড়ার মতো পড়ে। আতাজদ্দির কথা জিজ্ঞেস করলে মকবুল জানায়, সে দুদিন উপোসে আছে, দশটাকা বেশি দিতে চেয়েছিল, শালাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সে ফতেমাকে জানিয়ে দিয়েছে না খেয়ে থাকলেও নিজের মত মান, জান বাঁচাতে খাট রাখতে চাই। ফতেমার ধরা ডিবের আলোয় দুজন নীরবে বসে:

‘সেই ধোঁয়া-ওঠা দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্কপ্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।’

নীরব থাকার কিছু সময় পরে মকবুল ফতেমাকে বলে—ছেলেমেয়েদের তা থেকে নামিয়ে নিচে শোয়াতে কারণ সে খাট রাজমোহনকে ফেরত দেবে। এর পরের চিত্রেই গল্প শেষ:

মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুইটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, বললেন, “খবরদার।” রাজমোহনবাবু স্বীকার করলেন প্রকাশ্যে, এতদিন গোপনে এসে পালঙ্ক দেখে গেছেন তিনি। সে পালঙ্ক খালি ছিল। রাজমোহনবাবুর শেষ স্বীকৃতি:

'আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরও দুইজনরে দেখলাম—দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'

স্ত্রী ফতেমার হাত থেকে কেরোসিনের ডিবা নিয়ে রাজমোহনবাবুকে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেয় মকবুল। এখানেই গল্পের শেষ।

'পালঙ্ক' গল্পের টানা আখ্যান বলতে যা বোঝায়, তা গল্পের প্লটে মেলে না ঠিক সেভাবে। রাজমোহনবাবু ও মকবুলের সংঘাত চিত্র যতটা বাইরের (outer) তা থেকেও অনেক বেশি অন্তরের (inner)। কলকাতাবাসী বউমা অসীমার পত্রের তাৎক্ষণিক তীব্রতম প্রতিক্রিয়ায় রাজমোহনবাবু অর্থাৎ ধলাকর্তা পালঙ্ক বিক্রি করে দেন প্রতিবেশী মকবুলের কাছে রাগ ও অভিমান, অসম্মান ও অপমানবোধে, কিন্তু পরের দিনই রাগ কমলে মকবুলের টাকা ফেরত দিয়ে, বরং কিছু বেশি দিয়েই, ফেরত নিতে চান। মকবুল তাতে রাজি হয়নি—বেশি টাকা দিলেও না। এই যে দ্বন্দ্বের, টানাপোড়েনের সূত্রপাত, তা উভয়পক্ষের মনের মধ্য থেকেই তৈরি হয়। তাই গল্পে আখ্যানের প্রত্যক্ষ সূত্র-স্বভাব যেমন নেই, সেভাবে বড় এক বা একাধিক ঘটনার সমাবেশও তৈরি হওয়া সম্ভব হয়নি। গল্পের প্লটের যে জট তা মানসিক সংঘাত থেকে ক্রমশ এক আধ্যাত্মিক স্বভাবের অনুগ হয়েছে।

মকবুলের ক্রমশ প্রবল পালঙ্ক প্রীতি রাজমোহনবাবুর অধিকার হারানোর ভয় ও হতাশাকে ততই বাড়িয়ে দেয়। একসময় রাজমোহনবাবু মকবুলকে অন্যভাবে জব্দ করার কথাও ভাবেন। তাকে একঘরে করা, তার আর্থিক অনটনকে তীব্রতম করে চাপ দেওয়ার পরোক্ষ প্রয়াসও করেন ধলাকা। এই তিক্ততার মধ্যে বড় ঘটনা নেই, কিন্তু ধীরে ধীরে মকবুলের অর্থনৈতিক অসহায়তা ওঠে চরমে। মকবুলও অনশনে থেকে ধলাকর্তার দাবির। কাছে মাথা নোয়ায়নি! অন্যদিকে মকবুলও প্রতিশোধ নিতে ধলাকর্তাকে শেষমেশ খুন করার কথাও ক্রোধের আবেগে ও জ্বালায়—যদিও খুন করেনি—স্ত্রী ফতেমার কাছে বলে ফেলে। এইভাবে আখ্যান inner-স্বভাবে অবয়ব পেতে থাকে।

অর্থাৎ ‘পালঙ্ক’ গল্পের যে আখ্যান তা গল্পকার তৈরি করেননি, তা স্বতঃস্ফূর্ত রূপ পেয়েছে। চরিত্রদের মনোলোকের বিপরীত দ্বন্দ্বদীর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকেই। চরিত্রই যেটুকু আখ্যান—তাকে অবয়বের পূর্ণতা দিতে থাকে। ধলাকর্তা গোপনে, ব্যক্তিক কৌশলে মকবুলের বাড়ি এসে ফতেমার উপস্থিতিতেই পালঙ্ক দেখে যাবার দিক ফতেমাকে বুঝতেই দেন না।মকবুল ধলাকর্তার, এমন তার অবর্তমানে, বার বার আসার ঘটনাকে অন্যভাবে নেয়—ফতেমাকে বলে রাখে যেন ধলাকর্তার পালঙ্ক নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ কোনােভাবেই না শোনে। উভয়ের সম্পর্কের যে গোপন বিষক্রিয়া—তার বীজ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হওয়ার কারণে নিহিত। দেশ-বিভাজন ও বাস্তুত্যাগের ঘটনায় সামিল ধলাকর্তার পুত্র ও তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বৈশিষ্ট্যে একধরনের অভিশাপই! তা আখ্যান শুরুর প্রথম চাবিকাঠি। পরের সূত্র—অতিপ্রাচীন মূল্যবান পালঙ্ক বিক্রয়-ঘটনা যোগ হয়। আবার দাম ফেরত দিয়ে পালঙ্ক নিয়ে নেওয়ার মানসিকতা, মকবুলের ফেরত দেওয়ার ক্রমিক তীব্র অনীহা, দুজনের উভয়কে জব্দ করার চাপা কৌশল, সর্বশেষ সেই কৌশলের নিষ্ফলত্বের পর আতাজদ্দি শিকদারের কাছে পালঙ্ক বেশি দামে বিক্রি করার খবর ধলাকর্তার কানে আসা—এসবই আখ্যানের বাইরের সূত্র যোগ ঘটায় না, সবই 'mental and delightful'। অর্থাৎ লেখক নিজে থেকে গল্পের জট পাকাননি—যা প্লটকে পরিণামী চমৎকারিত্ব দেয়, তা প্রধান দুই চরিত্রের কৃতকর্ম ও দুর্ভোগ ('doing and suffering') ধরেই পূর্ণতা পায়।।

গল্পের climax তৈরি হয়েছে উভয়ের মনের গভীরতল ধরেই। ‘পালঙ্ক’ গল্পের মহামুহূর্ত’ রচনার প্রস্তুতি শুরু অসুস্থ প্রায়-অক্ষম ধলাকর্তার শেষমেশ সন্ধ্যা-পরবর্তী নিজন সময়ে একা মকবুলের ঘরে আসার পর থেকে। তিনি খবর পান তালাকান্দার। আতাজদ্দি শিকদারের কাছে পালঙ্ক বিক্রি করছে মকবুল বেশি দাম নিয়ে;

“রাজমোহন দুর্বল জড়িত স্বরে বললেন,.... পালংখানা তুই বেইচা ছাড়লি হারামজাদা? আমারে না জানাইয়া বেইচা ফেললি?’...... মকবুল বলল, না ধলাকর্তা, করি নাই। আসেন, ঘরে আসেন ধলাকর্তা। হাত ধরে রাজমোহনকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল মকবুল।... ‘তাইলে বেচিস নাই? আছে?”

মকবুল বলল, 'আছে ধলাকর্তা।'

'আতাজদ্দি বুঝি আসে নাই?'

"মকবুল বলল, "আইছিল। দেড়শ'র ওপর আরও দশটাকা বেশি দিতে চাই তবু ফিরাইয়া দিছি। দুইদিন ধইরা উপাস ধলাকর্তা। তবু শালারে ফিরাইয়া দিলে পারছি। তবু শালার ক্ষিদার জ্বালারে ঠেকাইয়া রাখতে পারছি। বউটা কান্নাকাটি করতেছিল। কইলাম কি ধলাকর্তা, কইলাম—মাগী, আমারে আইজকার রীতখনি সময় দে। অবুঝ প্যাটটারে জোর কইরা খামচাইয়া ধইরা থাক। আইজকার মত আমার মান বাচা, জান বাচা, রাখতে দে পালংখানা"

এইভাবে জিবন্ত দৃশ্য climax এ গিয়ে থমকে যায়।

'পালঙ্ক' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য রাজমোহনবাবু তথা ধলাকর্তা ও দরিদ্র প্রতিবেশী মকবুল শেখ-দুজনেরই একটি পালঙ্কের অধিকারবোধ ও তা থেকে জাত জিদ এবং সংচেতনার মিশ্র যৌথ তাৎপর্যের মূল উৎস থেকে শিল্পের অবয়ব পেয়েছে। একজন প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল পারিবারিক মানুষের আভিজাত্যবোধ, তার রুচি, মমত্ববোধ আর্থিক সচ্ছলতার অনায়াস অহংচেতনায় সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পায়। সেখানে তার গর্ব, আত্মসম্মান। সাক্তিত্বের বিকাশের ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র সহায়ক হয়। ধলাকর্তার আকস্মিক রাগে। ক্ষোভে যেভাবে পুরনো দামী পালঙ্কটি মকবুলের কাছে বিক্রয়ের নামে হস্তান্তরিত হয়, বাগ পড়ে গেলে সেই আভিজাত্যকেই তা আঘাত করে। পালঙ্ক বিক্রি করা মানেই দারিদ্র্যের দীনতাকে সকলের সামনে বুঝিয়ে দেওয়া।

আবার মকবুল শেখ যখন হতদরিদ্র হয়েও তা কিনে নেয়, তখন তার মধ্যে জাগে দামী পালঙ্ক ঘরে আনার সূত্রে নতুন আভিজাত্য বোধের স্বতন্ত্র এক অহং-এর দিক। ধলাকর্তার রাগ পড়লে, পালঙ্ককে কেন্দ্র করে গভীর শূন্যতায় আক্রান্ত হলে যে অনুশোচনা, তা তাকে পালঙ্ক ফিরিয়ে আনার জন্য মনের গভীরে তাড়িত করে। মকবুল যে পুরনো বাসনার নব-আভিজাত্যে এক অহংবোধের অধিকারী হয়, তা থেকে এখন আর বিচ্যুত হতে রাজি নয়। অন্যদিকে ধলাকর্তাও মকবুল তা ফেরত না দেওয়ার

কারণে, আত্ম-অপমানে, আত্ম- আভিজাত্যবোধে প্রবল আঘাত পান। এই দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ সংঘাত থেকেই কেন্দ্রীয় বক্তব্যের শিল্পশরীরের উদ্ভাস ঘটেছে।

ঝোঁকের মাথায় ধলাকর্তা পালঙ্ক বিক্রি করেছেন। আর সেই পালঙ্ক কিনে দরিদ্র মকবুল শেখ এতদিনের চাপা প্রবল বাসনা পূর্ণ করতে সমাজের ওপরতলার একটা স্তরে উঠে আসতে পালঙ্কটাকে দেখেছে লুব্ধদৃষ্টিতে। সে পালঙ্ক কিনে তার শ্রেণী থেকে ওপরে উঠতে চেয়েছে। নতুন করে তার মধ্যে এক আভিজাত্য বোধের জন্ম! স্ত্রী ফতেমার কথার উত্তরে মকবুলের নবজাগ্রত অহংচেতনার উপযোগী উত্তর: ‘ও আমার কাছে মরা কাঠ নারে ফতি, ভারী তাজা জিনিস, ও আমার পুরুষের ত্যাজ’! পালঙ্ক যে গরিবের ঘরের সোনার মতো দামী অলংকার, তা মকবুলের আহ্লাদিত মন্তব্যে মেলে: “আরে গয়নাই তো আনতেছি ঘরে। কেবল তোর গয়না না বউ, আমারও গয়না। দুইজনে মিলা একসঙ্গে পরব। কী চমৎকার পালং রে ফতি। তুই তো বাপের জন্মেও দেখস নাই, আমিও না।”

পাশাপাশি ধলাকর্তা—যিনি কোনদিন বাড়ির বাঁশ, গাছ, এমনকি খড় পর্যন্ত বিক্রি করতে গিয়ে আত্ম-অসম্মানে নিজেকে ছোট মনে করেন, তিনি ভুল শুধরিয়ে পালং ফেরত পেতে মনের দিক থেকে মরিয়া। চাকর কালুর কাছে তাঁর আবেগরুদ্ধ আত্ম অনুশোচনা: ‘কাউলা, এ আমি করলাম কি, আমি হাতে কইরা মাটি খাইলাম,...'। পালঙ্ক ধলাকর্তার কাছে এক অভিজাত বংশের মূল্যবান সম্পদ! তার যত্নে ধলাকর্তার মায়া। পালঙ্ককে বড় মাথা-উঁচু আভিজাত্যের শিক্ষার অভিজ্ঞান করে। সেই পালঙ্কই যখন মকবুল শেখের ঘরে এমন: ‘উঁচু পালঙ্কের নিচে হাঁড়ি-পাতিল, ফতেমার গৃহস্থালি। উপরে গদি নাই।......তার বদলে একটি মাদুর আর ভেঁড়া ময়লা কাঁথা বিছিয়েছে ফতেমা। একদিকে ওয়াডহীন তেল-চিটচিটে গোটা দুই বালিশ। যেন চিতা থেকে কেউ তুলে নিয়ে

এসেছে...'তখন ধলাকর্তার পক্ষে এ দৃশ্য দেখা যায় না।’ পালঙ্কের এই যে অসম্মান। যেনবা তা ধলাকারও!

ধলাকর্তা পালঙ্ক ফেরত চান, মকবুল তার তীব্র প্রতিবাদী। দুজনের মানসিক সংঙ্গ ধলাকর্তা একসময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, মকবুল দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম। অন্ন জোটে না দ অন্তর। ধলাকর্তা গোপনে নানা ছলছুতোয় মকবুলের অবর্তমানে তার বাড়ি এসে ফতেমার সামনে পালঙ্ক দেখে যান। সেখানেও অপমানিত হন তিনি ফতেমার কথায়। শেষে তালাকান্দা ধনী আতাজদ্দির কাছে মকবুল পালঙ্ক বিক্রি করছে খবর পেয়ে নির্মুম ধলাকর্তা রাতের অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে মকবুলের ঘরে আসেন। মকবুলের পরিবার দড়ি উপোসে কাহিল। ধলাকর্তা এসে শোনেন মকবুল এত উপোসের চরম কৃচ্ছ্বসাধনের মধ্যেও পালঙ্ক বিক্রি করেনি। ধলাকর্তা এতে অভিভূত এবং বাকশক্তিহীন। ধলাকর্তাকে দেখে মকবুলও নীরব নিথর। এই নীরবতার মধ্যে লেখক স্বয়ং গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের ব্যঞ্জনাগর্ভ এক রূপচিত্র এঁকেছেন দুজনকে লক্ষ্যে রেখে। সে রূপচিত্রে গল্পের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের গভীর মনোলোকের অপরূপত্ব: .....মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিকধলা আর কালো—দুই রঙের পালঙ্কপ্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল। পরস্পরের দিকে। যে ধলাকর্তা এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে খালি পালংকই দেখে গেছেন, তাঁর শেষ খাটের ওপর ঘুমন্ত দুই ছেলেমেয়ে দেখে মানস-পরিবর্তন এক মহামানবিকতার জন্ম দেয়, এবং তারই মধ্যে মহান মুক্তির কথাও শোনান। তা কেন্দ্রীয় বক্তব্যের ও লক্ষ্যের নরম। উর্বর মৃত্তিকাপ্রোথিত শিকড়ের অভিজ্ঞান: ‘আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরও দুইজনরে দেখলাম দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।’

ধলাকর্তা শেষ মুহূর্তে তার নিজের দুই নাতি ও দুই নাতনির কথা মনে রেখে—যারা কলকাতায় আছে, এখানে এলে এই পালঙ্কের শোভাবর্ধন করত—তাদের সম্মিলিত করে চৌদোলার মধ্যে আরও দুজনের স্থান কল্পনায় প্রতিষ্ঠা দেন। এতেই ধলাকর্তার জীবনের শেষ নির্ভরতা। তাই তার শেষ নির্ভরতা হয় মকবুলের পরিবারও। যা ছিল আভিজাত্যের নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে সংঘাত, তা হল দূর, ধলাকর্তার কাছে মকবুল ও তার অস্তিত্ব বড় মানবতার প্রতিষ্ঠা দিয়ে দেয়। ধলাকর্তা ধর্মে বৈষ্ণব,

রাধাগোবিন্দের সেবক, পূজক। বারবাড়িতে পূজার মণ্ডপে তিনি ধ্যানমন্ত্রের জপে বাসনা জানান: 'দয়াল, আমার সব মায়ার বন্ধন কাটাও, আমাকে আমার বৃন্দাবনের পথে নিয়ে চল। তোমার ব্রজের রাঙ্গা ধূলায় আমার কামনা-বাসনা, আমার লাঞ্ছনা-অপমান ঢাইকা যাউক। এই বাসনাই। ধলাকর্তার মধ্যে মকবুলের সংসারে তার দুই পুত্রকন্যার অবয়বে বড় ঈশ্বরের ভাবনা আনে, প্রেরণা দেয়। মনেপ্রাণে মায়ার বন্ধন মুক্ত ধলাকর্তা হিন্দু হয়েও মুসলমান মকবুলের সংসার ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে মুক্তি পান, সেখানেই সমগ্র 'পালঙ্ক' গল্পের বড় রূপ, বড় মিলনের সবুজ সিক্ত তৃণক্ষেত্র। গল্পের শেষে তাই ধলাকর্তার মকবুলকে তার ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ, মকবুলেরও ফতেমার হাত থেকে কেরোসিনের ডিবা নিয়ে ধলকর্তাকে পৌঁছে দেওয়ার তোড়জোড়। শেষতম যুগ্ম সম্পর্কের প্রতীকী ব্যঞ্জনার বিশালতা, অসীমত্ব গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যেরই নিরঙ্গ রূপসন্ধানী!

'পালঙ্ক' গল্পের চরিত্র পরিকল্পনার মূলে কাজ করেছে গল্পকারের মননজাত প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বভাবনার ভিত ও ভিতর। রাজমোহনবাবু তথা ধলাকর্তা একা থাকেন সদ্যজাত পাকিস্তানে। পুত্র সুরেন ও বউমা অসীমা দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে কলকাতাবাসী। ধলাকতা কিছুতেই স্বভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজি নন। এর মলে যেমন স্বভূমি-প্রীতি আছে, তেমনি আবার জন্মভূমির সব বিক্রি করে চিরকালের জন্য কলকাতায় আসার ব্যাপার তার ব্যক্তিত্বেই লাগে, তিনি অভিমান সূত্রে আত্ম-অপমানে জর্জরিত হন।

যাঁরা নিখুঁত সংসারী, খাঁটি আদর্শের বিষয়ী মানুষ, জন্মভূমির প্রতি ভালবাসায় উর্বর মাটির মতো আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের অন্য কারোর কাছে অসম্মান পেলে, অপমানের আঘাত পেলে দ্রুত ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ হতেই পারেন। ধলাকর্তা বউমার চিঠিতে স্বাভাবিকভাবেই আহত হয়েছেন, অপমানিত বোধ করেছেন। তাই রাগে অন্ধ হয়ে দামী পূরনো ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদ পালঙ্কটিকে বিক্রি করে দেন। এখানেই তার প্রথম ভুল।

এই ভুলকে শুধরে নিতে তিনি তার পালঙ্কের ক্রেতা মকবুল শেখের দ্বারস্থ হন প্রায় ভিখিরির মতো। কিন্তু পালঙ্ক বাড়ি এনে দরিদ্র মকবুল আর এক আভিজাত্যে, অহং-এ তখন অন্য মানুষ। গরিবের সংসারে তার পালঙ্ক তার কাছে মূল্যবান সোনার থেকেও দামী। তার অধিকার চেতনার জাগরণ ও অধিকারকে বাস্তবে প্রয়োগ করায় বোকর্তার মনের আর একদিক তুলে ধরে। তা হল তার জিদ। যাকে সন্তানের থেকেও যত্নে বাড়িতে রেখেছেন, যিনি কোনো সম্পত্তি ও তার সঙ্গে যুক্ত কোনো বিষয়ই বিক্রির বিরোধী, তিনি ক্রমশ মকবুলের কাছে হারতে থাকেন।

শুধু তাই নয়, ধলাকার মতো মানুষও গরিব মকবুলের ক্ষতি করার, অন্ন বন্ধ করার মতলব করেন। নানাভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে উঠেপড়ে লাগেন। এই আচরণ ধর্মভীরু সৎ ধলাকর্তার স্বভাবের বিরোধী। আসলে পালঙ্কই অর্থাৎ প্রবল পরিচ্ছন্ন আদর্শবোধ ও আভিজাত্যই, আত্ম-অপমানের জ্বালাই তাকে নিচে নামায়। ধলাকর্তা ক্রমশ ট্র্যাজেডির প্রধান উপকরণ হয়ে ওঠে। তার স্বভাবের এক ভ্রান্তি (error) তার মধ্যে 'ট্র্যাজেডি ঘটার রন্ধ্রপথ' (tragic flaw) তৈরি করে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অপমান ও অভিমানের কষ্ট, অস্বস্তি, বিভ্রান্তি কাটাতে পালঙ্ক বিক্রি করা! সুতরাং গল্পের মধ্য অংশ পেরিয়ে প্রবল অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত ধলাকর্তা এক পরিশ্রান্ত ট্র্যাজেডির নায়ক-উপাদানই হয়ে উঠতে থাকেন। তখন তার পালঙ্ক ফিরিয়ে আনার প্রবল বাসনা তার দৈনন্দিন জীবন স্বভাবের চালিকা শক্তি। তার "doing and suffering" তার স্বভাবের উত্তুঙ্গ রূপাবয়বে নিবদ্ধ থাকে।

কিন্তু ধলাকর্তার মেরুদাড়া ভাঙতে থাকে তার অসুখ, বয়সের জরা ইত্যাদি। তাঁর মধ্যে যতটা বয়সের শূন্যতা, তীব্র নির্জনতাবোধ, নিঃসঙ্গতার বেদনা জাগতে থাকে, ততই তিনি ট্র্যাজেডির ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্য তৈরি হতে থাকেন ভিতরে ভিতরে:

"হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতাবোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তার কেউ নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে-যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনীর বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যে তার থেকেও

নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শুন্যপুরীতে এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।”

এই শূন্যতার মূল ‘পালঙ্ক’ অন্যের হাতে চলে-যাওয়া। ট্র্যাজেডির মূল সেই পালঙ্ক। তবে ধলাকর্তার কঠিন বিষয়-ভাবনা বিষয়বিহীন বিষয়ীর আত্মতায় ক্রমশ হয়েছে নিহত আলোকপ্রাণ।

তার মধ্যে ছিল ঈশ্বরভক্তি। রায়বাড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন রসরাজ শ্রীগোবিন্দ তার ধ্যানের দেবতা। তাঁকে স্মরণে রেখেই ধলাকর্তা এক আধ্যাত্মিক মুক্তিবাসনা পোষণ করেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তার জ্বর ও রক্ত-আমাশয়ে অসুস্থ হওয়া। এর সঙ্গে গুজব আসে মকবুলের তালাকান্দার আতাজদ্দি সিকদারের কাছে বেশি টাকায় পালঙ্ক বিক্রির কথা। ধলাকর্তা আসেন রাতে একা মকবুলের বাড়ি। গুজব মিথ্যে প্রমাণিত হয়। পালঙ্কের সূত্রেই মকবুলের বিক্রি না করার মননধর্মে তিনি শান্তি ও সান্ত্বনা পান। এখানে তিনি আর ট্র্যাজেডির চরিত্র নন। এবার compromise-এর পালা। ঈশ্বরের ধ্যানে মনের প্রসারতায় ধলাকর্তা একসঙ্গে দুই যুগের, দুই জাতের, দুই বর্ণের ব্যবধান ঘুচিয়ে মকবুলকে যেন আশীর্বাদ করেন। তাদের পুত্রকন্যার মধ্যে রাধাগোবিন্দের ধ্যানী রূপ ধরে আপন নাতি নাতনিসহ চারজনের মিলমিশে নিজেই ট্র্যাজেডি থেকে ভিন্ন চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তার এই পরিবর্তনে পালঙ্ক বিক্রি না হওয়ার সুখ-আনন্দ ও নিজের ও মকবুলের পরিবারকে এক করে ভাবার মধ্যে ধলাকর্তা মৃত্যুহীন বড় মাত্রা পান। ধলাকর্তা লেখকের হাতে নতুন মাত্রায় এক প্রশান্তির মানুষ যিনি জীবনকে মুক্তির শ্বাস নিতে উদ্দীপিত করেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে এক নব জীবনদর্শনে উজ্জ্বল তার সৃষ্ট রাজমোহন চরিত্র।

অন্যদিকে মকবুল আর এক ব্যক্তিত্ব যে একমাত্র ধলাকর্তার পালঙ্কের সূত্রেই আর এক মাত্রার রূপ পায়। পালঙ্ক নিজের অধিকারে রাখতে তার যাবতীয় জিদ কৃচ্ছসাধন, উপবাস, অসহায়তা—সবই পালঙ্ক ধরেই কাঠিন্য ও গভীরতা পায়। স্ত্রী ফতেমাকে ধরেই মকবুল শেখের বিবর্তন গল্পে কিছুটা ধরা পড়ে। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, গল্পে মকবুল শেখের যে সব প্রতিক্রিয়া, সক্রিয়তা, সেগুলি ধলাকর্তার পালঙ্ক সূত্রেই

একমাত্র প্রাধান্য পাওয়ায় এক অর্থে মকবুল ‘dependent' চরিত্র, তুলনায় ধলাকর্তা independent। তার বিস্তারিত ইতিহাস আছে, তার জীবনে দেশ-বিভাজনের অভিশাপ ও দুরবস্থা আছে, পাকিস্তানে মকবুলের মধ্যে সেরকম কিছু ধরা পড়ে না। ধলাকর্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, গল্পের শেষেও তার সিদ্ধান্তই এক গভীর সত্য স্বভাব পায়।

ধলাকর্তার সঙ্গে মকবুলের তফাত দুই সময়ের। প্রথম জন বৃদ্ধ, দ্বিতীয় জন তিরিশ বত্রিশ বছরের জোয়ান পুরুষ। তার স্ত্রী ফতেমা একুশ-বাইশ বছরের যুবতী। ধলাকর্তার সঙ্গে মকবুলের বয়সের এবং সময়ের মাপে লক্ষণীয় প্রজন্মের ব্যবধান। নবজাত আভিজাত্যের বোধে মকবুল পালঙ্কের প্রীতি, বিলাস মনের গভীরে লালন করে। অবশ্যই তার পালঙ্কপ্রীতি তাকে আলাদা এক মানুষ করে তুলেছে। সেই স্বতন্ত্র নবব্যক্তিত্বে কঠিনতম উপবাসে কাটিয়েও ধলাকর্তার দাবির কাছে পালঙ্ক ফেরত নেওয়ার চাপের সঙ্গে কোনো compromise করেনি। এখানেই সে বিশিষ্ট। পালঙ্কের সেগুন কাঠ, তার নকশা জাতীয় কারুকার্যের বিস্ময়করতা, আর শৌখিনতা ও বিলাসের দুগণ স্বভাবের আকর্ষণ মকবুলের মতো দরিদ্র এক মানুষের পক্ষে লেত বিষয়। পালঙ্ক কোন যুক্তি মকবুলের পক্ষে এ সুযাোগ ছাড়া মাোটেই সঙ্গত হবে না। একটা জিনিসের মত জিনিস অন্তত থাকুক মকবুলের ঘরে। দরিদ্র হলেও মকবুলের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য প্রতি তার চরিত্রের আর এক মাত্রা আনে।

পালঙ্কটি ঘরে আনার পর একসময়ে খুশিতে মকবুল যে ভাবে ও ভাষায় ফতেমার সঙ্গে কৌতুক করে, তাতে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও স্ত্রীকে নিয়ে কৌতুক করার অভ্যাসটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চমৎকারিত্ব আনে! মকবুলের স্ত্রীর প্রতি কৌতুক: ১. ‘যদি পছন্দ হয় পালং-এর বদলে আমার বিবিরে নিয়ে যায়ন।’ ২. ‘তোমাগো বুক কাপর জন্যেই হইচে, কাপলেই সুন্দর ঠেকে।' ৩, ‘এ চউখের ধরনই আলাদা।... দুনিয়ার সোন্দর জিনিস দেখলে এ চউখে রঙ ধরে।’ স্ত্রীকে সামনে রেখে এমন যার অন্তরঙ্গ সংলাপ মকবুলের অভাবের মধ্যেও মনের আর এক দিক দেখায় পালঙ্ক হাতে পাওয়ার আনন্দে। কিন্তু তার পালঙ্ককে নিজের কাছে রাখার জন্য যে ভয়ঙ্কর কৃচ্ছসাধন, তা তার চরিত্রের দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্ত্রীপ্রেম ও পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ

ভাববার ও সুন্দর করার স্বপ্নকে মনোরম করে। গল্পের শেষে অন্নকষ্টে হতোদ্যম, অসহায় মকবুল ধলাকর্তাকে পালঙ্ক ফেরত দেওয়ার কথা নিজে থেকেই বলেছে।

“ফতি, পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।

.... সে কি কথা মকবুল?

.... হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়া যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি ?”

মকবুল কিছুটা পরিবর্তিত চরিত্র। পরিবেশের চাপ, অর্থনৈতিক দুরবস্থার ও অসহায়তার শিকার মকবুল। কিছুটা বুঝি ধলাকর্তার প্রতি করুণাতেও! কিন্তু তার থেকে ধলাকর্তার মানসিকতায় ঘটে উত্তরণ। তিনি দেখেন মকবুলের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে তাঁর নিজের কলকাতাবাসী দুই নাতি দুই নাতনির স্নেহদুর্বল অতীত অস্তিত্বের ছায়া। তিনি খালি পালং এ দেখেছেন চার নাতি-নাতনির চৌদোলার মধ্যে মকবুলের দুই সন্তান মিলিয়ে চৌদোলার প্রসারিত দিক! ঈশ্বরভাবনা ও মানবিক স্নেহে ধলাকর্তার ঘটেছে আধ্যাত্মিক উত্তরণ। এই অর্থেই তার মধ্যে আলোকপ্রাণতা! মকবুল থেকে, এ যুগ থেকে প্রাচীন যুগের মানুষের মনের বিস্ময়কর বদল গল্পের কেন্দ্রীয় সত্য ও সত্যদর্শন! ধলাকর্তা ও মকবুলের মধ্যে। এখানেই মৌল পার্থক্য।

বাস্তবত একটি পালঙ্ক ব্যঞ্জনায় একটি প্রতীককে কেন্দ্র করে এক প্রাচীন ও প্রবীণ মানুষের মানসিক বিবর্তনই গল্পের মূল লক্ষ্য হওয়ায় ‘পালঙ্ক’ গল্পটি অবশ্যই চরিত্রাত্মক।

সচরিত্রাত্মক বৈশিষ্ট্য ধরেই বর্তমান গল্পের শ্রেণী-পরিচয় মোটামুটিভাবে ধলাকর্তা প্রধানত, এবং সমান্তরাল মকবুল শেখ-দুজনের সামাজিক ও গজ, স্বভাব ও ভাবের বিবর্তনেই গল্পের এমন শ্রেণীভাবনার নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা চরিত্রের চিত্ত-স্বাতন্ত্র, নিজস্বতা বিবর্তন-এর মধ্য দিয়ে বিশাল মানবতায় উতে ধাবিত হওয়া এক স্বভাবের অপূর্বত্ব ও শিল্পের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। ভাবের ছায়া-স্বভাবে মকবুলের এই প্রজন্মের আশা,

বাসনা-কামনা, অভিজাত তত ও আত্মসম্মানের জাগরণ—গল্পের প্রধান দুই চরিত্রের মহনীয় দিক তুলে ধরেছে। গল্পের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য চরিত্রধর্মের আলোয় আলোকিত।

গল্পের 'ক্লাইম্যাক্স' বা 'মহামুহূর্ত' কোনো ঘটনায় আসেনি, এসেছে চরিত্রের মনোলোকের অন্ধকার অধিলোক থেকে আলোর দ্যুতিময়তায়, তার স্ফুরণে। যেহেত গল্পটি ঘটনাশ্রয়ী নয়, বিশেষ ভাবের ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে ভাবেরই বিস্ফারক্ষেত্র, তাই চরিত্রের প্রকাশমূলকতায় শেষে সব ঘটনা বর্জিত হয়ে ভাবের দ্বিস্তরে ক্লাইম্যাক্স ও পরিণামী ব্যঞ্জনা চিত্রল হয়েছে। লেখক ধলাকর্তা ও মকবুলের নিবিড় নীরবতার নিপুণ ছবি এঁকে নিজেই 'চরমক্ষণে' যেন বা অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের মতো এঁকেছেন: 'ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্কপ্রেমিকের' অপলকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার চিত্র! এর পর এসেছে গল্পের শেষে দুটি সিদ্ধান্ত—প্রতীকে ১. পালঙ্ক এক চৌদোলা—যার ওপর ধলাকর্তার চার নাতি-নাতনির সঙ্গে মকবুলের দুই পুত্র-কন্যার সহাবস্থানের ভাবনা, ২. পালঙ্কের বাসনার উর্ধ্বে আর এক সহাবস্থানে মকবুলের ওপর ধলাকর্তার নির্ভরতার প্রতীকে বড় জীবনভাবনা! পরিণামী ব্যঞ্জনার দুই স্তরে বিস্তার ও অসীমতা গল্পের বিশেষ ভাবকে করেছে তীব্র, গভীর।

গল্পের মূল ভাব অবশ্যই একমুখিন। কোথাও তার অতিবিস্তৃতি নেই অপ্রয়োজনীয়তার স্বভাবে। পালঙ্ককে কেন্দ্র করে প্রাচীন আদর্শের ধলাকর্তা ও নবীন প্রজন্মের মকবুল এক হয়ে গেছে বড় মানে ও মর্যাদায়। সেখানে দুই জাতের বিভেদ নেই। হিন্দু-মুসলমান হয়েছে এক ও একাত্ম। হিন্দুর অবিভক্ত বাংলার 'পালঙ্ক'-বাসনা আর মুসলমানের নব পাকিস্তান সমাজপ্রেক্ষিতে 'পালঙ্ক'-আকাঙক্ষা মিলেমিশে বানভাসির মতো একাকার। ধলাকার গৌরবর্ণের যে আভিজাত্য এবং মকবুলের কৃষ্ণবর্ণের যে কারণে যে বিচ্ছিন্নতার আড়ষ্ট স্বভাব—সব মানুষের সাদা-কালোর উর্ধ্বে পালঙ্ককে এক প্রান্ত-অতীত সুদূর মানবতার স্বভাব দেয়। এসবই গল্পে নির্মিত হয়েছে ভাবের গতিপ্রাণতার একমুখিন স্বভাব দিয়েই! গঙ্গে আখ্যায়িকা চরিত্রে আছে অন্তঃশীল, নানান চিত্রে তার বাইরের রূপ! গল্পের প্রকাশরাতি ও ভাষা একাধিক চিত্রে হয়েছে সফল

অঙ্গের লাবণ্যময়। গল্পের মধ্যবর্তী সমস্ত আলো মুখরতা স্তব্ধ ও গভীর হয়েছে বাক্যহীন ধলাকর্তা ও মকবুলের নীরব অপলকে দেখা স্বভাবেন পারস্পরিক বৈপরীত্যের স্বতঃস্ফূর্ত সহমিলনে, সম্মেলনে। মকবুল-ফতেমার কৌতুক সিক্ত সংলাপ, ধলাকর্তার রাগ ও অভিমানের ভাষা, শেষে মকবুলের ওপর ধলা নির্ভরতার ভাষা,—সবই 'পালঙ্ক' গল্পের ভাষাদর্শের স্বর্ণময় বিভার সঞ্চার ও সঞ্চালক।

১৪.৫ অনুশীলনী

১। 'অভিনেত্রী' একটি অনুভবের গল্প আলোচনা করো।

২। 'অভিনেত্রী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাবণ্য, যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।

৩। 'অভিনেত্রী' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৪। 'রানু যদি না হতো' গল্পটির নাম কতটা ব্যাখ্যাশ্রয়ী- আলোচনা করো

৫। 'রানু যদি না হতো' গল্পের আর্থসামাজিক পটভূমি সম্পর্কে লেখ।

৬। স্বাধীনতা -উত্তর সময়কাল ও দেশ বিভাজন এর ঘটনা কিভাবে উঠে এসেছে 'হেডমাস্টার' গল্পটিতে?

৭। 'হেডমাস্টার' কি যথার্থ চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

৮। দেশ বিভাজনের অভিশাপ, বেদনা, নিঃসঙ্গতা ও আর্থিক দুরবস্থা একই সঙ্গে ধরা পড়েছে 'পালঙ্ক' ছোট গল্পটিতে আলোচনা করো।

৯। ছোটগল্প হিসেবে 'পালঙ্ক' গল্পটি কতদূর সার্থক হয়েছে?

১০। জাতিভেদ এবং অহং চেতনা কিভাবে 'পালঙ্ক' গল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে- আলোচনা করো।

১১। নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব 'পালঙ্ক' গল্প অনুসারে আলোচনা করো।

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ সাহিত্য বিহার

২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা।

৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—'আত্মকথা', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২

৪। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী

৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—'গল্প লেখার গল্প' (১-১৫ জুলাই ১৯৭৫) বেতার জগৎ পত্রিকায় প্রকাশিত

৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র-'জন্মভূমি' ভাঙ্গা হাইস্কুল শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, শান্তিনগর ঢাকা, বাংলাদেশ,

৮। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—

৯। অরুণকুমার মুখপাধ্যায়—সাহিত্য সন্ধান, পরিবধিত ২

১০। বীরেন্দ্র দত্ত—বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, এস পি পাবলিশিং, কলিকাতা,

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খণ্ড—গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা,

১২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়—শিল্প সাহিত্য দেশ কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা,

১৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র—অসমতল গল্পগ্রন্থ ২য় সংস্করণ

১৪। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, চতুর্থ প্রকাশ,

১৫। নারায়ণ চৌধুরী-নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প'